স্বপ্ন
দেখার
অধিকার

স্বপ্ন দেখার অধিকার

মহাশ্বেতা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭

সোমাকে-

প্রকাশকের নিবেদন

একটি উপন্যাসে বা একটি ছোটগল্পে লেখকের মানস জগতের অনুসন্ধান কোনো কোনো সাহসী সমালোচক বা কখনও কখনও উৎসুক পাঠক করে থাকেন। কিন্তু পাঠক বা সমালোচকের হাতে যখন একসঙ্গে একাধিক উপন্যাস বা উপন্যাসিকার একটা সংকলন এসে পড়ে, তখন তাঁরা লেখকের একটা সামগ্রিক পরিচয় পেয়ে যান, আগ্রহী পাঠক লেখকের মানস জগতে একটা অনায়াস প্রবেশাধিকার লাভ করেন। *স্বপ্ন দেখার অধিকার* এই রকম পাঁচটি ছোট বড় কাহিনীর সংকলন। পাঠকের সামনে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে তাঁর আর একটি কার্যক্রমও উদ্ভাসিত হয়, সেটি তাঁর মানবদরদী সমাজ-সচেতনতা। সেই পরিচয় সামনে রেখে এই সংকলনটি যখন পড়া যায়, তখন মনে হয় এই গ্রন্থটি যথার্থই তাঁর সাহিত্য ও সমাজকর্মের প্রতিনিধিস্থানীয়। সমাজের তথাকথিত ওপরতলার মানুষদের মুখে আমরা অনেক মহৎ সব শব্দ ও স্লোগান শুনি—কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ো, জাতপাতের বিচার শিকেয় তোলো, পিছড়েবর্গ ও ব্রাত্য সমাজকে এগিয়ে আনো, স্ত্রী-স্বাধীনতা, পুরুষ-নারীর সমানাধিকার, ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এগুলি যে কত অসার ফাঁকা আওয়াজ তা আমরা সবাই মর্মে মর্মে জানি। তাই তো গরীব চাষী ধনী মহাজনের চক্রান্তে নিষ্পিষ্ট হয়, গরীব পাতাকুড়ানি লম্পট ধনীপুত্রের হাতে ধর্ষিত হয়, জন-কল্যাণকামী প্রচেষ্টা স্বার্থান্ধ মানুষের চক্রান্তে বানচাল হয়, সমাজসেবী তরুণদের [illegible] অপবাদ দিয়ে কারারুদ্ধ করার ব্যবস্থা ক'রে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। পুলিশ একদা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার ছিল, আজও বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, শাসকদের একাংশ আজও ধনী অত্যাচারী মাফিয়া সমাজের বশংবদ। তাই তরুণ দেশভক্তের প্রাণ যায়, বিশ্বায়নের নামে বিদেশী পুঁজির স্বার্থে সুবিশাল বাঁধ তৈরীর জন্য অথবা নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গরীব মানুষ বার বার উৎখাত হয়। যারা ধর্মের বেড়া ভেঙে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যায়, তাদের পদে পদে হেনস্থা হতে হয়। স্বপ্ন দেখার অধিকার কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র আজও চলেছে, দেশের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত, কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত। নিপীড়িত মানুষদের জন্যই মহাশ্বেতা দেবী আন্দোলন করেন নিজের জীবন বিপন্ন করে, সেই সঙ্গে এঁদের জন্যই কলম ধরেন—একটি মাত্র দুর্দমনীয় আশায়—স্বপ্ন দেখার অধিকার একদিন যথার্থ হবে, বাস্তব সফলতার মধ্যে দিয়ে ; যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন চলবে সৎমানবাত্মার এই সংগ্রাম। এই সংকলন সেই অনন্ত সংগ্রামেরই এক লেখচিত্র।

ঃ গ্রন্থসূচি

স্বপ্ন দেখার অধিকার

বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে।   -এর পরেই স্বপ্ন দেখলে দেখ, দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন যা দেখায় সেই সব স্বপ্ন দেখ। এহেন নিষেধাজ্ঞা বহুদিনের। কারা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দেয়? তা কখনো জানা যায় না, তাই আমি জানি না। একদিন একটি তরুণ (যে কিছুতে তেমন সফল হতে পারছে না, যেমনটি হলে মেয়েটি তার সঙ্গে বসবাস করে, নয়তো তাকে বিয়ে করে) বলেছিল। আমাদের সময়টা অভিশপ্ত। আমাদের কোনো স্বপ্ন নেই। যে স্বপ্ন আছে, তা মিলিয়ন-বিলিয়ন তরুণ তরুণীর আছে। ম্যানেজমেন্টটা পাশ করি। গরিবভাবে চাকরি শুরু করি মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকায়, তারপর উঠতে থাকি,— সবচেয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত থামা যাবে না।

—সব চেয়ে ওপরটা কি রকম?

—টপ্। সেখানে উঠতে উঠতে আমি বুড়ো, চল্লিশ বা পঞ্চাশ তো হয়েই যাবে। সেখানে উঠে কাদের দেখব?

—কাদের?

—আমার মতোই মিলিয়ন-বিলিয়ন মানুষ সব। ঠিক আমার মতো দেখতে কি না তাও জানব না। একই পোশাক ও জুতো সকলের। ব্যাগে গোছা গোছা গোছা ক্রেডিট কার্ড। কি ভয়াবহ তাই ভাবুন!

—আমাকে বলছ, আমি তো ওসব বুঝিই না!

—লাকি, আপনারা খুব লাকি'

— কিসে?

—বুঝতে পারছি, আপনাদের মনে আজও স্বপ্ন আছে।

—তোমাদের নেই?

—না। মানে... কোনো নিজস্ব স্বপ্ন নেই। রিমাও তেমনি। ওর স্বপ্নও মিলিয়ন-বিলিয়ন মেয়ের স্বপ্ন। ও নিজেও ওইরকম একটা স্যালারিতে কোথাও ঢুকবে। আমাকে নিয়ে উঠবে টপে। তারপর দেখবে....

—থাক থাক। বলেছ তো কি দেখবে।

—সাবান কিনতে প্যারিস যাবে, গরমে সুইজারল্যান্ড!

—আর তুমি?

—আমিও যাব, আমিও যাব। বললাম না, আমরা ওই একই ছাঁচে ঢালা।

ছেলেটি অল্প অল্প কাঁদছিল। আবার ঘন ঘন মাপও চাইছিল। একটু ড্রিংক করলে যা হয়।

—আমার কোনো স্বপ্ন নেই।

আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। স্বপ্ন তো দেখবে তরুণরাই। আর তারা যদি স্বপ্ন না দেখে, তা হলে তো অচলায়তন সরবে না, নড়বে না। তরুণরা, একমাত্র স্বপ্নতাড়িত তরুণরাই পারে নিশ্বাসের বায়ুকে বহমান রাখতে। সব কিছু তো টি. ভি. বিজ্ঞাপনের কদর্য, কুৎসিত প্যাকেজ-পণ্য নয়।

এই মিলিয়ন-বিলিয়ন ছেলেমেয়েরা দেশের সমগ্র জনসংখ্যা নয়। তার বাইরে যে পৃথিবীতে অনেক ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন মানুষ আছে, তাদের স্বপ্ন থাকে না?

আমি একজন পাগলা-খ্যাচাকে জিগ্যেস করেছিলাম, এমন কি হতে পারে, যে কোনো সুপার শক্তি মানুষের স্বপ্নগুলো বন্দি রাখতে পারে?

পাগলা-খ্যাচারাই প্রকৃত জ্ঞানী হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম সমুদ্র পৃষ্ঠের মতোই অবিচল তাদের প্রজ্ঞা।

সে বলেছিল, নিশ্চয় পারে। তারা দুনিয়া জুইড়া সন্ত্রাস চালায়, আর অখন আমাদেরে সন্ত্রাস সাগরে নিমগ্ন করছে। তাদের হাতে তো আমরা বন্দি। আপনে যার কথা কইলেন, তারই বাই-লেন সংস্করণ আমার নাতিটা। এখন তো কেউ লাখ টাকার স্বপন দেখে না। ওরা ন্যাশনাল ট্রেজারির স্বপ্ন দেখে। কয়, কয়েক কোটি টাকা না থাকলে বাঁচা মুশকিল।

—আপনার ছেলে কি বলে?

—কি বলব? হ্যাঁ সোনা, ঠিকোই কইত্যাছ, এই সব বলে। আর বলিয়েন না। ঘরে ঘরে একটি কইরা সন্তান। আমার পোলা আর বৌমা তাদের নয়নমণির বেঙ্গালোরে পড়াইছে। যা চায়, তাই দেয়। দুজনেই বেঙ্কে কাজ করে। দিক! পোলারে উচ্ছন্নে দিক!

—আপনাকে দেখতে তো হয়!

—ক্যান্ দেখুম? আমি আছি। পেনশান আছে, কবে লোন নিয়া বেহালায় বাড়ি বানাইছি। ওরা তো থাকে নিকো পার্কের কাছে। যাউক গা! অগো স্বপন ওই রকমই হইব। তয়, যারা দুনিয়া চালায়, তারা মানুষের ছোট ছোট স্বপন গুলিরে ভয় পায়! নিশ্চয় কোথাও বন্দি কইর্যা রাখে।

আশ্চর্য বটে! ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট স্বপ্নগুলো বন্দি।

কোথায়, কোন্ জেলখানায়?

সেখানে জেল ব্রেক হয় না?

হয়েছিল। ছোট ছোট স্বপ্নগুলো জেল ভেঙে বেরিয়ে যায়। এ খবর জানাজানি হতে বেজায় ভয় পায় নিয়ন্তারা।

একশো কোটি মানুষের দেশে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।

আমি যতদূর জানি, ওরা পলাতকই থাকবে।

যেমন মাগনদাসী পয়সা জমায়, পয়সা জমায়। রান্না পুজোর দিন ও তিন রকম মাছ রাঁধবে।

ওর স্বপ্নটি পলাতক, সে কারণে স্বপ্নটি জীবিত।

এরকম কত, কত অগণন।

কলকাতায় কালচারাল মালটিপ্লেকস এসে যাবে। "গেট টু কলকাতা", জোড়া আইফেল টাওয়ারের চেয়েও উচ্চতর গরিমায় হাজির হবে বাইপাসে।

এ সবই হবে, কিন্তু ইলেকট্রিক মিস্ত্রি নীতিশ চৌকিতে বেঞ্চিজোড়া নিয়ে বৌ ছেলে মেয়ের পাশে যখন শোয়, ওর মনে হয়, এ জীবনে কি ওর একখানা নিজের ঘর হবে না? দাদাদের ঘরদোরের পাশে একফালা জমি, নয় বেড়ার দেওয়াল, খোলার চালই হোক? একখানা ঘর, যেখান থেকে ওকে উৎখাত করা যাবে না। একখানা ঘর।

নীতিশ তার সামান্য স্বপ্নটি রাতের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। ওর ছেলেটা ফোলা পেট, রক্তশূন্য হাত পা সব ছড়িয়ে ঘুমোয়।

ও এ হেন স্বপ্ন দেখে, তা বউকেও বলে না। বউ বলবে, তোমার রোজগার তিন পয়সা তো আমি কি করব? দুটো বাড়িতে কাজ নিইছি। বালতি বালতি কাচতে আমার ড্যানা ভেঙে আসে তা জানো? সত্যি, ও দুটো না থাকলে রেলের চাকায় গলা দিতাম। তা মনে করো।

নীতিশ কোথায় যায়?

প্রগাঢ় ঘুমে ও চলে যেতে পারে টাকি নদীর ধারে বেলপাড়া। দাদাদের বার উঠোন ডিঙিয়ে পৌঁছে যেতে পারে নিজের ঘরে।

স্বপ্নে মাঝে মাঝে ও বেড়ার ঘর পায়। মাঝে মাঝে পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির ইটের দেওয়াল। স্বপ্নটা ইটের দেওয়ালে পৌঁছলে ঘরের চালে টালি ওঠে। নীতিশ চোখ বুজে থাকে, একটা দাওয়া, দাওয়ার কোলে রান্নাঘর, বাড়ির পিছনে একটি জনতা শৌচাগার,—জলটা পথের মোড় থেকেই আনতে হবে। এই স্বপ্নটি নীতিশের খুব মনোমত হয়। এটিকে ও পালিয়ে যেতে দিয়েছিল।

আশ্চর্য কি, এমন সব স্বপ্নগুলোই পালিয়ে গেছে!

২

অনি, কুশল আর বিশাল, দশকে খুব নিষ্পাপ কাজ করছিল। তিনজনই কৃষি অর্থনীতিতে মাস্টারস্ ডিগ্রি পেয়েছে। কুশল অধ্যাপনা করে। ওদের প্রধান মুশকিল হয় ওদের বয়স।

মনে হচ্ছিল অর্থবহ কিছু করতে হবে।

বয়স যাদের প্রাকত্রিশ, তাদের ক্ষেত্রে এহেন "মনে হওয়া" বড় ঝামেলা পাকাতে পারে।

বারবার ওরা ঝাপগাড়ি যাচ্ছিল, বিশাল বলেছিল, জলের ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করতে পারি তো "বারিয়ে"-এর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ঝাপগাড়ি, যেখানে বর্ষা সবসময়ে হয় না, সেখানে বর্ষার জল দূরে রাখার কাজটা করতে

এসব কাজকর্ম ওরা শুরু করে ১৯৯৮ সালে। খবরের কাগজে কখনো সখনো পঞ্চম পাতায় ছয় আট লাইন খবর হয়েছে ওরা। তা থেকে জানা যায়, তিন জন শিক্ষিত ছেলে ভূস্তরের জল যেখানে নীচে নেমে গেছে, সেখানে বর্ষার জল দূরে রাখতে শেখাচ্ছে। এবং ক্রমে ক্রমে সে বার্তা রটে গেছে গ্রাম হতে গ্রামে। পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েতে। এবং ওরা গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

এসব কাজকর্ম ভাঁওতা।

আসলে ওরা জনযোদ্ধা।

বলছে বটে পাঁচ হাজার টাকায় মহারাষ্ট্র-জলগাঁও টেকনিকে সেচহীন জমিতে পাঁচ থেকে দশ লাখ লিটার জল ধরে রাখতে সক্ষম "বনধারা" বানানো যাবে।

কিন্তু এসব ভাঁওতা।

এ যদি সত্যি হত, পঞ্চায়েত করত না? রাজ্য সরকার করত না? এত লোক বা আসছে কেন? ওরা জনযোদ্ধা। এর মধ্যেই গ্রামবাসীরা বলতে শুরু করেছে, জলের বেবস্থা তো কেউ করে না। কেন করে না? এরা পথ দেখায়, তাতেই এত ঝামালি?

জনযোদ্ধাদের বেলা একই ব্যবস্থা নিতে পারে প্রশাসন। আপাতত জেলার থানা লকাপ—জেল হাজত—নো ভিজিটর—জামিন অযোগ্য এ ভাবে রাখো। রাখো, ভুলে যাও।

এরা কোনো প্রতিরোধ করে না। কুশল ওর দাদাকে বলে, দেখ, জামিন দেয় না কি।

জেল পুলিশও ফাঁপরে পড়ে।

বিপজ্জনক ইস্তাহার ছড়িয়েছে শোনা যাচ্ছে। আজকাল রাজনীতিক দলে দলে এমন ঝামেলা। বাজার থেকে তোলা তুলবে, বাস দাঁড় করিয়ে রং নেবে, হক না হক অটো চালকদের কাছে চাঁদা নেবে, সেই লোক বোমবাজি করল, বাজারের লোকদের নালিশে পুলিশ তাকে ধরল।

ছাড়াতে এল কে?

স্থানীয় নেতা।

কাকে ধরলে কোন্ রাজনীতিক নেতা এসে ছাড়াবে কে জানে।

এরা জনযোদ্ধা?

শিক্ষিত, ভদ্র, ঈষৎ হেসে বলে, আপনার কাজ আপনি করুন।

অথচ এরাই না কি বিপজ্জনক।

—আপনারা ইস্তাহার ছড়িয়েছেন?

—পেয়েছেন তো, পড়ে দেখুন।

—বুঝব?

—কি করে বলব?

একটি ইস্তাহার মেজবাবু বুক পকেটে রেখেছিল।

বিপজ্জনক ইস্তাহার! বিপজ্জনক!

মেজবাবু জানে জনযোদ্ধাদের বেলা "নো মার্সি"। এরা সেই সর্বনেশে সত্তর সালের পুনরাবৃত্তি করতে চায়। দেশে সন্ত্রাসবাদ এরাই আনছে।

এদের পিছনে কারা আছে, কে জানে। বিপজ্জনক ইস্তাহারটি হিন্দিতে লেখা, নীচের লাইনে বঙ্গানুবাদ।

বর্ষা, জল সংরক্ষণ! (নির্ঘাৎ সাঁপুইয়েব প্রেসে ছাপানো। এ হরফ তো চেনা। আর সাঁপুই এখন ডি. টি. পি.-তে বড় হরফে ছাপছে!)

"কেড়িয়া ফার্ম প্যাটার্ন বনধারা!!" সস্তায় স্বউদ্যোগে জল সঞ্চয় বিষয়ে স্বউদ্যোগী হবার জন্য জল সঞ্চয়ের পদ্ধতি...

খরচ,—২০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা! অথবা ৭০০ টাকা + শ্রমদান! প্রতিবছর ৫০,০০০ লিটার থেকে ২০ লক্ষ লিটার জল পাবেন!!!

লিখেছে কি? জলসঞ্চয় করে ফিলটার পূর্বক নলকূপও বানানো যাবে।

মেজবাবুর চাষবাস আছে দক্ষিণ বারাসতে। সেখানে মাটি অন্য জাতের, জলাভাবও নেই। কিন্তু সহসা তার ইচ্ছা জাগে, সাতটা গ্রামের বাঁজা, শুকনো জমি নিয়ে নেয়। বর্ষা—জল সংরক্ষণ পদ্ধতি পরীক্ষা করে, প্রয়োগ করে।

এই তো লিখছে, যা ফলাবেন, তাই ফলবে। ইস! মহারাষ্ট্রে জলগাঁওয়ে বসে একটা মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার কি কাণ্ড করে ফেলেছে!

জনযোদ্ধাদের রীতিমতো সমীহ হয় ওর। কোথায় বন্দুক, বোমা, হাতিয়ার?

কে জানে এ সবই স্বপ্ন কি না! আসলে হয় তো এ সব সাংকেতিক ভাষা। এর অন্য অর্থ আছে। ছেলেগুলো পাগলাও আছে। কৃষি-অর্থনীতি বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়ে, বড় চাকরি পেতে পারতিস সহজেই। তা না করে কয়েকটা অভিশপ্ত গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু করলি।

কুশলের বাবা, অনির মা বাবা চুপ করে থাকতে পারেননি। তাঁদের চেষ্টা ও দৌড়াদৌড়িতে এদের জামিন হয়। বিশালের বেলা দিল্লি থেকে চলে আসেন সরদেশাই। বিশালকে বলেন, জামিন আমি করাব, কিন্তু তুমি সিধা যাবে "বারিষ"-এর হাজারিবাগ কেন্দ্রে। আর কিছু ভাববে না।

—এরা যাবে না।

—আমার মনে হয়, গেলে ভালোই করবে। কিছুকাল থাকুক, কাজ করুক!

অনি হেসে বলে, কাজটা এখানেই দরকার। তিনটে জেলা আছে, যেখানে বর্ষার জল ধরে রাখতে পারলে ওদের চাষও হবে, আবার একটা নতুন জিনিস শেখাও হবে।

সরদেশাই খুব চিন্তাকুল হয়ে বলেন, তোমাদের উগ্রপন্থী বলছে? আশ্চর্য! আমাদের সংগঠন ভারতে এগারোটা জায়গায় কাজ করছে...বাই দি বাই, অনি! তোমার আংকল বুড়ঢা চৌধুরী?

—হ্যাঁ। ওঁর কাছে আপনার নাম শুনেছি।

—আসে মাঝে মাঝে?

—খুব বেশি নয়। তবে কলকাতা বইমেলাতে আসে, ওর ভাই...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। অ্যাওয়ার্ড দেয় তার নামে। যাক! এখন কি করবে?

—পুলিশ লেগে থাকবে, তবু গ্রামেই যাব, ওখানে কাজ করব।

—দেখ, "বারিষ"-এর একটা ইউনিট।

রাতে অনি ওর মা বাবাকে বলেছিল, গ্রামে কাজটা করতে পারলে মা.. ভালো লাগবে...ওরাও একটা নতুন জিনিস শিখবে.. ওদের আগ্রহ যদি দেখতে!

মা আর বাবা ওর চোখ মুখ দেখছিলেন। ছাত্র জীবন শেষ হবার পর ওকে এতটা খোলামেলা ভাবে খুশি হতে দেখেননি। অনি, অনি ! ওঁদের একতম সন্তান! একতম সন্তানদের হাওয়া যখন এল, সেই সময়েই ও জন্মেছে। ছোটবেলা মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকত। বলত, মা! আমার আরেকটা ভাই, একটা বোন নেই কেন? নন্দনের ভাই আছে, তীর্থঙ্করের বোন আছে।

সেই অনি! অসীম রায়ের "অনি" পড়ে ছেলের নাম "অনীক" রাখা। অনীক তো থাকেনি। অনিই হয়ে গেল। জরুরি অবস্থার বছরে জন্ম, নাম অনি। বাবা, মা, অনি খেতে বসে কথা বলছিল। বাবা বলল,—তোদের যে জনযোদ্ধা বলছে, তা তোরা কি এক্সট্রিম লেফ্‌ট হয়ে গেছিস?

—না বাবা, মা তুমিও শোন। শুনেছি ছোটমামা সেই সময়ে রাজনীতি করত। তাদের কথা অনেক শুনেছি। তোমাদের একটা আনুগত্য রয়ে গেছে।

—অতীতের প্রতি। আর, বুঝতে তো পারি, সেটা ছিল, ষাট-সত্তর দশক, সারা দুনিয়াতে তরুণদেরই প্রভাবিত করে। আশ্চর্য কি, তোর ছোটমামা! কি বয়স বা ছিল! আমাদেরকে ওর মৃত্যুটাই যেন শিখিয়ে দিয়ে গেল!

—আমি ওসব দেখিনি! আমরা ছাত্রজীবনে পড়েছি অনেক, রাজনীতি নিয়েও ভেবেছি, মনে হয় না প্রভাবিত হয়েছি। ক্ষীণ হেসে বলে, কোনো রাজনীতিক দল ভিড়ে পড়ার আগ্রহ হয়নি। ওদের তো কিছু দেবার নেই।

—কিন্তু এই গ্রামে যাওয়া...

—কাজের সময় তো একটা তৃপ্তি থাকতে হয়, যে-কাজটা করছি সেটা শ্লোগান নয়, মিটিং নয়, লেকচার নয়। গরিব মানুষ যারা সমাজে বড়ই পিছনে, তাকে কি ভাবে এমপাওয়ার করা যায়, আমরা ভাবতাম। এ রাজ্যে বড় জমি মালিকানা কম। চাষবাসে মোটা টাকা লাগিয়ে মহারাষ্ট্র-গুজরাট হরিয়ানা-পাঞ্জাব-ইউ. পি. হয়ে যাবে তার সুযোগ নেই। জমিই কম এ রাজ্যে, তার মালিকানা বা দখলও খুব সুবিধের নয়। আমরা এই অর্ডারটা ভাঙার কথা এখনই ভাবছি না।

ঝাপগাড়ি ওরকমই একটা জায়গা বাবা। কোথায় ব্লক আপিস, ব্যাঙ্ক, কৃষিঋণ, হেন তেন! কিছুই নেই কিন্তু চল্লিশ-বেয়াল্লিশ একর অসেচ-জমি আছে। আর...বর্ষার জল ধরে রাখার জন্যে যে স্ট্রাকচারটা করতে হবে...সেটা খুব কম খরচে হয়, খুব কম!

—তোরা সশস্ত্র কিছু...

অনি দৃঢ় গলায় বলে, নো আর্মস!

—ফট করে বলে দিল, জনযোদ্ধা!

—ওরা সর্ষের মধ্যে ভূত দেখছে।

—হয় তো তাই। কাগজ পড়ে যা জানছি.....ভয় হয়।

—আমাদের বাড়ির ওপর নজরও রাখছে। বেশ ইমপরটেন্ট হয়ে গেলাম হঠাৎ।

৩

পলাতক স্বপ্নরা কোথায় যায়?

কোথাও যায় না। আমি, কনু চানটা। আমি গাড়িয়া লোহার। পঞ্চমহল জেলার ভাডোর তালুকায় আমরা আছি। আজ কয়েক পুরুষ ধরে। আমরা গাড়িয়া লোহার। আমরা সবাই গাড়িয়া লোহার। গাড়িয়া লোহাররা চিরকাল ঘুরে ঘুরে কামারের কাজ করে। তাতেই আমরা ক্ষেতীওয়াড়ি করিনি, আর সে জন্যেই না কি সাহেবরা বলেছিল, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষেতীওয়াড়ি করে না, "ঘুমন্তু" থাকাই তো অপরাধ। তা আমাদের "গুনেগার", অপরাধী বলে জানিয়ে দিয়েছিল।

সেদিনের গাড়িয়া লোহাররা উটের পিঠে মেয়ে আর বাচ্চাদের বসাত। কামার কাজের হাপর-নেহাই-হাতোড়া-ছেনি সব বোরায় বেঁধে উটের গলায় ঝুলাত। পুরুষরা উটের গলায় রশি বেঁধে সামনে চলত, লোহার পেটা ঘন্টা বাজাত।

তোমরা তাদের দেখনি। তারা তো বাসের রাস্তা, মোটর গাড়ির, ট্যাক্সি, জীপের রাস্তায় যেত না। পাহাড়ের নীচ দিয়ে দিয়ে ঘুরত গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে। কে জানে, কোথায় কোথায়! উটের পথ ধরে চলছি, চলছি। ঘন্টা শুনে গাঁওবাসীরা বেরিয়ে আসবে। আছে, কাজ আছে।

আমরা উট দাঁড় করাব। উট কিছু খাবে, আমরা কিছু খাব। গাঁওয়ালেরা মাটির ঘুঘড়াতে জল রেখে যাবে, জল খাব। তারপর গ্রাম মুখিয়াকে শুধাব, কি কি কাজ আছে।

গ্রামে যাও, তো মুখিয়াই আসল লোক। লাঙলের ফাল, দা, হাঁসুয়া, লোহার কড়াই, দরজার কড়া, শিকল, জানলার শিক, লোহারের ঘন্টা শুনল তো, পুরো গ্রাম চলে এল।

সেখানে আমরা থেকে যাব। গরমকাল হোক তো খোলা ময়দানে ঘুমাব। শীতের সময় হল, তো বাচ্চাদের নিয়ে মেয়েরা শোবে তাঁবুতে। আমরা কাজ করব, মেয়েরা খানা পাকাবে। ছেলেরা

দৌড়াবে মুহড়া গাছের কাছে। দড়ি বেঁধে দুলবে। একটু বড় ছেলেরা আমাদের কাজ দেখবে। লোহার আঙ্‌রায় আগুন জাইয়ে রাখবে। ওদের তো শিখতে হবে।

শুনেছি, শুনেছি, যখন ভীলি রাজ্য ছিল, তাদের যত দা, কুড়াল, বর্শা, তিরের ফলা, লোহার পেটি, ঘোড়াশালের ছিটকিনি, শিকল স—ব বানাবার জন্য কয়েকঘর গাড়িয়া লোহারকে এনে বসত করিয়েছিল।

তা ঘুরছি, ঘুরছি, এর মধ্যে বড় বড় রাস্তা তৈরি হল, বড় বড় ট্রাক, লরি আসতে থাকল। রাস্তা যতই এগোয়, আমরা উট নিয়ে সরে যাই। কোনো গাছের নিচে ঘেসো জায়গায় থাকি। নিজেরাই বলি, কত টাকার রাস্তা বানাচ্ছে, দেখ?

হায়! কে জানে সেদিন, যে যে-সব গ্রামে আমরা ছাড়া কম লোকই পৌঁছত, সে-সব গ্রাম কত কাছে এসে যাবে। ওই রাস্তায় চলবে বাস, লরি, ট্রাক, মোটর গাড়ি। দেখতে দেখতে ওই রাস্তায় পুলিশও চলে এল।

—এই! এই! তোরা গাড়িয়া লোহার?

—হাঁ সাহেব!

—উঠা, তোদের ছাউনি উঠা, ভাগ্! তোরা তো ঘুমন্ত! গুনেগার! গ্রামে গ্রামে যাস, আর চুরি করে ভাগিস!

আমাদের দলে যে সবচেয়ে বুড়ো, সেই দলপতি, আর চার পাঁচটি দল মিলিয়ে আমাদের "পঞ্চ" হয়।

আমাদের মুখিয়া বাজাভাই চামটা বলল, এমন কথা না বোলিও সরকার! গাঁওওয়ালেদের কাজ করি আমরা। ওরা ডেকে নেয় আমাদের। চুরিচামারি আমরা কোথায় করেছি?

পুলিশ লোক আঁখ মোটা করে বলল, আমি বলছি তোরা চোর! যা, আদালতে যা! ওরা কি তোদের কথা মানবে, না আমার কথা?

—আমরা চোর নই।

—তবে জুরমানা দে।

—কোথায় পাব টাকা?

—আমরা জানি, কোথায় রাখিস টাকা! উটের গলায় যে থলি ঝুলছে, তাতে রাখিস টাকা!

তাই রাখি। উট আমাদের সহায়, ভরসা, বাহন।

গাড়িয়া লোহার উটকে বলে "ভগবতী"। চলতে পারে বিশ মাইল। জল পেল তো অনেক জল পিয়ে নিল। আর খাবার তো গাছের পাতা। আমরাও ঘাস, খড়, চাল, যা পারি দিই। পয়সা উটের কাছেই রাখি। তা, তখনকার দিনে, আমি যখন পনেরো বছরের ছেলে, পুলিশ পাঁচ টাকা খিঁচে নিল।

পরে শুনেছি, কাছ্, ভালসাড়া, বরোদা, ছোটা উদেপুর, জেলায় জেলায়, তালুককা তালুকায় গাড়িএওয়া লোহারদের কপাল পুড়ছে। দিওয়ালি, কি হোলি, কি নবরাত্রি পরবের দিনগুলোর আগে পুলিশ খিঁচে নিচ্ছে বেশি।

বাজাভাই বলল, গাড়িয়া লোহাররা আর বাঁচবে না। ক্ষেতীবাড়ি করে না, তাতেই এত শাস্তি! আমি বলি, ফরেসের জমি অনেক! পঞ্চমহলের লুনাওয়াড়ার কাছাকাছি ফরেসের জমিতে আমরা বসে যাই।

আমার বাবা বলেছিল, আমরা ক্ষেতী করব? আমাদের কুল-কর্মের কি হবে?

—খুব খারাপ দিন আসছে চিলিয়া! কুলকর্ম ধরে থাকলে বাঁচতে পারব না। আরো কি! পথে জন্মাবে, পথে বড় হবে, পথে বুড়ো হবে, এ আর চলবে না। বসত করতে হবে, ছেলেরা ইস্কুলে যাবে, নইলে ওই যে রোলার চালিয়ে সব গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে, আমরা অমনই পিষে যাব।

সেই সময়ে আমরা পঞ্চমহল জিলায় ভড়োরা তালুকায় চলে আসি। জঙ্গল ছিল, জঙ্গলের জমিনও ছিল। আমরা সেই জমিনে ঘর তুলেছিলাম। গাঁওওয়ালে সে লোক বহোত্ হি চমকে গেল। বলল, তোরা গাড়িয়া লোহার! এখানে তোরা কি করবি?

বাজাভাই হাত জোড় করে বলেছিল, লোহারের কাজই করব। আর...ফরেসের জমিনের দয়া থাকে, তো কিছু ক্ষেতী করব। ফরেসের কাজও করতে পারি! আর কি! বড় ইচ্ছা, বাচ্চাগুলো কিছু লিখাইপঢ়াই করুক।

সে সময়ে আমরা, মানে পনেরো-যোলো বছরের ছেলেরা পাঁচ-সাত মাইল হেঁটে তালুকা শহরে গিয়ে সদাশ্রম ট্রাস্টের ইস্কুলে লিখাইপঢ়াই করেছি।

হ্যাঁ, গ্রামের কেন, আশপাশের গ্রামের কাজকর্মও করেছি। বাজাভাইয়ের নাতি দুখাভাই তো সাইকেল সারাবার কাজ শিখে নিল। আমরা একটু লঙ্কা, বেগুন, শাক আবাদ করি, আর কাজ খুঁজি। লিখাইপঢ়াই-এর অসুবিধা রয়েই গেল।

আজ থেকে তিন-চার বছর আগে লুনাওয়াড়া থেকে কাঞ্জীভাই প্যাটেল এল। খুব কাজের লোক। বেশি কথা বলে না। বলল, গাড়িয়া লোহার, মাদারি, বাজানিয়া, এ সব ঘুমন্তু লোকদের জন্যে ইস্কুল করব।

আমরা একটু ঘাবড়ে যাই। বললাম, মাদারিরা সাপ ধরে, খেলা দেখায়, সাপের বিষ বেচে; বাজানিয়ারা বাজা (ঢোল) বাজায়। একসঙ্গে ইস্কুল হ...।

আঁখমোটা করে কাঞ্জীভাই বলল, তোমরা সব ঘুমন্তু! অনেক চেষ্টায় পাঁচটা ইস্কুল করবার টাকা পেয়েছি। ইস্কুলও হবে, তোমরা ছেলেমেয়েদের পাঠাবে।

এই যেন বুঝলাম, আমরা আর ঘুমন্তু থাকছি না। বোধহয় জমিনে বসে গেলে এরকমই হয়।

আরো কি! কাঞ্জীভাই কলেজের মাস্টার, তায় ও প্যাটেল! ওকে পেয়ে আমরা যেন অকূলে কূল পেলাম। পুলিশ কিছু করল? ও আমাদের নিয়ে দৌড়াবে। গ্রামের লোকরা কিছু বলল? ও দৌড়ে আসবে।

এমনি তো সব চলছিল...চলছিল...কিন্তু হঠাৎ, এই দাঙ্গার পর ফরেসের লোক বলছে, তোদের ঘর ছাড়তে হবে, এটা ফরেসের জমিন। ঘর বাঁধতে হয়, সরকারের ভেস জমিনে যা।

শুধু কি বলল? আমাদের ঘর ভেঙেও দিল।

এই লড়াই তো আমরা জানি না। কে গরমেন? ভেস্ জমি কি? ফরেসের জমি নিয়ে তো ভীলরা কবে থেকে আবাদ করছে। আমাদের বেলাই দোষ হয়ে গেল? আমাদের জেলায় জমিন অনেক, বসতি কম।

কত চেয়েছিলাম ঘুমন্তু থাকব না!

বউ বলে, স্বপন দেখেছিলে!

স্বপন দেখব না? আমি, কানুভাই চামটা, এখনো দুধ জ্বাল দেবার লোহার কড়াই বানাই। লাঙলের ফাল, কাটারি, কাঠ কাটবার কুলাঢ় বানাই। আমি তো একটা ঘর তুলে, একটু সবজি আবাদ করে, শান্তিতে থাকতে চাই।

খুব ইচ্ছা, আরো দশ পনেরো ঘর গাড়িয়া লোহার আসুক, একটা গাঁও হোক!

গাড়িয়া লোহার যদি ক্ষেতীবাড়ি করে বসে যেতে চায়, তার স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যাবে কেন?

আমি...কানুভাই চামটা বেরিয়ে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে যাব। দোকানে গিয়ে টেলিফোন করব কাঞ্জীভাইকে। শুধাব, ফরেসে আর যারা চাষ করছে, তাদের ঘর তো ভাঙা হয় না। তোমার সঙ্গে তালুকা জঙ্গল আপিসে যখন গেলাম, তুমিও তাই বলছিলে। নয় কি?

আবার তোমার সঙ্গেই গেলাম সরকারি জমিভূমি আপিসে। সেখানে অফিসার বলল, আরে, তালুকার ম্যাপ দেখুন না, ও জমি জঙ্গলের কাছে তো কি হয়েছে? ও তো সরকার নিয়ে নিয়েছে, সেই কবে!

—ওটা ভেসট জমিন?

—আর কি!

—তাহলে জঙ্গল আপিস কেন ওদের তাড়াতে চায়?

—আপনি এদের লিখিত অভিযোগ এনেছেন?

—নিশ্চয়! আজ আনি নি। ছয়দিন আগে দিয়ে গিয়েছি। আর আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিই। কানুভাই! তুমি ঘর চলে যাও। আমি কথা বলছি, আজ বাড়ি চলে যাব। কাল তোমাদের ওখানে যাব।

আমি সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম। এ কি দুর্ভোগ বল গাড়িয়া লোহারদের। এ জেলায় যেখানে সেখানে জমি দিয়ে দিতে পারে। গাঁয়ের লোক অন্যদিকে টানা জমি পেয়েছে। চাষ করছে। যদিও ঘর তোলেনি, ঘর তো গাঁয়ে ওদের আছে।

আমরা মোটে ২/৩ একরে বসত করেছি, এই জমি খুব সরস নয়। আর চাষবাসও আমরা জানতাম না। একটু একটু করে সবজি ফলাচ্ছি। শিখছি।

এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসবাস করব, এ তো ভাবিনি কেউ! ধীরে ধীরে মন বসছে।

তারপর শুনছি, এ জমি জঙ্গল আপিসের নয়। সরকারের। আগে শুনতাম জঙ্গল আপিসের জমি।

আরও কত নতুন কথা জানছি। এ রাজ্যে ঝড়তিপড়তি জমি অনেক। তাই যদি হবে, তাহলে আমাদের মত ঘুমন্তু গাড়িয়া লোহারদের, মাদারিদের, বাজনিয়াদের, সব ঘুমন্তু মানুষদের সে জমিতে বসায় না কেন? রাজ্যে না কি মানুষ কম?

কমই তো হবে! সাগর সমান রসাল জমি নিয়ে একেকজন। চাষ করে। ওই প্যাটেলরা। সবাই কি আর কাঞ্জীভাইয়ের মত হবে?

বউ কিছু বোঝে না।

বাবা-ভাই বলে গেছে যখন এত গাঁও, এত শহর ছিল না..., এত রাস্তা হয়নি, মোটর-লরি-ট্রেকার-বাস ট্যাক্সি এখানে কেন, দুনিয়াতেই হয়নি, তখন ছিল ঘুমন্তুদের দিন। গাড়িয়ালোহারদের ঘন্টা শুনবে বলে গ্রামবাসীরা দাঁড়িয়ে থাকত পথের ধারে।

সে তো থাকবেই। লোহারের কাজ আমরা ছাড়া কে করবে? সে ছিল একদিন। সে ছিল একদিন...

কিন্তু স—ব বদলে গেল।

শহর হল। রাস্তা বসল। মোটর গাড়ি চলল. শুনেছি রেলগাড়িও চলে। আমি এখনও চড়িনি।

এত সব হল, কিন্তু গাড়িয়া লোহাররা তখন যেমন, আজও তেমন, উটের পিঠে সংসার দিয়ে সেই সব রাস্তায় চলে, যেখানে এমন শক্ত, কালো কালো রাস্তা ঢোকেনি।

বউকে কি বোঝাব, উটের দিন চলে গেছে, গাড়ির দিন এসেছে। তাই আমাদের বসত বসাতে হচ্ছে। পুরানো রীতিতে আর বাঁচা যাবে না।

সেই জন্যেই এত ছুটাছুটি করছি। এখনো ঘুম ভাঙলে যখন দেখি ঘরে শুয়ে আছি। এখনও অবাক লাগে। এ ঘর আমার?

এই যে জঙ্গালের আপিস, আর জমিভূমির আপিস আমাদের নিয়ে এভাবে একলা করছ, কোর না।

গাড়িয়া লোহাররা শান্তি চায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা কি বলেছিলাম?

কোনও গাড়িয়া লোহার হসরৎভাইদের ঘর জ্বালাবে না। মুসলিমরা লোহারের কাজ করে না। আমাদের খাতির করে ওরা। চাষিবাসী নয়, দোকান-গ্যারেজ নিয়ে ওদের কারবার। ওরা ক্ষেতীওয়াড়ি করে না, কিন্তু আমাদের কোনওদিন 'এঃ, ঘুমন্তু!' বলেনি।

সৃষ্টিকর্তা ঘুমন্তু করেছে। ঘুমন্তু অ্যাছিই মনে করি। মনে মনে তো ঘুমন্তু হয়ে যাবার ইচ্ছে মাঝে মাঝে জাগে।

কিন্তু আর পারব না।

রেলগাড়ি এসে গেছে। উটের গাড়িতে সুরাট যাব, তা কি বুদ্ধির কাজ হয়? চোখ মেলে যখন ঘরের চাল দেখি, নিশ্চিন্ত লাগে। সময় নেবে, কিছু সময় নেবে, কিন্তু ধীরে ধীরে আমি থিতু হয়ে যাচ্ছি। বউ বলে, জল আনতে নল আছে। সওদা দরকার, গ্রামের দোকান আছে। ছেলে-মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে...

কাঞ্চীভাই বলেছে। আমরা না কি হাজার বছর ধরে ঘুমন্তু।

এক ঘুমন্তু মানব গোষ্ঠী ঘর তুলে ক্ষেতীওয়াড়ি আর ছোটামোটা কারবার করতে চায়। তার মনে অনেক স্বপ্ন থাকে।

ছোটামোটা স্বপ্ন।

সে কি অপরাধ না কি?

৪

একটি শিশুর মায়ের স্বপ্ন কী ছিল?

আমার স্বপ্ন আর কি থাকবে। স্বামী অটো চালায়, আমি দেখ, দুটো বাচ্চার মা। একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। তারপরেও তিন বছর বাদে একটা হল, হ্যাঁ, ছেলেই হয়েছিল। ছেলে হবে, না মেয়ে, তা নিয়ে ভাবিনি। তবে ছেলেটা হতে মাথা যেন কাটা গেল। আগেরটা হবার পরে অপারেশন করাতেই পারতাম।

মা বলল, পাশের ঘরের তারাদিদি বলল, অপারেশন করাবি। তা সোয়ামি মানবে?

শোনো কথা! মানবে না কেন? ওরে তো অপারেশন হতে বলছি না। আমিই হব।

ওরে শুধোব কি! আমার দেহটা এটা পেটে আসা থেকে খুবই খারাপ যাচ্ছিল। ছেলেটাও আগের দুটোর মত রিষ্টপুষ্ট হয়নে।'

পাঁচ কথায় তখন করাইনি। এটা জন্মাতে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন হয়ে এসিছি।

কারো বাড়ি ঠিকে খাটলাম, সে সুবিদে নি। ঘরে ছেলেটারে দেখবে কে? ওদের বাপ বেরুবে অটো নে।' পাঁচ বছরের মেয়ে এই শিশুকে দেখতে পারে?

সোয়ামিও বলেচে, এসেছে যখন, ওরে দেখ। বড় হলে নয় এট্টা কিছু করিস!

তা বলব, একেবারে বসে থাকিনি। চারদিক ফেলাট বাড়ি। ওই গানের ইস্কুলের দিদিমণির মাসি, না মামি, উনি আমারে সাত বছর দেখতেছে। এক সময় ওনার বাড়ি বদলির কাজ করি এক মাস। উনি আমার হাতের সেলাই দেখে বলেছিল, অ মেয়ে! কাপড়ে ফলসো বসাতে পারবে?

বসালাম। উনি তো খুব খুশি। আর ওনার বাড়ি বছর-বছর পুজোর সময় শাড়ি বিক্রি হয়। ওনার বিজনেস বলতে পার। আবার পুজোর আগে শাড়ির দোকানও দেয় পাড়ার একজিবিশনে।

ওনার কথাতেই এ কাজ ধরলাম। কাজে আমার সুনামও হয়েছে। কাজটি খুব সোজা নয়। রঙে রং মিলিয়ে ফলসো কিনব, রঙে রং মিলিয়ে সুতো কিনব, আঁচলায় পিকো ফোঁড় দেব, সে নানান-খানা কাজ। হ্যাঁ, টাকা পাই। না পেলে করব কেন? তবে হ্যাঁ, কাজ করি দিনেমানে। সংসারের সকলটি সুমলে, তবে। রাতে করি না। টিউপ বাতির আলোয় চোখ বিঁদিয়ে সেলাই করে মরব না কি?

না, অটো ওনার নিজের নয়। একটা নিজের অটো হলে সোমসার সেজে উঠবে।

বাড়ির কতা শুদোচ্ছ? না, বাড়িঘর নেইও বটে। আচেও বটে। আমাদের বস্তিটার সুনাম আচে। পাট্টির মলয় খুব লড়িছিল সে সময়। তাতে কল পাইকানা হয়েচে, আলদা মিটার হয়েচে। মালিক আমাদের ওটাতে পারবে না। শুনচি এখেনে বড় ফেলাটি বাড়ি তুলতে চায়। তা করতে গেলে আমাদের অনেক টাকা দে তবে ওঠাতে হবে।

সপন! সপন কি থাকবে বলতে পারো?

কোলের ছেলেটা জম্মো থেকে, কোনো কষ্ট দেয়নে। কান্নাকাটি নি, টাইনে খইয়ে দাও, শান্ত হয়ে ঘুমোবে। কি টানা টানা চোখ। একমাতা চুল, তবে নিজের ছেলেকে মা কবে মন্দ দেখে?

অসুখেবিসুখে হোমোপাতি ডাক্তারখানায় দৌড়েচি। ওনার ওসুদেই ভালো থেকেছে। আটমাসে পড়তে মন্দিরে পুজো দে, মুখে পরমান্ন দিলাম। বাপ নাম দিল, 'কিংশুক'। ছেলে মেয়ের নামের বাহার আছে, বলতে পারো! কাঞ্চন, মহুয়া, কিংশুক। নাম শুনে ডাক্তারবাবু বলল, বেশ নাম! তা মেয়ে!

ছেলেকে মাঝেমাঝে ডিমের কুসুম দিলে, রোজ একটা কলা খাওয়ালে, ভাত খায়?

—ওই চটকে মটকে ডালের জল দে...

—জল কেন? মুসুর ডাল সেদ্ধ, আলুসেদ্ধ আর ভাত।

—ওদের মতো গড়ন হয়নি।

—সব কি আর একরকম হবে?

—খিদেও যেন তেমন নয়।

—হবে, হামা টানছে, হাঁটবে, দেহ নড়াচড়া হলে খিদেও হবে। আর দেখ! দুধের মুখ! নুন দে ডালসেদ্ধ আর ভাত খেলে মুখেও রুচবে।

সাদ্যমতো যত্ন করিচি গো মা! আমার তো পোস্কের পোস্কের বাতিক! কাচা জামা যদি ফর্সা

না হল, আবার কাচব। ঘর বারবার মুছব। মিছে বলব না, ঘরে থাকলে সোয়ামিও ছেলে দেখেচে। আর এত বছর বে হয়েছে, দোকানবাজার সাদ্যমতো করতে দেয়নে।

পাড়ার মেয়ে বউ বলতো, তিনটেরে পড়াতে পারবি? একটা বাচ্চা পড়াতে কষ্ট যকোনে?

বলতাম, সাদ্য মতো চেষ্টা তো করব। একনে দেকচি গরিবের ছেলে। গরিবের মেয়ে কৎ কষ্টচেষ্টা করে পড়চে। আবার কেমন রেজাল করছে। চেষ্টা তো করব। তা বাদে কপালে ঝা আচে হবে!

কপালে ঝা আচে বলচি গো মা। কিন্তুক কপাল বলে মানি কি করে, তা বলো? কপাল তো আমার সব্যনাশ করেনি। সে তো করল হাসপাতাল!

বড় দুটো অসুকে বিসুকে হোতাই তো যেতু! দেকাতাম। ওষুধ কিনতাম...হ্যাঁ গো কিনতাম। অবিশ্যি মাজে মদ্যে ওষুধ ওনারাও দিতু, মিছে বলব না। মিছে বলে নরকে ঝাব কেন?

মাজে মাজে কিংশুক, আহা! 'ছোটখোকা' বলিছি। দশটা ডাক নামে ডেকে সোয়াগ করিনি। তাইতেই কি...?

মাজে মাজে ছোটখোকা অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো রে মা! তকোনে ভেবিচি, কইতে পারে নে, চোক দে বলচে। শুদু কাজই করবে? একটি বার কোলে নিতে জানো না? কোলে নিইছিলাম বাবা! কোলে নে দৌড়েছিলাম!

ওই হাসপাতালে! কি যমপুরীতে যে গেলাম! কৎ আশা করে গেলাম! আমি তো একলা নেই গো! আমাদেরে বস্তির তা ধরো আটটা গেছে! আমরা ওই দাস্ত, বমি আর হিক্কা-ওটা দেকে বাপেরা মায়েরা সব ছুটিচি।

ছেলের বাপ শুদু বলছে, কেউ হাউকাউ কোর না তো! ক'টা পাড়ায় থাকে ছোটদের হাসপাতাল? হা রে আশা! না, কাঁদচি না; কাঁদব কি! বুক ঝে রেগে গনগনে আংরা হয়ে আচে!

আর কি বলব! তোমরা তো সকল কতাই ঝানো। এই নিয়ে এত ছিছিক্কার, এত লেকালেকি, এত তক্কো! টি. বি.-তেই দেকাচ্ছে!

ছেলেরে তো ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। হাসপাতালকে গালি দেবার কালেও আমি জাইনি। ঝেতে পারিনি, বলতে বুক ফেটে ঝায় রে মা! এমন কতা কে শুনেচে এক খাটে দুটো-তিনটে বাচ্চা খাবি খাচ্চে কই মাচের মতো! এগবারও তোরা নিশ্বাস নিতে গ্যাস দিলি না, এট্টা ডাগতার দেকল না, নাসগুলো অব্দি মুখ ঘুইরে...

খুব ছি ছি ক্কার রটেচে?

মন্ত্রীকে বকাবকি করেচে মুক্যমন্ত্রী?

তাতে আমার জ্বালানি পোড়ানি নিবরে? ওই অতসীকে দেক! এট্টা হতেই অপোরেশান! ও কেমন করে নিজেরে বোজাবে?

সপন দেকি? না, সপনে ছোটখোকারে দেকি না। ছেলে-মেয়েরে জাপটে পড়ে থাকি।

সপনে দেখি না, তবে দিনরাত মন্যি দিই। ভাবি, খ্যামতা থাগলে ওই ডাগদার, নাস, সবারে...মর, মর তোরা। আমাদের মতো শোগ পা!

কিচুই হত না, চিকিচ্ছেও হোত, গ্যাসও মিলত, ঝদি বড়লোগের ছেলেপুলে ভর্তি হোত!

অবিশ্যি বড়লোগে সরকারি হাসপাতালে ছেলেপুলে আনত না, কোনোদিন আনে নে।

সপন ? সপন দেকি না ! বড্ড সাদ ঝায় আমরা সব মেয়ে ঝ্যাঁটা নে কর্তাদের আগাপাছতলা পিটোই।

গাঁ নয়, গেরাম নয়, কলকেতার বুকে এতগুলো বাচ্চা এভাবে মরল? ই কি রাজত্যি মা! সপন দেকব? ওই এট্টা সপন!

আমরা সগলা ওদেরে পিটোচ্ছি!

৫
একটি কাককে ফাঁদি দিতে চেয়েছিল পরভাত

সেমিনারটি ছিল খাদ্য, জল ও জমি বিষয়ে মানুষের মৌল অধিকার। দিল্লিতেই সেমিনারটি হয়, কিন্তু সেমিনারের আচরিত নিয়ম মেনে নয়। বৃন্দা আমাকে বলল, দেখছ, এরা মূলত তরুণ।

—হ্যাঁ। রাজি হলাম আসতে, মনে হচ্ছে সেটা ভালো করছি।

—হাজারিবাগ থেকে প্রকাশ এলে খুব ভাল হত।

—চিনাকুড়ি কয়লাখাদান বিস্ফোরণ?

—হ্যাঁ, অসামান্য ডকু তুলেছিল বটে।

—প্রকাশ আসবে না?

—ও বেরোয় অ্যাসবেস্টস মাইনের...

—সে তো বন্ধ হয়ে গেছে।

—হয়নি। বন্ধ করতে বাধা হয়েছে। সিংহানিয়া হাত কামড়াচ্ছে বসে বসে। আদিবাসী লেবারকে রোজ বিশ টাকা দেয়। দু'মাস কাজ করতে না করতে অ্যাসবেসটোসিস ধরে যায়। তাকে পাঠায় হাসপাতালে। এখন খাদান। প্রকাশ হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসাটির ডকু তুলছে।

—ও পারেও বটে!

—পারবে না? একুশ বছর বয়সে গিয়েছিল। এখন একচল্লিশ হল। কুড়ি বছর, ফেয়ার টাইম!

—দীনা ওর সঙ্গে আছে?

বৃন্দা আমার দিকে তাকাল। কি দেখল? একজন মোটা নির্বোধ চেহারার বৃদ্ধাকে, যে পুরনো ট্র্যাক রেকর্ড বাজাচ্ছে।

—তুমি কত কি জান না!

—সত্যিই জানি না, সেদিন তো নেই যে বেরোতে অ্যাসবেসটোসিস, আর আমি দৌড়ে গেলাম।

—না, ওরা তো যাচ্ছে।

—সেটাই যা আশা। তুমি ডাকলে আমার যাদের মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ লাগে, সেই হাতে কলমে কাজকরা কাজের মানুষদের দেখতে পাই। শোনো, প্রকাশের ইউনিটের শঙ্কর জোংকে কি বলছে!

—শঙ্কর! আমি তোমার ঠাকুরদাকে চিনতাম।

—হ্যাঁ, খুব শুনেছি, কিন্তু এখন তো তোমাকে একবার যেতে হবে।

শঙ্কর, ওর বন্ধু পালবী টোপ্পো আর অরুণ কেরকেটা সমস্বরে বলল, তোমার ওপর আমাদের খুটকাট্টি অধিকার।

বৃন্দা বলল, খুলেমেলে বলো।

—আরে, আগে আদিবাসি গ্রামে লোক বেড়ে যেতে তো মানকি মুণ্ডা, সে পহানও বটে, চলে যেত পাঁচ-সাত মাইল দূরে। পালক ভাসিয়ে দেখত বাতাস কেমন, নদী, বা ঝোর, বা তাল কোথায় তা দেখত। গড়াম, গ্রামদেবতা হবে সে শালগাছটি, সেটিকে নির্বাচন করত। তারপর শালের খুঁটা পুঁতে দিয়ে জানাত, এটি আমাদের খুঁট কাট্টি গ্রাম হল। দশ-পঁচিশটা পরিবার চলে আসুক। আমাদের ইলাকা বাড়ুক। তোমার ওপর আমাদের খুঁটকাট্টি অধিকার, যেতে হবে।

আমার গলায় কথা আটকে গেল।

শঙ্কর বলল, কৈসে ন যাইব? আচ্ছা তুমি আমাদের কে হলে?

—তোর বাবা-মাদের আকিন ছিলাম, তোদেরও আকিনই থাক।

—এইটে সহিবাত আকিন! আমার ছেলে, আমার নাতি, নাতির ছেলে, তুমি আমাদের আকিনই থেকে যাও।

—হাজারিবাগে জঙ্গালের হাল কি?

—ছিল না তো কিছু। জঙ্গাল আপিস সব কেটে উড়িয়ে দেয়। এখন...কিছুকাল হল...ঢুকে গেছে মায়লেরা। বাস, জঙ্গাল কাটাই বন্ধ। আমরা শাল লাগিয়ে যাচ্ছি। বুঝলে?

বুঝলাম। চল্লিশ বছর আগে দেখেছি, এখনও চোখে লেগে আছে।

—পরকাশ ভাই এখন এল না। ওই হাসপাতাল!

—কোন্ হাসপাতাল?

—সেবার ১৯৭৯-এ বহোত কি লড়াই করে যেটা হল!

—তখন সি পি আই-এর খনি-খাদান লেবর ইউনিয়ন ছিল...পূর্ণেন্দু, লাবুজোংকো আর লাবুব মহিলা ইউনিয়ন ছিল, সি পি আই-এর ইজ্জত ছিল...খুবই ছোট হাসপাতাল...বাইরে চালাঘরেও রোগী থাকত।

সেই হাসপাতাল...পরকাশভাই ওহি হাসপাতাল কহানির!

সবচেয়ে আগে উঠেছিল জলের কথা। পরভাত বেঁটে খাটো, তামাটে রং, বুলেটের মতো শক্ত, সে আগে বলল, সবচেয়ে আগে জলের কথা বলো, জলের। জল নিয়ে নকশা চলছে, আর এখন সরকার আমাদের জল না দিয়ে শুকিয়ে মারবে।

কে "গুজরাট মেঁ" বলল। পরভাত হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। বলল, সব কিধার! সব জায়গা গুজরাট করে দেবে, মাথায় রাখো! যত বুঝবে, তত ভালো!

বৃন্দা বলল, তুমিই বলো। তবে বলতে বলতে রেগে যেও না, নারা উঠিও না, কেমন?

—আমি? রেগে যাব? জীবনে রাগ করেছি কখনো? আমার মতো ঠাণ্ডা দিমাক কার আছে? তোমার তো নেই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

এদের চেঁচামেচি আমার খুব ভালো লাগছিল। খইনি এগিয়ে দেওয়াও ভালো লাগছিল। একদা এরাই তো সপ্রেমে খইনি ব্রতী করেছিল।

পরভাত বলছিল, তেহুরি বাঁধ বনেছে। কেন বনেছে? তেহরিকে জল দেবে। হিমাচলকে, তার পাদভূমিকে তো এরা খেতে শুরু করেছে পঞ্চাশ বছর আগে থেকে। ভাকরা নাঙ্গালে যারা উচ্ছেদ হয়, তারা কি পেয়েছিল? ভাবরের জঙ্গাল কোথা গেল?

বৃন্দা ওর কানে কানে কি বলল।

পরভাত চাপা গর্জনে বলল, রেগে তো যাচ্ছি না। একষট্ বছর বয়সে রাগ করে বা কি লাভ? আমি তো প্রেমসে ঔর সান্ত বচনসে কাম লেতা। জো ভি হ্যায়, তা এই যে তেহুরি হল, এর জল কে পাচ্ছে জানো? দিল্লি, দিল্লি সিটি! মহানগরী! মহা ভাগাড়! যাই বলো! দিল্লি জল পাবে আর ড্যাম থেকে দিল্লিতে জল পৌঁছাবে কোনও মালটিন্যাশনাল। কেয়া একোইশাকা সেঞ্চুরি! কি কেন্দ্র, কি রাজ্য, যেখানে যা হচ্ছে, সব করবে মালটিন্যাশনালরা। কবে মালটিন্যাশনাল বলে দেবে...বলে দেবে...যাক গে! এই সব বিপদ তোমার ঘরে ঘুসে গেছে! নিজেরা ভাবো! ঔর হ্যাঁ! অত জল! অত জল! ওহি মালটিন্যাশনাল, ওহি কর্পোরেট তেহুরি সে ইউ পি ; দিল্লি; সব কোই কো পানি পিয়াস থা। তোমার তেহুরি বাঁধের জল, তুমি ওদের বোতল থেকে কিনবে।

—কেন আমরা মানব?

—চলো, পানি মুভমেন্ট করেঁ?

পরভাত বলল, কা পানি মুভমেন্ট? আমি মিরাট জিলার মকাই চাষি। কৌয়া আসে, মকাই খায়, মকাই কায়।

তখন আমরা একটা কৌয়া ধরে ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দিই বাঁশের আগায়। বাস : সব কৌয়া ভয় পেয়ে পালায়।

সহসাথীয়োঁ! মালটিন্যাশনাল? দিল্লিকে পানি পিয়াবে? দিল্লির হোটেলে সুইমিং পুলে থাকবে তেহরির জল? নাংগাপাংসা মেয়েরা সাঁতার কাটবে আর ফোরেন টুরিস ভুলাবে? একদম নয়। আমি যাব, হাজার মকাই চাষি নিয়ে দৌড়াব, আর...আর...কৌয়া ধরে ধরে লটকাব।

তেহরির উদয়ভানজী প্রৌঢ়, শান্ত, আস্তে কথা বলে। সে বলল, ভৈয়া, হিংসার পথে যেও না।

—কে চায় হিংসা? জল চাই।

—হায় পানি! তেহরির জল খেয়ে কার কবে কি অসুখ হয়েছে? আজ মালটিন্যাশনাল জল বিশুদ্ধ করে বোতলে ভরবে? আর আমরা কিনব? আরে! ওখানে জল বোতলে ভরালে কস্টিং মে খরচ দু'টাকাই হবে! তা কিনব ১৫/২০ টাকা দিয়ে?

— কে বলল, দেশে তো পিয়াও...কা জলসত্রের রীতি কবে থেকে আছে।

পরভাত বৃন্দাকে বলল, আমি আজই ভাগ যাব়ে দিদি রাতের ট্রেনে।

—কি করবি তুই?

—পিয়াও শুরু করব। আর সবাইকে জানাব, ভাই সব! কৌয়াকে ফাঁস দিতে হবে। উদয়ভান বলেন, হিংসা করতে পারো না পরকাশ।

—কবে বা হিংসা করলাম? যা করব, অহিংসার পথে করব।

—কিন্তু গরমেন বলে দেবে তুমি জনযোদ্ধা!

—গরমেন তো বাথরুমে গেলেও ফালাশ টেনে দেখে নেয় জনযোদ্ধা বেরোচ্ছে কি না!

বৃন্দা ধমক দিল, বাস, বাস, পরভাত!

পরভাতের একটা স্বপ্ন আছে। পরভাত বলল, এই সপনটারে লুকিয়ে রাখতে হবে। নইলে মা! লাইফে পুলিশ ঢুকবে, গুন্ডা ঢুকবে। ধর্মীয় গুন্ডারা ঢুকবে, সেদিন পুলিশ লখনউয়ের বুকে বাওরিয়া বস্তি জ্বালিয়ে দিল?

এভাবেই স্বপ্নগুলো পালাতে থাকে, পালাতে থাকে। সরকার জানতে পারে যে থানা-গারদ ভেঙে অনেক স্বপ্ন পলাতক।

তবু সব স্বপ্নদর্শীদের জনযোদ্ধা বলা কঠিন হয়ে পড়ে।

৬

কাপড়কুঁচি, বাটাম, বাঁশ, চাঁদমালা, কালীবাবুর স্বপ্নও পলাতক কেন?

খারাপ, খুব খারাপ... যে স্বপ্ন পালাচ্ছে, সেগুলো সব ফালতু ফালতু লোকদের এক পয়সার স্বপ্ন। হোআট? এক পয়সা কি? একটাকার নোট বাতিল, এক টাকার কয়েন চেহারায় আধুলির অধম, এ রকমাবস্থায় তোমাকে "এক পয়সা" কি, তা বোঝানো অসম্ভব। দেখিনি, আমি এক পয়সা দেখিনি, আমি শৈশবে দশমিক মুদ্রার এক পয়সা দেখেছি। উধাও। মেয়েদের কপালের টিপের সাইজের। আমার ঠাকুর্দা বলতেন, ওঁরা পুরনো দিনের বড়সড় এক পয়সায় মুড়িমুড়কি কিনে পেট ভরে খেতেন। সে সময়ে এক পয়সায় জুতো পালিশ চলত। একটা সিনেমার গান ছিল,

> একটি পয়সা দাও গো বাবু
> একটি পয়সা দাও
> ময়লা জুতো সয়না পায়
> পালিশ করে নাও॥

ঠাকুর্দার মা-বাবা পয়সা নয়, কড়ি দিয়ে গ্রামের হাটে শাক কিনেছে। ঠাকুমা শৈশবে ছড়া কাটত,

> এক পয়সার তৈল
> কিসে খরচ হইল!

এখন বাজারে এক পয়সা কেন, একটাকার নোট আর দুই টাকার নোটও বাতিল। এক নয়া পয়সার কোনো দাম নেই। আজ মালটিন্যাশনালরা আমাদের একমাত্র লাইফলাইন। এর মধ্যে...স্বপ্নগুলো অ্যানালাইজ করেছ? এদের কোনো উচ্চাশা নেই! ডেঞ্জারাস! প্রত্যেকে একেকটি জনযোদ্ধা! কতজনকে জেলে রাখবে?

—এক সময়ে "এনকাউন্টার" চলছিল না?

—অনি, কুশল, বিশালকে মেরে দেবে?

—ওরা মহারাষ্ট্র, জলগাঁওয়ের "বর্ষা-জলসঞ্চারণ" পদ্ধতিতে...

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ও সব ওরা বলে! বিপদ হল, স্বপ্নগুলো আসছে যেখান সেখান থেকে.... ফ্রম অল ওভার!

—যাচ্ছে কোথায়?

—এসব স্বপ্ন বেজায় কুচক্কুরে। হয়তো কারো বাজারের থলিতে, কোনও প্রবালদ্বীপে, কোনও মকাইদানায় লুকিয়ে থাকছে। টু ব্যাড... এ স্টেট অফ এমার্জেন্সি...

—এমার্জেন্সি ডিকলেয়ার করা যায় না?

—যাও, বেরিয়ে যাও, আমার মাথা খারাপ করে দিও না! আর... যেভাবে পাত্তা লাগাচ্ছ, কোনো কোনো স্বপ্ন পলাতক...সে ভাবে খবর রেখে চলো!

আমি কালীকৃষ্ণ পাল। আমি কসবা-বোসপুকুরে পঞ্চাশ বছর ডেকোরেটরের কাজ করছি। না, বড় পুজোর প্যানডাল বানাই নি, ছোট পুজো, আশপাশের পুজো। শুধু কি পুজো? অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ এলাকায় মানুষ আমাকেই খুঁজত।

অন্যান্য পুজোতে মণ্ডপ করিনি। তবে তালবাগানে সরস্বতী পুজো জাঁকের পুজো ছিল, প্যান্ডেলটি আমার বাঁধা।

এ কাজ করেই সাতটা ছেলে, তিনটে মেয়ে। একটা নাতনির বে দিয়েছি। তিনটে ছেলে চাগরি করছে। সে কতা সত্যি। কিন্তু আর চারটে এ কাজেই আছে। এক অন্নে থেকিছি। বাড়ি ক্রেমে ক্রেমে বাড়িয়েছি। ঘর বেড়েছে। রান্নাঘর একটা। সে কথা পাড়ায় দশজনা বলেছে। কালীবাবু ক্ষ্যামতা ধরে। সমাজের চেহারা পালটে পালটে প্রমথেশ থেকে শাহরুখ হয়ে গেল। কালীবাবু ১৯৭২-এর পথেই চলেছে।

অন্দর সামলেছে আমার গিন্নি। সাতটা বউ! আবার নাতবউ সামলে চলা সোজা কথা? কয়লার উনোন দুটো জ্বলত; দিনের রান্না শেষ হত বিকেলে। রাতের রান্না চাপিয়ে বড় বৌমা খেতে বসত।

তেমন সংসার এখন আর নেই। গিন্নি আমাকে রেখেই বিশ বছর হল মরেছে। আমার কি অক্ষয় আয়ু! আশি চলছে, এখনও সকালে হাঁটি, বিকেলে ছাতে হাঁটি। বড় সাধের একান্নবর্তী সংসার এখনে ছত্রখান!

চাগরে ছেলেরা যে-যার ফেলাট কিনে উঠে গেল, যাক! বিজনেস থেকে টাকা চায় নে, বিজনেসের হাল দেখছে। একটা বড় সড় সম্পত্তি আছে বই কি! বাড়ির পেছনে বাক্ষুসে দুটো গুদোমঘর! বাঁশ রে, পাল রে, সামিয়ানার কাপড়, ঘেরের কাপড়, সবই রাখা হত।

এখন দেখ! আশ্‌শোলা ফরফর করচে তো করচেই। ডোবা পুষ্কন্নি সব বুজিয়ে বাড়ি উঠেছে, তা তেমন বিষ্টি হলে জল ঢোকে বই কি!

আমার বাড়িটা আব গুদোম দুটো রীতিমতো কুদশ্যান। চারদিকে হাল ফ্যাশানের বাড়ি। ছেলেরা বলে, তুমি থাগতে থাগতে বিক্রি করে ভাগ করে দিলে হত না?

আমি সবই শুনি। কিন্তু হাবার মতো চেয়ে থাকি। আমার মনের কতা অশ্বিনী জানে। অশ্বিনীর বাপ হেতা কাজ করত। অশ্বিনী এখনে করে। ওর বাপকে সে সময়ে জমি কিনতে সাহায্য হই। তাতেই কোমোরপাড়ায় বাড়ি তুলেছিল। অশ্বিনী সে কতা মনে রেকেচে। যাগ গে! আমার দুক্য অন্যত্তর!

দুগ্‌গাপুজোর প্যান্‌ডাল যখনে করতাম, যা জানি তাই করতাম। বাঁশ আসত গাড়ি গাড়ি। মণ্ডপের কাজ শুরু হত। অমন ধা' ধামাকার পুজো হোত না পাড়ায়। কিন্তু সারাবছর বিয়ে রে, অন্নপ্রাশন রে, বিবাহবার্ষিকী রে, শ্রাদ্ধ রে, কাজ তো কামাই যেত না। তা বাদে বেল বাগানের মাঠে এত এত ফাংশান হত। সেখেনে কাজ করেচি। সবচেয়ে ভালো প্যান্‌ডাল করেছিলাম, যখনে দত্ত বাড়ি এখানে শতবর্ষে সর্বমঙ্গলা পুজো করল। ওনাদের দেশের বাড়িতে বছর বছর হত। আর ওনার পুঁথিতে লেখা আছে। উনি নৌকো চেপে এসে বলেছিলেন, তোমাদের পুজো নোব।

কোন নদী দে এলেন। সে সব জানি না। তবে দত্তবাবুদের বেজায় রমরমা এখনে। ওনাদের সর্বমঙ্গলা কন্ট্রাক্টর আর প্রোমোটারের ব্যবসা, ওনার নাম দে হাসপাতাল, ব্যাঙ্গালোরে মাস

কম্যুনিকেশান কলেজ... হেথা সর্বমঙ্গলা কম্‌প্লেক্স.... কাজটা পানুবাবু আর আমি করি। কি নৌকো না বানিয়েছিলাম! আর একশোটা ঝাড়বাতি, একশোটা চালিমণ্ডপে সর্বমঙ্গলা, খুব প্রশংসা হইছিল। সব কাগজে বেরোয়! এ সব কথাই মনে করি।

পানুবাবু তো বড় প্যানডেল করতেন। এগবারে ক্ষুদিরাম পার্কে জয় জয় প্যানডেল করেন। সিংহানিয়াদের বেটার বিয়েতে ফুলের মণ্ডপ যা করেছিলেন!

আমাদের তো ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল। টিউব বাতি, দেশলাইয়ের বাক্স, আইসক্রিমের কাপ, এসব দিয়ে প্যানডাল হচ্ছে, হোক! এককালে হরলিক্‌সের প্রতিমাও হয়েছে।

কিন্তু প্যানডাল মানে বাঁশ। সামিয়ানা, শালু, কারিগর। কতজনের মেহনত ভাবুন!

'হল' ভাড়া করে, 'বাড়ি' ভাড়া করে অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

যুগের হাওয়া, যুগের নিয়ম! কিন্তু বাংলার ডেকোরেটররা মার খেয়ে গেলাম। পানুবাবু এক কালে দিল্লি, বম্বে, নানা জায়গায় পুজো প্যান্ডেল করত। বাংলার একটা ইজ্জত ছিল।

আমাদের কথা কেউ ভাবল না।

আমি কে? চুনোপুঁটি বই তো নই। কিন্তু একদিন আমার এটুকু কারবার থেকেই যা করবার, সব করেছি। টাকাও ছিল কম! আর এই পুরস্কার, সেই পুরস্কার ছিল না। এত টি ভি রে,—কাগজ রে,—নামকরা লোকরা প্যান্ডেল দেখছে, এত ছিল না।

তবু কি যেন ছিল। কি যেন ছিল। চালচলতিতে এত ফাঁট ছিল না। পয়সার দাম ছিল। এখন পয়সা অনেক, ধামাকা অনেক, যাক গে! নাতিরা বলে, যুগের হাওয়া ঠাউদ্দা!

সে তো হল! কিন্তু আমাদেব যে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল, তার কি হবে?

এবার পুজোয় একটা মণ্ডপই করচি। তাদেরও পয়সা কম, অর্থাৎ আমাকে ক'হাজার ঠেকাবে, লাইটে, ফিস্টে, বাজনায়, ধাষ্টামোতে অনেক বেশি খরচ করবে।

সপন দেখি, যে মানুষের রুচি পালটেছে। পুরনো দিনের সব্যস্য বিসজ্জন দিচ্চে না।

সে কি দেকে যাব?

মনে জানি, দেকে যাব না। তা বলে সপন দেকতে দোষ কী?

অলোক গাগাড়িয়া কী স্বপ্ন দেখে?

দেখে ও, নিরন্তরই স্বপ্ন দেখে। ওর বয়স তেইশ, রং ফর্সা। ওর চোখে স্বপ্ন থাকে, থাকে ওর আঙুলে। অলোক! অলোক! তুই কী স্বপ্ন দেখিস?

অলোক কথা কমই বলে। ওর চোখ কথা কয়। অলোকের বয়স তেইশ। ও থাকে কুবেরনগর-ছারানগরে। আমেদাবাদ ঢোকার মুখেই বাঁ দিকে ঢুকে গেলে বাঁদিকে সাত ফুট চওড়া রাস্তা (এঁকে বেঁকে গেছে), তার দুদিকের বাড়িগুলো বলতে গেলে এ ওর মুখে মুখ ঘষছে।

আমরা এই ছারানগরে থাকি। আমরা 'ছারা' সম্প্রদায়ের লোক, এক সময়ে ছিলাম গুণেগার জাতি। আজও গুণেগার। কারণ সরকার বল, সমাজ বল, আমাদের গুণেগার করেই রেখেছে।

আগে রাখতো সেটেলমেন্টে। উঁচু পাঁচিল ঘেরা কমপাউন্ড, তার ভিতরে। আমাদের সমাজে সব চেয়ে বুড়ো লোক, ভূপৎ কোডেকার বলে, আমার লেখাপড়া খুব দামি। তা জানিস?

আমরা, যারা গ্রাজুয়েট, তারা হাসি। তবে মুখ নামিয়ে। বুড়োদের মান্য করতেই হয়। না করলে হয় না।

যখন ভূপৎভাই খুব ছোট, তখন পাঁচিল টপকে ওরা পালাত। শহর আর সেটেলমেন্টের মধ্যে জঙ্গল ছিল। ওরা খেলত, পাখি মারত, পুড়িয়ে খেত। বিকেল পাঁচটা অবধি অগাধ অবসর। পাঁচটা বাজলেই বুড়ো, বুড়ি, মরদ আওরৎ, বালক, শিশু সকলের হাজিরা ডেকে পুলিশ ঢুকিয়ে দিত ব্যারাকে।

গান্ধীজী না কি কিছুদিন আশ্রম থেকে আসতেন, ভূপৎভাইদের পড়াতেন। সেই জন্যে ভূপৎভাইয়ের লিখাইপঢ়াই খুব দামি।

এখনও সবাই বলে, ছারা? চোর! গুন্ডা! ডাকু! দারু বানায় আর খায়।

হ্যাঁ আমরা দারু বানাই। বানাতে হয়। নইলে পুলিশ ছাড়ে না। গুড় থেকে দারু ঘরে ঘরে বানাতেই হয়। বাইরে কুবেরনগর স্টেশনের সামনেই থানা। দারু কোথায় কোথায় পৌঁছব, সেও পুলিশ বলে দেয়। অবশ্য আমরা জেনেও গেছি।

দেখবে, ছারারা ফর্সা, দেখতে সুন্দর। আমরা চিরদিন দেখছি, দারু বানাতেই হয়, পৌঁছতেও হয়। দাদা এ কাজ করেছে। বাপ এ কাজ করেছে। আমি এ কাজ করেছি, আমরা যখন কলেজে পড়েছি, আমাদের ছোটভাইরা এ কাজ করেছে। ছারার ঘরে যে ছেলে জন্মায়, সে যেন দারুর ঠেকের খবরাখবর জেনেই জন্মায়।

হ্যাঁ দারু বেচি! বহোৎ হি কম দামে। তারপর পুলিশকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ঢুকি।

এ কাজ করতে অস্বীকার করলে? সে ট্রেনে কাটা পড়ে।

ছারা যদি বিয়ে করে বউ নিয়ে ঢোকে, কতবার পুলিশ স্বামীকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানা লকাপে পুরে দেয়। কত, কত ছারা মেয়ে কুড়ি না পুরতে বিধবা, তা কে খবর রাখে?

আমরা, আমি, দক্ষিণ, রকসি, অশোক, যখন বড় হলাম, জেদ তো ছিল দারু বানাব না, বেচব না! এখন জেদের জন্যে বহোৎ মার খেয়েছি। তবু আমরা ক'জন প্রথম বিদ্রোহ করলাম।

আমরা প্রথম লাইব্রেরি করলাম।

সেটাও একটা বিদ্রোহ।

ছেলেরা বেশি, মেয়েরা কম, এখানে আসে, বই কাগজ পড়ে।

ছারানগরে পুরুষরা প্রায় সবাই গ্র্যাজুয়েট। নয়তো ওকালতি পাশ।

কিন্তু ভকিলরা আদালতে কেস পায় না।

ছারা লোকরা হরদম ধরা পড়ে। আমেদাবাদে যা কিছু হয়, ছারাদের আগে ধরে।

ভকিলরা এই ছারাদের জামিন করায়।

হ্যাঁ, রতন কোডেকার এক মাত্র ছারা, যে সম্মান কেড়ে নিয়েছে। কোর্টে জজ হয়েছে। কি হয়ে যাবে।

রতনভাই কলকাতা গেছে, বাদল সরকারের নাটক দেখেছে এক সময়ে, বই পড়ে।

ও আমাদের টেনে নিয়েছিল। ছারাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে সরকারি অফিসে ধর্না দিয়েছে, আমাদের চাকরির জন্য চেষ্টা করেছে। শিখিয়েছে, সমাজে কোনও বিপদ হলে দৌড়ে যেও।

ভূকম্পের সময়ে আমরা অনেকে পুরো রাত ধ্বংস সরিয়ে মানুষ উদ্ধার করেছি। কাঁধে বয়ে নিয়েছি হাসপাতালে। প্রৌঢ় থেকে যুবক, সবাই রক্তদান করেছি। জোয়ান বয়সে কয়েকদিনে কয়েকবার রক্ত দিলে কিছুই হয় না।

কী হয়েছে আমার! আমি কি বলব।

আমরা ও বি সি। এবার গুজরাট দাঙ্গায় নেতারা কৌশল করে ও বি সি আর আদিবাসীদের জড়ায়। ছারারা এর আগে কখনও দাঙ্গায় জড়ায়নি।

আমেদাবাদে দাঙ্গা তো অনে—ক বার হয়েছে! কখনও কোনও ছারা তাতে ছিল না।

অন্য ওবিসিরা সবাই তো গুণেগার সম্প্রদায় নয়। তাই আমেদাবাদের হিন্দু বল, মুসলমান বল, এস সি বল, আমরা সকলের চোখেই ব্রাত্য।

তাই তো কেউ যদি বলে, চেয়ারে বোস না! আমরা বর্তে যাই।

—বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কিছু খাবে?

এ কথা শুনলে বক্তার পায়ে পড়ে যেতে ইচ্ছে জাগে। এবার নিশ্চয় পুলিশের দাবড়ানিতে আর বজরঙ্গীদের সন্ত্রাসে সামান্য সংখ্যক ছারা লুটতরাজ করে, আগুনও লাগায়।

তাদের ধরল সবার আগে, সে সঠিক কাজই করল। কিন্তু তারপর থেকে কত ছারাকে ধরেছে আর জেলে ভরেছে জালি কেস দিয়ে। সে কথা ভাবতেও ভয় করে।

আমার কথা তো সেটাই। ছারা ঘরে জন্ম নিলে লেখা পড়া শেখো, ভাল কাজ করতে চেষ্টা কর। কিন্তু গুণেগার জাতির কলঙ্ক আর কাটে না।

রতন কোডেকারই ১৯৯৮ সালে বলে, তোমরা নাটক কর।

—আমরা পারব?

—যারা বিনাবিচারে দু'শো বছর মার খাচ্ছে, তারা নাটক পারবে না তো কারা পারবে?

—নাটক কেমন করে কারা পারবে?

নাটক কেমন করে করে, আমরা জানি না। আমাদের কি স্টেজ আছে, লাইটম্যান আছে, মেকাপ ম্যান, শব্দযন্ত্রী আছে?

কিছুই নেই।

মনে হল, নেই বলেই আমরা পারব। 'বুধন' পত্রিকায় বুধন শবরের কেসের রায় পড়েছিলাম। আমরা তা পড়ে ঠিক করলাম 'বুধন' নাটকই করব। গুণেগার জাতিদের জীবন ওই নাটকেই ফুটে উঠবে।

রতনভাই বলল, একেবার থার্ড থিয়েটারের ফর্মে করবে।

আমরাও তাই চাইলাম। পোশাক বদল নেই। যেখানে সেখানে নাটক করতে পারব। কল্পনা আমাদের বন্ধুর বউ।

ও লাফিয়ে চলে এল।

৩১. ৮. ১৯৯৮ আমরা প্রথম অভিনয় করি। প্রথম দিন থেকেই আমি বুধন। তারপর এ নাটক আমরা আমেদাবাদ, দিল্লি, ভোপাল, বরোদা, রাজস্থানে অন্তত একশোবার করেছি; পুলিশ অ্যাকাডেমিকেও দেখিয়েছি। আমরা বিখ্যাত হয়ে যাই।

আর আমি পেয়ে যাই পথ। বুঝতে পারি নাটকে অভিনয় করতে পারলেই আমি বেঁচে যাব।

কী বলব? জাতীয় নাট্যাভিনয় ইনস্টিটিউটে এত চেষ্টা করলাম, এত চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার পিছনে তো টিকে ধরবার কেউ নেই।

ওরা আমাকে নিল না।

কাকে নিল?

তা বলে কি হবে!

আমাকে নিল না।

আমার মুখের ওপর 'না' বলে দিল।

কিন্তু আমাকে অভিনয় করতেই হবে। আর কিছু করেই আমি 'আমি' হয়ে উঠতে পারি না।

কে তা বুঝবে? আমি কোথায় যাব? আমি কি আবার দারু বেচতে যাব। পুলিশকে বাট্টা দেব, আর ঘরে ফিরব?

পুলিশই আমাদের দিয়ে দারু করায়।

'না' বললে ধরে নিয়ে যায়।

'এরা ছারা, দারু বানায়' বলেও ধরে নিয়ে যায়।

আমার স্বপ্নটা নিশ্চয় অনেক, অনেক তরুণের।

আমি এমন করে পচে পচে নিঃশেষ হয়ে যেতে চাই না। তোমরা কারা? যে একটা ছোট ছেলেকে বাঁচতে দিতে চাও না?

আমার স্বপ্ন একটাই।

নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে বাঁচতে চাই। আর আমার মতো এ স্বপ্ন দেখে, অগণিত তরুণ।

তারা গুন্ডা কেন হয়ে যায়, তা বুঝতে পারি।

কিন্তু আমি গুন্ডা হতে চাই না।

'আলোক' নামে বাঁচার স্বপ্ন দেখি আমি। শুনছি, স্বপ্ন দেখাও অপরাধ।

পরকাশের স্বপ্ন কী ছিল?

প্রথমেই বলে ফেলা ভালো, পরকাশ যে জনযোদ্ধা, তাই বিশ্বাসযোগ্য সে বিষয়ে ওই রাজ্যের পুলিশ, নেতা ইত্যাদির কোনো সংশয় নেই।

সে হিংসাবাদী এ কারণেই, যে তাকে এ অবধি কেউ 'বড় জোর ক্যামেরা' ছাড়া আর কিছু বহন করতে দেখেনি।

ও কখনো চড়া গলায় কথা বলে না। ওর পরনে থাকে ধুলো রঙের জীনস্, ধুলো রঙের কুর্তা। মুখে থাকে ক্ষীণ বিনয়ী হাসি। চোখে থাকে একটা অদ্ভুত বিস্ময়। সর্বদা ও বিনম্র, যেন ক্ষমাপ্রার্থী।

কোনোদিন, কোনো মেয়ে বলেছিল, কেন তুমি সকলের কথা শুধুই শুনে যাও? ওই সব আজে বাজে লোকের কথা শোনো কি করে?

—ওরাও বলল, আমিও শুনলাম।

—কতবার "উচিত ছিল" বলল, বলো তো? আপনার আগে সার্ভে করে নেওয়া উচিত ছিল... দেখছি এক দম্পতির তিনটে বাচ্চা... ওদের পরিবার পরিকল্পনা শেখানো উচিত ছিল। দুটো মেয়ে, একটা ছেলে, মেয়েগুলোকে অবহেলা কোর না, শেখানো উচিত ছিল...

—আমি তো বললাম, ওরা বিরজিয়া আর পাহাড়িয়া আদিবাসী। আর আদিবাসী ঘরে মেয়েদের বেশি আদর।

—তোমার মতো লোক আমি দেখিনি।

—এখন তো দেখছ।

খুব টগবগে মেয়ে ছিল, খুব কাজের। চুল ছোট করে ছেঁটেছিল। খাদির কুর্তা আর প্যান্ট পরত। পরকাশের সঙ্গে "সাখিন"দের ওপর ডকু করেছে, পালামৌ-এর বিরজিয়াদের তাঁতশিল্পের ওপর ডকু করেছে। ওদের তথ্যচিত্র দেশিবিদেশে পৌঁছে গেছে। তারপর মেয়েটি বলেছিল, আমরা কি কাজের সাথী হয়েই জীবন কাটাব?

—পরে বলব।

পরে, ওই ক্ষুদে শহরের "পীকক" হোটেলে বসে পরকাশ নিজেকে খুলে মেলে ধরেছিল।

—তুমি হয়তো বিয়ের কথাই বললে...কিন্তু...

—তুমি কি মেঘনাকে কথা দিয়েছ?

পরকাশ হো হো করে হেসেছিল। মেয়েটি খুশি হয়নি,—এটা হাসার কথা হল?

—মেঘনা এখন মেঘনা নাগরাজ। ফ্রান্সে থাকে। ওর স্বামী কীটনাশক ওষুধের ফলে চাযের জমির ক্ষতি নিয়ে বক্তৃতা দেন। ওদের মেয়ের বয়স তিন বছর। মেঘনা! মেঘনার বুদ্ধি ছিল। ও আমার মতো বাউন্ডুলেকে বিয়ে করত না।

—কিন্তু আমি তো...

—আমি কোনো স্থায়ী সম্পর্কে যেতে ভয় পাই।

—আমি পাই না।

—আমার সাহস নেই। আর আমি যেমন ঘুরে ঘুরে কাজ করি ..না! তোমার অনেক ভালো বিয়ে হওয়া উচিত। তুমি তো সত্যিই এক অসামান্য মেয়ে।

"পীকক" হোটেলে ওরা দুটো ঘর নিয়েছিল। হোটেলের লোকরা আশা করত, কোনোদিন একটা ঘর খালি থাকবে রাতে।

তা হয় নি। সকালে পরকাশ জেনেছিল, মিস জোশী চলে গেছেন। একটা চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠিটা খুব সংক্ষিপ্ত। "কাল রাতের কথাবার্তা ভুলে যাও। আপাতত কলকাতা হয়ে দিল্লি ফিরে যাব। ছবিটার একটা প্রিন্ট আমাদের অফিসে পাঠিও। আমরা লিটারেচার বানাব। সর্বত্র পাঠাব। মনে করি বিক্রি হবে। ভালো থেকো। —রুচি।"

রুচিরার সঙ্গে কি আশ্চর্য। আর দেখা হয়নি। ও রাজস্থানে কাজ করছে। ওর কথা পরকাশের মাঝে মাঝে মনে হয়।

বয়স তো ছেচল্লিশ হয়ে গেল। এখন পরকাশের কেন মনে হয়, এমন কোনো কাজই করা হল না যাতে মনে হয় কিছু করছি। হ্যাঁ, সে সময়ে সারফেস কালিয়ারিতে কাজ করার বিপদ নিয়ে ছবি করেছে।

খুব প্রশংসা পেয়েছে ছবি। অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পালামৌ গিয়ে সেদিনই দেখে এসেছে। ওরা সেই কাজই করছে। তিরিশ বছর আগে বারোআনা দিলে ঘরে কয়লা পৌঁছে দিত। এখন চারটাকা দিতে হয়।

তেমন খনি-খাদান নেই। নেই চাযের জমি। হয় ক্ষেতমজুর, নয় বনবিভাগে জঙ্গল মজদুর, অনেকে চলে গেছে দেশ ছেড়ে। কিন্তু মূল অবস্থার পরিবর্তন খুব একটা হয়নি। এসব দেখলেই মনে হয়, হয়তো একটা জায়গা। সেখানকার জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করলে হত। আরণ্য বিহার বা ঝাড়খণ্ডে তো মুশকিল। বলে দেবে, "জনযোদ্ধা"।

জনযোদ্ধারাই বা ওকে বিশ্বাস করবে কেন? পরকাসের মনে হয়। সে তো পরম সততায় কাজ করে। যাদের জন্য কাজ করে, তারা তো ওকে আপনজন বলেই মেনে নেয়। মাকি বিরজাইন কতবার বলেছে, থাক তো আমাদের কাছে? ঘর তুলে নে একটা। ইচ্ছে হলে বিয়ে কর আমাদের সমাজে। এমন সমাজ পাবি কোথা?

পরকাশের মনে হয়, মাকিদের কাছের মানুষ ওই জনযোদ্ধারা। পরকাশ যেন এমন কিছু না করে, যাতে মাকিদের সঙ্গে ওদের সম্পর্কে কোনো চিড় ধরে।

বেরোতে আসার আগেও ও কতই খবর নিয়ে এসেছে। পূর্ণেন্দুবাবু নেই। ইউনাইটেড মিনারাল ওয়াকার্স ইউনিয়ন এখন সম্ভবত পূর্ণেন্দুর সাথের সাথী লাবু জোংকোর কাছে পড়ে থাকা একটি বিবর্ণ কাঠের বোর্ড।

লাবুর প্রতীক্ষা, অরণ্যদুহিতা সে, এক শবরীর প্রতীক্ষা যেন। সে বিশ্বাসে অটল হয়ে আছে যে, কোনোদিন কেউ আসবে। তাদের বাউ, বড়দাদা, পি মজুমদারের পথে আদিবাসীদের জন্যে কাজ করবে। বেরোতে অ্যাসবেস্টস খাদানে কাজ করতে আমার উদ্দেশ্য দুটো। সেই যে একদা অ্যাসবেসটোসিস রোগে মজুররা মরতে থাকে ..সেই যে একটা হাসপাতাল তৈরি হয়, সে কাজটা আবার শুরু করতে হবে। চালাতে হবে।

বলা যায় না, জনযোদ্ধাদের মধ্যে ডাক্তার থাকতেই পারে। সে কি অ্যাসবেসটোসিস বিশেষজ্ঞ হবে না? না হোক!

বিলাসপুরে ছিলেন পূর্ণেন্দু ঘোষ। কাকদ্বীপ তেভাগা কালে অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণের কারণে যিনি 'রাঙা ডাক্তার' নামে পরিচিত হন।

বিলাসপুরে এসে বসলেন, চেম্বারও খুললেন। তিনি কিন্তু মুটে মজুর, রিকশাওয়ালাদের ধরে ধরে প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়ম শেখান। ওদের শেখান ব্যান্ডেজ বাঁধতে, পোড়ার চিকিৎসা করতে, এমন কি ইনজেকশনও দিতে। বলতেন "খালি পা ডাক্তার তৈরি করছি।"

এখানে একটা হাসপাতাল থাকলে নানা কাজই করা যাবে। প্রথম দিকের কিছু টাকা, পরকাশ তার স্কীম নিয়ে গিয়ে "ডক্টর অ্যাট ইওর ডোর" সংগঠন থেকেই আনতে পারবে, কিন্তু আদর্শদীপ্ত ছেলে।

বেরোতে অ্যাসবেসটস মাইন। স্থানীয় আদিবাসী লেবারই কাজ করে। বেশ দূরে পি মজুমদারের চেষ্টায় তৈরি হাসপাতাল।

একবার লাবু কোংকোর কাছেও ঘুরে এল। মাকি বিরজাইন বলেছিল, মাথা নিচু করে যেও। ও এক জীবনে যত লড়াই করেছে, ওদের কোলহানে একশোটা মরদ তা করেনি। বহোত লড়াই করলো ১২/১৩ উমর থেকে। কোলহানে আদিবাসীরা বিপদে পড়লে ওর কাছেই যায়।

পি মজুমদার স্মৃতি ভবনের দোতলায় বসেছিল লাবু জোংকো। ওর বর অমরনাথ ওর চেয়ে বয়সে ছোটই হবে। ও সবসময় সোজাসুজি বলে। লাবু চালায়, আমি চলি।

একটি প্রৌঢ়া বসে কাঁদছিল। লাবু বলল, তোমার মেয়েকে যখন মধ্যপ্রদেশে সাতনায় পাঠালে, তার আগে আমাকে জিগ্যেস করোনি কেন?

পরকাশের দিকে চেয়ে বলল, ইনলোগোকোঁ কৈসে বচাউঁ।

মহিলাকে বলে, যাও, সব লিখে নিয়ে এসো। কে ছিল ঠেকেদার, কি বলেছিল, কোথায় নিয়ে যাবে, কি কাজে, কতদিন কাজ করবে, কত টাকা পাবে—হঠাৎ কঠোর গলায় বলে, এই জন্যেই

ফরাম ছাপাই, বারবার বলি ঠেকেদারের লোককে আমার সামনে এনে ফারাম মেঁ লিখাও। তুমি কত টাকা পেয়েছিলে?

আঙুল তোলে মেয়েটি।

—দু'শো?

—ঔর কাপড়া লত্তা! মেয়েকে ব্যাগ দিল...

—যাও। যাও তাকে ধরে আনো, যাও!

পরকাশ অবাক চোখে দেখছিল। শীর্ণ, লম্বা, কাঁচাপাকা চুল, খুব পরিষ্কার সাদা কাপড়, সাদা জামা পরেছে, ঘরে কাচা। চুলে বেনি বাঁধা। এই মেয়েই একদিন সিংভূম পুলিশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। থানায় ঢোকালে আদিবাসী মাটিতে বসবে না, চেয়ারে বসাও, এ অধিকারও লাবু আদায় করেছে।

আরো কত, আরো কত!

—বলুন পরকাশ ভাই।

—ঠেকেদার আদিবাসী রেজা এ ভাবেই নিয়ে যায়?

লাবু শুকনো গলায় ঈষৎ হেসে বলে, হ্যাঁ, ঝাড়খণ্ডের জন্যে বহোত হি লড়লাম সারাজীবন, ঝাড়খণ্ড তো আদিবাসীকে অনেকই দিল... অনেক...!

লাবু বাইরে রাস্তার দিকে তাকায়। পরকাশের বুকে কি যেন বিঁধে যায়। ও এমন কারো সঙ্গে কথা বলছে, যে ১২/১৩ বছর বয়সে কলকাতা এসেছিল খোয়া পাথর ভেঙে রেল লাইনে বসাতে। যে দশক থেকে দশকে...

লাবু খৈনি ডলে গালে ফেলে ও বলে, নিয়ে যায়! মাঝে মাঝে আমাকে দৌড়াতেও হয়। একবার একটা ছেলেকে ওড়িষা থেকে, আরেকবার দুটো মেয়েকে মৌবানীপুর থেকে বের করে আনলাম। সে সময়ে ললিত সঙ্গে ছিল।

—ললিত মাহাতো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন হাজারিবাগ চলে গেছে। এম সি সি হয়ে গেছে। কি করবে? কত দেখবে?

—এখনো ঠেকেদারের লেবার!

—কেন হবে না? কি দিয়েছে ঝাড়খণ্ড আমাদের? না জঙ্গল। না জমিন, না জল, আরে! লাল রেশন কার্ডই দেয় না। চাকাতে এসেছ (চক্রধরপুরে) আঁখ খুলে দেখে যাও। শহরের চারপাশে ভিখারির বস্তি। স-ব আদিবাসী। আর...

—আর কি। দিদি?

—এখন শুনছি, ১৯৩২ সালের আগে যারা জমির দলিল রেজেস্টারি করেছে, তারাই ঝাড়খণ্ডের নাগরিক। এতে আদিবাসী গেল, অনেক বাঙালি গেল, আরো কতজন গেল তার ঠিক কি?

—আদিবাসী গেল?

—আমার পূর্বপুরুষ থেকে আমরা এখানে। আমরা হো, লাকড়া, চাই লড়াকু হো। আমরা সব খুটকাট্টি গ্রামের পত্তন করেছি, থেকেছি। ততসাল আগে জমিন আপিস ছিল না।

—তাহলে তো ঝাড়খণ্ডে কেউই থাকবে না।

লাবু ঈষৎ হাসে। বলে, আমরা অনপড় ছিলাম পরকাশ! নইলে মালিক-মহাজন, লালা, বানিয়া, ঠেকাদার, সব বিহারের লোক। আমাদের রক্ত চুষেছে। ওরা লেখাপড়া জানত, কাগজ

আছে। ওরা আরাম সে আছে। ঔর, সেই ইংরেজরাজ থেকে যত খনি-খাদান মালিক এখানে ইনডাস্ট্রি করেছে তাদের কাজ তো পোক্ত। ঝাড়খণ্ডে তাদের অধিকার নেই, যাদের জমিন-জঙ্গল-পাহাড়-ঝরনা ছিল। তুমি বলো। ঠেকেদারের লেবার হওয়া ছাড়া আদিবাসীর হাতে রইল কি! সরকার দেখিও না। যে আদিবাসী সরকারে যায়, সে আদিবাসীর কোনো ভালাই করতে পারে না। আরে! গুয়াফায়ারিং-এর পর সিংভূম পুলিশ...দিল্লির মন্ত্রী কার্তিক ওরাওঁয়ের গাড়ি ঢুকতে দেয়নি। সে তো কংরেস রাজ ছিল। তাই না?

পরকাশ ভাবে। কি হয়। যদি এখানে থেকে যাই। এর সঙ্গেই কাজ করি?

লাবু বলে, বলো, কি জন্যে এসেছ।

—বেরো অ্যাসবেস্টস খাদান! ওহি হাসপাতাল!

—হ্যাঁ। পি মজুমদার আমাদের নিয়ে বহোত হি লড়েছিল। বহোত...

—বিরলাদের ছিল?

—ও তো ফরন্ট কা নাম হোতা হায়? সে সময়ে এত লোক মরে গেল। অত বাচ্চা রোগ নিয়ে জন্মাল, বহোত লড়াই উঠে গেল. এমন হলে মালিক খাদান আর হাতে রাখে না। দেয় কোনো বিরাদরকে। দাদা তো ছাড়ত না। চৌথা মালিকের কালে ওই অসপাতাল হল।

—এখন মালিক...

সুবুজ কেওড়িয়া। সেও আর কাউকে দিয়েছে...ওই খাদানের মালিক কে, তা একশো জন ভকিল একশো বছর তালাস করেও বের করতে পারবে না। আদিবাসী কী করবে, বলতে পার?

—অসপাতাল?

—বহোৎ হি লরাই-এর পর হয়েছিল। সে অসপাতাল বনাবার কালে দিল্লি থেকে তারা মেহ্‌তা দিদি.... তখন পি মজুমদারের নাম ছিল. সি. পি. আই সাহায্য করত...এক মেডিক্যাল টীম পাঠিয়ে দেয়।...ভালো চলছিল।

—দিদি! খনিও আছে, লেবারও মরে। আমি দিদি! তথ্যচিত্র তুলি।

—জানি।

—জানেন?

—ছোটামোটা জায়গা পরকাশ! খবর তো এসেই যায়।

—টকসে?

লাবু হাসে। বলে, মুখে মুখে! দু'বার এসেছ। সঙ্গে দুটো মেয়ে থেকেছে। প্রথম একটা ছেলে মটরবাইক উলটে পড়ে যায়...আরে! ও হি "পীক্‌ক" হোটেলের মালিক তো হরদম আসত।

—তাহলে তো সবই জানেন।

—ওই। যা শুনি...এখনো বেঁচে আছি...সাইকেল চেপে ঘুরিও খানিক।

—দিদি! আপনার উমর কত হল?

—কোলহানের মেয়ে হই আমি। যতদিন চলতে পারি, চলছি। যেদিন চলতে পারব না, মরে যাব। তোমার কথা বলো।

—দিল্লিতে একটা সংস্থা। ওরা দুনিয়াতেই খনিখাদানে খনিজ গুঁড়া থেকে যে শ্বাসের ব্যারাম হয়, তার ওপর কাজ করছে।

—তুমি কি করবে?

—হাসপাতালের এখন যা অবস্থা, তার ছবি উঠাব। ওখানে নতুন হাসপাতাল ওহি সংস্থা বানিয়ে দেবে। ওরাই ডাক্তার রাখবে...এই সব!

—তোমার চোখে অনেক দুখ, পরকাশ!

—দেখে দুখ উঠে যায় দিদি! যাদের কাজ করতে আসি। তাদের দুখ্‌ তো থেকেই যায়।

—তাদের সঙ্গে কেউ থাকে না। আদিবাসী লেবারের জন্যে অসপাতাল করবে, চলে যাবে। অসুখ হলে ইলাজ করবে, কিন্তু পরকাশ!

দিদি?

খনিমালিক কি ওদের সকলকে শ্বাস নেবার মেশিন সিলিন্ডার দেবে? অ্যাসবেসটোসিস, সিলিকোসিস, কেয়া সিমেন্ট ডাস্‌ থেকে যে অসুখ, তাতে কোম্পানির যা করবার তা করে না। দুনিয়াতে করে, এখানে করে না।

পরকাশ বুঝছিল। আমি জড়িয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছি অ্যাসবেসটোসিস হলে বিপদের কথা। কিন্তু এটা তো দু-দিকে কাজ চালাবার ব্যাপার। মালিক যদি লেবারের প্রোটেকশানের কথা না ভাবে...অ্যাসবেসটোসিস তো হবেই। না। যে ভাবে কাজ করা যায়। সেটা যথেষ্ট নয়। তথ্যচিত্র দেখে তোমরা বললে। দেখ, দেখ, কি শোষণ চলছে ওখানে। হ্যাঁ সে চিত্র উদ্‌ঘাটন করা যায়। চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল বহোৎ হি লড়ে আদায় করা হয়। কিন্তু মালিকের যে ব্যবস্থা নেওয়া বাধ্যতামূলক, সে তা নেয় না। আর ঝাড়খণ্ড! দূরে দূরে এখানে ওখানে খনি খাদান! কেমন লেবার ইউনিয়ন? তারা কি লড়বে? যাবে খনি খাদানে শ্রমিকদের বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে কোনো দপ্তরে, কোনো আদালতে?

যে দেশে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর আজও জখমিদের ক্ষতিপূরণ মেলে না?

ইউনিয়ান কার্বাইড কোম্পানি অন্যের হাতে বেচে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে?

—পরকাশ। সেই ছোট্ট কাজটা করো, যার সম্পূর্ণটা করতে পারবে।

—হ্যাঁ দিদি।

—ওই পরকাশ! আমার খুব মনে হয়, লেবারদের বাচ্চাদের সাবধানে রাখা খুব দরকার।

—হ্যাঁ দিদি!

কাজ! কাজ! অর্থবহ্‌ কাজ! মালিকপক্ষ, শ্রমিকদের জন্যে তাদের যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যিক তা বিনিশ্চিত করবে কারা?

যারা খাদানে নামবে, তাদের অ্যাসবেসটোসিস যাতে না হয়, তা দেখবে হাসপাতাল! তেমন হাসপাতাল কি আগেও ছিল?

পরকাশ বলে, দিদি! আপনি বোধহয় আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

—আমি কে, পরকাশ? আর শোনো, তুমি কোনোদিন মায়লে পোলিটিস করো নি। বারবার নাম কেন বদল করেছ, জানি না। এখন পরকাশ আছ। থেকো।

ঈষৎ হেসে লাবু বলে, চন্দর...

পরকাশ...আহীর...এ নাম বাউও শুনে গেছে।

—বাউ?

লাবু হেলান দেয়। বলে, বাউ...দাদা...পি মজুমদার...ও রকম পাগল তো আর হবে না। কোন ভাষাটা বলত না? হো, সানথালী, কুরুখ, মুণ্ডারী, সব ভাষা বলত। হিসেব ছাড়া লোক ছিল।

অসুখের সময়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল কলকাতা। মিটিকাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হল, মরেও গেল। তাকে যারা বড় ভালোবাসত, তারাও কাগজ পড়ে জানল!

—আমি...আপনার সঙ্গে যোগ রাখব...

—কষ্ট কোর না...ললিত খবর দেবে।

—আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

—ছোটোমোটা জায়গা পরকাশ। খবর চলেই আসে।

—আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে...

—এখানে কে লালটিম জ্বেলে বসে থাকবে? এক সময়ে এত লড়তাম, কোথায় সি পি আই! কোথায় খনি খাদান-মজদুর ইউনিয়ান। তব্ ভি এরা লাবু জোংকোর কাছে আসে!

—দিদি! আপনার কোনো সপন নেই।

—আছে। খুব ইচ্ছে করে আগেকার মতো সশক্ত হয়ে যাই, সাইকেলে ঘুরে বেড়াই। মেয়েদের জঙ্গল ইউনিয়ান বানাই, সে তো হবার নয়। চাকা তখন রেলোয়ে টাউন। চাকা দিয়ে চলে যাবার সময়ে আমরা একটা বড় শিরীষ গাছের নীচে বসতাম। রেলের কলে নাহাতাম, কাপড় ধুতাম, দোকানে খেতাম। আরো আগে লেবার লোক কলকাতা, পাটনা, গয়া থেকে কাজ করে চলে আসত। দেড়শো মেয়ে গিয়েছিল: দেড়শো মেয়ে আসবে। তারপর যে-যার গ্রামে যাবে।...সে সময়ে খুব সশক্ত ছিলাম! চলে আসার সময়ে লাবু সস্নেহে বলে, সাবধানে থেকো পরকাশ। বহোত্ হি বুরা টাইম। যারা পাঠায়, তারা বোঝে না কিছু।

পরকাশ বলে, আবার আসব।

—হতে পারে, আমার কাছ থেকে সার্জোম জোংকো যাবে। আমাব ভাতিজা। মায়লেরাও চেনে পুলিশও চিনে। ওই তো আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়। না অমর, না আমি আমরা খুব ভালো লিখতে পারি না।

—কি করে, সার্জোম?

— রেলে কুলি কাজ করে, আর ফুটবল খেলে। এখনকার ছেলে!

পরকাশ বোঝে। লাবু তার সাধ্যমতো ওর নিরাপত্তা বিনিশ্চিত করতে চেষ্টা করছে।

—তুমি অখ্বরে লেখো না?

—কিছু কিছু। আপনার একটা ছবি নেব?

—নাও না।

—আরেকদিন এসে আপনার বায়োডাটা লিখে নেব।

—কি হবে?

—প্রচার দেব।

—পরকাশ! ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীর পাশে যে দাঁড়াবে, তাকেই আশীর্বাদ করব। তখনো যা, এখনো তাই?

ঠিকাদারের কুলি হয়ে চালান যাবে? আর কিছু হবে না? নিজের জায়গায় থাকতে পাবে না? ইত্না আইন বনল, লাগু করে কে?

—সরকার করে না।

—একেকটা আইন লাগু করতে আদিবাসীকেও একাট্টা হয়ে লড়তে হয়।

—হ্যাঁ দিদি।

লাবু জোংকোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরকাশ দিল্লীতে ই-মেইল করে একটা দোকান থেকে।

আমার সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি হবে না।

পরকাশ বেরোতে যখন পৌঁছায়, মাথুর ওখানে অপেক্ষা করছিল। মাথুরই ওর কনটাক্ট। মাথুর বলে, এখন নাহাও। থোড়া কুছ খাও।

কাল নিয়ে যাব অসপাতাল।

—চলুন।

মাথুরের অ্যাসবেস্টস শেডের যে বাংলো, তাই বর্তমান হাসপাতাল। তার পিছনে মাথুরের থাকার ঘর। যে স্নানের জল দেয় এবং স্টোভে রান্না করে পরোটা ও সবজি, সে ওয়ার্ড বয়।

মাথুর বলে, ওয়ার্ড বলতে অসপাতালে তিনটে বেড। সেও খালি। আমরা ওদের টাউন অসপাতালেই পাঠাই। ওয়ার্ডবয় একজন।

—ডাক্তার?

—টাউন থেকে শনি-রবিবার আসে।

পুরনো হাসপাতাল?

—দেখাব। দেখাব। দেখতেই তো এসেছেন। ইস... সে সময়ে এত ধুমধামাকা হল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। দু'বছর না যেতে টাকা বন্ধ হল...

—খনি মজদুর ইউনিয়ান খুব লড়েছিল...

—তার ফলে কিছুকাল চলে...

—পি মজুমদার মারা গেলেন...

—ইউনিয়ান ভি তিনটে হয়ে গেল..

—আবার দুটো ইউনিয়ান জুড়ে গেল...

—তারপর ঘন ঘন মালিক বদল...ঔর...

—খাদান চালানো লাভজনক তো?

—অ্যাসবেস্টসে নাফা নেই? নাফা হি নাফা!

—এখন মালটিন্যাশানাল ঢুকে যাবে...মালিকরা মোটা টাকা নিয়ে ভেগে যাবে...

—সব জানেন। তো অসপাতাল নিয়ে এত ভাবছেন কেন আপনারা?

—আমি তো ডকুমেন্টারি তুলব। মালিকদের আপিস কোথায়?

—ন্যাচারেলি টাউনে। তারা মনে করে, পাঁচ মাইলের মধ্যে থাকাও বিপজ্জনক। বলতে কি! অ্যাসবেসটস খাদান থাকতেই পারে। আর লেবার ছাড়া আর কারো বিপদ হয় না। সে কথা বুঝবে কে?

—বেরো টাউন কোথায়?

—আসার সময়ে সাত মাইল আগে ফেলে এসেছেন। এখানে আশপাশ থেকে শুধু লেবার আসে কোম্পানির ট্রাকে।

—রেগুলার লেবার?

—৬৫% ভাগ ক্যাজুয়াল। বেগার শ্রমিক।

—কি পায়?

—থাক... ওভারসিয়ার আসছে।

ওভারসিয়ারটি প্রত্যাশিতভাবেই অন-আদিবাসী। সে বলে। ইনিই এসেছেন দিল্লি থেকে?

—এক এন জি ও পাঠিয়েছে?

পরকাশ নিচু গলায় বলে, আমাকেই শুধান।

—পরিচয় তো হয়নি।

—আমি পরকাশ।

—শুনেছি। আপনি খনি-খাদানের ফিল্ম তোলেন। খুব নিন্দা হয়...লেবর সেক্রেটারি আপনাকে চিনলেন কি করে?

পরকাশ শুভ্র হেসে বলে, একসঙ্গে পড়েছি।

—আই এ এস হয়েছিলেন?

—পরীক্ষায় বসলাম না...

—ও! তা এখন শুনছি.... আপনি এম সি সি নন তো?

—হলে কি বলতাম, না আসতাম? না, আমি জনযোদ্ধা নই। বহোৎ হি ভোঁতা হাতিয়ার!

—যাক গে...দেখুন! অসপাতালটা যদি হয়ে যায়, তাহলে গরিবের খুব উপকার হবে। বেগার লেবার তো বেশি!

ওদের জন্যই ভাবি...

—তা তা, মালিকরা হাসপাতাল করছে না কেন?

—করেছিল। চলল না।

—চালাল না, বলুন!

—কি বলব? কিন্তু খাদান দেখতে চান তো দেখিয়ে দেব। যা বলেছিলাম... মাথুরজীও বলেছেন নিশ্চয়... ওই জঙ্গল এলাকায় বিপজ্জনক সব লোকেরা ঢুকে গেছে... ওদের হাতে বন্দুকও আছে।

আমি একটু ঘুমাব।

—ঘুমান, ঘুমান, বিশ্রাম নিন।

ওভারসিয়ার চলে গেলে মাথুর বলে, লোকটা ভালো নয়। এখন মায়লেদের ভয়ে ভালো হয়ে আছে।

—বটে?

—হ্যাঁ, ঝ্যামেলা না করেই হপ্তা দেয়। শুনছি এরা লাল রেশনকার্ড পাবে। বেরো গেলেই সস্তার চাল পাবে। আর! একটা ইস্কুলও করবে হয়তো!

ওরা বলছে বেরোতে করব, লেবার বলছে গ্রামে করো, এতেই বোঝা যায়, মায়লেদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। ওই সাহস দেখে মনে হয়।

জনযোদ্ধারা আছে? তারা নেই? কি হবে তা জেনে। যখন অঞ্চলে লাল রেশনকার্ড ঢুকছে, সস্তায় চাল মিলবে? ওদের সাহস বেড়েছে।

—মাথুরজী।

—বলুন!

—ওরা তো সওদা করে হাটে। বেরো শহরে যাবে?

মাথুর সহাস্যে বলে ওহি তো তামাশা। পুরনো অসপাতাল এখন ওদের দাবিদাওয়ার কাগজ লাগাবার জায়গা।

ওরা লিখতে জানে?

আমি জিজ্ঞাসা করি না।

এখানে প্রসঙ্গটি থেমে থাকে, শেষ হয় না। এটা পরকাশ জীবনভর দেখেছে, কোনো প্রসঙ্গ ই যেন শেষ হয় না, চলতে থাকে। ও আর বুটিরা ভালো বন্ধু ছিল। ওদের সম্পর্ক তার চেয়ে প্রগাঢ় হল না।

শেষও হল না।

অনেকদিন পরকাশের মনে দুঃখ থাকবে। ও এক ভালো বন্ধুকে দুঃখ দিয়েছে। আবার নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হয়ে থাকবে, কোনো মানবিক সম্পর্ককে স্থায়ী করার কথা ভাবতেই ও ভয় পায়। এসব ভাবলে নিজেকে ওর ভালো লাগে না এখন ওর মনে হচ্ছে, ছবি তুলে, DAYD বা 'ডক্টর অ্যাক্ট ইওর ডোর' বা 'ডাগদর হাজির হ্যায়'—কে ক্যাসেট পাঠাবে। হাসপাতালটা তৈরি করা ওদের কাজ...ও কি করবে?

পরকাশ বলে, আমি হাসপাতালটা দেখে আসি।

—বললেন যে ঘুমোবেন?

—দেখে এসে ঘুমাব?

চলে আসবেন। আমি অসপাতাল গেলাম। না না, দরজা খোলাই থাকে। একে তো চুরিচামারি নেই, তার ওপর যে ডাক্তার এখানে থেকে যায়, চলে যায় না, তার ঘরে চোর ঢুকতে দেবে না। যে সবজি খেলেন, ওটা জংলি পরবলের সবজি। কাঁচা লঙ্কা, লেবু, পরবল, তুরি, শাক, লাউকি, ওরা মাঝে মাঝেই এনে দেয়।

—আপনি ওদের গাঁও যান?

—২/৩ বার গেছি, চিকিৎসা করতে। সাপে কাটার ইঞ্জেকশান আমার ভাইপো পাঠায় বম্বে থেকে। সাপে কাটা রোগী বাঁচালেন, তো আপনি দেওতা!

—আপনি ওদের ভালোবেসে ফেলেছেন।

—ওদের নিয়ে খুব শান্তিতে আছি। অসপাতালের অব্যবস্থা তো আলাদা কথা। পুরনো অসপাতালের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পরকাশ স্বপ্ন দেখতে থাকে।

হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকব। মাথুরের কাছে শিখে নেব স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ! গ্রামে যাব, কাজ করব।

কি হয়। যদি ওদের স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ শিখিয়ে নিই। ওদের মেয়েদের ধাই হবার ট্রেনিং ব্যবস্থা করি?

হয় তো মায়লেরা বুঝবে। আমি বেইমান নই।

তারপর...তারপর...ভাবতেও ভয় করে...যদি আমি ওদের গ্রামে গিয়ে পড়াতে শুরু করি?

লাবুদিদি খুশিই হবে। আমরাও তো ভালো নই। কোথায় দুঃখ বঞ্চনা, শোষণ, অবিচার, তা দেখতে চলে যাই।

তারপর চলে আসি।

এমন তো আমিই করেছি কবার। এটাই আমার স্বপ্ন। এ ছবি তুলব, পাঠাব, কিন্তু তারপর লিখে দেব। আমি এক ভুলে যাওয়া আদিবাসী অধ্যুষিত অবহেলিত জনপদের নাগরিক।

আমার স্বপ্নটা জানিয়ে দিলাম।

না-যুবক-না প্রৌঢ় মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

আকাশপানে মুখ তুলে পরকাশ হাসে।

৯

কনকলতার স্বপ্ন

স্বপ্ন-স্বপ্ন শুধোও কেন? স্বপ্ন তো সত্যি হয়নি। হয়নি বলেই আমি আদালতে ঘুরে ঘুরে মরছি। মিছে বলব না, আমি তারা দিদিদের সংগঠনে আছি। ওনাদের অপিসে ডেসপ্যাচের কাজ করি। সে কাজ কেমন?

তা হোলে আমার বেবাক রুটিন শুনতে হবে।

দেখ, তারাদিদিদের আপিস ই এম. বাইপাসে। আমারই আপিস খুলে চালু করার কথা ছিল। সে তো আমি পারি নি।

পারা যায়? তোমরাই বলো। আমি থাকব বেলেঘাটায়। সাতসকালে উঠে কোনোমতে এক কাপ চা করে খাব, ছেলেকে তুলব ঘুম থেকে।

ছেলে রোজ বলবে, না মা! আমি আরেকটু ঘুমোই মা! এখনি তুলে দিও না।

একবার মন বলে, আহা! ঘুমোক!

তারপর মন শক্ত করে বলি, শনিবার রাতে ঘুমিও সোনা! রবিবার অনেক বেলায় উঠো। আজ ইস্কুল আছে না?

—ইস্কুল না গেলে কি হয় মা?

—মুখ্যু হয়ে থাকে। নাও, ওঠ!

ওকে ওঠাই। তৈরি করাই। ততক্ষণে প্রেসার সিটি মারে। ভাতে ভাত, ওর ডিমসেদ্ধ। সব নিয়ে বসি মা আর ছেলে। এটা মানতেই হবে, অভ্র আমার খাওয়ায় দাওয়ায় লক্ষ্মী। খুব বুঝদার... খুব বুঝদার.... এই যে মাছ মাংস এত ভালবাসে, মাসে এক রবিবার মাছ আনি, আরেক রবিবার একটু মুরগি। তাতে ও কিচ্ছু বলে না।

ওকে তৈরি করে রানিদিদির ঘরে পৌঁছে দিই। যার কেউ নেই। তাকেও ঠাকুর দেখে, ঠাকুর দেখে। নইলে রানিদিদি বা আমার পাশের ঘরটা নেবে কেন? আর এ বাড়ি-ও বাড়ির ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পৌঁছবার কাজ-বা করবে কেন? রানি দিদির ছেলে নেই, মেয়ে আছে। স্বামী পাঁউরুটি-বিস্কুটের দোকানি।

মেয়েটা, কি বলব, জন্ম হতেই ন্যাবা। জন্মেছিল সর্ব অঙ্গে পক্ষাঘাত নিয়ে। এমন যে হয়, তা দেখিওনি, শুনিওনি। ষোলো বছর বয়স হল। মেয়েছেলের যা হবার তাও হয়েছে। রানিদিদি ওকে তুলবে, হাগাবে, মোতাবে, মুখ ধোয়াবে, টেনে এনে বারান্দায় বসাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

তা বাদে নিজের ঘরদোর মুক্ত করবে, চা দেবে দাদাকে, নিজে খাবে। চায়ে ডুবিয়ে মেয়েটাকে পাঁউরুটি খাওয়াবে। কি পাপে মেয়ে, বাপ-মা কষ্ট পাচ্ছে জানি না। আমার ছেলে ওকে দিদি বলে। মেয়েটা মুখ তুলে হাসে। দিদি নাম দিয়েছে, মঞ্জুলি।

বলে, আমার মেয়ে, আমি সুন্দর নাম রেখেচি। তাতে পাঁচজনার গা পোড়ে কেন?

যে কথা বলছিলাম...রানিদিদি আমার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসে। হোলে বা পাড়ার স্কুল! তবু ইংলিশ মিডিয়াম তো! আজকাল শিক্ষা হল সব্যস্ব। আপনারা বুঝতে পারছেন, আমি তত লিখিপড়ি নই। কোনোমতে "পি" ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিক পেরোলাম, বাবা বিয়ে দিয়ে দিল। অনেক, অনেককাল লেখাপড়া হয়নি। শেষে এ আপিসে ঢোকার পর ওদের সাহায্যে দু'বারের চেষ্টায় বি. এ. পাশ করলাম। কমপ্যুটার শিখতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু ইংরিজি তেমন জানি না। ভালো ইংরিজি না জানলে কমপ্যুটার শিখে লাভ কি?

আমাদের আপিসে দীপশিখা দিদি বড় ধমকে ধমকে কথা বলে।

তবে বাংলা কম্পিউটার শেখো! বাংলাও তেমন জানো বলে মনে হয় না।

তারাদিদির মতো মানুষ আমি দেখিনি। দেখব না। তিনি শান্ত, মিষ্টিগলায় কথা বলেন। তিনি বলেন, দীপশিখা! কনক তো ডেসপ্যাচ, মেসেঞ্জার এই কাজই করে। সে কাজ করার মতো বিদ্যে ওর আছে! ইংরিজি-বাংলার কথা বলছ? ইস্কুলে যদি ভালো করে না পড়ায়, ওরা শিখবে কি করে?

আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ হই। আমি তো জানি, যে স্মার্ট আমি কোনোদিন ছিলাম না। দেখতেও ছিলাম না সুন্দরী। ছিল বুনো স্বাস্থ্য।

উনিশ বছরে অমন সুন্দর, উকিল পাত্র পেয়ে বাবা বিয়ে দেন, সবাই "ধন্য ধন্য কপাল" বলে।

বলতেই পারে। স্বামীরা চার ভাই, উনিই বড়। বয়সের তফাৎ বারো বছরের। দেখলে পরে ওর অনেক বয়স তা মনে হত না। আমাকে ওর পাশে মানায়নি, তা সবাই বলত।

আমি তো ভাবতাম, শুধু কি দেখতে সুন্দর? কত উদার মানুষ! একটি টাকা পণ নিল না। নিজেকে খুবই ভাগ্যবতী ভাবতাম।

যাক গে, দিদির আমার রোজকার রুটিনের কথাই বলি। ছেলেকে রানীদিদির জিম্মা করে দিই। তারপর যত্ন করে সাজি। দেখতে যেমন হই, তেমন হই, বয়স তো সবে বত্রিশ।

আর আপিসে যারাই আসে, সব মেয়েই খুব ছিমছাম, সেজেগুজে আসে। অনেক দেখে দেখে আমি সুন্দর চুল বাঁধতে শিখেছি। সালোয়ার কামিজ পরে আপিসে যাই। রানিদিদি বলে, তোকে চেনা যায় না রে কনক। বেশ দেখায়!

অপিসে পৌঁছতেই হয় সাড়ে ন-টায়। সাড়ে আটটায় পৌঁছে যায় সুমতিদিদি। ওর বোন তারাদিদির বাড়িতে কাজ করে। ওর কাজ অপিস খোলা। ঝাড়পোঁছ করা, খাওয়ার জল ভরা, কাগজ ফেলার ঝুড়ি সাফ করা, তারপর ওর ডিপার্টমেন্টে চলে যাওয়া।

ওর ডিপার্টমেন্ট বলি, "সুমতিদিদির ক্যান্টিন" বলি। বারান্দার এক কোণ ঢেকে নিয়ে গ্যাস রেখে ও চা বানায়, বিস্কুটও রাখে। মাঝে মাঝে আমাদের মিটিং হয়। সেদিন বাইরে থেকে প্যাকেট আনা হয়। একবার দীপশিখাদিদি ওঁর ছেলে দারুণ, দারুণ ভালো রেজাল্ট করার পর চাইনিজ খাওয়ালেন। তারাদিদি আমাকে দুটো প্যাকেট দেন। বলেন, ছেলের জন্যে নিয়ে যেতে।

বাড়ি ফেরার সময়টা ঠিক থাকে না। যখন দেরি হয়, খুব, খু—ব চিন্তা হয়। ছেলে একা থাকবে। রানিদিদির ঘরে সব সময়ে যায় না। ফিরতে না ফিরতে জামাকাপড় ছেড়ে রান্না চাপাই। ওর ইস্কুলের পড়াও দেখি। আমার যেমন জ্ঞান বুদ্ধি তেমনই দেখি। শুনছি আগামী বছর মাইনে কিছু বাড়বে। তখন ওকে কোচিং-এ দেব।

আমাদের আপিসের কাজই তো হচ্ছে, মেয়েদের উপকার করা। শনিবার লিগাল সেল বসে। যাঁদের আইনি সাহায্য দরকার, তাঁরা আসেন। কেস করতে অত পয়সাও লাগে না।

এ কথা শুনেই তো আমি তারাদিদির কাছে আসি। আলিপুরের এক উকিল আমাকে চিঠি দিয়ে পাঠান। তারাদিদিরা বললেন, রোজগার তো তেমন নেই। ছোট একটা দোকানে শাড়ি বেচে আর কতই পাও! আটশো টাকায় কী হয়?

আমি মাথা নেড়েছিলাম। কিছুই হয় না।

—বাড়িটা নিজেদের?

—বাবা করেছিলেন।

—বাবা নেই?

—মা, বাবা দুজনেই চলে গেছেন।

—তোমরা ক' ভাইবোন?

—দাদা, আর আমরা তিন বোন।

—তাদের বিয়ে হেয়েছে?

—তা হয়েছে। যে-যার নিজের বাড়িতেই আছে।

—এখানে দাদা, বউদি আর তুমি।

—হ্যাঁ দিদি।

—দাদার সন্তান আছে?

—এক মেয়ে।

—তা...তোমরা বাড়ির ভাগ পাওনি?

তখন তো সব দুঃখের কথা বলতে হোল। আমি জানতাম, স্বামী পণ নেননি। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, পণ নেননি, কিন্তু আইনের বই কিনে ওনার আপিস সাজিয়ে দেন বাবা। সে অনে—ক টাকার মামলা। সে জন্যেই স্বামী আর টাকা নেননি। শুনেছি, সে লাখ টাকার কারবার। এক লক্ষ টাকাই লেগেছিল কি না, তা জানি না।

বাবা জমি-বাড়ি বেচাকেনার দালালি করতেন, দাদাও তাই করেন। বিয়েতে টাকা ওভাবেই দেন। "পণ নেয়নি" কথাটা জাহির থাকল।

তবে বাবা আমাকে দশভরি সোনার গয়না দেন। সে তিন বোনকেই দেন। ছোট বোন নিজেই বিয়ে করে, ছেলে কিছু নেয়নি। জামাইবাবু দিদিকে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করে। টাকা লেনদেনের কথা ওঠেনি।

এটাও সত্যি, যে বাবা কোনো উইল করেননি। উইল না করলে মেয়েরাও ভাগ পায়। তো দাদা বলল, কেস করে নিতে হবে। আর মা বলল, তোরা যে-যার বাড়িতে আছিস, ওর ভাগের ভাগ নিবি কেন?

আমরা কেউই "না" বলিনি। দিদি বলল, ভাগ নেব না। কিন্তু এলে যেন ২/৪ দিন থাকতে পাই। তা পাবো তো?

সবাই খুব হাসলাম। বউদি বলল, সে আর বলতে?

এ সব কথাবার্তার সময়ে কে ভেবেছিল আমি থাকতেই আসব? আমি তো ভাবিনি।

আমাদের বাড়িটা সেকেলে দোতলা বাড়ি। ওপরেই আমরা থাকতাম।

টানা বারান্দা, পরপর চারটে ঘর, মাঝে একটা হলঘর। আবার ভেতরেও দু'খানা ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, দুটো বাথরুম!

নীচে একটা লম্বা উঠোন। তার সামনের দিকে দু'ঘর ভাড়াটে। পেছনে তেমন আলোবাতাস নেই, এমন চারটে ঘর। দুটোতে ডেকোরেটররা তাদের সরঞ্জাম রাখে। আর দুটো ঘরের একটাতে রানিদিদি, একটায় আমি।

রানিদিদির স্বামী এক আশ্চর্য মানুষ। রানিদিদির মেয়েটা অমন হল, নিজের তো ওই বুটির দোকান। যদি কেউ বলেছে, "কি হবে, ও জ্যোতি!"

উনি ওপরপানে হাত দেখায়। অর্থাৎ ওপরঅলা যা করবে, তাই হবে।

আমার দুর্দিনেও বলেছে, দুঃখ কোর না তো! ওপরঅলা যা করবে, তাই হবে!

এতসব তো ঘটে পরে।

বিয়ে হল উনিশ বছরে। সে সময়ে সুখেই ছিলাম বলতে হবে। শাশুড়ি সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। আমার স্বামী বড়, তো সেই কর্তা। ভাইরাও দাদার অনুগত।

বিয়ের পর আমাকে রাঁধাবাড়া করতে হয়নি। পুরনো লোক দীপালির মা, মা-মেয়েতে রাঁধে। ঠিকে লোক কাজকর্ম করে। স্বামী বড় বেশি বাইরে যায় কেস করতে। ২/৩ দিনও থেকে যায় বাইরে। আবার শহরে থাকে যখন, আমাকে সিনেমায় নিয়ে যায়, একবার ওর কোন মাসতুতো দিদির বাড়িও যাই দুজনে। তিনি খুব ঠাটেবাটে থাকেন, সল্টলেকে নিজের ফ্ল্যাট।

সধবা, না বিধবা, না কুমারী, তা বুঝি না। খুব সাজগোজ, চুলে কালো মেহেন্দি, দুটো কুকুর আছে। আমাকে দেখে সে কি হাসি।

—এ যে বালিকা বধূ! সত্যি একটি খুকি বিয়ে করেছ। দিদিমা বলত, তাদের সময়ে ছোট মেয়েদের বিয়ে দিত, সঙ্গে পুতুল দিত। শাশুড়িরাও পুতুলের রান্নাবান্নার হাঁড়ি, কড়াই কিনে দিত। —মিষ্টি মেয়ে।

আমার চিবুক নেড়ে দিলেন উনি। ওঁকে প্রণাম করতে গেলাম, উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, প্রণাম আমি নিই না ভাই! নিজেকে বড়ই বুড়ি মনে হয়!

প্রণাম করতে দিলেন না, কিন্তু আমার আঙুলে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন। তারপর দুজনে ইংরিজিতে কি বললেন, আর বেজায় হাসলেন।

আমার খুব কুণ্ঠিত লাগছিল। আমি ম্যাচ করে শাড়ি, জামা পরেছি। সামান্য গয়নাও পরেছি। এই মাসতুতো দিদি কি স্মার্ট! ঝরঝরিয়ে কথা বলছেন, ঝরঝরিয়ে হাসছেন, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে নেলপালিশ, কেমন ইংরিজি বলছেন। আমি কোনোদিন ওঁর মতো হতে পারব না।

আসবার সময়ে শাশুড়ি বলেছিলেন ছেলেকে, শর্মিলার ওখানে যাচ্ছ?

যেখানে হয়, যাচ্ছি!

মা ও ছেলের কথা এমনই হত। মা যে বড়ছেলে না থাকলেও আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন, তা নয়।

বরঞ্চ বলতেন, তুমি ঘরে যাও মা! ও জানলে রাগ করবে।

অবাক লাগতো।

ওকে বাড়িতে এত খুশি থাকতে দেখিনি। ইনি কি ইয়ার্কি না করছিলেন।

ভাইটি খুব দুষ্টু, জানলি? খুব শাসনে রাখবি।

আমি মৃদু হাসলাম।

হঠাৎ বললেন, এই! যা যা ভালোবাসো, সব—ব রাঁধিয়েছি। খেয়ে নিন্দে কোর না।

আমি ওর দিকে চাইলাম। রাতে খেয়ে যাব? বাড়িতে তো তা বলা হয়নি?

ও নিচুগলায় বলল, বাড়ির কথা ভেব না। মা জানে, এখানে এলে আমি খেয়ে যাই!

একবার বাথরুমে গেলাম। এ যেন হলঘর একখানা। প্রসাধনের এত জিনিস, এত জিনিস, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

অবাক হওয়ার সেই তো শুরু!

খাবার আসায় যা যা সাজিয়ে দিলেন, সেগুলো যে দোকানের জিনিস, বাড়িতে রাঁধা নয়, তা সেদিন বুঝিনি। চিকেন চাওমিন, চিকেন হট অ্যান্ড কি যেন...চিকেন পকোড়া, সবশেষে আইসক্রিম!

ভালো করে খাও, ভালো করে খাও, কাঁটাতে অসুবিধে হচ্ছে? হাত দিয়ে খাও! সত্যি! তুমি একটি পল্লীবালিকাকে বিয়ে করেছ।

আমি বোকার মতো বললাম, বেলেঘাটাও খুব ডেভেলপ জায়গা...অনেক হাইরাইজ হচ্ছে।

শুনে মহিলা হাসতে হাসতে গড়িয়ে গেলেন। হাসছেন আর বলছেন, কি সুইট! কি সিম্পল!

আসার সময়ে বললেন, একটা জিনিস দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে পরবে, কেমন?

বাড়ি এসে সেই রাতে ও বলল, প্যাকেটটা খোলো, পরো! পরে আমার সামনে এসো।

প্যাকেট খুলে দেখি, জলের মতো স্বচ্ছ একটা নাইলনের নাইটি।

নাইটি পরিনি কখনও, এমন স্বচ্ছ কোনও নাইলনও পরিনি।

—পরো! বলে ও গর্জে উঠল।

—পারব না।

—পারতে হবে! চেহারা তো ঝি-এর মতো! আমি চাই...

ও আমার জামাকাপড় খুলে ফেলে দেয়, নাইটি পরায়। চুল ধরে টেনে এনে ঠোঁটে লিপিস্টিক ঘষে দেয়। বলে, লক্ষ্মী মেয়ে! ছোট্ট মেয়ে! শিট!

তারপরই আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়। আলো নেভায়নি।

আমি কাঁদছিলাম আর কাঁদছিলাম।

বিয়ে হল উনিশ বছর পেরিয়ে। পঁচিশ বছর বয়সে আমার ছেলে হয়। এর মধ্যে একবারই আমি বলেছিলাম, কেস করতে যেখানে যাও, আমাকে নিয়ে চলো না!

কেননা তখন আমি জেনেই গেছি, কেস করতে ও কোথাও যায় না। কলকাতাতেই ওর ২/৩টি যাওয়ার জায়গা আছে।

বাড়িতে গিয়ে এ সব কথা মা আর বউদিকে বলেছি। জিজ্ঞেস করেছি। আমি চলে আসব?

দাদা বলেছে, না না, সে ভারি বিশ্রী হবে, পাড়ায় একটা কেলেংকারি।

কিন্তু এটা ঘটনা, যে ছ'মাস গর্ভাবস্থাতেই ও দাদাকে ফোনে বলে আমাকে নিয়ে যেতে। ওর মা অশক্ত! ওখানে আমাকে দেখার কেউ নেই। হেন তেন...

অনেক কথাই বাদ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কেননা এগুলো অমন ব্যাপার নয়, যা আমার জীবনেই প্রথম ঘটল।

দাদা আমাকে নিয়ে আসে। ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জানানো হয়। ছেলের বাপ, ওই নার্সিংহোমে এসে যা দেখে গেল, সেই শেষ! তারপর একমাস না কাটতে ও লিখে পাঠাল,

আমি যেন ফিরে না যাই। ও আমার মতো মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে রাজি নয়। এ ছেলে ওর কি না, সে বিষয়েও ওর সংশয় আছে।

আমাদের বাড়িতে তো বজ্রপাতই হল। হঠাৎ নিজেকে এত নিরাশ্রয় মনে হল, তা বলতে পারি না। অনেকদিন চেষ্টা চালাল দাদা, যাতে মিটমাট হয়। সে তো হল না। অগত্যা কেস! বড় জামাইবাবুর সাহায্যেই কেস করি প্রথমে। ওদের বাড়ি কালীঘাটে। আর ও আলিপুরে উকিল! কেস হল আলিপুরেই। আসার সময় গয়নাগুলো এনেছিলাম, কেসে কাজ দিয়েছে।

সন্তান যে ওর, তা ডি. এন. সি.-তে প্রমাণ হয়। প্রায় সাত বছর হল কেস চলছে। ওই কেসের জন্যেই তারাদিদির সেন্টারে আসি। আর এখানেই কাজ পেয়ে যাই।

মা মারা যাবার পর দাদা আমাকে একতলাতেই ঠেলে দেয়। ওদের সংসারে আমি খুব অবাঞ্ছিত, কেননা আমি স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের, ছেলের ভরণ পোষণের মামলা করেছি। ছেলে এখন সবই বোঝে। "বাবা" শব্দ ও উচ্চারণও করে না।

দীপশিখা দিদি বলে, ডিভোর্স নাও। এই বয়স তোমার! আবার বিয়ে করো।

বলার কথা, বলে দিলেন। ইচ্ছে তো আমারও করে। তবে ডিভোর্স তো হয়নি। ডিভোর্স হলেও ছেলেসুদ্ধ আমাকে বিয়ে করবে কে?

আমার তত লেখাপড়া নেই, তত আকর্ষণ নেই, সে তো আমি বুঝতে পারি। আমার এখন একটাই ভাবনা, ছেলেকে কি ভালো পরিবেশে, হস্টেলে রেখে মানুষ করতে পারব?

লোকটা কিছুতে আমাদের খোরপোশের জন্য অন্তত তিন হাজার টাকা দিচ্ছে না। আমি চাকরি করি, সে খবর ও জেনেছে। আমার ভয়, কবে যদি ওই যৎসামান্য মাসিক টাকাও কমিয়ে দেয়।

ডিভোর্স করলে টাকাও কমিয়ে দেবে। স্বপ্ন আমার ছোট মাপেরই ছিল। বিয়ে হয়েছে, সংসার করব, গয়না গড়াব, আনন্দে থাকব। সিনেমা দেখার নেশা ছিল, সিনেমায় ও নিয়ে যেত। মিছে বলব না, হোটেলেও খাইয়েছে ক'বার। আমি তো তাতেই খুশি ছিলাম। খুবই হ্যাটা-অচ্ছেদ্দা করত, সেও মেনে নিয়েছিলাম। সকলের কপাল তো একরকম হয় না!

দিদির ভাসুরঝির বিয়ে হল, দিদি বললেও আমি যাইনি। যাওয়া মানেই প্রেজেন্ট দেওয়া, আর ছেলেকে দেখে কেউ যদি বলে, "ওর বাবা কোথায়?"

আমাকে তো বলতেই হবে, "ছেলের বাবার সঙ্গে আমার সাত বছর কেস চলছে।" আর তারপর শুনতে হবে, ও কথা না বললে চলছিল না?

কি বিচার, তাই বলো! স্বামীর বিরুদ্ধে কেস করলে অন্যায় কিসে?

দাদাও সম্পর্ক তুলে দিয়েছে। তারা দিদি বলে, বাপ যখন উইল করে যায়নি, তোমার থাকবার হক তো আছেই। দাদা উলটা-সিধা করলে উকিলের চিঠি দিও।

এত লড়াই করে বাঁচা যায়? যারা পারে, তারা পারে। আমি ভালোমানুষ, আমি ভিতু, আমি চৌকশ নই। আমি কি করে পারব?

তারাদিদি বলে, সে তোমার বোঝার ভুল কনক! কে চাকরি করছে, ছেলেকে দেখছে, তাকে পড়াচ্ছে। নিজেরটা নিজে চালাচ্ছে, স্বামীর দেওয়া সর্বস্ব টাকা ছেলের নামে রাখছে?

—আমি!

—মনে রেখো, তুমি স—ব পারো।

আগের স্বপ্নগুলো ছিল এলেবেলে। এখন অনেককাল ধরে একটা স্বপ্ন দেখছি! এখানে হোক, ওখানে হোক, সেখানে হোক, একটা ছোট্ট, না হয় চারশো স্কোয়্যার ফুটের একটা ফ্ল্যাট। ছেলেটার নিজের জায়গা একটা হোক।

ওই স্বপ্নের সঙ্গেই আরেকটা স্বপ্ন দেখি। ছেলে তোমার, আদালতে মেনে নিয়েছ। বউ তোমার, যৎসামান্য খোরপোশ দিচ্ছ। তা হলে কালীঘাটের তেতলা বাড়িতে ছেলের অধিকারটা দিতে হবে, এমন কোনো কেস্ যেন করেছি।

কেস করেছি, কেসে জিতেছি, এই স্বপ্নটা আজকাল জেগেও দেখি, ঘুমিয়েও দেখি।

স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার মতো অতি সাধারণ মেয়েদের কেন থাকবে না?

১০
নগিন দুসাদের স্বপ্ন

আমার নাম নগিন দুসাদ। বাড়ি গয়া জেলার চেতপুর গ্রামে। এখন আমার বয়স ৫৭। সাতান্ন হয়ে গেল তো বহোৎ দিন বাঁচলাম। আজাদির চেয়ে আমি দু'বছরের বড়। আমার পহেলা বউ তো গওনা হবার আগেই মরে যায়। ওর বাপের বাড়িতে আট-দশটা গ্রামে হায়জা হয়েছিল। হায়জা বুঝেন? যার নাম কলেরা, তার নামই হায়জা। বাংলা মুলুকে বলে ম-হা-মা-রী। হাঁ হাঁ, বাংলা মুলুকই বললাম। আমরা কলকাতাকেই বাংলা মুলুক বলি। সেটা গলত্ বাত হয়ে গেল? কৈছন্? খোকাবাবু, কৈছন? ও, বাং-লা-দে-শ! আমি তো বাংলাদেশ দেখলাম না। অনেক আগে বাংলাদেশ থেকে কিছু মুসলমান চলে এসেছিল। শুনেছি, তারা বিহারি হয়ে গেছে।

কলকাতাই আমাদের কাছে বাংলা মুলুক। চেতপুরে দুসাদদের খুব কষ্ট, খুব কষ্ট। আর জাতপাতের ঘিন্ ছিল খুব। সে ছুঁয়াছুতির কথা তুমি বুঝবে না। পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা, গ্রামে ঢুকেছ কি জমিদার কাছারিতে নিয়ে জুতাপেটা করত।

বিশ্বাস কর না? আমার বাবাকে করছিল, তা জানো? বাবাও তো কলকাতায় চলে এসেছিল, হাতরিকশা টানত। আবার কলকাতায় একটা সিনিমাও দেখেছিল। একটা লোক রিকশা টানতে টানতে মরেই গেল। বাবা বলত, নিচুগলায়, ছেলেটা একটু বড় হবে, তো কলকাতা নিয়ে যাব। ওখানে, বুঝলি নানুয়া কে মা! হাঁ হাঁ, তাই তো বলত। আমি নানুয়া, আমার ভাই ধনীরাম ধানুয়া। আমাদের বোন রুখ্নি।

বাবা বলত, ওখানে ফুটপাথে ঘুমাও, ঘর পেলে ঘরে থাকো, কিন্তু জাতপাত ছুঁয়াছুতি নেই।

মা একটা করে লেট্টি সেঁকত আর হাসত। বলত, এ ধানুয়াবে বাপ! ওখানে কি বরাম্ভোন, লালা, কুর্মি কায়েথ থাকে না? ছুঁয়াছুতি নেই এমন জায়গা আছে।

ওহি তো উ নেহি সমঝল দাদা! ওহি দুখে আমার বাবা চলে আসে কলকাতা, সে ঠেলাগাড়ি চালাত। শান্তিতে কাজ করত, যখন ভাই চলে আসত, তখন বাবা টাকা নিয়ে দেশে যেত। আর আমি যখন বারো বছরের ছেলে, জমিদারের গোমস্তা বলছে, ওকে কাজে লাগা,—তখন এক রাতে বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতা চলে এল। বাপরে! রেল গাড়িতে বসে আমি ভাবছি, এ কিসে চড়লাম! আমরা তো টিকিট করি না কখুনো। রেলের গাড়িতে উঠে গামছা পেতে মাটিতে শুয়ে যাই। আমি বাবার হাত ধরে ঘুমাচ্ছিলাম।

সে সময়ে বাবা যখন ঠেলা চালাত আমি পাশে পাশে চলতাম। সে টাইম তো খুবই অলগ্

থা। কোন কোন রাস্তায় গলিতে, গ্যাসবাতি দেখেছি। কলকাতায় যব ভি কোই মকান বদল করত, ঠেলাগাড়িতেই সামান চাপাত। নিজেরা যেত রিকশা চেপে। একবার আরপুলি লেনে কাদের বাড়ি বদল হচ্ছিল। তো গিন্নির কাকাতুয়ার খাঁচা আমার হাতে দিল। বাহা রে কাকাতুয়া! ইয়া মোটা, পায়ে ঘুঙ্গরু, আর শুধু বলছে—কিষ্ণ কিষ্ণ! রাম রাম! ভাবছি এ কা তাজ্জব! নতুন ঘরে যাচ্ছ। তো ভগবানের নাম করছে।

নতুন মকানে নামার সময়ে গিন্নিমা, খুব মোটাসোটা, রাগি রাগি মুখ, রিকশা থেকে নামার কালে আমাকে বলছে, দে। পাখি দে!—আমি হাত বাড়লাম। নাও। তোমার পাখি নাও। বললাম, খুব ভকত পাখি। ভগবানের নাম করে করে চলে এল।

গিন্নি বলল, হ্যাঁ! খুব ভালো পাখি। তুই নিবি?

আমি তো হাঁ করে চেয়ে থাকলাম।

বাবা বলল, কেমন করে নেবে মা? গাড়িবারান্দার নিচে ঘুমাই। রাস্তায় বসে সত্তু খাই। কোথায় রাখব মা?

ওই গিন্নি আমার হাতে আট আনা দেয়। সেদিন আট আনার দাম কত! ঠেলাগাড়ি এসেছিল চারটে। রেট ছিল, ও বাড়িতে মাল উঠাবে, এ বাড়িতে নামবে। পাবে আড়াই টাকা। তবে আটআনারও দাম ছিল।

বাবা আমার মাথায় হাত বুলাল। তারপর ফুটপাথ থেকে একটা কালীঘাট হোসিয়ারির গেঞ্জি কিনে দিল। সে গেঞ্জির মতো দামি, নরম, সুন্দর গেঞ্জি আমি তার আগে পরিনি।

এ তো গেল ছেলেবেলার কথা। বাবা কখনও রিকশা চালায়নি। কিন্তু আমাদের আড্ডাটা তো একই জায়গায়। আমাদের ইলাকার রামভরোসে বাবাকে বলল, নগিনকে রিকশা টান কাজ শিখতে হবে। শহরে চেয়ে দেখেছ? রিকশা হি রিকশা! রিকশা টানলে অনেক পয়সা।

—ভৈয়া, তা তো আমিও বুঝলাম না। ঠেলাগাড়িটি চালালাম।

—নগিন গেঞ্জি পরছে। ও কি তোমার আমার মতো গরমকালে গামছা কাঁধে আর শীতকালে বনোরামের সিলাই করা ফতুয়া পরবে?

—হ্যাঁ। রিকশা... কিন্তু রিকশা পাবে কোথায়?

—কার ঠেলাগাড়ি ঠেলি?

—মালিকের।

—রিকশাও মালিকের কাছেই নিতে হবে। রিকশা জমা নিবি। মালিককে দিন দেড়টাকা, তাহলে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা বুঝিয়ে দাও। বাকি পয়সা তোমার।

কি বলব, বাবা সপন দেখতে শুরু করল। নগিন রে নগিন! ঠেলাগাড়ি ঠেলে ঠেলেই বল্ অতটুকু জমি হাসিল করেছি। তোর মা-কে দুটো ছাগল কিনে দিয়েছি। একটু একটু করে...দেশে থাকলে কিছু হত না রে ববুয়া।

কলকাতা ছিল বলে...

সে কলকাতার খুব বড় কলিজা ছিল, ঘর গিরস্তী মানুষ সব...আমি যখন রিকশা টানতে শুরু করি, তখন তোমাকে ইস্কুলে পৌঁছাতাম...ছোটদের পৌঁছাতাম...আনতাম...মা কত নিশ্চিত থাকত। চেনা রিকশা। যেন বাড়ির লোক। কোনোদিন কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। কখনও না...

আবার বুড়িদের মন্দিরে নিতাম, গঙ্গাস্নানে...কলকাতায় যখন হঠাৎ হঠাৎ বন্‌ধ ডেকে দিত, কে আনত ইস্কুল থেকে বাচ্চাদের?

আমরা আনতাম। আমরা! কাঁকলিয়া বস্তিতে থাকতাম, আমরা, মুচিরা ইস্তিরিঅলারা... বিহারের অচ্ছুৎ জাতদের জন্য একটা জায়গাই বানিয়েছিল ভগবান।

কলকাতা! কলকাতা!

রিকশা চালাতাম। আর দেশে বাবা ছাগল কিনত। ছাগলও বিহারের অচ্ছুত জাতের মতো। খাবে কম। দুধ দেবে, বাচ্চা দেবে। খুব কাজে লাগে। বউ একটা গাই ভাগা নিতে—ভাগে পালতে নিয়েছিল,—দুধ বেচে...গোবর থেকে ঘসি বেচে ঘরের হাল ফিরিয়েছে। এখন গাঁয়ে সর্বোদয় পাঠশালা...আমাদের ছেলেমেয়ে পড়াই করে। এখন মায়লে লোক এসে গেছে। হ্যাঁ, থোড়া বহোৎ হাংগামা লেগে থাকে। ওদের আর রণবীর সেনাদের মধ্যে। সে কারণেও উঁচা জাতের দপদপা আমাদের ওখানে এত নেই।

কিন্তু কলকাতা যে আমাদের ফেলে দিল। ভাসিয়ে দিল। শহর থেকে রিকশা তুলে দিল?

সেদিন পার্টির জনাইবাবু বলল, নগিন। এখন অটো এসে গেছে, রাস্তাঘাট হয়ে গেছে। এখন আর তোদের রিকশা রাখবে না গোরমেন!

'গোরমেন' কে? 'গোরমেন' কি? রিকশাঅলার কাছে পুলিশ হয় গোরমেন। তো সে আমরা কবে মেনে নিয়েছি। সন্ধেবেলা পুলিশের হাল্লা আসে। রাস্তার ওপর যারা ফল-তরকারি-রুমাল-পুতুল বেচে, তাদের তুলে নিয়ে যায়।

টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়।

ওহি তো 'গোরমেন', না?

রিকশার কাছ থেকে ভি তোলা উঠায়।

বাবুরা আর রিকশা রাখে না। কর্পোরেশন আর রিকশাকে লাইসেন্স দেয় না।

রিকশা যে কয়টা দেখ, কিছু তো পুলিশেরও।

খোকাবাবু, খোকাবাবু! সেদিন বর্ষায় শহর জলে ডুবে গিয়েছিল। তখন তোমাদের ভাড়াটেকে আমি নিয়ে গেলাম রামকৃষ্ণ হাসপাতালে। সে বাঁচল না। কিন্তু ঘরে তো মরেনি।

কলকাতার কলিজা পাথর হয়ে গেছে। বড় বড় বাড়ি উঠছে...এত এত গাড়ি চলছে...এখানো অনেক ইলাকা আছে। যেখানে চলতে পারে শুধু রিকশা!

রিকশাকেই বলে দিল নিকাল যা!

সেদিন জনাইবাবু এ ভি বলল, কলকাতার মানুষ, মানুষে টানা গাড়ি চড়ে। এ তো সরমের বাত! কলকাতা দেখে সাহেব লোক। আর রিকশার ফটো খিঁচে!

তা, রিকশা বন্ধ করে দিলে কলকাতা অন্যরকম হয়ে যাবে? শুধু রিকশার জন্যে কলকাতা সরমিন্দা হয়ে আছে?

হায় নসীব! হায় কলকাতা। তা একটা রিকশা একটা লোক চালায়, সে তো অন্য কাজ শিখে নি। আর কাজ কোথায় কলকাতায়? কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লেবার লোকও ভিখমাঙা হয়ে যাচ্ছে?

আমরা কোথায় যাব? ছুঁয়াছুতি নেই বলে এতকাল এ শহরে থাকলাম। শহর আমাদের ভাত দিল। আজ আমরা কোথায় যাব?

গোরমেন ভাবল না, পাবলিক ভাবল না, নগিন দুসাদ এখন কোথায় যায়?

খুব অধরম হয়ে গেল। খুব অধরম।

সপন? কি সপন দেখব বাবু। মনের দুখে রাতে ঘুম আসে না। জেগে জেগে পুরানো কলকাতা দেখি।

সেদিন এত লোডশেডিং হত না। সেদিন কলকাতায় ছোট রাস্তা, চাই গলির মোড়, চাই বাজারের পাশে রিকশার লাইন থাকত।

সেই কলকাতাটার সপন আমি জেগেই দেখি।

কি বললে? ওসব সপন দেখে লাভ নেই? না থাকুক। ঘুমিয়ে সপন কোনো দিন দেখি নি। এই শহর আমাদের বাতিল করে দিল, সেই দুঃখে রাতে জেগে সপন দেখি।

সপন আমি দেখবই খোকাবাবু। কেমন করে তা বন্ধ করবে? অত হিম্মৎ কি তোমাদের আছে? নেই।

এখন কি করবে?

১১
রতনের স্বপ্ন কী ছিল?

আমার নাম রতন কাত্যায়নী। আমার বয়স বিয়াল্লিশ। জয়পুরে আমার বাড়ি। হ্যাঁ, আমরা ব্রাহ্মণ। আমার সংগঠনের নাম আপনারা শুনেছেন, 'মুক্তিধারা'।

নইলে শোনেননি। কে কত সংগঠনের নাম শুনবে বলুন। এত বেসরকারি সংগঠন। এত নাম তাদের। এন জি ও এ সময়ের এক বিশ্ব-বাস্তবতা। আরে, ভারত সরকার আগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সরাসরি যে টাকা দিত, সেও ছিল বিদেশি টাকা। নোরাদ প্রকল্প মানে নরোয়ের টাকা, ড্যানিডা প্রকল্প মানে ডেনমার্কের টাকা।

এখন তো ওগুলোকে ভারত সরকার প্রদত্ত টাকা বলবার কারণ নেই।

কারণ নেই, কেননা স—ব বিদেশি টাকা। দিচ্ছে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগ।

আমার নাম রতন কাত্যায়নী। ফর্সা, মাঝরি, হট্টাকট্টা চেহারা আমার। আমাকে যারা চেনে, সবাই জানে, আমি মিতভাষী, গম্ভীর, সিরিয়াস।

সেই আমিই কি পাগলামিটা না করলাম!

আপনারা জানেন না, বাঞ্জারা আদিবাসী গোষ্ঠীরা ডিনোটিফায়েডও বটে। ঘুমন্তুও বটে।

"বাঞ্জারা" শব্দটি সুন্দর। বাঞ্জারা মেয়েদের নাচও অসামান্য। হাতের তেলোয় পাথরের প্রদীপ নিয়ে এক হাত ঘুরিয়ে, আরেক হাতে ঘাগরার কোণা একটু তুলে ওরা নৃত্যশেষে বিদায় জানিয়ে যায়, সে নাচ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ওদের রং তামাটে, অর্থাৎ ফর্সা রং রোদে পোড়া। চুল কটাশে, চোখ কটাশে, ভুরু কালো। আর গহনার কথা কি বলব। কানে, গলায়। ওপর হাতে, পায়। কাঁসা, পিতল, কখনো রুপোর গয়না পরে।

"বাঞ্জারা" নামটি হিন্দি ফিলমের গানে অনেক শুনেছে। বাঞ্জারা নৃত্যের নামে ভয়ংকর শরীর দেখানো নাচ ফিলমে অনেক দেখেছেন।

সে সব তো বাজারি সংস্করণ।

আসলে বাঞ্জারা অস্তিত্বই অভিশপ্ত। ঘোরে আর ঘোরে ওরা রাজস্থানে। ছাগল ভেড়া চরায়। লোম দিয়ে কম্বল বোনে, বেচে। ওদের তাঁবু যখন পড়ে, সেও ১৫ দিনের জন্যে। 'ঘুমন্তু' তো!

১৬ দিনে পড়লেই পুলিশ ওদের ঠেঙিয়ে তুলে দেয়। ঘুমন্তু আর ডিনোটিফায়েড। ভারত সরকার কবেই ওদের ক্রিমিনাল ট্রাইব নাম থেকে বিমুক্ত করেছে। কিন্তু সমাজ, রাজ্য সরকার, পুলিশ ওদের জন্মাপরাধী বলেই জানে।

আমি জন্ম থেকেই ওদের দেখছি। আমিও ওদের জানতাম না। এখন আত্মারাম রাঠোর বাঞ্জারার লেখা 'তাণ্ডা' পড়ে অনেক জেনেছি। রঞ্জিৎ সিং নায়েকের সাহচর্য করে জেনেছি। ইউরোপের জিপসি বা রোমানিদের সঙ্গে বাঞ্জারাদের মিল অনেক।

ইউরোপের এক জিপসি মহিলা কি কারণে উদয়পুরে এসে ২/৩ বছর থেকে যায়। ওর বাড়িতে বাঞ্জারা আসত, থাকত, কথা বলত, মানে এ ওর নিজস্ব ভাষা বুঝত।

আজ মনে পড়ে সে কথা, আর অবাক হয়ে ভাবি। কত কম জিজ্ঞাসা আমাদের মনে, কত কম জানার ইচ্ছা!

কি আত্মারাম, কি রঞ্জিৎ সিং, এদের জেনেছি অনেক পরে।

"মুক্তিধারা" প্রতিষ্ঠার অনেক পরে।

জানতাম না। ওদের জানতাম না। আমাদের ভালো জমিজমা আছে। বাবা আছেন মাথার উপর। আমি ওকালতী পাশ করে উকিল হয়েছি। লড়াকু উকিল হিসেবে সামান্য পরিচিতি পেয়েছি।

আদালত থেকে বেরিয়ে হাঁটছি, দেখি একটা মস্ত গাছের নীচে বসে আছে এক বৃদ্ধ বাঞ্জারা। তার সঙ্গে দুটি বালক। পুলিশ তাকে শাসাচ্ছে: ঘুমন্তু তোরা এখানে এসে বসলি কেন?

লোকটি খুব মিনতি করছে। সেপাইকে বলে এসেছি, আর তোমাদেরও বলছি, সাজা তো কেটে যাবে আমার। সাতদিনের জামানত কেউ দেয় তো নাতি দুটোকে পৌঁছে দিয়ে আসি "তাণ্ডা"য়।

—কে তোর জামানত হবে?

আমি বললাম। তাণ্ডা কি?

—হজৌর। বাঞ্জারাদের ডেরার নামই তো তাণ্ডা।

তোমার তাণ্ডা কোথায়?

—আলোয়ারে।

—সে তো অনেক দূরে।

হজৌর! পুলিশ তো বাঞ্জারাদের দেখলেই তাড়ায়। এক জায়গায় সাতদিনের বেশি থাকতে দেয় না। পুলিশের হাল্লা এল। ওরা দৌড়ে চলে গেল। ছেলে দুটো আর আমি বাদ পড়লাম।

পুলিশকে বললাম, বাচ্চা দুটোকেও ধরবে?

—না। বুড়োটাকে।

—বাচ্চারা কোথায় যাবে?

—এখানে পড়ে থাকবে। ভিখ মেঙে খাবে। বাঞ্জারা তো!

বালক দুটি এমন কথা অনেক শুনেছে, ওদের মুখে কোনো অভিব্যক্তি ছিল না।

হঠাৎ মনে মনে যেন চাবুক খেলাম! এমন দৃশ্য আগেও দেখেছি। বাঞ্জারাদের বিষয়ে অনেক শুনেছি।

সেদিন আমি, রতন কাত্যায়নী ওদের নিয়ে ভেতরে গেলাম। রাজস্থানের আদালতে আদালতে

বাঞ্জারা ধরে এনে হাজির করা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। বাঞ্জারা যেমন থাকে, তেমনি থেকে যায়।

আজ তো বিশ্বাস করি, ওরা যুগযুগান্ত ধরে আছে। এক জায়গায় থাকেনি, ঘুরেছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, কর্ণাটক সর্বত্র বাঞ্জারা। আগে হয়তো ঘুরতে ঘুরতে ল্যান্ড রুট ধরে ইউরোপেও যেত। আবার ওখান থেকেও আসত।

সেদিন আদালতকে বললাম। আমি ওর জামানত হব। ওকে ছেড়ে দিন।

আদালতে যেন বাজ পড়ল।

—আপনি...আপনি ওকে চেনেন।

—এখনই আলাপ হল, নাম জানি না।

—এই! নাম কি তোর?

—"তুই"! নাম বলবেন না। "আপনি" বলুন।

এবার নৈঃশব্দ্যের একটা বিশালত্ব গমগম করতে থাকল। লোকটি শুকনো গলায় বলল, আমি চমন বাঞ্জারা.... আলোয়ারে গেছে আমার লোকরা।

—সাতদিনে চলে আসবে?

—জী!

—না এলে এই ভকিল কী জেলে যাবেন!

—চলে আসব।

আদালতে এবং বাড়িতে সবাই বলল, এ আমার রোমান্টিসিজম! আমি কাকে বোঝাব। লোকটির চোখে আমি কি দেখেছিলাম যেন!

শহরে এ কথা গল্পকথাই হয়ে যায়। আমার সহপাঠী "দৈনিক ভাস্কর" কাগজে কাজ করে। ও বলল, আমি কি করে জানব, তোমার এত আগ্রহ আছে ওদের বিষয়ে? পরবশ জোশী ওদের নিয়ে আমাদের কাগজে লিখেছিল। ও মনে করে। ঘুমন্তু জাতিরা মহাভারতের চেয়েও পুরনো।

—একটা কথা তো ঠিক, ভৈয়া। চিরকাল দেখছি। ওরা ঘুরে আর ঘুরে। কখনো ওদের মানুষ বলে ভাবিনি। জন্ম থেকেই পথে!

—সত্যি!

—দেখা যাক্ কি করে!

—যদি না ফেরে। রতন?

—আমি ওর চোখ দেখেছি। ও ফিরবে।

ঠিক সাতদিনের মাথায় ভোরে দেখি ও আমার ঘরের সামনে বসে আছে। আমার পা ধরতে যাচ্ছিল। বারান্দায় বসলাম বেঞ্চে। তারপর ওকে নিয়ে চায়ের দোকানে গেলাম। দোকানি খুবই হতচকিত। তারপর বললাম। আদালতে কি করে?

—ওই, দশ টাকা জরিমানা, নয়তো বিশ টাকা।

—না দিতে পারলে?

—ক'দিন জেল খাটায়। জয়পুরের চেয়ে উদয়পুরের জেল ভালো। খাটায় কম। ভালো কম্বল দেয়।

যদি লেখক হতাম, তো কোন জেল ভালো, কোন্ জেল মন্দ, তা নিয়ে অনেকই ভাবতে

পারতাম। লেখক তো নই। আর হিউমার বোধ আমার তেমন নেই। আদালত থেকে খালাস করে ওকে নিয়ে ফিরলাম। ওর সঙ্গে বসে, বলতে গেলে সারা রাত কথা বললাম।

লাখের ওপর বাঞ্জারা রাজস্থানেই থাকে। "থাকে", মানে "ঘোরে"। ওদের ঘর থাকে না। বাচ্চাদের লেখাপড়া হয় না, ক্ষেতিবাড়ি করার স্বপ্নও ওরা দেখে না। ওরা তো "সেটেল্‌ড" নয়। ওরা "ঘুমন্তু"।

আমি, কি বলছি, তার দায়িত্ব না বুঝেই বললাম, যদি জমিতে বসত করানো যায়, তোমরা বসত করবে?

ও হাঁ করে চেয়ে থাকল। না, ওর চোখে কোনো স্বপ্ন চমকে উঠতে দেখিনি। বাঞ্জারারা যদি মহাভারতের কাল থেকে ঘুমন্তু থাকে। নিজের জমি, নিজের ঘর, এ শব্দগুলো ওর কাছে অর্থহীন।

চমন বলল, তা কেমন করে হবে হুজুর?

--দেখাই যাক না। সাতদিন বাদে আলোয়ার থেকে তোমার মতো প্রবীণ আর ক'জনকে নিয়ে এসো। এখানেই এসো।

না, আমার বাড়িতে কেউ বিরক্ত হয়নি। বাহির-বাড়ি এটা। আমার আপিস, আমার লাইব্রেরি, আমার মক্কেল!

ওখানেই ওরা এসেছিল।

ওরা আসে দশ দিন বাদে। এখন, যখন এ কাহিনি লিখছি। আমার বয়স বিয়াল্লিশ। যখনকার কথা লিখছি, তখন বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ।

সে সময়ে অদ্ভুত কাজই করেছিলাম। ভীষণ, ভীষণ খেটে, সরকারি খাস জমিনের রেকর্ড দেখে বুঝলাম, সরকারে ভেস্‌ জমিন প্রচুর। এক আলোয়ারেই হাজারটা পরিবার, বা ষাট হাজার মানুষকে বসানো যায়।

ওই কাজটা শুরু করে "মুক্তধারা" এন জি ও করে ফেলি। এই যে ষাট হাজার মানুষকে বসিয়েছি, আলোয়ারের দিকে দিকে, সরকারকে তো বোঝাতে হয়েছে। কাছাকাছি গ্রাম থাকা দরকার। নইলে এরা পানীয় জল পাবে না।

এটা খুবই সৌভাগ্য যে "পাহলা পাঠ" সংগঠন কয়েকটা স্কুলও চালাচ্ছে।

কিন্তু প্রধান সমস্যা দেখছি জলাভাব। খুঁজছি, খুব খুঁজছি। যদি জলের কোনো চেষ্টা করা যায়। সবাই তো মরুভূমিতে তাণ্ডা বসায়নি। দেখা যায়, গ্রামে কিছু গাছ আছে। ফণীমনসার কাঁটা ঝোপই বেশি।

তবু তো আছে জল!

আমি অনেক জায়গায় খবর করছি, অনেক জায়গায়।

ঘুমন্তু জাতির ঘুমন্তু মেজাজ!

যত আনন্দে সেটেল করেছে, তত আনন্দেই ঘর উঠিয়ে চলে যেতে পারে।

আমার স্বপ্ন একটাই। কোনো এন জি ও আসুক। দেখুক জলের ব্যবস্থা করতে পারে কি না। জলের সমস্যা সমাধানের সূত্র পাই যদি, তা হলে "মুক্তধারা" রাজস্থানের সব ঘুমন্তু জাতিকেই জমিতে বসিয়ে দেবে।

আমার সাংবাদিক বন্ধু বলে কি ভাগ্য, রতন। যদি অন্য কোনো জায়গা হোত, তোমাকে নিশ্চয় "জনযোদ্ধা" নাম দিত।

দিলে দিত। বাঞ্ছারামদের জলের ব্যবস্থা তো করতে পারিনি। কিন্তু তারা জল পাবে, এমন স্বপ্ন দেখা কি করে অপরাধ হতে পারে?

কেন স্বপ্ন দেখব না?

১২
সুতনুর স্বপ্ন কী?

আমার স্বপ্নটা অত্যন্ত বৈধ। অত্যন্ত ন্যায্য। আমার অতি সংক্ষিপ্ত সমস্যা। আরো সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি।

আমার নাম সুতনু রায়। নামটা ঠাট্টা, কেন না আমি মোটে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। অতি সাধারণ চেহারা। কিন্তু মীনাদি বলে, চার্ম আছে।

আমার বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ। চেহারা দেখলে তা বুঝবেন না। আমার চেহারাটা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে কোথাও আটকে আছে। ফ্রীজ শট করে দিয়েছে কেউ। অনিন্দ্য বলে, তোর চেহারায়...একটা ব্যক্তিত্বের অভাব। অথবা...তোর পার্সোনালিটিটা খুব ফ্লুইড— গলন্ত...চলন্ত...ইত্যাদি! কি করবি বল্? একদিকে চার্লি চ্যাপলিনের মতো! কখন হিটলার, কখন খুনে, কখন প্রেমিক।

এ সব শুনলে তো আমার কান্না পায়।

আমি একজন ভালো ইলেকট্রিক মেকানিক। ফাংশানে-প্যানডেলে-বিয়ে বাড়িতে-পুজো মণ্ডপে, আমি সারা বছর কাজ করি, এবং কামাই।

আমার স্বপ্ন একটাই!

কোনোদিন, কোনো টিভি সিরিয়ালে তিন সেকেন্ডের জন্যে হলেও গোটা চেহারাটা দেখাতে হবে সুতনু রায়ের।

সেটাই হচ্ছে না।

আমার বান্ধবী, বান্ধবীর মা, আমার মা, পাড়ার বন্ধুদের মা, অর্থাৎ আধা ডজন মা, এক ডজন পাড়ার ছাট্‌লে, ইত্যাদি ইত্যাদি রাতদিন আমাকে 'মিথ্যুক' বলছে।

বলবেই! আমি তো যাই, একে তাকে তুতিয়ে পাতিয়ে এই শত শত সিরিয়ালের কোথাও না কোথাও অ্যাপীয়ার তো করি!

কিন্তু সেটি যখন দেখানো হয়, সবাই বলে, ধাপ্পা! ধাপ্পা দিস তুই! তুই তো ছিলি না।

ওই যে জানলা খুলে নীচে তাকালাম?

ওটা তুই, না অন্য কেউ?

এরকম হ্যাটা আমার কপালেই কেন জুটছে। জানি না।

আমি টি ভি-তে অ্যাপীয়ার বা মিস অ্যাপীয়ার করেছি এগারোবার।

১. "..."-তে ঋতুপর্ণাকে কেবিনে চা আমিই দিয়েছিলাম পিছন ফিরে।

২. "..."-তে সিঁড়ির ওপর থেকে অতিকায় ভিলেনকে জড়িয়ে আমিই পড়েছিলাম।

৩. "..."-তে রাতে নৌকো বাইছিল দুজন। একজন আমি।

৪. "..."-তে থানায় মুখ নিচু করে রিপোর্ট লিখছিলাম আমি।

৫. "..."-তে মৃতদেহ সাজলাম। কিন্তু নায়িকার মুখই দেখা গেল। সে "দাদা" বলে চেঁচাচ্ছে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। সে অবস্থায় মুখ দেখানো সম্ভব নয়।

এ রকম আরও বার ছয়েক হয়েছে। অ্যাপীয়ার করি। আমাকে দেখা যায় না।

আমার নামটাও "এবং আরো অনেকে"-র মধ্যে চলে যায়।

এ অবস্থাটা সত্যি অপমানজনক।

চাই। আমি চাই। অন্তত একবার আমাকে দেখানো হোক। যেন "আমি" বলে চেনা যায়।

আমাকে সিরিয়াসলি নেবেন না। কেউ নেয় না।

১৩
আমঝর্নার শবরদের স্বপ্ন

স্বপ্ন হামারদের একটাই। আমঝর্নায় পৌঁছিবার কুন্‌-অ রাস্তা কুন্‌-অ দিন ছিল না। আমরা তো পলায়ে আছি। কারো মুখ দেখতে চাই নাই। না দেখে খু—ব ভালো ছিলাম। ছিলাম না? সুমিতি বলুক' কে জানত আমরা আছি? কেনও না! এমন তো আমরা অনেক দিনই আছি, অনে—ক দিন! তো সেই যে সুমিতি আল্য...

আমঝর্নার শবরদের স্বপ্ন একটাই। রাস্তা বা বনাও কিসড়্? এ ইথি কতগা মাড়ুস আসবাক কিসড়্?

অর্থাৎ রাস্তা বানাও কেন? এখানে কত মানুষ আসবে কেন?

ওরা চায়, কেউ আসবে না, সুমিতিও না।

আমঝর্নার শবররা মুরিগেনাক বা ইহলোক থেকে জীবড় বা জীবনের আশা, বাঁচবার মন তুলে নিয়েছে। আশা না থাকলে তাকে নিরাশা বলে না। আশা না থাকা মানে বাইরের জগৎ ওদের চোখে আর বাস্তব নয়। ওরা হাসেও না, কাঁদেও না। কথা বলে যখন, বলে গভীর অনিচ্ছায়। তেরোটি শবর পরিবার, বৃদ্ধ থেকে শিশু, মনে মনে চলে যাচ্ছে সেইখানে, যেখানে বুধন আদি অনেক শবর, অনেক শবরী কোনো অন্ধকার বলয় বৃত্তে তাদের জন্যে অপেক্ষমাণ।

আছে, ওদের সঙ্গে এদের সমুদ্রসমান তফাৎ আছে।

বুধন বলতেই পারে। থানা লকাপে কি জেহেলে পিটাই পিটাই মারি দিল কি বা?

ওরা মাথা নাড়বে।

ভদ্র শবর বলতেই পারে, গ্রামের মানুষ পাথরে ছেঁচে মারি দিল কি বা?

ওরা মাথা নাড়বে।

ওরা বলতেই পারবে না, বোঝাতেই পারবে না। কেন ওদের মৃত্যুর পর আমঝর্না গ্রামে কোনো শবর নেই। ঘরগুলি ধসে গেছে। পাতা ঝরে ঝরে ভূপৃষ্ঠ ক্রমে উঁচু হয়ে উঠছে। যে দণ্ডবায়সটি প্রত্যহ এসে বসত এবং ওদের খবর নিয়ে উড়ে চলে যেত, সেও আর আসে না।

আমঝর্নার শবরদের যেভাবে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে বিশ্বকে দেখাবার মতো ব্যাপার। বিশ্বকেই একটি মডেল উপহার দেওয়া হচ্ছে। এই মডেলই ভারতে খুঁজে খুঁজে আদিবাসী অঞ্চলে অনুসরণ করা হবে। গরিবকে নিকেশ করবার এর চেয়ে উন্নততর কোনো উপায় নেই। দেশে দেশে এই বার্তা রটি যাবে ক্রমে। তখন সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকাসহ অন্যত্র যেখানেই মরা গরিব আছে, সেখানেই কাজ হবে।

অবশ্যই এ কাজ কিছু সময় নেবে। সে সময়ে কাগজে চাপান উতোর চালানো যাবে, যে প্রতি আর্থিক বছরে এত কোটি টাকা রাজ্যে রাজ্যে আদিবাসী উন্নয়নে দেওয়া হয়েছিল।

দিয়েছিলে তো আমঝর্নার এ হাল কেন? তা জিজ্ঞাসা করা যায়, কেস করা যায়। এইসব কেস-টেস আসলে রাজ্য সরকারে খুব মনোমত। দাবড়ানি দেওয়া যায়, কেস তুলে নাও, না নিলে...

সরকার, দরকারে কোটি টাকা খরচ করে কেস চালাবে। তবু আমঝর্না যাবার পথটি বানাবে না।

আদিবাসী, বিশেষ শবরের মতো আদিম জাতি। যে একদা 'অপরাধপ্রবণ' হবার গৌরব অর্জন করেছে। সেই শবরের মেটে ঘর, ঘড়ের/টিনের/টালির চাল/তাকে পাট্টা জমিতে দখল দান/তাকে হিংস্র ও মাংসাশী প্রতিবেশীদের হাত থেকে বাঁচানো, তাকে পানীয় জল, আহার ও বস্ত্রদান, এ সব কাজ বাস্তবায়িত করার কোনো প্ল্যান নেই।

অনেক সহজ ও সরল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সরকার। শবর খাতের টাকার শ্রাদ্ধ করে জেলা সমাহর্তা। পঞ্চায়েতকে 'কি করেছ, যাও বোলে" বলার সাহস কলকাতার, বা জেলার দণ্ডমুণ্ডদের থাকে না, সফল জনগণতন্ত্রে যা হয়! অতএব সমাহর্তা ব্লকবাবুদের কাছ থেকে জালি রিপোর্ট আনায়, কলকাতায় পাঠায় নির্দ্বিধায়, কলকাতার হেড আপিসের বড়বাবু সে রিপোর্ট পাঠায় আদালতে।

এ এক প্রোগ্রাম, যা বলা হয় না।

এ কাগজ যার সুমিতিতে। ভেরিফাই হয়। 'যা লেখা হয়েছে, সবই বকোয়াস'—এ রিপোর্ট আসে। আবার আদালত। আবার সমাহর্তাকে হুমকি। আবার ব্লক বাবু, আবার জালি রিপোর্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। গদীনশীনরা নিজেরা নিজেদের পিঠ চাপড়ান ও ঘন ঘন প্রেসনোট ইস্যু করেন।

সুমিতিই আবিষ্কার করে আমঝর্নাকে। ব্লক : বান্দোয়ান ; গ্রামপঞ্চায়েত কুঁচিয়া। ব্লক ও পঞ্চায়েত "আমঝর্না" নামটি সম্পর্কে স্বর্গশিশুর মতো নিষ্পাপ অজ্ঞতায় ভোগে। নানা রকম পরস্পরবিরোধী মন্তব্য শোনা যায়—আমঝর্না? হে হে! আগে শুনতাম বটে, অনেকদিন শুনি না...তা আমঝর্নায় কি হবে?

পিকনিক রিসর্ট?

কট্টর লোকজন। যারা ব্যাং লাফালেও বলে, জনযোদ্ধাদের কাজ,—তারা বলে, উ রে বাবা! উখানকার শবররা সব জনযোদ্ধা হয়ে গেছে আজ্ঞা। শবরগুলান শূরবীর কি! তারা লাফ মেরে পাহাড়ে উঠে, ঝাড়খণ্ডে যেয়ে ডাকাতি করে। মদে মাংসে উবুচুবু যারে বলে! কেউ বলে, অসভ্য! অসভ্য! মেয়েমরদে ঢলাঢলি করে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দুর্নীতিতে বোঝাই, জানলেন? ও জাতকে বিশ্বাস কি বা!

সুমিতি যখন ওদের আবিষ্কার করেছিল, সুমিতির মাথায় বিস্ফোরণ ঘটে। আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। এমন দৃশ্যের, বা অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত ছিল না ওরা।

এলানো ঢাল দিয়ে ওঠার আগেই ওরা বুড়িঝোর শবর গ্রাম দেখতে পায়। বান্দোয়ান ব্লকে সুমিতি সবে ঢুকছে।

পুরুলিয়া, বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়া এমনিতেই "নো ডেভেলপমেন্ট" নীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। বারো হাজার সেচ পুকুর এবং কংসাবতী নদী শুকনোই থাকে। বর্ষা ভালো হলে কিছু জল পড়ে, কিন্তু বর্ষা বিদায়ে সে জলও মরীচিকা হয়ে যায়।

শবর পল্লীগুলির অবস্থা দুশো বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনই। জল নেই, পথ নেই, মালিকানা জমি নেই। সেদিন অরণ্য ছিল, আজ নেই। শবরের অধিকার শুধু নিষ্করুণ বঞ্চনায়, নিষ্ঠুর অত্যাচারে। তবু তারা দৌড়য়, প্রতিবাদ করে, থানা ঘেরাও করে।

আমঝর্নায় ওরা ঢুকেছিল মধ্যাহ্নে। তিন দিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়। পাদদেশে গ্রামটি পাহাড়ের প্রহরায় থাকে। ওরা শবরদের যে ঘরগুলি দেখে, তা গর্ত সদৃশ। প্রথম ঘরে এক স্বামী-স্ত্রী ছিল। প্রথমে স্ত্রী একটি কাপড় জড়িয়ে বেরোয়। তাকে গলিতবসন বলাই সমীচীন। সেই বসন "গলিত", যার সুতোগুলির জান চলে গেছে। মেয়েটির বলার কিছু ছিল না, এদেরও শুধাবার কিছু ছিল না। ধীরে মেয়েটি ভিতরে চলে যায়। এবং পুরুষটি সেই প্রবেশ ও প্রস্থান বলে দেয়, ওদের কাপড় একখানাই। সেই কাপড় পরেই বেরোয়।

বাইরে একটি নড়বড়ে খাটিয়ায় এক যুবক শূন্যে চোখ মেলে নির্বাক শুয়েছিল। এক বৃদ্ধ বলেছিল, ওরে লড়চড় করিস না ছাউ! ও মরি যাবে।

কয়েকটি গলিত ঘর। কয়েকটি নির্বাক মানুষ। দুটি একটি শিশুও ছিল বা!

সুমিতি ফিরে আসে। পরদিনই চাল-ডাল-লবণ-আলু-হাঁড়ি বাসন নিয়ে ওরা যায়।

এক বৃদ্ধা বলে, নিয়ে যা! নিয়ে যা ছাউ!

"ছাউ" বলে ওরা ছোট ছেলেকে। বোঝা যায়, ওরা মানুষী হিসেবের বাইরে চলে গেছে। যুবকদের "ছাউ" বলছে তাই!

বৃদ্ধা নিদন্ত মুখে থুথু টেনে টেনে বলে, কে রাঁধবে? আমাদের কারো শক্তি নাই যে উনোন জ্বালি, কাঠ গুড়াই, ভাত চাপাই, ভাত নামাই।

শান্ত ঔদাসীন্যে বলে, নিয়ে যা!

এরা নিজেরা বলে, রাস্তাও নাই!

বৃদ্ধা বলে, বুড়িঝোরের...শবররা আসে...কান্দা, মূল বাঁওলা দিয়ে যায়...

—আর...?

—ঝোরের জল আছে...তোরা যা...

সুমিতি হাল ছাড়ে না...আসতে থাকে...আসতে থাকে...

তারপর সমাহর্তা, সাংবাদিক, আরো অনেক কৌতূহলী লোক। আমঝর্নার সামান্য সীমানা বড়ই মানুষে ভরে যায়।

সমাহর্তা পথে বলেছেন, শবরদের জন্যে কেমন তোড়জোড়ে কাজ শুরু হয়েছে।

—সাংবাদিক জিগ্যেস করেন, আমঝর্নাতেও?

—আপনারা কি....আমঝর্না যেতে চান?

—তাই তো কথা ছিল। গতবারই বললেন, বিশাল উদ্যোগে কাজ হচ্ছে!

—তা...তিনটে ঘর ফিনিশ্‌ড!

—এমন বর্ষায়...

—বলবেন না, নিজে যেটি না দেখব...

ব্লকবাবু ঝটপট বলেন, পলিথিন দিয়েছি...আর...আর...মশারি!

টানাবে কোথায়? ঘর তো নেই, বলতে গেলে...

—জামাকাপড় আমরা এনেছি সঙ্গে।

সমাহর্তা বলেন, শবররা আসলে...বড় উদ্যোগহীন! আমরা যা করতে চাই, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে না...

বয়স্ক সাংবাদিকটি নাছোড়বান্দা। তিনি বলেন, কি করতে চান?

—আমরা চাই ওরা চাষ করুক...

—জমি আছে?

সুমিতির কর্মীটি মিথ্যে কথা বেশিক্ষণ সইতে পারে না। সে বলে, ব্লক ভূমিরাজস্ব অপিসে, বা পঞ্চায়েতে পাট্টা আছে। শবররা কোনোদিন সে জমির দখল পায়নি। চাষ করে নি।

আদালত-বন্ধু কলকাতা থেকে আগত। তিনি বলেন, কি বললেন?

ছেলেটি নিচু গলাতেই বলে, এদের কারো লাল রেশন কার্ড নেই। অবশ্য এরা ভোটার লিস্টে আছে, আর ওদের নামে ভোটও পড়ে।

এদের জমি হাতে পায়নি? জিগ্যেস করুন না শবরদের নামে যে পাট্টা দেওয়া হয়, তাতে কারা চাষ করে?

ব্লকবাবু তো জানেন...

—না...সেগুলো দেখা হচ্ছে...

—ওদের নামে যে প্লট, তাতে পাথরখাদান চলছে। তা জেলায় হর্তাকর্তারা জানেন।

—মশারি দিয়েছি আমরা...

—কোনও ব্যবসায়ী দিয়েছে। দেখুন, দশ বাই পাঁচ ফুট ঝোপড়িতে মশারি টানাচ্ছে কি নাঁ!

তারপর বলে, আমঝর্নাতে যাবার সত্যিই কোনো মানে হয় না। বিশ বছর আগে ওদের তাড়িয়ে ওখানে ঢোকানো হয়েছে। ঢুকিয়ে দেবার পর ওদের অস্তিত্ব কারো মনে নেই। আমঝর্না একটা মডেল শবর গ্রাম। বাঁচার সহায় কিছু না দিয়ে ওদের ফেলে রাখা হয়েছে।

আদালত বন্ধু বলেন, ওদের মনে বাঁচার আশা জাগাতে হবে না?

—একদিন তা পারা যেত। উলঙ্গ কয়েকটা আদিম মানুষ...এত আদিম মানুষ আমি দেখিনি।

আমঝর্নায় পৌঁছে আদালতবন্ধু বলেন, আদিবাসী উন্নয়নের টাকা কোথায় যায় তা এ গ্রামটি দেখলেই বোঝা যাবে। বহুবছর সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখলে ওরা মরে যাবে, মরে যাচ্ছেও।

তারক শবর, সুমিতির মাস্টার কিছু একটা রেঁধেছিল। ও একবার আসে। রেঁধে বেড়ে খাইয়ে চলে যায়। এক গ্রাস ভাত খেতে ওদের অনেক সময় যায়। তারক ও সুমিতির ছেলেরা গাছের ডালে ডালে পলিথিন বাঁধে। বলে, জল তো নামবেই! তা ওই পোড়ো ঘরগুলোর চালে চালে কেন, গোটাটাই ঢেকে দিই। কাল খুলে দিব।

এখন বৃদ্ধটি এগিয়ে আসে। বলে, এই করতে চেয়েছিলি! করেছিস, কোনদিন দেহে বল পাব। মাথা তুলে বেরাব। সে সাহস নাই। মেরে দেবে।

মরছি তো আমরা বটেই। ব্যাং-সাপ-পাখি-কচু কলা-বাওলা একদিন খেয়েছি। তাতেই এতদিন মরি নাই।

—না, মরবে কেন?

—মারতে চাও বলে যেথাক্ ঠেললে। এখন বল, মরবে কেন? কত লকশা জানো তোমরা...

এরপর কথা চলে না। বৃদ্ধ তো রেগে বলেনি, হাতিয়ারও তোলেনি কোনো।

—আর এস না হে তোমরা। রাস্তা বানিও না। যে রাস্তা করছ, তা ভেঙে দিও যাও। অ সুমিতির ছাউ! আমারদের আমারদের মতো মরতে দে বাবা!

এই শবররা সেই নিশ্ছিদ্র বৃষ্টির শব্দ শোনে পলিথিনের নীচে বসে। বৃদ্ধটি বলে, সপনটি যেন সত্যি হয় ঠাকুর। আর রাস্তা নয়, জল নয়, গিদাপিদা, জাই যোবতী কে বা আছে আর? মঙ্গলা আর তার ছেলা? বুড়িঝোরে চলে যাবে।

তারপর বলে, সপন দেখি, রাস্তা নাই, কেউ আসে না। ওরাদেরে কি বলব? সরকার যা দেয় সব খেয়ে বসে থাকে?

আমরা আমরাদের নিয়ে থাকি? এ সপনটা কি সত্যি হবে না?

এই স্বপ্নটা আমঝর্না গ্রাম আজ দেখে। ব্লকবাবু ভাবে, সব মরে ঝরে গেলে, এখানে এমেচার পর্বতারোহীদের একটা বিশ্রামের জায়গা করাই যায়।

বৃদ্ধ তা বুঝেই যেন বলে, পারবি না। যতজন গিছে, ওই মাটির গাহারায় সামাজ দিয়াছি। আর আসিস না। মুক্তি দে! একটা শবরটোলার একটা সপন সত্যি হোক।

বোঝা যায়, এ স্বপ্ন সত্যি হবেই। আর আমঝর্না মডেলটি আপাতত রাজ্য হতে রাজ্যে চালানো যাবে।

যারা শবরদের ক্ষুধার অন্ন, প্রাণ ধারণের জমি, সব কেড়ে নিয়েছে, তারা যেন না আসে। এই স্বপ্নটা দেখে বৃদ্ধ চোখ খুলে।

এমন বড় মাপের পাপের মধ্যে ও বাঁচতে চায় না। সে স্বপ্নটা দেখার অধিকার ওর নিশ্চয় আছে। বুড়িঝোরকে বলতে হবে, ওই রাস্তা তোরা বন্ধ করে দে ছাউ। শবর যে মরতে জানে তা ওরা জানুক। আর হ্যাঁ, মঙ্গলা আর তার ছাউকে নিয়ে যাস!

এমন স্বপ্ন দেখার অধিকারই তাকে দিয়েছে দেশ।

তারক শবর বলে, দাদুবুড়া। ওদের বলি নাই। তোমাদের সকালারে আমরা কাঁধে বহে বুড়িঝোরে নিব। ওখানে ঘর তুলব, নয়া আমঝর্না বানাব। সকাল থেকে রোদে সেঁকলে দেহ থেকে অসুখ পলাবে।

—বটে?

—ই টো হামরার সপন!

বুড়া ওর গায়ে হাত বুলায়। বলে, শবর ছাউ কথা দিছে। তবে দেখা যাক।

—ওখানে কবিরাজ, লতাপাতা বেটে দিবে.... সিদ্ধ জল খাওয়াব.... কত্ত কি শিখলাম না?

তাই করিস! তবে আমার সপনটাও রাখিস! যে-যার সপন দেখতেই পারে, না কি বলু?

—নিয্যস পারে।

ধান কুড়ানি

চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥

খনার বচন। তা কুড়ানি যে বছর জন্মেছিল, সে বছর চৈত্রে সত্যিই কুয়াশা হয়েছিল। ভাদ্র মাসে বান ডেকেছিল কালী নদীতে। কালী নদীর বুক বোঝাই বালি। ঝঝে জল বয় থিরথির। ছোট ছোট খোড়ে মাছ নেচে চলে যায়।

ঝমঝমে বর্ষা। তো নদী পাড় ছাপিয়ে ঘরে এল। কিন্তু সেবার শুধু বর্ষায় বান ডাকে নি: মুলাগড়া ব্যারেজটি সরকারের বাগান-বিলাস। খরার সময় ব্যারেজের জল ছাড়লে সেচখালে জল বয়। চাষি বাঁচে। ব্যারেজও খালি হয় খানিক।

কিন্তু সরকার কখনো গ্রীষ্মে জল ছাড়ে না। হা জল। হা জল। চাষি কাঁদে আকাশ পানে চেয়ে। আর মুলাগড়া ব্যারেজ কানায় কানায় জল নিয়ে নিথর পড়ে থাকে। যেন বড়লোকের বউ। দেখনশোভা হয়ে থাকাই তার কাজ। বর্ষায় ব্যারেজ উপছে পড়ে। তখন সরকার ব্যারেজ বাঁচাতে জল ছাড়ে। বান বন্যা তৈরি করে। গ্রীষ্মকালে খরাত্রাণ। বর্ষাকালে বন্যা ত্রাণ। ব্যারেজের জল তখন নদী উপছে গ্রাম ভাসায়।

কুড়ানির জন্মের সময় এই সবই হয়েছিল। তারপর ঘাস-পাতা-কচু-ঘেঁচু খেয়ে পেটের রোগে মানুষ মরেও বিস্তর। খনার বচনের সবই সত্যি নয়। এমন ধান বন্যার সময়ে, মকরন্দপুরের সব মানুষ যখন ইস্কুল বাড়িতে, সে সময়েই কুড়ানির মার ব্যথা উঠেছিল।

পাঁচু পিসি প্রসব করায়। পাঁচু পিসি নিজেই এক প্রসূতিসদন। সকল অবস্থায় পোয়াতির পাশে পাঁচু পিসি থাকে।

দলমলে মেয়ে মা। কেমন চুল, কেমন মেটে লালচে রং, কেমন হাঁ মুখটি।

তা বানের জল ইস্কুল ঘরে। মেয়ে-মায়ের ঠেলা খেয়ে টেবিলের বোর্ড থেকে জলে পড়েছিল। গেল কোথা। গেল কোথা। পাঁচু পিসিই কুড়িয়ে তুলে আনে।

পরে জল সরে গেলে, সবাই যখন ঘরে ফিরে থিতুভিতু হচ্ছে, পাঁচু পিসি মেয়ে নিয়ে থাকত। তোরা ঘর ঠিক কর, মেয়ে আমি রাখি। কেমন মেয়ে মা, কাঁদে না, কেমন ঘুমোয়। শান্ত মেয়ে।

কুড়ানির মা বড় শান্ত, বড় নরম। স্বামীর প্রথম পক্ষ ছেলে রেখে ঘর ছেড়ে যায়। পুরন্দ সিং, ব্রয় ডোম, গৌরদাসীকে বিয়ে করে আনল। গৌরদাসী না বিইয়েই কানায়ের মা। কানাইও 'মা' বলতে অজ্ঞান।

পাঁচু পিসি বলত, ছেলের পর মেয়ে, এই তো বেশ। পুরন্দর, বয়স আছে, গতর আছে, তোর অনেক ছেলেমেয়ে হবে।

কুড়ানি, ছ'মাস হতে না হতেই নাম হয় কুড়ানি। সেই জলে পড়ে গিয়েছিল, সেই যে পাঁচু পিসি কুড়িয়ে নিয়েছিল সেই থেকেই কুড়ানি।

ফাল্গুনে আমের বোলে মৌ মৌ দিয়ে পাঁচু পিসি মণ্ডল বাড়ির ঠাকুর বাড়ির দালানের নিচে বসে থেকে পুরুতকে অনেক দোই থোই করে এক বাটি পায়েস নিবেদন করিয়ে, খর রোদে আঁচল ঢেকে পায়েস এনেছিল।

তুলসি পাতা বেছে আঙুলে তুলে কুড়ানির মুখে দিয়েছিল।

—অ গৌরদাসী। তোর কুড়ানির মুখে ভাত হয়ে গেল মা। দেখ কেমন খাচ্ছে, দেখ। অ কানাই। এ টোকা তুই খেয়ে ফেল বাছা।

—বোনের এঁটো খাব?

—বোন তো এখনও যাকে বলে ভগবান, ছোট শিশু হল ভগবানের অংশ। জানলি বাবা?

মেয়ের মা বলে, পাঁচু দিদি, মেয়ে তো তোমার, একটা নাম দেবে না?

—না বউ। কুড়ানি নাম তো মন্দ নয়। হবার কালে বানবন্যে। কিন্তু দেখো, তোমার গাছেই বোল এসেছে আমে, গাই বিয়োলো বকনা, নানা করেও ধান চারটি পাবে, মেয়ের লক্ষণ ভালো।

—দেখো। তোমার কাছেই রাখো।

—না বউ। আমারে ভগবান দিলও না। পরেরটা নিলে মন্দই হবে। ওই পাঁচজনেরটা নেড়ে চেড়ে পাঁচুর দিন যাবে। তেমন কপাল যদি হবে, তাহলে অকালে বিধবা বা হব কেন, আর পোয়াতি খালাস বা করব কেন, এ জন্মে এই কাজ!

পাঁচু পিসিই কুড়ানির কান বিঁধিয়ে দেয়। এ সব কাজ ওর। পাঁচুমণি ষোলো না হতে বিধবা। তবে আবার সাঙা করতে পারত।

কিন্তু মকরন্দপুরে ডোম সমাজটি মণ্ডল, পাল, গড়াই, মাষচটক, এ সব সমাজের রীতকরণ দেখে দেখে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। কানাইয়ের মায়ের কথা কেউ ভুলেও বলত না। যেন ব্যাপারটি ঘটেনি।

ডোম সমাজের মাথা নিত্য সিং বলত, সাঙা-মাঙা তোরা ভুলে যা। আইবুড়িদের বিয়ে হয় না। বিধবাদের সাঙা। যার যা মন হয় এমনিই করো না বাবা!

পাঁচুমণি নিত্যের বোন হয়ে সাঙা করত কেমন করে? মণ্ডলবাবু বলত, যে কাজ করছ মা, ভগবানের কাজ। ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই, পোয়াতিদের খালাস করত কে? পুণ্য হবে রে তোর পাঁচু, মরলে পর সগ্‌গে যাবি।

শৈশবস্মৃতিতে কুড়ানি বড় খুশি।

ঠাকুমা সংসারের হাল ধরে বসে থাকে। দুই বিঘা বাপোতি জমি পুরন্দর। অঢেল ধান। সকলের মতই ওদের আটচালা ঘর। একতলার ঘরের মধ্য দিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ছোট ঘর। আবার উঠোনের এক পাশে লেখা গোয়ালের চালা। তার একদিকে বাঁশের আগড়ে গরু থাকে। অন্যদিকে বাঁশের আগড়ে রান্না হয়। গোয়াল ছেড়ে পিছন দিকে একটি নিচু ভিটে তোলা।

ওখানেই তালপাতার ঘর তুলে আঁতুড় হয়েছে। ঠাকুমা এক ছেলে, পাঁচ মেয়ে বিইয়েছে। কুড়ানির পিসিরাও এসেছে প্রথম প্রথম মা হবার কালে। আঁতুড় ঘর তোলো, আঁতুড় গেলে ভেঙে ফেল। কানাইয়ের জন্মও ওই ঘরে। গৌরদাসী এক মেয়ে বিইয়ে ছয়টি বছর জিরেন নিয়ে ওই ঘরেই ননীবালাকে জন্ম দেয়।

কুড়ানি জানতও না, ভাতের কষ্ট বলে কিছু আছে। দাদা ইস্কুলে যেত। কুড়ানি শাক তুলত, সজনা ফুল কুড়োত, দোকানে যেত।

তারপর কালী নদীতে গামছা ছেঁকে মাছ ধরো। আম কুড়োও, জাম কুড়োও, মাটিতে লেপটে বসে গুটি খেলো, সুখের শৈশব ছিল, সুখের শৈশব।

ঠাকুমা ছিল বড় পিসি অন্ত প্রাণ।

বড় পিসির বিধবা হওয়াটা কুড়ানির খুব মনে পড়ে। বাড়িতে খুব কান্নাকাটি। ঠাকুমা বুকের কাপড় ফেলে বুকে দমদম করে কিল মেরে কাঁদছিল।

কাঁদতে কাঁদতেই ঠাকুমা বলেছিল, ডাকাত ওরা! ডাকাত বই তো নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে ল্যাই করে ভাইকে মেরে ফেলল! অ পুরুন্দা! সন্নকে তুই নিয়ে আয়! তোর বাবা কি দেখে ভুলেছিল যে! লবডিহা যে জঙ্গলের দেশ পুরন্দ!

লবডিহা তখন জঙ্গলের দেশই ছিল। কুড়ানি শুনেছে, শীতকালে বাঘ আসত, ভালুক আসত। সূর্য ডুবলে ঘর থেকে বেরোত না কেউ। বড় পিসি বলত, সাঁওতালরা ছাড়া সে দেশে কেউ থাকতে পারে না।

তেমন দেশেই পিসির বিয়ে হয়। ঠাকুরমার কান্না শুনে বাবা বড় পিসিকে নিয়ে এসেছিল। ঘর তুলে দিচ্ছি, থাকো। ওদের জমিতে ভাগে চাষ করুক। ওরা তো লাঙল ধরে না। আলু, আখ, যা চাষ হবে তার ভাগ পাবে।

এখন লবডিহা নাকি গঞ্জ জায়গা।

জঙ্গল কোথায় ছিল, হদিস মেলে না।

বড় পিসির ছেলেরা দেখ। একটু একটু করে জমি কিনেছে, অবস্থা ফিরিয়েছে।

যাদের সব ছিল তাদের হাল কি হল?

যাদের কিছু ছিল না তাদের পানে চেয়ে দেখ।

কুড়ানির এখনো মনে পড়ে, ঠাকুমা ছিল বউজ্বালানি, মেয়েভোলানি।

সর্বদা বলত, দেখলে পেটের মেয়ে দেখবে। পরের মেয়ে কি দেখবে? তাতেই দোরগোড়ে আমগাছ বসালাম।

বড় পিসি আমগাছ। সর্বদা ফল দেবে, ছায় দেবে, পাতা দেবে, কাঠ দেবে।

কিন্তু পরে তো ঠাকুমাই বলত, দোরগোড়ে শ্যাওড়া গাছ বসালাম। গাছের বা বাতাসে আমার জীবন জ্বলে গেল।

মা মুখ বুজে কাজ করে যেত। দাদার দিকে চেয়ে বলত, তুই বড় হলে আমার ভাবনা থাকে না কানাই। তাড়াতাড়ি বড় হ।

বাবা নিজের জমি চষত দাদাকে নিয়ে। ভাগে চষত ধান, আলু, আখ, সরষে। চাল, আলু, গুড়, তেল, সব ঘরেই থাকত।, আর বাড়ির লাগোয়া ডোবার লঙ্কা, কুমড়ো, বেগুন, সিম, লাউ, সে মায়ের বাগান।

কুড়ানি ততদিনে মায়ের ডান হাত। ননীকে দেখে, ঘরের কাজ করে।

ঠাকুমা দেখে গরু আর গোয়াল। ধান নিকোয়, শুকোয়, ভাঙিয়ে আনে।

আর মাছ ধরে। এমন দিন যায় না, কচু পাতায় মুড়ে ঠাকুমা চারটি মাছ আনে না।

পাঁচু পিসি তার মধ্যেই এসে পড়ত।

—অ বউ, অ কানায়ের মা! কুড়ানিকে নিয়ে যাব? বড়ুঙে সন্ত সাধু এসেছে গো! সবাই যাচ্ছে।

ঠাকুমা বলত, সাধুর কাছে তুই কি গোনাবি?

—মামি গো! সংসার উঠোন নিকোই, ধান সিজোই, খেজুর পাতায় চাটাই তুলি, তাতেও ভাজ বলছে, এক থালা ভাত মারে, বসে বসে খায়।

—সাধু কি বউয়ের জিভ বন্ধ করবে?

—গোনে গেঁথে বলে দিক, কদিন বাঁচবা। পাঁচু পিসি কেঁদে ফেলেছিল।

আর কুড়ানি ফ্রকের কোঁচড় থেকে কাঁচা আম ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে পিসির আঁচল ধরেছিল।

—তুই মরে যাস না পিসি, আমাকে চুল বেঁধে দেবে কে?

কুড়ানির মা বলেছিল, নাও দেখি। কেঁদো না। এখনো কানায়ের বিয়ে বাকি। আমার নাতি হবে তোমার হাতে। বউ বলেছে, কি হয়েছে? ভাই তো বলে নি। যা কুড়ানি, পিসির সঙ্গে যা। বেলায় বেলায় চলে এসো দিদি।

পাঁচু পিসি ডিঙে মেরে মেরে চলত। আল ধরে খপ খপ করে লাফ মেরে মেরে কুড়ানিকে নিয়ে চলার সময়ে পিসি ছোট্ট মেয়ে যেন।

—মকরন্দপুরের মতো গাঁ হয় না, বল্?

—হ্যাঁ গো পিসি।

—কেমন ঢাল ধরে নেমে এসে কালী নদীর কোলটি। কালী নদী নাম কেন, জানিস?

—কে যেন কালী ঠাকুর পেয়েছিল।

—ঠাকুর বলে ঠাকুর। এই দু হাত লম্বা কালো পাথরের ঠাকুর। আমাদেরই জ্ঞেয়াতি, তোর ঠাকুমার কেমন সম্পর্কের কাকা যেন! কালীতে ঢল নেমেছে, সে লোক মাছ ধরতে গেছে। যেন মস্ত শোল মাছ খলবল করছে, সে লোক ডুব দিয়ে আঁকড়ে ধরল, ও মা! পাড়ে তুলতেই মাছ হয়ে গেল ঠাকুর।

—সত্যি সত্যি?

—নয়তো কি মিথ্যে?

—তারপর?

—সে লোক মাথায় করে ঠাকুর আনল, নিজের ঘরে রাখল। এই সলাদানাতে রে।

—যেখানে মেলা হয়?

—হ্যাঁ রে! তো ডোমের ঘরে কালীপুজো হচ্ছে জেনে বামুনরা খুব রাগ করল। জোর করে ঠাকুর তুলে নিয়ে গেল। খুব তো প্রাচিত্তির করে পুজো করছে। ও মা! সকলের সামনে ঠাকুর পুজো হচ্ছে, সেই ডোমের আট বছরের মেয়ে দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকেছে, বলছে, দে দে! ভোগ দে!

গল্পটি কুড়ানি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল।

—বামুন তো তাকে মারতে গেছে। তখন সেই মেয়ে বলছে, তোর পুজো কে নেবে? যে পেয়েচে তাকে দাও, নইলে তোমার বউ বিধবা হবে। এ কথা বলেই সে মেয়ে ঠাকুরের গায়ে যেন্ মিলিয়ে গেল। সবাই বলল, নদীতে সবাই নেমেছিল, একা ডোম ঠাকুর পেল কেন? যার ঠাকুর তাকে ফিরে দাও, নইলে তুমি সন্ধ্যে দেখবে না।

—ডোমের মেয়ে সত্যি এসেছিল?

—না, না। সে সব ঠাকুরের ছলনা বই তো নয়। ডোমের মেয়ে তখন আমগাছের তলায় বসে মুড়ি খাচ্ছে।

—তারপর কি হল পিসি?

—ডোম তার ঠাকুর নিয়ে গেল। নতুন ঘরে ঠাকুর বসাল। তারপর ঠাকুর পুজো করে তার কত সম্পত্তি না হল আর সেই থেকে ব্রম্ভডোমরা আর শুওর পালি না, নোংরা কাজ করি না। গ্রামের নামই সলাদানা ডোমাকালী হয়ে গেল। দেখিয়ে আনব তোকে।

ডোমকালীর কথা বলতে বলতে অনেক পথ হাঁটে। কুড়ানি বলে, খানিক বোস কেন পিসি?

—বাঁশঝাড়ের ছাওয়ায়? সর্বনাশ কুড়ানি। বাঁশঝাড়ে পেতনি থাকে। ভর দুপুর, আর সন্ধ্যেবেলা, বাঁশঝাড়ের ধারে যাবি না। ওই তেঁতুলগাছের সামনে দোকান। চ, ছাওয়ায় বসাব, মুড়কি খাওয়াব।

—জল পিপাসা লেগেছে।

—জল খাবি, রয়ে বসে।

বড়ঙের সাধু ভর দুপুরেও বটগাছের নিচে বসে আছে, চাষিবাসী মানুষদের সঙ্গো কথা বলছে।

—আয় কুড়ানি, বোস।

—তোমরা কারা গো?

—মকরন্দপুর থেকে আসছি বাবা।

—গনাবে, না মাদুলি নেবে?

—সে তো আপনি বলে দেবে।

—মেয়ের হাত গনাবে?

—আমারও।

—নাও, পা ঢেকে বোসো। বাঁ হাত পাতো দেখি। এ হে হে, কপাল পুড়িয়ে বসে আছ?

—সে অনেককাল।

—কি জানতে চাও মা?

—কত কাল বাঁচব, কেমন জীবন যাবে...

—আয়ু তোমার অনেক।

—এখনো অনেক?

—তা পঁচাত্তর বচর তো হেসে খেলে থাকবে।

অ ঠাকুর। হেগোমুতে পড়ে থাকব?

—নাগো, পড়বে আর মরবে, রোগজ্বালা নেই।

পিসি অম্বলে ভুগত, আশ্বিন মাস থেকে ঘঙঘঙে কাশি হত। আতপ চাল ভেজা জলে অম্বল কমাত। বাসক পাতা আর বচের ক্বাথ খেয়ে কমাত। অথচ গণক বলল, 'রোগজ্বালা নেই', পিসির মুখ হাসিতে ভরে গেল। সগর্বে বলল, দেখ কুড়ানি কারো সেবা নেব না। মন্ডল কর্তা কি মিছে বলে পুণ্যবতী।

—অ ঠাকুর, ভাতের কষ্ট পাব না?

—কোনো দিন নয়।

—পাবার কথা নয়। এত সেবা করলাম, বাবা মৃত্যুকালে বলে গেল। নামো জমি এক বিঘে সাত ছটাক পাঁচুর। ঘরে তখন অনেক লোক। সবাই জ্বাজুল্য সাক্ষী। বউ ভাতের খোঁটা দেয়। তা এবারের রেকর্ডে নামটা তোলাব।

পিসি যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়।

অথচ, কুড়ানির পনেরো না পুরতে ওদের সংসারের মহা দুর্দিনে পাঁচু পিসি তো ওদের ঘাড়েই পড়েছিল, আর রক্তামাশায় ভুগেছিল কতদিন।

কুড়ানির ছেলে খালাস করার জন্যেই বুড়ি বেঁচেছিল যেন! তারপর বাঁশঝাড়ে পায়খানায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে ছিল। সে এক দিনই গেছে।

—এবার মেয়ের হাত দেখ তো?

—তোমার মেয়ে?

—ভাইঝি।

—এ মেয়ে তা সুলক্ষণা গো। শাস্ত্রে বলছে।

শ্যামাঙ্গী সুকেশী তনু লোমরাজি কান্তা সুভ্রূলীলা কিংবা সুগতি সুদন্তা মধ্যক্ষীণা যদি হয় পঙ্কজনয়নী কুলহীনা হইলেও বরেষ্টদায়িনী!

—বাংলা করে বল, অ ঠাকুর।

—রং ময়লা, দিব্যি ঝাঁকড়া চুল, গায়ে লোম কম, কোমর তা বয়সকালে সরুই হবে। চোখ, হ্যাঁ পদ্ম পাপড়ির মতো গড়ন। এমন মেয়ে যেমন ঘরে জন্মাক, একে যে বিয়ে করবে, সৌভাগ্য তার পায়ে বাঁধা থাকবে।

—আমাদের ঘরে তো ফর্সা রং হয় না। কিন্তু ওর মা রূপসী। মেয়ে তো দেখছ। মেয়ের কপাল কেমন?

দুপুরে প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় কত যেন মায়া। গণক যেন সকলের সব ভবিষ্যত জানে।

—এ মেয়ের এমন বিয়ে হবে যে, ভিখিরি এলেও ভাত পাবে। আর কি চাও?

—আর কি চাইব ঠাকুর? মেয়েটা বড় ভালো, বড় শান্ত। ওর কপালটা ভালো হলে আমার শান্তি।

পিসি আঁচলের গেরো খুলে দুটো টাকা দিয়েছিল গণককে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে প্রণাম করেছিল। কুড়ানিও ভয়ে ভয়ে প্রণাম করেছিল।

একজন চাষি এবার এগিয়ে এসেছিল।

—বউয়ের পেটে মেয়েই হয়। গাই বিয়োলে এঁড়ে বাছুর। এর উপায় করে দাও ঠাকুর।

—দেখি ডান হাত দেখি।

পাঁচু পিসি বলেছিল, চল কুড়ানি। উঠি।

দিনটি ছিল মায়াময়, কত না সুলক্ষণের প্রতিশ্রুতি ছিল সেই আশ্চর্য দিনে।

তখনো ঝোপঝাড় অগণন। বাঁ দিক দিয়ে শিয়াল দৌড়ে ঝোপে ঢুকেছিল, সুলক্ষণ সুলক্ষণ। নীলকণ্ঠ পাখি বসেছিল শিউলি গাছের ডালে।

—নমস্কার কর কুড়ানি।

চলতে চলতে পিসি বলেছিল, এবার তোকে ডোমকালী সলাদানা নিয়ে যাব। ঠাকুরের মায়া কেমন, জানিস? কে দেখে কালী, কে দেখে শিব। যে যা দেখে, তাতেই মঙ্গল। সেখানে থেকে লোহার বালা পরিয়ে আনব তোকে, আপদে রক্ষে পাবি।

—মাকেও নিয়ে যাব।

—মা কি সংসার ফেলে যাবে?

—মাকেও বালা পরাব। ঠাকুমা শুধু বকে, মা কেঁদে কেঁদে ভাত খায়।

—মামি অমন ছিল না। বয়স বাড়ছে, ভিমরতি বাড়ছে। তোর বড় পিসি, ওই সন্ন. ও মন ভাঙাচ্ছে তো!

সে কথাও সত্যি। বড় পিসি এল। ঠাকুমাও যেন অন্য রকম হতে থাকল। মা বলত, জমিজমায় ভাগ বসাবে।

বাবা বলত, ও কথা থাক।

অথচ জমিগুলির ওপর বাবার মমতা কত!

ফেরার পথে পিসি বলেছিল, চল্ নদীর নামু ধরে যাই। ছপছপে জলে হাঁটতে আরাম। আলে হেঁটে হেঁটে...জানিস তো, আলে হেঁটে ঘাস আনছিলাম। সে সময় নদী আর ক্ষেতের মাঝে কি ঘাস, কি ঘাস। গোচর জমিই ওটা। মুখুজ্জে বাবুরা যে সব জমিতে আবাদ করছে, মানুষ গোরু চরায় কোথা বলো?

—যেথা যাই, তাড়ায় গো!

—খুব জানি সে কথা! অথচ সেটা অধর্ম ছাড়া কি? হতে পারে মুখুজ্জেদের দখল! কিঁছু গোচর জমি তো ছাড়তে হত। তোমাদের অভাব আছে কোনো?

ঘাস কেটে আনছিলে। কি বলছিলে?

পাঁচু পিসি হাসে, যেন অবাক হয়ে যায় পুরনো কথা মনে করে। যেন কার না-কার কথা বলে চলে।

—চেহারা, গতর খুব ছিল। তোর পিসে রেলের খালাসি। খালি ঘুরত। খুব মদ খেত, খুব জোয়ান দেহ, চুলগুলো যা পেকেছিল। আর মোচ পাকিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেবারই পুজোর কালে আসবে। আমায় নিয়ে যাবে। তা আমি দু'বার গেলাম। দু'বোঝা ঘাস আনলাম। তখনো সধবা। তারপর ঘাস কেটেছি। বোঝা বেঁধেছি। ওলা শাক দলমল করে। গুছিয়ে গুছিয়ে অনেক তুলেছি। আল ধরে এমনি করেই যাচ্ছি মা। কি আশ্চর্য কথা! উঠোনে ঘাস ফেলেছি। দেখি উঠোনে পাড়া ভেঙে পড়েছে। কি হয়েছে মা? তোর ঠাকমা বলছে, ঘরে উঠো না উঠো না পাঁচু, কপাল তোমার পুড়েছে। ঘাটে চলো মা, কপাল তোমার পুড়েছে।

—বিধবা হলে কপাল পুড়ে যায়?

—নিশ্চয়।

ছপছপে জল ডিঙি মেরে ভাঙতে ভাঙতে পাঁচু পিসি বলে।

স্বামী হল মেয়েছেলের সর্বস্ব। স্বামী গেল তো সবই গেল।

—তারপর?

—আগের শনিবার চুড়ি পরেছিলাম...তখন গালার চুড়ি পরতাম আমরা...রূপদস্তার বালা-ঘাটে নিয়ে সব খুলল। ভাঙল। মেটে সিঁদুর কি উঠতে চায়? তখন সাবানও মাখতাম না তেমন...সব ছেড়ে বাবার ধুতি পরে...

—চুল কাটলে কবে?

—ক দিন বাদে। বাবু বাড়ির রীত করণ যত...চুল কাটলাম...তুলসি পরলাম, এই তো!

—মা বলে, সাঙা কর নি?

—মামাতো দেওর বলে। আমি ওকে এখন সাঙা করতে পারি। আমার ঘরে ধান আছে। আমি বলি, কি লজ্জার কথা মা! মেয়েছেলের আবার বিয়ে?

পরে কুড়ানি বড়পিসির কাছে শুনেছে, ওই সব কথা সত্যি নয়।

—পিসি পিসি করিস, পিসির চরিত্র জান না।

—ঠাকুমা বলেছিল। সে কথা বলিস না সন্ন!

—বেরিয়ে যাচ্ছিল না।

ঠাকুমার প্রথম পুত্রবধূই ছেলে রেখে পালায়। ঠাকুমা এ সব কথা ভালবাসে না। এক কথায় আরেক কথা উঠবে।

—বেরিয়ে যায় নি। সাঙা তো চলে বাপু সমাজে। এখন যদি মানুষ না করে। সে অন্য কথা। মামাতো দেওর সাঙা করতেই চেয়েছিল, পাঁচুর মন ছিল, পাঁচুর মা বলেছিল করুক সাঙা। ভাত কাপড় পাবে, সংসার হবে। ওই পাঁচুর বাপ যেন নেচে উঠল। আমার বদনাম হবে। তাতেই পাঁচু দমে গেল। অন্যের কথা বোল না সন্ন, তোমারগুলো ওর হাতে খালাস।

—জানি না বাপু!

বড় পিসি গণগনিয়ে চলে গিয়েছিল।

সেদিন নদীর জল ভেঙে ফিরতে ফিরতে পাঁচু পিসি বলেছিল, তোর হাতটা দেখিয়ে মন যেন শান্ত হল। ভালো বিয়ে হবে মা। সুখ হবে।

কুড়ানি কি খুশি। কি খুশি।

—আগে তো দাদার বউ আসবে. তার পরে।

—কানায়ের মেয়েও দেখে রেখেছি। সলাদানার ভীম সিংয়ের মেয়ে ভোমরা। খুব খাটিয়ে পিটিয়ে মেয়ে, দিব্যি গড়ন, আর হেসে বিনা কথা নেই। তোর পিসির যা গোমড়ামুখী!

—মা বলে, ঠাকুমার মেজাজ পেয়েছে।

—সন্নকে দোরগোড়ে তুলল মামি। না জানি কি করে সন্ন। ওর মাথায় প্যাঁচ অনেক।

বড় পিসির মাথায় প্যাঁচ যত, বুদ্ধি তত, খাটতে পারেও তত। দুই ছেলে জগা আর বলাকে নিয়ে নিজেও যাবে চাষ কবতে। ভাগের চাষেই ঘরে কত সামগ্রী।

তখন এত আইন হয় নি। তখন গ্রামে ডোম সমাজের ধর্মগোলা ছিল ঈশ্বর ডোমের উঠোনে। ঈশ্বরই সমাজপতি। সকলের ঘরে হামার থাকত না। যার যার ধান ওই গোলায় রাখো। যার যখন যেমন দরকার, মেপে নিয়ে এসো। ধর্মঠাকুরের নামে এক পালি থেকে এক কাঠা ধান দিও। চৈত্র মাসে সেই ধান থেকে পুজো হবে।

ভাগে চাষ কে না করত।

কিন্তু বড় পিসি ঠাকুমাকে বলেছিল, অন্ন, মান্নো, যশি আর কুমির তো অভাব নেই। যত অভাব আমার। কানাই যদি পৌত্তর হয়, জগা আর বলা দৌউত্তুর। তাদের কথা ভেবে আমাকে এক বিঘা জমি দাও।

—তাই হয়? আমার কানাইয়ের যদি সাত বেটা হয়। তারা খাবে কি?

—এখন দাদা আমাদের দেখ্ছে, তখন জগা, বলা তাদের দেখবে। ধর্ম কথা।

ঠাকুমা হঠাৎ বলেছিল। ধানও পাচ্ছিস। বেচে জমিও কিনছিস। ক-বছর তো হল। এখন খোরাকি ধান নিস কেন? সেটা কি ধর্ম হয়?

—দোরগোড়ে ডেকে এনে বসালি কেন? থাকতাম সেখানে পড়ে, বাঘে খেলে খেত?

বড়পিসি নাচতে শুরু করেছিল।

ঠাকুমাও হার মানবার নয়। সেও নেমেছিল উঠোনে হাতে ঝাঁটা নিয়ে।

—কর্তব্য কাজ করেছি, আবার গালমন্দিও খাব?

—জমি তুই দিবি। নইলে আমি আত্মঘাতী হব।

—আত্মঘাতী হবি তো হ।

মা-মেয়ের বিবাদে কাক চিল ওড়ে। গৌরদাসী একবার শাশুড়িকে ধরে, একবার ননদকে। কিন্তু গ্রামের জীবনে এ রকম প্রচণ্ড ঝগড়ার দাম অনেক। ঝগড়া শুরু হলে তা চলতে থাকে।

গৌরদাসী ননদের ঠেলা খেয়ে ঘুরে পড়ে, ও দাওয়ার সিঁড়ির ইটে ইটে কাদায় সিঁড়ি পুরন্দ গেঁথেছিল মাথা ঠুকে মাথা কাটে। রক্ত দেখে ননী হাহাকার করে কাঁদে ও কুড়ানি 'মাকে বড়পিসি মেরে ফেলল' বলে দৌড়য় বাবাকে ডাকতে। পুরন্দ, কানাই জগা ও বলা সবাই এসে পড়ে।

জগা ও বলা তাদের মাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। পাঁচু পিসি এসে না পড়লে মাকে মাথায় জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে দুর্বো ছেঁচে দিত না কেউ। ঠাকুমা তখনো 'দূর হ ভাতারখাকি' বলে উদ্দাম নাচছিল। কানাই জোয়ান ছেলে। ঠাকুমাকে পাঁজাকোলা করে চেপে ধরে তবে থামায়।

ঠাকুমা বলতে থাকে, দু বাড়ির মাঝখানে মনোসা লাগাব। কাঁটার বেড়া। পুরন্দ, ওদের আর এক পালি ধানও দিবি না। জমি চায়। জমি! কিনেছে সন্ন, তুই জানতিস? এখন রিষ করছে।

—তা জানব না কেন?

—আমি জানি না আগে?

পুরন্দ প্রথমত শান্ত লোক। দ্বিতীয়ত ভরা চাষের সময়ে মাঠ ছেড়ে দৌড়ে আসতে হয়েছে বলে বড়ই অসন্তুষ্ট। উঠোনে পাক দিতে শুরু করে সে।

—জান নি তো কি হয়েছে? ওরা গতরে খেটে জমি করেছে, করবে না কেন?

—ধান নেবে কেন?

—তুমি ডেকে এনেছিলে, নয়?

—তাতে কি?

—আমাকে বলেছ, আমি এসেছি। মায়ের পেটের বোন, যা ধর্ম হয়, তা করেছি। সন্ন আসার পর তুমি আর সন্ন কানায়ের মাকে দু বেলা ছেঁচে খাচ্ছ। জমি! কেমন করে জানব ওকে দেবে বলেই ভরসা দাও নি?

—আমি ভরসা দিয়েছি?—এ কথা বললে আমি আত্মঘাতী হব।

—আত্মঘাতী তুমি হবে কেন? আমি আমার বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আত্মঘাতী হই, তোমরা মা-মেয়ে থাকো। সংসারে অশান্তি ছিল না, ডেকে আনলে।

এ সময়ে জগা এসে দাঁড়ায়।

—মামা।

—তুমি আবার কেন?

—চলো, মাঠে চলো। তোমার জমি চাই না মামা, মা যা বলুক, চলো।

পাঁচু পিসি বলেছিল, তার আগে একটা গরুর গাড়ি জোগাড় কর, বউয়ের রক্ত বন্ধ হয় নি, বড়ঙ্গে নিতে হবে।

ঠাকুমা চেঁচাচ্ছিল, খুন করেছে সন্ন। দে ওকে থানায় ধরিয়ে। লাথি মেরে বউকে ফেলে দিয়েছে।

কানাই সে সময় 'মা' বলে দৌড়ে চলে যায়, গরুর গাড়ি জোগাড় করে ও মাকে তোলে।

আর জগা ও বলা অপরাধীর মতো সঙ্গে হেঁটে যায়। পুরন্দ ও কানাই মাকে ধরে গাড়িতে বসে।

আর ঠাকুমার হাহাকার করে কান্না।

কানাই কানাই কাকে করি, ঠাকুমার চেয়ে সৎমা তার আপন হল?

একদিনেই কুড়ানি ছোট থেকে বড় হয়ে যায়।

কেন না গৌরদাসীর পেটের সন্তানটিও নষ্ট হয়। বড় পিসির সঙ্গে এ বাড়ির আড়ছাড় হয়ে যায়।

পাঁচু পিসি আসন্তি যাওন্তি।

ঠাকুমার কাছে ননীকে রেখে কুড়ানি তুলে নেয় হাঁড়ি ও হেঁসেল।

পরে কুড়ানি বুঝেছে। সেদিনই তার শৈশব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মা ফিরেছিল এক মাস বাদে রক্তশূন্য শীর্ণ হয়ে। কানাই গেঁড়ি-গুগলি-মাছ এনে দিত। মা খাবে, মার দেহে রক্ত নেই। পুরন্দ হতাশ চোখে বসে থাকত সন্ধ্যে বেলা। ঠাকুমা বলত, বেটাছেলে নোস তুই?

—তুমি থামবে?

—একটা বউ চলে গেল, তাতে মরেছিলি? আরেকটা বউ এল, তা সত্যি ব্যামো না নেকামো কে জানে! মরলে মরবে, আবার বিয়ে হবে।

কানাই সেদিন প্রথম বিদ্রোহ করে।

—মাকে অমন বেঁকিয়ে মান্য দিও না।

—ওঃ, সৎমার জন্যে এসে গেলি?

—সৎমা হলেও মায়ের বাড়া। যে বাড়িতে মায়ের অপমান, সে বাড়ি ছেড়ে চলেই যাব।

ঠাকুমা কেঁদে বাঁচে নি।

—তোর মায়ের রোগ, তা আমি ঘরের পাট করি না? বাটনা বেটে দিই না? ক্ষার কাচি না?

বড়পিসি কি নির্বাক, কি নির্মোহ।

—তোমার মেয়ে এখন রা কাড়ে না কেন? অমানুষ বই তো নয়। আমাদেরটা খেয়ে মেখে আমার মাকে খুন করতে গিয়েছিল। তোমার উশকানি পেয়েই তো!

সেই থেকে দুর্দিন শুরু।

হালের গরু সাপে কাটল, সংসারও বিশৃঙ্খল। দিশাহারা পুরন্দ এক বিঘা জমি বেচে বসল।

ঠাকুমার কি হাহাকার।

—বাপোতি পেয়েছিলি, বেচে দিলি। নিজের হেকমতে পারবি জমি কিনতে?

—পারলে পারব, না পারলে পারব না। এর মধ্যেই মা একদিন উঠে নীরবে হেঁসেলের ভার নিয়েছিল।

আর মা উঠতেই ঠাকুমা বিছানা নেয়। জ্বর থেকে শোথ। তারপর গা ফুলে যায়।

বড়পিসি, জগা, বলা, কেউ দেখত না।

ঠাকুমার সেবাযত্ন, সব মা করেছে।

এতকালে এই প্রথম ঠাকুমা বলত, বউ নয় মেয়ে, মেয়ে তুই। এই যে পড়ে আছি, কে বা দেখল?

মা মুখ বুজে ঠাকুমার গু-মুত কাড়ত, কাপড় কাচত। আর কুড়ানি নিয়ে যেত কাঁথা, মশারি, চাদর নদীর ঘাটে।

ততদিনে তারও বয়স বেড়েছে। নদীর হা হা বাতাসে চুল শুকোতে শুকোতে কুড়ানি ভাবত, তেরো বছর হয়ে গেল, দাদার বয়স কুড়ি একুশ হবে। বাবা দাদার বিয়ের কথাও ভাবে না। আমার বিয়ের কথাও ভাবে না, আমি কি আইবুড়ী থাকব?

সোডার জলে কাঁথা মশারি কেচে নদীর বহতা জলে ধুত কুড়ানি। চেটাল পাথরে মেলে দিত। তারপর বেশ করে স্নান করে নিজের কাপড় কাচত, মেলে দিত।

ননীকে বলত, এখানে ছায়ায় বোস, নজর রাখবি। খেলে বেড়াবি না। তাইলে মেরে হাত ভেঙে দেব।

ঘাস কেটে কেটে খড়ের দড়িতে বাঁধত কুড়ানি।

তারপর শুকনো হোক, আধা শুকনো হোক, মশারি কাঁথা নিত ঝাঁকায়, ঘাসের বোঝা দড়ি ধরে টানত, ননী সঙ্গে সঙ্গে চলত।

সংসারে সবাই ধরেই নিয়েছিল কুড়ানি অসুমার খাটবে, সংসারটি বেঁধে তোলার কাজে হাত লাগাবে।

সে সময়েই একদিন সাইকেল চেপে চলে এসেছিল মুখুজ্জেবাবুর সেজো ছেলে। যার নামটি বেশ, কমল। শিউড়ি কলেজে কয়েকবার পড়ায় ফেল। বাপ বলল, হেলে গরু কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়, না যেতে পারে? কপালে রয়েছে চাষবাস, তাই কর্‌গা যা।

মকরন্দপুরের এটাই বৈশিষ্ট্য। কি পুরন্দরা, কি বাবুরা, লেখাপড়ার ধার ধারবে না, চাকরির দিকে যাবে না, জমিতে স্যালো বসিয়ে বড় জোর চাষ বাড়াবে। কিন্তু বাপোতি-রায়তি ভাগ জমির ভরসায় বংশবৃদ্ধি করবে।

একমাত্র সুবল গড়াই ব্লকে কেরানি।

এককালে, মাওড়া ছেলে গৌরদাসীর দুধ খেয়েছিল, কুড়ানির জন্মের পাঁচ বছর আগে গৌরদাসীর যখন একটা মেয়ে দু' মাসে মরে। দুধেল গাই না দোয়ালে যেমন হয়, গৌরদাসীর তখন সেই অবস্থা।

সুবলের বাপ নতুন কাপড়, চাল-পান-সুপারি-তেল-হলুদের সিধা দিয়ে গৌরদাসীকে বলে, এক বছুরে ছেলে। দুধ দাও।

মকরন্দপুরে ছেলে পিলে মায়ের দুধ তিন চার বছর অবধি খায়। সুবলও খেয়েছিল। তা অবস্থার পার্থক্য বিস্তর হলেও এখনো সুবল বলে 'ধর্ম মা' আর গৌরদাসী বলে 'ছেলে'। মা-ছেলে সুবাদে কানাই সুবলের দাদা, কুড়ানি আর ননী বোন।

সুবলই এ গ্রামকে খানিক টেনে আনল বর্তমান সময়ের কাছে। সুবলই বলে যেত, গেরস্তরা ডোমপাড়ায় ঘুরবে, মেয়েদের সাথে মশকরা করবে, এ সব বন্ধ করতে হবে।

পুরন্দকে বলত, জমি আর জমি। এখন তোমার জমিতে মেয়েদেরও সমান ভাগ। জমির ভরসায় থেকো না কাকা। কালনেমির লঙ্কা ভাগ হয়ে যাক।

—তবে কি করব?

—দাদা তো খানিক পড়তে জানে। ওকে দাও, চেষ্টা করলে চাকরি ওর হয়ে যাবে।

পুরন্দ মাথা নাড়ত।

—মেয়ে বড় হচ্ছে, আমি যাব মাঠে, ও যাবে কাজে, এরা সব অরক্ষো হয়ে যায় সুবল। আর মায়ের বুদ্ধিতে দোরগোড়ে বিষ আঁচড়ার গাছ বই তো নয়। সন্ন তোর মাকে আবার মারবে না বিশ্বাস কি?

—নয় জমি বাড়াও।

—আর না সুবল! বাপতি জমি আমি নিয়েও আসি নি। নিয়েও যাব না।

—জমি বেচলে, কিনল ওই মুখজ্জেরা।

—তখন খুব দুঃসময়।

—সন্ন পিসিকে আর কিছু করতে হচ্ছে না। এখন আমি মাথা দিচ্ছি। গ্রামে ক্লাব করব, ছেলেরা বসবে। ক্যারাম খেলবে, মাঠেও খেলাধুলো করবে। গ্রামে গোলমাল বাধলে আমরা ফয়সালা করব।

—দেখা!

—দাদাকেও থাকতে হবে।

—কখন যায় সে? আমার মা শুষছে, মাঠে কাজ থাকে, ঘরেও নানা কাজ।

—ঠাকুমাকে অষুদ দিচ্ছ?

—ঈশ্বর যা অষুদ পালা করে।

—টোটকার কাজ নয়।

গৌরদাসী ঈষৎ হেসে বলেছিল, তোর মাই তো রোগাভোগা বেশি। তা গ্রামে ডাক্তার বসা, হাসপাতাল কর, তবে তো বুঝি। করলে তোরা করবি, আমরা তো পারব না।

—তা বললে হয়? এখন সবাই সমান।

—না ছেলে। হাতের আঙুল পায়ের আঙুল সমান হয় না। তোদের সঙ্গে আমরা সমান?

—দিন বদলে যাবে গো মা। তবে কি, পাশের গ্রামে ইস্কুল, বাবুদের ঘরেও ওই খানিক পড়ে সাঙ্গ আর তোমাদের ঘরে দাদা যা শিখল, ঈশ্বর কাকার নাতিটা, মেয়েদেরও পড়তে হবে।

—বড়টার তো বিয়ে দিতে হবে। ছোটটা

—বিয়ে? কুড়ানির বয়স কত হল?

—তেরো হয়ে গেল।

—আরো বড়ো হোক?

—আর ছেলে...ওদের ঠাকুমাকে যদি দেখিয়ে দিতিস ডাক্তার এনে...আমরা যেমন জানি তেমন করছি। এদিকে বড় মেয়ে তো দিকে দিকে ঢোল দিচ্ছে যে বিনে চিকিচ্ছেয় আমার মাকে মেরে ফেলছে। ননদদের সবাইকে চিঠি লিখে জানাচ্ছে।

—এত বড় কথা? কাকা এনেছে বলে আমরা বসতে দিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে শত্তুরতা করে তো জগা বলা সুদ্ধ সন্ন পিসিকে তুলে দেব।

সন্ন ওদিক থেকে বলেছিল, কিসের জোরে?

—মাটি বাপের নয়, দাপের। আমি যদি পেছনে লাগি তাহলে দেখবে কিসের জোরে।

—তোমরা বড়লোক। সব করতে পারো।

—পারি পারি সন্ন পিসি, এখন সময় পালটাচ্ছে। বড়লোকের মতো চললে তোমার ছেলেদের জমি কিনতে হত না। কে মধ্যস্থ করেছিল মনে রেখো। আমার সঙ্গে বেইমানিও সইব না। কাকার সঙ্গে লাগলেও সইব না।

জগা ছুটে এসেছিল।

—মা। তোর জন্যে আমরা কি উচ্ছেদ হব? দাঁতের খিয়ে বাবাকে মারলি, সেখানেও লঙ্কাকাণ্ড করলি, আবার এখানেও? জমি বেচে আমরা চলে গেলে দাঁত ধুয়ে খাস। মা নয়তো রাক্ষসী।

ঠাকুমা কাঁদতে শুরু করেছিল।

—অ সুবলা ডাক্তার ডেকে দেখা বাপ। সেরে উঠে সন্নব গুষ্টিকে তাড়াই।

গৌরদাসী ঠাকুমার মুখে হাত চাপা দিয়েছিল।

—এমনকথা কেউ বলে? চুপ করো তো।

—বউ নোস, তুই মেয়ে।

—বুঝেছি চুপ করো।

—বড় কষ্ট দিয়েছি।

—চুপ করো এখন।

সুবল কিন্তু সাইকেলে চাপিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তার দেখে শুনে বলল, কি গো, বাঁচতে খুব ইচ্ছে?

—খুব ইচ্ছে।

—কেন গো, কি জন্যে?

—কানায়ের বউ দেখব।

—বউকে দেবে কি?

—হীরে, সোনা, নানা নিধি। ডাক্তার—

—বল গো।

ধম্মঠাকুর থানে উঠবে। পাঁঠা মানসা করেছিলাম। দেখে জেনে মরতে চাই।

দেখি, তোমার এত ইচ্ছে।

বেরিয়ে এসে ডাক্তার বলেছিল, চোত বোশেখের ভরসা করি না। তবে নাতির বিয়ে দেখতে চায়...

গৌরদাসী বলেছিল, কেমন দেখলেন বাবা?

—ওষুধ দিচ্ছি। আর সেদ্দ মেদ্দ খেতে দিও, মুড়ির ভাত! নানা রোগে ধরে গেছে। বয়স কত হবে?

পুরন্দ মাথা চুলকোয়, সুবলের দিকে তাকায়।

—বয়স কে জানে বাবু! আমি যে বৎসর জম্মাই, মায়ের প্রথম সন্তান বটি। সেবারেই কালী নদীতে পেল্লায় বান, পুল হচ্ছিল, ভেসে চলে যায়। অনেক ক্ষতি হয়।

সুবল হাসে।

—আমার বাবা আর পুরন্দ কাকা চারদিন আগে পিছে, তা বাবার হল পঞ্চান্ন।

ঠাকুমা ঘর থেকে বলে, পুরন্দ বড়। এই মঙ্গলে পুরন্দ, পরের শনিবারে তোর বাপ হল।

—ওই হল। তা পল্লীগ্রামের ব্যাপার। ঠাকুমার সত্তর বাহাত্তরই হবে। বড় জোর পঁচাত্তর।

ডাক্তার প্রত্যেকের সকল কথাতেই মাথা নেড়ে চলে। যেন এগুলি বড়ই গুরুতর প্রশ্ন।

—যা চায়, করো। আর এটা খুব ভালো যে দেহে, যাকে বলে, বেডসোর হয়নি।

সুবল বলে, মা খুব পরিষ্কার রাখে।

—গা মুছে পাউডার দিলে...

কুড়ানিদের বাড়িতে সেই প্রথম হিমানী ট্যালকম পাউডার প্রবেশ। সুবল একটা কিনে দিয়েছিল। একটি রবার ক্লথ।

গৌরদাসী হেসে কেঁদে বাঁচে না।

—দেখ! কেমন রবার কিনে দিল ছেলে। এর ওপর কালি দিলে তা নষ্ট হবে, কেচে দেব। কাঁথা নষ্ট হবে না। আর গা মুখে পাউডার মাখালে কেমন গন্ধ!

পাউডারের গন্ধ শুঁকেই যেন ঠাকমা ভালো হয়ে ওঠে। অন্তত আনন্দ পায় খুব। আর একটি রোদ ঝলমল দিনে, দাওয়ার কোণে আগড়ের ঘর থেকে কানাই ঠাকমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে উঠোনে বসায়।

বাপকে বলে, সাপটে ধরে থাকো। মাথার চুলের বংশ কেটে নিকেশ করি। তা বাদে মাথা ধুই। মাথা ঠাণ্ডা করে গা মুছিয়ে তুলে শোয়াই।

কুড়ানি আর পান্না অবাক।

ঠাকমার পাকা চুলের বোঝা কেটে দাদা মুড়ো করে দেয়। পাঁচু পিসির সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে ঠাকমার মাথা চার পয়সার কার্বলিক সাবানে ধোয়ানো হয়। সর্বাঙ্গ মুছে দেয় পিসি।

ঠাকমা বলে, আঃ! কি আরাম! খুব আরাম হল কানাই। দেহ যেন পগাড় হয়ে গিয়েছিল মা!

বলেছিল, আবার শীত পড়লে তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দিবি তো? তোর মা পারে না। কি করল সন্ন!

হ্যাঁ, সেই সন্তান নষ্ট হল। না কি ফুল ওপরে উঠে গিয়েছিল। সেই থেকেই মা আর ভারী কাজ করতে পারত না। সে সময়ে কুড়ানি ছোট্ট, অত বুঝত না। দাদা কিন্তু মায়ের কাপড় কাচা, মাকে সেবা করা, মেয়েছেলের কাজ করেছিল।

সেদিন ঠাকমা কি খুশি, কি খুশি। হোমিওপ্যাথি ওষুধে কতটা ভালো হচ্ছিল কে জানে। কিন্তু মকরন্দপুরে খুব রটে যায় যে পুরন্দর মাকে ডাক্তার দেখছে, পুরন্দর মা রবারে শুচ্ছে, গায়ে পাউডার মাখছে।

যে সব কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি।

পুকুরঘাটে একদিন সে কি কাণ্ড!

গ্রামের বিখ্যাত কোঁদলানি, ঈশ্বরের বউ বলল, কি রে সন্ন!

দশদিন চোরের, একদিন সাধুর। খুব যে রটনা দিয়েছিলি তোর দাদা বউদি অচিকিৎসায় মাকে মেরে ফেলছে। এখন কি হল? ডাক্তার, ওষুধ, পাউডার, ছেলে আর নাতি মাথা ধোয়াচ্ছে, বউ গু-মুত কাড়ছে, নাতনি কাঁথা কাচছে।

—সেটা কর্তব্য!

তুই হলি বিষ আঁচড়া। এই যে মা তোকে এনে বসাল, দাদা তোদের ভাত দিল, ছেলেদের দাঁড় করাল। তুমি তোমার মাকে এক ঘটি জল দিয়ে সেবা করলে কোনো দিন?

—বউ আছে, করছে।

—বউদিকে তো খুন করতে গিয়েছিলে। আমার স্বামী হলে অমন বোনকে লাথ মেরে তাড়াত।

বড়পিসি চুপ।

এবারে এসো ধান রাখতে, রাখাব!

সমাজপতি ঈশ্বরের বউ সগর্বে বড়পিসির মুখটি চুন করে দিয়ে স্নান করে উঠে যায়। মুখ নিচু করে ঘটি মাজতে মাজতে কুড়ানির খুব আনন্দ হয়েছিল।

আর তার ক' দিন বাদেই কালী নদীর ধারে ঠাকমার কাঁথা নেতা কেচে শুকোতে দিয়ে কুড়ানি যখন ঘাস কাটছে, তখন মুখুজ্জেদের কমল সাইকেল থামিয়েছিল।

—কি রে, বড় হয়ে গেলি?

—সরো, পথ ছাড়ো।

—রোজ তোকে দেখি, জানিস?

—সরবে?

—কি সুন্দর না হয়েছিস!

—হ্যাঁ, বাবুরা আমাদের সুন্দরই দেখে।

—কেন, সুবল যায় না?

—এই, সে আমার ধর্মভাই।

—আর আমি?

—সুবল দাদাকে বলতে হচ্ছে।

—বলিস, তাকে আমি ভয় পাই না।

কুড়ানি হঠাৎ একটা হলহলে সাপের লেজ ধরে কমলের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিল।

'বাপ রে, মা রে' বলতে বলতে কমল সাইকেল চালিয়ে পালায়।

আবার মশকরা করতে এলে জাত সাপ ছুঁড়ে মারব মনে থাকে যেন!

ঘরে এসে কুড়ানি এ কথা কাউকে বলে নি। ননী বলে দেয়।

মা বলেছিল, দরকার কি? সে যা বলার বলে যাক। তুই চুপ করে থাকবি। বোবার শত্তুর নেই।

—ইশ! চুপ করে থাকব।

—বাবুদের ছেলেরা তো চিরকাল...

—এখন থেকে পিসিকে নিয়ে যাব।

—পুকুর কাচা তো চলে না।

—ওই ময়লা পুকুরে কাচতে দেবে কে?

গৌরদাসী দেখেছিল মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস ফেলে বলেছিল। কপালে থাকে তো দাদার পরেই তোর বিয়ে দেব। কিন্তু কানাইয়ের বউ না দেখলে...

বাড়িতে সবাই বুঝতে পারছিল, ঠাকমা থাকার নয়। ঠাকমা নিজেই একদিন বলল, বউ, পুরন্দকে ডাক।

—কুড়ানি, বাপকে ডাক তো।

—বাবা গরু বাঁধছে।

—বেঁধে আসুক।

—ওষুধ আনতে যাবে।

—পরে যাবে।

কালো গাইটির বাঁটে ঘা। গ্রামে গোবদ্যি খুঁজতে যেতে হয় নদীর ওপারে সাঁওতালপাড়া। ভব সরেন অব্যর্থ পশু কবিরাজ। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, সব পশুপাখির চিকিৎসা করে থাকে। খুব কম কথার মানুষ। এ অঞ্চলে ওর পসার আছে। পুরন্দ এসে দাঁড়াল।

—ভবের ফর্দা ফটকিরি, ঘি, মোম, সবেদা, সব দিয়ে এসেছি। মলমটা আনব।

ঠাকমা চোখ বুজে বলল, নিমপাতা সিজো, উষ্ণ জলে বাঁট ধুয়ে দে।

—দিয়েছি, মলম না দিলে হবে না।

—পুরন্দ।

—কি, মা?

—খুব কষ্ট পুরন্দ...এ দেহে আর বাস করতে প্রাণ চায় না। দেহ গেছে, নিজের নিশ্বাসে এমন দুর্গন্ধ, বেঁচে আছি। তোদের কষ্ট দিচ্ছি।

—নাও, এই কথা বলতে ডাকলে?

—কানাইয়ের বিয়েটা দেখে যাই। নইলে যেন মরতে পারছি না। কুড়ানির বর দেখা হবে না।

—ধান ঘরে উঠুক।

—এ বছর ধান কেমন?

—ভালই।

—গুড় পাবি? আলু পাবি?

—তা পাব। কানাই আর আমি তো...

—আগে হলে...কত সোনাদানা দিতাম...

—সোনাদানা কবে ছিল মা?

ঠাকমা বিরক্ত হয়ে যায়।

ছিল...ছিল...আমার তখন বিয়ে হয় নি...শাল নদীর বানে বামুনপাড়া ডুবে যায়...সে জামবোনাতে...গেরস্তরা ঘর ছেড়ে পালায়...সে সব বাড়ির ভিত থেকে মানুষ কত কি পায়...

—আমার বাবা সোনাদানা পেয়েছিল। আমাকেও সোনার মুড়কি দেয় গলায়। তাই বেচেই তোর বাপ ওই খালা জমি কেনে। সবাই বলে, খালা জমি। কিন্তু সে জমি দিনে দিনে...বিয়ে দে! কানাই মুখ গোমরে থাকে।

—দেব। মেয়ে তো পাঁচু দেখেছে।

ঠাকমা বলে, না। সেই যে সেদিনে আমাকে শাঁকালু থেঁতো করে খাইয়ে গেল, সেই বেড়ালচোখা মেয়েটা...ঈশ্বরের ভাইঝি...কানায়ের পছন্দ!

—কেমন করে জানছ?

—ক-দিন এল। কানাই আর ও চোখে চোখে হাসে। আমি দেখেই বুঝেছি।

খবরটি সকলকে বড় বিমর্ষ করে।

পাঁচু পিসি বলে, ধাতিং ধাতিং চলে...

—সে তো তুই চলিস।

—মামি! ডিং মেরে চলি, মানছি, নেয্য কথা। কিন্তু তাতে আমার কপালখানা ভালো হয়েছে?

—মনোমিল! কি বলবে?

—ধাতিং ধাতিং চলে, দাঁত চেরণদাঁতি, পিংলা চোখ, সর্বাঙ্গে লোম। খনার বচন বলছে, কুলক্ষণা মেয়ে। সলাদানার ভীমের মেয়ে ভোমরার সকল ভালো।

গৌরদাসী বলে, বীণা সে জন্যেই আসছে যাচ্ছে। ওর মা আসে একবার, তো ও পাঁচবার।

গ্রামে গ্রামে এ বার্তাও রটে গেছে যে পুরন্দর মা আর বাঁচবে না।

স্বজাতির এ-ঘর ও-ঘর থেকে এ-ও এটাসেটা খাইয়ে যাচ্ছে বুড়িকে। এ সব নিয়ম তখনো ছিল।

অথচ কুড়ানির মা যখন শয্যাগত, পরিবারের অন্ন নেই, তখন গ্রামসমাজ কত বদলে যায়।

মাকে কেউ একমুঠ দেয়নি।

মা খেতই একমুঠো। নাড়ি শুকিয়ে গিয়েছিল।

তা, গৌরদাসী আড়ালে কানাইকে ডেকে গায়ে হাত রেখে বলে, সলাদানার মেয়ে দেখব, তা মকরন্দপুরের মেয়ে?

কানাই মাটিতে মিশে গিয়ে বলে, গ্রামে গ্রামেই তো ভালো মা। দূরে যেয়ে কি হবে?

দাদার কোমর সরু, কাঁধ চওড়া, চোখ ছোট, নাক চাপা, কোঁকড়া চুল। গৌরদাসীর চোখে তার ছেলে রাজপুত্র।

—সলাদানার মেয়ে সুলক্ষণা। বীণা তো...

কানাই চুপ।

—বুঝেছি। তা ভোমরাকে দেখেছিস?

—দেখেছিলাম, পিসি দেখিয়েছিল।

—পছন্দ হল না?

—বিয়ে না করলে বা কি হয়?

—থাক। তুই সুখী হলেই ভালো।

কানাই মুখ নিচু করেই বলেছিল, বদনের বোনও খাটে পেটে। আর তুমি তো তেমন পারো না। কুড়ানিও যাবে পরের ঘরে। তখনকার কথা ভেবে...

পাঁচু পিসির মুখ ছোট হয় খুব। ভীমকে সে ঠারেঠোরে বলেছিল যে কানাইয়ের হাতে ভোমরাকে দেবে ভীম।

—ওরা আমার কোনো কথায় 'না' বলে না। আমার বলাই ওদের বলা ধরে নাও।

ভীম ধীর স্থির মানুষ।

দেখ, অনেক কথা নইলে বিয়ে হয় না। যদি অল্প কথায় বিয়ে হয়, সে আমার ভাগ্য।

কুড়ানি তো তখন অবাক।

বীণা তার চেয়ে খানিক বড়ো। পনেরোয় পড়েছে। চেহারায় বয়সের ঢলঢলানি ছাড়া কিছু নেই।

দাদা কি দেখে মুগ্ধ হল?

পুরন্দ পাঁচুপিসি, মা খুব ভাবনায় পড়ে।

ঈশ্বর সিং যেমন, তার বৈমাত্র্য ভাই ভুবন একেবারে তেমন নয়। নিজের জমি এক বিঘাও নেই। বারো মাস উঞ্ছবৃত্তি। আর ভুবনের মেজাজ যেমন। মারামারি বাঁধাতেও তেমন। বদন বার দুই জেল ঘুরে এসেছে ধানচুরির মামলায়।

তবে হ্যাঁ, বাড়ির মেয়েরা খাটে পেটে। ভুবনের বউ, ভুবনের মেয়েরা, অন্যের মাঠে ধান রোয়, নিড়ান দেয়, মাটি কাটতে যায়। পরের ধান নিকোয়।

ভুবন ও বদন মদ খায় খুব।

আজ বিয়ে হলে কাল থেকে ধান রে, চাল রে, চাইতে থাকবে। সাধে কি ঈশ্বর সম্পর্ক রাখে না?

গৌরদাসী বলে, বড় ঠাকুরঝির সঙ্গে মেয়ের মায়ের খুব ভাব।

পাঁচু পিসি বলে, তাই বলো। গ্রামে কম জনা বুড়ো হয়ে মরল না। কই কখনো তো দেখিনি ভুবনের বউ কোথাও এটা সেটা পাঠায়। নিজে পায় না, পাঠাবে কোত্থেকে?

—হ্যাঁ, কচুশাক, চ্যাং মাছের ঝোল, শাঁকালু থেঁতো, কয়েক বারই এল বটে।

—এ বিয়ে ভালো হবে না। কানাই শান্ত ছেলে, ওর ঘাড় ভেঙে যাবে।

—কিন্তু সে তো বলে অন্যত্তর বিয়ে করবে না।

পাঁচু পিসির রাগ হয়েছিল।

—কি এমন ভালোবাসা হল, যে অন্যত্তর বিয়ে করবে না? নিশ্চয় মন্তর করেছে বীণার মা। নবকাশীর মেয়ে। ও মন্তর তন্তর জানে। নানা বিদ্যেবতী।

—দেখ।

আলোচনা বন্ধ করে দিল ননী।

—ও মা! ও পিসি! দাদা দড়ি নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। তোমাদের কথা শুনতে শুনতে দৌড়ল।

—সে কি কথা?

গৌরদাসী ঢলে পড়ে। পুরন্দ, কুড়ানি দৌড়য়। পাঁচু পিসি ডিং মেরে দৌড়য় আর চেঁচাতে থাকে, অ কানাই। যা চাইছিলি তা হবে। ও কাজ করিস না। কানাই পিছন ফিরে কি বলে, আবার দৌড়য়।

দেখ, দেখ ছেলে বুঝি নদীর ধারে যেয়ে সাঁইবাবলা গাছেই ঝুলে পড়ে, নয় কুয়োতে ঝাঁপ দেয়।

তীর বেগে দৌড়ে কুড়ানি এগিয়ে যায়। কিন্তু দাদা নেমে যায় নদীর বুকে।

কুড়ানি কাঁদতে থাকে। পুরন্দ কপাল চাপড়ায়। পাঁচু পিসি চেঁচিয়ে চলে, যা চাস তাই হবে, ও কাজ করিস না।

দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে কালীর বাছুরটিকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসে। বাপকে বলে, জানো ও কি বজ্জাত? দড়ি খুলে রাখে?

কুড়ানি পরে শত দুঃখেও সেদিনের কথা যত ভেবেছে তত হেসেছে।

কুড়ানি বলেছিল, অ দাদা! আমরা ভেবেছি, বীণার সঙ্গে বিয়ে দেব না বলে তুই গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিস। সে জন্যে আমরা ছুটছিলাম।

নে, ধর।

কুড়ানিকে বাছুরের দড়ি ধরিয়ে দিয়ে কানাই সবার পিছনে মুখ নিচু করে চলতে থাকে।

পাঁচু পিসি বলে, বাপের সামনে আকাশ মাটি সাক্ষী রেখে বললাম, যা চাস তাই হবে। এখন তো এ বিয়ে দিতেই হয়। আর 'না' বলা চলে না।

সেই বিয়েই হয়।

কুড়ানি কালীর বাছুরকে লাল সুতোর গাছি মালা পরিয়ে দেয়। আর নদীর ঘাটে ডাকে বীণাকে।

বেড়ালচোখী।

শেয়ালচোখী!

চেরণদাঁতী!

ইঁদুরদাঁতী!

দাদাকে বিয়ে করবি তো, ঘটককে যত্ন করিস, ঘাস খাওয়াস মা গো! কালীর বাছুর ঘটকালি করল।

দুজনেই হেসেছিল।

বীণা ধপাধপ কাঁথা কেচে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, তোর মা বাবা খুশি নয়, তাই না?

—জানি না।

—ভোমরা তো অনেক ভালো।

—দাদার চোখে তুই!

—আমার কি দেখ, বিয়ে হলেই হল। বাড়িতে এই চেঁচামেচি, নিত্য অশান্তি, যে বিয়ে করবে, তার সঙ্গেই চলে যাব।

দেখ! দাদা ভালবেসে মরেছে, বীণা কি তত ভালবাসে?

দাদা কেন, যাকে হয় বিয়ে করতে পারে?

—তবে বিয়ের পর আমার মা নিত্য মাগন মাগতে যাবে, তা যেন না ভাবে কেউ। আমি ঢুকতে দেব না।

—মা কাউকে 'না' বলতে পারে না।

—অত ভালোর ভাত মেলে না ভাই।

বীণার পিঙ্গল চোখে রোদ ঝকমক করে।

—তার সব ভালো যার শেষ ভালো। এই যে তোর মা মুখ বুজে থাকত, আর ঠাকমা

তোর পিসিরে আনত, মাখত, খাওয়াত, যাবার কালে একে ঘটি, তাকে বাটি দিত, তাতে কোন ভালোটা হল? পিসিরা তোর মাকে দেখল, না ঠাকমাকে?

—ঠাকমা শাউড়ি, মা কি বলতে পারে? বললে বলত, তুমি পরের ঘরের মেয়ে, কথা কও কেন?

—শাউড়ির অনেক কাজ সইতে হবে?

—আমার মা তোকে অনেয্য কাজ সইতে বলবে না। মা কি মানুষ! দাদা যে সৎ ছেলে, দাদাও জানে নি। আজও মা 'সৎ' কথা শুনতে পারে না। আমার মা বাবুদেব ঘরে জন্মালে ধন্য ধন্য করত সবাই, ডোম ঘরে নাম পেল না।

—বাবুদের কথা থাক। যেমন ঘর, তেমন চালে চলতে হয়। এই যে সন্ন পিসিকে এত দেখল তোর মা, তার লাথি খেয়েই দেহটা গেল তো! ভালো হয়ে কি হল?

—তুই শেখাস মাকে।

—আমি ভাই, নিজের শ্বশুর শাউড়ি, নিজের ননদ, তাব বাইরে কারুক্কে দেখব না। আমার মা তো বলে, ননীর মা করেও মরে, নামও পায় না। আমি করবও না। নামের আহিংকেও নেই। মরে মরে পরের করব কেন?

—আমার মা তেমন হলে দাদাও বাঁচত না, সুবলদাদাও ধর্ম ছেলে হত না, বল?

—সে তো জানি। কিন্তু ভালো মানুষের এমন ভাগ্য দেখে ভাই রাগ হয়ে যায়।

—দাদাকে যেন বলিস না। সে 'মা' বলে...

বীণা হেসেছিল।

—আমি তেমন মেয়ে নই, পারুলকে দেখছিস না? বরকে বশ করল, ভিন্ন হল, আপন মা, আপন ভাই সবাইকে ভুলে গেল বর।

—সেটা কি ভালো?

—পারুল তো সুখে আছে। বর পিওনের চাকরি করে, আবার জমিজমা করেছে, শুনেছি খুব সুখ।

কুড়ানির মন বলেছিল, বীণা বউ হয়ে এলে অশান্তি বাধবে সংসারে। কি সব স্বার্থপর কথা!

—নে, আমসি খা। ভাবিস না। আমি কোনো অশান্তি কবব না। বরাবর তো খেটে আনছি, তবে খাচ্ছি। কথা অমনি তেতো হয়ে যায়। তোদের মা কত ভালোবাসে তোদের। আমার মা?

—হ্যাঁ রে, তোর মা নাকি মন্তর জানে?

—ছাই জানে।

—দাদার সঙ্গে ভাবটা করলি কখন?

—বলব কেন?

বীণা হেসে হেসে চলে যায়।

—যাই ভাই। পাল বাড়ি পাট কাজ বাকি। ও বাড়িতে জানিস তো। গিন্নির শুচি বাই। রোজ এক বালতি কাচব, বউ গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে নেবে। বুড়ি মরেও না।

ওই খরখরি টরটরি বীণাই বউ হয়ে এল অঘ্রাণ মাসে। বিয়ের সময়ে এল দুই পিসি, অন্ন আর মান্নো।

অন্ন বলল, কুড়ানি যে বড় হয়ে গেল গো বউদি! আমার ভাসুরপো লবর সঙ্গে মানাবে। বলব?

—দাদাকে বলো।

—মার কাছে যাও কি করে, গন্ধ লাগে না?

—আমার সয়ে গেছে।

মেজ আর সেজ পিসি মানুষ মন্দ নয়। কেমন চাল ভানল, চিড়ে কুটল, মুড়ি ভাজল। কুড়ানিদের নিজের ঘরে আর ওপরের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘর বাড়ানো হল। সেজপিসি দাদার ঘরের দেয়াল নিকিয়ে বড় বড় পদ্ম ফুল আঁকল খড়ির গোলা দিয়ে।

মেজপিসি মাকে "সরো সরো" বলে হেঁসেলের ভার নিল।

আর মা বড়পিসিকে হাত ধরে নিয়ে এল।

জগা বলা এখানে খাটছে খাচ্ছে। তুমি কেন নিজের জন্যে রাঁধবে? তুমি হলে বড় পিসি। কানাই তোমার একটা ছেলে, তাই ভাব না কেন?

জগা বলল, আসবে মামি, আসবে। মা বোঝে আমার কথা। তোমার মিষ্টি কথা বোঝে না।

—জগা, মায়ের সঙ্গে ও কেমন কথা?

—যেমন বলে, তেমন শুনবে।

বড় পিসি সকলকে অবাক করে দিল খেতে বসে।

—বৈশাখে জগার বিয়ে দেব। তোরা আসবি তো?

—কার সঙ্গে?

—সলাদানার ভীম সিংয়ের মেয়ে ভোমরা। বাসন দেবে, শয্যে দেবে, জগাকে আংটি দেবে, মেয়েকে পাঁচ ভরি রুপো। গেরস্তের মত গেরস্ত বটে। সাজানো সংসার। মেয়ের দাদার জন্যেও মেয়ে খুঁজছে, আমি বললাম মেয়ের খোঁজ জানি না।

—কুড়ানির কথা বলতে পারতিস?

—না বাপু। কানাইয়ের সঙ্গে ভোমরার বিয়ের কথা পাঁচু দিদি বলেছিল। সে বিয়ে তো হল না। সেখানে কানাইয়ের বোনের কথা বলা যায়?

পাঁচু পিসি বলল, জগার ভাগ্যি ভালো।

—ভাগ্যি আবার কি? দেখে শুনে নিতে হয়। ঘর দেখব। বাপ মা দেখব, মেয়ের লক্ষণ দেখব। না দেখে না শুনে চোর ছ্যাঁচড় নিত্য মাগন থেকে মেয়ে নেব কেন?

—অ সন্ন, পদ্মফুল পাঁকেই ফোটে। শেকড়ে পাঁক চাই, নইলে ফুল ফোটে না, সে এক কথা। ভালো ঘরের মেয়েও খুনে মেয়েমানুষ হয়, ইলমবাজারে দেখেছি। তা বাদে ছেলেমেয়ের মন বসেছে, আর কি কথা খাটে?

—আমার জগা বলা কোনো মন বসাবসিতে নেই। মা যা ধরে দেবে তবেই "হ্যাঁ" বলবে।

পাঁচু পিসি বলে, ভাত হাতে বলছি অন্ন রে, মান্নো রে! এমন চচ্চড়ি অনেকদিন খাইনি। তবে শোন তোরা। সন্ন তো সকল কথা কোনোদিন বলবে না। কানাইয়ের সঙ্গে ভোমরার বিয়ের কথা আমি বলি, সত্যি, সত্যি, সত্যি। ছেলে এদিকে মনে মনে বীণাকে ভালোবেসেছে, সত্যি, সত্যি, সত্যি। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে সন্ন আজকের দিনে হক কথাটা বলতে পারত। বড় দুঃখ হয় সন্ন, যে বলতে পারলি না।

—কেন গো, কি হল?

—পুরন্দ দাদার মনটা খুব 'কিন্তু কেমন' হয়েছিল। শেষে আমাকে বলল, চল্ দেখি যাই ভীমের ঠেঙে। সমাজের মধ্যে বিবাদ হয়ে থাকব? আর এ কথাও ঠিক, যে কানায়ের মা বারবার বলেছে, তোমরা যাও, জগার কথা বলো। বাপ নেই, মামাই এখন গাজ্জেন।

—তোমরা গেলে?

—গেলাম। দাদা এক বোতল পাকি মদ কিনল, এতগুলো ফুলুরি। ভীম তো মহাদেব! নেশায় উবুচুবু থাকে।

—তারপর?

—সে এক বিত্তান্ত বটে!

ভীম বলে, নেব কেন? কুটুম্বিতে হয় নি যখন? তোমার বাপ আমার বাপ এক সঙ্গে গোরু কিনতে যেত, তারা হাতে উলকি পরে এর নাম ওর হাতে লিখিয়ে বন্ধু হয়েছিল, মানছি।

পুরন্দ সবিস্ময়ে হাসে। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে মন তার খুবই ক্ষুণ্ণ. মায়ের কারণে মন ভারী, এমন সময়ে এ সব অতীত কথা, যা তার মনে ছিল না, তা ভীমের মুখে শুনে বড় আনন্দ হয়।

বিড়ি টেনে বলে, সে সকল কথা বলছ বলে মনে জাগছে, সংসারের তাপে রে ভাই, মনে থাকে না কিছুই। কানায়ের মার দেহ চলে না। মা শুষছে ওধারে! আর হেলো বলদটা একে তাকে দিলে কিছু টাকা পাই। সেও এক চোখে যেন ঘোলা দেখছে। সেদিন আমার হাত থেকেই পাথরের খোরাটা ভাঙল!

ভব রইতে ভাবনা কি? ঢোলা পাতার রস দিলেই চোখের ছানি কাটে। গাই বলদ যত্নের জিনিস।

—তা ভাই খুলে মেলেই বলি। বল পাঁচু।

—আমার মুখ নেই দাদার কাছে।

—ভাই ভীম! তোমার আমার সংসারে মেল হয় সে তো হতে দিল না কানাই, বুকটা ভেঙে দিল।

—আগে জানলে আমিও আশা করতাম না।

—মাপ করো ভাই। তবে তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আমার মত খাটল না এখানে। বড় আশা ছিল...

পুরন্দ চোখ মোছে।

—যাক গে! সম্বন্ধ-ই এনেছি। পুত্র না হলেও বেটার সমান, নিজের ভাগনে। খুব খাটিয়ে ছেলে। মা আর দু ভাই। সংসারে ঝামালি নেই। এসেছিল নিঃসম্বলী। ক' বছরে নিজেদের দেড় বিঘে জমি করেছে, ধান কেনে না। ভাগচাষে বছরের আলু, গুড়, সর্ষে তোলে। খুব বাঁচিয়ে চলে, আবার জমি বায়না করছে। দশ বছরে গ্রামের একটা মাথা হবে। তুমি এসে ঘর দেখ, ছেলে দেখ, গ্রামে পাঁচজনের কথা শোনো। আমার বোন একটু মেজাজি, কিন্তু হাতে পায়ে লক্ষ্মী। যদি পছন্দ হয়, তবে আগাও।

পাঁচু সগৌরবে বলল, সন্ন! সুখবর দিলি তাও নতুন কুটুমদের ঠেস দিয়ে। দাদা বউদিকেই ঠেস দিলি। যে দুজনা তিনটি বছর টানল, অত বড় ঘর তুলে দিল, জগা বলাকে পথ করে

দিল, ভোমরা বউ হবে। ঘর হাসবে। কিন্তু সে কাজও করে দিল দাদা! নইলে ভীম এ কার্যে এগোত না।

সন্ন নীরবে খেয়েছিল। তারপর হাত ধুয়ে হঠাৎ গৌরদাসীকে অবাক করে বলেছিল, বাটি ঘটি থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে বউ! সে সব মনে রাখলে চলে না।

—মনে রাখি না ভাই। নিজে তো আস নি। আমি যেয়ে হাত ধরে আনলাম।

পাঁচু মাথা নেড়ে বলল, সবাই এসে মামিকে খাইয়ে যাচ্ছে, পাশে বসে আছ, একটা দিন মা বলে...অন্ন আর মান্নো চুপ। দিদির মেজাজ তারা জানে। এর মধ্যেই বলা এক বাঁক শালপাতার থালা এনে ফেলল।

—মামি গো! বাসন মাজার কষ্ট খানিক কমালাম।

—ওঃ, মুখ যেন লাল হয়ে গেছে। বোস্ খানিক।

—ধুয়ে এনেছি একেবারে। দাঁড়াও, দইটা আনি!

জগা, বলা আর সুবলই বিয়েবাড়ি তুলে দেয়। বীণা নিজের পয়সা পাল বুড়ির কাছে জমাত। তা থেকে পিতলের ঘড়া, পিতলের থালা, বাটি, গেলাস, দানসামগ্রী আনে।

বৌভাতে বীণা সকলকে মেপে মেপে ভাত দিল।

অন্ন বলল, মেয়ে হিসাবি আছে গো, ভালো।

তিন পিসি দিল তিনখানা কাপড়। কানাইয়ের বন্ধুরা মিলে দিল টর্চ বাতি, আর সুবল দিল পলা রুপোর বালা।

ঠাক্‌মা বলল, নাতবৌ! সোনার সংসার পেলি। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি, সবাই ভালো। মান্যি রেখো।

পাঁচু পিসি দুজনকেই দিল রুপোর আংটি।

নাতির বিয়ে দেখবে বলেই ঠাকমা বেঁচে ছিল। কানাইয়ের বিয়ের পর চারদিন না কাটতে ঠাকমা বলল, বউ! উনোন ধরাস না। যে যার ভাত পান্তা খেয়ে নে। পুরন্দকে বেরোতে বারণ কর।

—দেহ কি মন্দ বোঝ?

ক্ষীণ হেসে ঠাকুমা বলল, আমাকে নামতে হবে উঠোনে। মন বলছে আজই যাব। দেহ বলছে যাই।

জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ বুড়ি ঠাকমা। সবাই ভাতপান্তা খানিক খেল। খানিক হাঁসকে দিল।

—বাঁজা আমগাছটা কাটিস পুরন্দ।

উঠোনে শোয়ানোর এক ঘন্টার মধ্যেই ঠাকুমা মরে গেল। গ্রামে সবাই বলল, জ্ঞানী মানুষটা গেল। কত পুণ্যে বলতে পারে, আজ আমি যাব?

কুড়ানিদের সংসারে একটি যুগের শেষ।

দাদার বিয়ে অঘ্রাণে। জগার বিয়ে বৈশাখে। বিয়ের যেন মরসুম সেটা। প্রায় বিনা আয়োজনে বীণার দাদা বদনও কালী নদীর ওপারে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে গেল। শ্বশুরের তিনটে মেয়ে, ছেলে নেই। জগার বৌভাতের দিন বীণা, কানাই, কুড়ানি গিয়ে গতর দিয়ে কাজ তুলে দিল।

বড়পিসি সকলকে অবাক করে একটি নতুন কাপড় কুড়ানিকে দিল। পাঁচজনা আসবে। কি পরে বেরোবি?

ভাগ্যে দিল। নইলে তো মায়ের সেই আদ্যিযুগের গোলাপী পাটের শাড়ি পরতে হত।

জগা নিজে গিয়ে বোলপুর বাজার থেকে মামার জন্যে ধুতি, আর মামির জন্য ডুরে কাপড় কিনে আনল।

—মাকে দিয়ে আমাদের বিচার কোর না মামি। আমি অন্তত তোমার ঋণ ভুলব না। সুখের দিনে মানুষ কত কথাই বলে!

বীণা নিজের হাতে শাশুড়িকে সাজাল।

—জামা পরো। দম আটকে আসে বললে চলে?

তেল মাখিয়ে চুল বেঁধে, টিপ পরিয়ে, সিঁদুর আলতা পরিয়ে গৌরদাসীকে বীণা সুন্দরী করে দিল।

—লজ্জা করে রে মা!

—করুক। ওরা কুটুম, দেখবে না?

ভোমরাকে দেখে কুড়ানির নিশ্বাস পড়ে না, এমন মেয়েকে দাদা পছন্দ করল না?

বীণার কিন্তু গিন্নিত্ব খুব।

মাকে ও মাগন মাগতে দেয় নি। শাউড়িকে বলেছে, ধার নেবে তা শুধবে কিসে? আমার যখন বিয়ে হয়নি না খেয়ে ছিল? মাকে তুমি চেনো না।

কয়েকদিনেই বীণা খেজুর পাতা কেটে আনল।

—ঘরে বসে চেটাই বোনো, হাটুরে নিয়ে যাবে। আর কোনো কাজ করতে হবে না।

রান্নাবান্না, মুড়ি ভাজা, বাসন মাজা, ঘরের পাট কাজ, সব বীণা দশ হাতে করে।

ননীকে বলে, টোক মেরে খাবি না।

কুড়ানিকে বলে, গোয়াল দেখ।

আর বাড়ির যত কাপড়, সব কাচবে।

পাঁচু পিসি বলল, দেখ, সংসারের আহিংকে ছিল, সংসার করচে। ঘরও পেয়েছে তেমন। শাউড়ি তো কোনো কথায় "না" বলবে না।

ভোমরার সঙ্গে তুলনায় বীণা খাটো হবে না যেন পণ করেছিল। ভোমরার গলা শোনা যায় না, বীণার গলা সবাই শোনে। সবচেয়ে আশ্চর্য, বড় পিসির মনও গলিয়ে ফেলল বীণা।

—অ পিসি, চুল বেঁধে দাও।

—অ পিসি মাথাটা ঘষে দেবে?

—মাছ নাও পিসি, ননী খালার জল থেকে ধরল।

কুড়ানি বলত, বীণা, তুই পারিস বটে।

—দোরগোড়ে ঘর, আপনজনা, পর নয়। মিলমিশ করে থাকলে কারো মন্দ হয় না। আমার মাকে তো দেখলাম। জ্যাঠা সমাজের মাথা। ওদের সঙ্গেই মানিয়ে থাকতে পারে না।

কানাইয়ের মুখে সে বছর হাসি আর ধরে না।

বীণা বলল, জগা ঠাকুরপো কেমন শক্ত মানুষ জানো? জমি সব সমান ভাগে, দু-ভাইয়ের নামে রেকর্ড করাচ্ছে।

—এক অন্নে, পৃথক রেকর্ড কেন?

—কেন করবে না? আজ মিলেমিশে আছে। পরে তো বিবাদ হতে পারে।

হবে না।

—পিসিকে জব্দ করেছে বটে। আমার ঠাকুমা দিদিমাকে ছেঁচেছ, মামিকে ছেঁচেছ, বউয়ের ওপর কিছু করেছ তো মাঠ পারে ঘর তুলে দেব। ভাত কাপড় দেব। আর কোনো সম্বন্ধ রাখব না। আগে এমন জানতাম না। মামিকে দেখে তবে বুঝলাম মেয়েছেলে ঠাণ্ডা হলে ঘরে লক্ষ্মী থাকে।

এ ভাবেই জগা তার মায়ের সাধের স্বপ্ন 'বউ এলে ছেঁচব', সেটি নষ্ট করে।

সন্ন বলে, না বাবা! আমার দিনও গেছে, মুখও গেছে। এখন আমি দাসী বাঁদী।

ভোমরা কথাই বলত না।

সর্বস্ব কাজ করত, মাঠে ভাত পান্তা নিয়ে যেত, গোয়াল কাড়ত, সব নীরবে।

বীণা বলত, অত ভালো হোস না।

—আমি ওই রকমই।

—তোর বর হাঁকডাক করে, তুই হলি বোবা। আমার বরের মুখে কথা সরে না, আমি হলাম কুঁদুলি।

—ভগবানই মিলিয়ে দেয়।

শাউড়ির তো কথাই নেই।

—শাউড়ির ছেলে?

—কি বলব, বল?

—মামা কিন্তু বড় ভালো লোক।

—হ্যাঁ, তবে নিজের ভালো বোঝে না।

কুড়ানি ওদের কথাবার্তার মধ্যে এসে পড়লেই বীণা বলত, বউদের কথায় মেয়েরা কেন ভাই?

ভোমরা বলত, আমার দাদা আসুক এবার। ইলমবাজারে না সিউড়িতে কাজ পেয়েছে তো! কুড়ানিকে বউ করব। কুড়ানি হাসত।

—সত্যি ভাই। এবার গেলেই মাকে বলব।

ভোমরা কুড়ানির চিবুক ধরেছিল।

—ঠাকুরঝির আমার চিকণ মাজা, ইঁদুরদাঁতী, ঝাঁপালো চুল, চলন ধীরে, রংটি কালো, দেখতে ভালো।

বীণা হেসে গড়াগড়ি।

—বল, কালো কোলো সুন্দরী।

—নিশ্চয়। চোখ দেখেছিস, ভুরু দেখেছিস?

—রংটা যদি ফর্সা হত।

—আমাদের ঘরে কার রং ফর্সা হয়?

—পাঁচু পিসির ভাইঝি?

—তার কথা কেন ভাই? তার তো ধবল রোগ।

—তোদের ঘরে গেলে অভাবও জানবে না।

—তা জানবে না। বাবা বলে মেজদাকেও কাজে ঢোকাবে। আজকাল শুধু জমির ভরসায় চলে না।

—ভালো ঘর দেখে দিতে হয়। নয় তো তোর শাউড়ির মতো...আমার শ্বশুরের মতো ভাই পেয়েছিল বলে...

—রাতে ওকে বলব।

জগা নাকি খুব খুশি। ডোম সমাজে কবে মেয়েকে পণ দিয়ে বউ আনত ছেলে। বাবুদের হালচাল রীতকরণ দেখে দেখে এখন ছেলেই পণযৌতুক নেয়।

তবে শ্বশুর তোর বিয়েতে পণ দেয় নি। পণ চাইতে পারে না ছেলের বেলা।

—মা ঘরন্তী গেরস্তী মেয়ে চায়।

—কুড়ানির বেলা সে কথা বলতে হবে না। দাঁড়া, একদিন নেমন্তন্ন করি সুন্দরকে। সে দেখুক, মামারা দেখুক। ছেলের যদি মনে ধরে...কানাইদা যা করল।

—কেন বীণা তো বেশ বউ।

—তোর মতো?

—সে তার মতো, আমি আমার মতো।

—মন্দ নয়। দেখব বউ, আমার কানে যেন না যায়। আমার মা ঠিক ভাংচি দেবে। দিত, বড়পিসি ভাংচি দিত, সুযোগ পায় নি।

জগা বলেছিল, নতুন কুটুম নেমন্তন্ন করেছি, কানাইদা, বউদি, কুড়ানি, ননী, সবাই দুপুরে খাবে।

—আমরা বাদ?

—আমরা জোয়ান মানুষরা, মামা।

—কি, মদ খাবি?

—রাম রাম! কোনোদিন খাই? বাপ মনকষ্টে মদ খেত, তার দুর্গতি মনে নেই?

ভোমরা বীণাকে বলেছিল, কুড়ানিকে দিয়ে পরিবেশন করাব। বেশ সাজিয়ে আনিস।

—না, না। বড় পিসি ধরে ফেলবে।

বড়পিসি জগাকে বলেছিল, তুই ছোঁড়া বিয়ে করে যেন মাতা পাগল হয়েছিস? মাছের টক, পোস্ত, আবার হাঁসের মাংস? এত নিধি জিনিস?

—তবে কি ডাল ভাত দেব? যাও যাও, কথা বলো না। আমার কুটুম, আমি বুঝব।

—ও বাড়ির গুষ্টি কেন ডাকছিস?

—বেশ করছি। তাদেরটা তিন বছর খেলে, তারা একদিন খেলে বুক পুড়ে যাচ্ছে?

বড় পিসি মুখ অন্ধকার করে চুপ করে যায়।

কুড়ানির বড় আনন্দ হয়।

—চল ননী, ঘাস কেটে আনি গা!

কুড়ানি নদীর ধারে দৌড়েছিল।

ঘাসের বোঝা ননীর মাথায়, তার মাথায়, সাইকেল চেপে কে আসে কাছে?

নিশ্চয় কমল।

কুড়ানি ঘাসের বোঝা মাটিতে ফেলে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। আর সুন্দর সাইকেল থামিয়েছিল।

বাবরি চুল, জোয়ান ছেলে, খাকি শার্ট, ফর্সা ধুতি, পায়ে চটি, হাতে ঘড়ি।

বাপ রে! চাকরি করে, দেখেই জানা যাচ্ছে।

ভোমরার মতই মুখ চোখ, তবে গোঁপ আছে।

—কি হল, কুড়ানি?

লজ্জা, লজ্জা, অপার লজ্জা। না না, ঘাসটা ফেলে একটু গোছ করে নিই।

—রোজ ঘাস কাটতে আস?

—গরু আছে।

—দাও, সাইকেলের পিছনে দাও।

—না, না, আমি চলে যাব।

—তবে তুলে দিই।

—আমি পারব।

সুন্দর কি মুগ্ধ হয়ে যায়, মুগ্ধ হয়ে যায়। পিছনে অপার আকাশ, চারদিকে মাঠ, ধানের চারায় সবুজ কোনো কোনো ক্ষেত। এরপর বীজতলা থেকে ধানগাছ তুলে রোয়া হবে। এ বছর বৃষ্টি হয়েছে জ্যৈষ্ঠে। সবুজে সবুজ চারিদিক। তার মাঝে সলাজ হাসি মুখে মেখে কুড়ানি, যেন সবুজ ধান নিজেই।

পরনে ময়লা হলুদ বিবর্ণ কাপড়, গায়ে নীল জামা, ঝাঁপালো চুল উঁচু করে হাতখোঁপা, কপালটি ছোট, ঘাড় বড় সুন্দর।

—মাসাঞ্জোর দেখেছ?

—না।

—সলাদানা-ডোমকালী দেখেছ?

—পাঁচু পিসি দেখাবে বলেছিল। আচ্ছা, সেখানে কি সত্যি দেখা যায় ক্ষণে কালী ক্ষণে শিব?

সুন্দর হেসে ফেলে।

—আমি তো কালীই দেখেছি।

—পিসি বলেছিল।

—তা হবে।

ননী বলে, দিদি চল্।

—হ্যাঁ, যাই।

চমক ভেঙে যায়।

—চলো না সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাই?

—না না, আপনি চলে যান।

সুন্দরের কথা কি! অমন ভাবে গেলে গ্রামে কি কথাটা উঠবে। সবাই কুড়ানিকে নিয়ে মশকরা করবে। বেটাছেলের নিন্দে হয় না, মেয়েছেলের নিন্দে নিমেষে হয়। আর মকরন্দপুরে! সন্ধ্যের পর গ্রাম নিষ্প্রদীপ। যে যার ঘরে বা এ ওর বাড়িতে, ঘোঁট পাকাও, মেয়েরা করো

পরচর্চা। ঈশ্বর সমাজপতি। তাকে যত সামাজিক বিচার করতে হয়, অধিকাংশ ঘোঁটকচালি বিষয়ক। খুব বন্ধ সমাজ।

পুরুষরা যারা তাড়ি খাবার খায়।

বাবু ঘরের ছেলেরা ছোঁক ছোঁক করে ডোমদের মেয়ে বাউয়ের লালচে।

কুড়ানি নিশ্বাস ফেলে ঘাস মাথায় তোলে।

সুন্দর চলে যায়।

দুপুরে চুল বেঁধে, ফর্সা কাপড় পরে সে আরেক কুড়ানি। পাতে পাতে ভাত দেয়। বড়পিসি চৌকিতে বসে বলে, দে, ভাত দে, ও কি পরিবেশন!

রান্না কম নয়। বিউলির ডাল, ডিংলা পোস্ত, মাছের টক, হাঁসের মাংস। মাছ খাল থেকে ধরা, মদ্দা হাঁসা দুটি বাড়ির। খেতে খেতে সুন্দর বলে, চেনা রান্না।

—ভোমরার।

—ঠকে গেলেন। মাংস আমি রেঁধেছি।

—সবাই মাসাঞ্জোর দেখতে আসবেন। আমি রেঁধে খাইয়ে দেব। খুব দেখার জায়গা।

বড় পিসি বলে, চাকরি কিসের?

—ইরিগেশানে পিওনের কাজ।

—থাকো কোথায়?

—কেন, কোয়ার্টার আছে।

—তবে আর কি! এবার বিয়ে করো।

—দেখি...

—দেখাদেখি তো নদীর ধারেই হয়েছিল।

পুরন্দ আর গৌরদাসী বড় খুশি হয়।

—ভোমরা বউ! কাজটি হলে পায়ে রূপদস্তার বেঁকি মল দেব মা! কুড়ানির মতো সুলক্ষণা মেয়ে পাবে কোথায়?

বড় পিসি বলল, চাকুরে ছেলে! চাইবে অনেক। কিন্তু সলাদানার ভীম সিং মাথা নাড়ল।

—ছেলের মনে ধরেছে, সে চাইতে "না" করেছে। চাকুরে ছেলে। ওর ভরসায় এবারে তিরিশ ডেসিমেল জমি বায়না করেছি, আর ভাই। বেশি টানতে গেলে গরু দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। ছেলের বেলা দেখেছ না?

—মেয়ে তবু ভালো আছে, তোমার।

—তা আছে। শাউড়ি বড় বিষ, তবে জামাই মাকে রাশে বশে রাখে। যাক! বিধির বিধান, তোমাতে-আমাতে সম্বন্ধ হবে। মেয়ে দিতে পারলাম না তো মেয়ে নিই। তবে ভাই, বাসন এক প্রস্থ দিও, কড়াই, খুন্তি, হাঁড়ি। সেই কোয়ার্টারে থাকবে।

—এখানে থাকবে না?

—বউ থাকতে ছেলে হাত পুড়িয়ে খাবে?

—দেব, গুছিয়ে দেব সব। তুমি যেমন মানুষ, তেমন সম্মান রেখে সাজিয়ে দেব যথাসাধ্য।

বাড়িতে কানাই বলল, জমি যেন বেচো না। ননী আছে, সে কথা ভাবতে হবে।

—ননী বড় হতে এখন দেরি আছে।

বীণা কানাইকে বলল, যা হোক, তোমাদের খরচ হল না কিছু। জগা তার কুটুমকে খাওয়াল, তোমরা জামাই পেলে।

—তোর বাপের বা কি খরচ হয়েছিল?

—এই! জেনে শুনে হাত ধরেছিলে তুমি।

—নিশ্চয়।

—আর যত খরচ কম হয় ততই ভালো। দিতে তো আমাদেরই হবে।

—বাবার মান রক্ষেটা চাই।

—তোমরা বাপু বড় বোকা। আমাকে দশ টাকা দাও, তাকে বিশ টাকা করে দেখাব।

—মন্তর করবি?

—সুদে খাটাব। আমাদের জাতের মরণা! ধার করবে। সুদ দেবে। কিন্তু ধার দিয়ে সুদ নিতে জানে না। পাল বুড়ির কাছে দেখেছি। ধান রে, টাকা রে, সুদী কারবারটি তার। বুড়ি এক পোঁটলা টাকার ওপর বসে থাকে।

—বাপ রে, তোর কত্ত বুদ্ধি।

—আমার হাতে আসুক সব, আমি দেখাব। কানাই মুগ্ধ, মুগ্ধ।

—তোর বুদ্ধি আছে বউ।

—বুদ্ধি না করলে হয়? আজ আমরা দুজনা। ছেলে মেয়ে হবে না? সংসার বাড়বে না?

—মা বলে তুই লক্ষ্মী।

—বলা দরকার। তাকে কোন কাজটা করতে দিই? তার গতরই নেই। বড়পিসির গতর দেখেছ?

—মা বড্ড খেটেছে বউ। ঘরে সব থাকতেও সময়ে খেতে পায় নি। বাবা দেখত না কিছু...ঠাকমা পিসিদের নিয়ে মাকে খুব মুখ করত। বড়পিসির গতর আছে মানি। কিন্তু তার লাথি খেয়েই মার দেহটা...

বীণা বলল, যে আক্‌কেলে, বাস্ কথা ছাড়ো তো। বড় পিসি চেঁচায় তাই। মা হয়তো চিপটেন কাটছিল।

—না বীণা। আমার মা চিপটেন কাটে না। জানেই না। মা যদি জানত তবে তো বাঁচত। মা জানে সকলকে ভয় করতে।

—ধন্য তুমি! সৎ মায়ের ওপর এত টান!

—মা আমার একটাই। ও কথা উচ্চারণ করিস না। ঠাকমা, পিসিরা, চিরকাল আমার মন ভাঙাতে চেয়েছে। আমি তাদের কথা কোনো কালে শুনি নি।

—নাও শোবে চলো।

—তুই যেন অসৎ চোখে দেখিস না।

—না গো, না।

কুড়ানি যেন মাঠে ঘাটে কম যায়।

—তোমার বোন, তুমিই বোল।

কানাই পরদিনই বলল, এই। যেথা যাবি ননী যেন সঙ্গে থাকে। এখন বিয়ের কথা হচ্ছে, হটর হটর ঘুরো না

—ঘুরি কোথায়? ঘাস কাটতে, নয় মাঠে ভাত দিতে, নয় গরু আনতে...একা বউদি সব পারে?

—যা হোক, বুঝে চলবে। অনেক কপালে এমন সম্বন্ধ জোটে। সুন্দরের জন্যে কত মেয়ের বাপ ঘুরে গেছে।

আর বীণা শাশুড়িকে বলল, একটু একটু করে জোগাড় করো। হুট করে খরচ করা তো যাবে না।

পুরন্দ বউকে শুনিয়ে বলল, চাইলেও এখনি হচ্চে না। মাঘের আগে নয়। ছেলের ফাঁড়া আছে। বিয়ে হলে ফাঁড়া হবে। পৌষে ফাঁড়া কাটবে, মাঘে বিয়ে।

গৌরদাসী বলল, সময় আছে।

স্নানের ঘাটে বীণা বলল, মন যে খারাপ দেখি।

—যাঃ, কি যে বলো।

—হবে লো হবে। মাঘেই হবে।

—আমি বলেছি কিছু?

—দেখিস, তখন চিনবি তো? কোয়ার্টারে থাকবি, মাস গেলে বাঁধা টাকা, গরু রে, ঘাস রে, কোনো কষ্ট জানবি না। বাবু বাড়ির বউদের মতো হবি।

বীণার হিংসে হয়েছিল।

—তোর দাদা তো খানিক পড়তে শিখেছিল। সে তো পারত চাকরি করতে। বাড়ির চাড় থাকলে হত। ভোমরার বাপের চাড় কত।

—দাদা তো ভাবে নি কোনোদিন। সুবল দাদা এখন বলে, সলাদানা বড় জায়গা। খোঁজখবর আসে।

—সুবল দাদা নিজে তো কাজ করছে।

ও দুটো পাশ দিয়েছে।

—তোর দাদা? এ-পাশ আর ও-পাশ। নে, হাত চালা। তাড়াতাড়ি কর্। দোকানে কেরোসিন আনতে যাবি।

দাদার ওপর যেন বেশ একটা তাচ্ছিল্য দেখায় বীণা। কুড়ানি মনে মনে ভাবে, বীণার এমন বিয়ে হত?

মুখ খোলে না।

আর কয়েক দিন বাদেই সুন্দর আসে সাইকেল নিয়ে নদীর ধারে, কুড়ানিকে চমকে দেয়।

—অ ঘাসকাটুনি, ঘাস বেচবে?

—ছি ছি, কে দেখবে!

—তাতে কি? বউ হবে যে, তার সঙ্গে কথা কইলে দোষ আছে কিছু?

—নিন্দে হবে।

—হোক। হাত দেখি?

—কেন?

—চুড়ি পরাব।

—প্ল্যাস্টিকের না নাইলনের চুড়ি।

—না, লুকিয়ে রাখব।

—তোমার হাতে পরে একদিন নিশ্চয় সোনা পরাব। দেখে নিও। একদিন পরাব সোনা।

—দুর! সোনা আমাদের ঘরে পরতে নেই।

—ও সব বাবুদের ঢপ বই তো নয়। কুলোয় না, পরে না। আমার মাইনে যত, উপরি তত। হাতে সোনা পরাব। সাইকেলে বউকে চাপিয়ে ঘুরব।

কুড়নির বুকে কালী নদীর বান ডাকে।

—মন বলে, তোকে নিয়ে পালাই।

—এই ফাঁড়া আছে না?

—তা আছে।

—বোনকে দেখতে যাবে তো?

—এলাম তো দেখেই যাই। কিন্তু ঘাস কাটতে আসিস যে, সাপও তো আছে।

—এই কাস্তে দিয়ে কেটে দেব।

—খুব যে সাহস!

—ও আমাকে কাটতে পারে। আমি ওকে কাটব না কেন?

—ঘেমে নেয়ে উঠেছিস তুই।

—ঘরে যেয়ে স্নান করব।

—সাইকেলে চাপ।

—ননীকে নিয়ে যাও।

—চল রে ছোট গিন্নি।

—অ দিদি, কি বলে সুন্দর দাদা?

—তাকেই শুধো।

ননী বোঁচা নাক কুঁচকে বলল, ইশ! গোঁপ আছে না? আমার বর হবে দাদার মোত। গোঁপ থাকবে না।

ননী মহানন্দে সাইকেলের পিছনে চেপে চলে যায়।

কয়েকদিন বাদেই কমল ওকে দাঁড় করিয়েছিল কেরোসিনের দোকানের সামনে।

—কি রে, তোর না কি বিয়ে হচ্ছে?

—পথ ছাড়ো।

—পথ কি তোমার কেনা?

কমল সাইকেলে বসেই হেলে দাঁড়ায়।

কুড়ানি বিপন্ন, বিপন্ন। দোকান বাবু পাড়ায়, পালেদের দোকান। এখানে তার স্বজাত কে আছে?

—খুব অহংকার, অ্যাঁ?

লালু পাল দোকানি। সে ডেকে বলল, কি হল কমল?

—পুরন্দরের এই মেয়েটা। সেদিন সাপ ছুঁড়ে মেরেছিল জানো? ঘাস কাটছে, কথা কইতে গেলাম!

—আরে, দিন এখন ওদের! এদিকে বিনে পয়সায় পড়বে। কোটায় চাকরি পাবে, গরমেন্টের রকম দেখছ না? লাঙলে হাত দেবার আগে বেটারা আট আনা মজুরি বাড়াচ্ছে।

—পথ ছাড়ো তুমি।

—যদি না ছাড়ি? সাপ ছুঁড়বি?

—হ্যাঁ, হেলে নয়, কেউটে।

গর্জে এগিয়ে এসেছিল সুবল গড়াই। সুবল দাদা! তুমি নারায়ণ গো! উদ্ধার করলে?

—তোর কি রে, সুবল?

—পথ ছাড় শালা। ও আমার বোন হয়।

—বোন, না আর কিছু?

সুবল কমলের জামা ধরে টান মারে। ঈশ্বর কথা বলতে বলতে আসছিল, সেও থমকে দাঁড়ায়। সুবল রাগে কাঁপতে থাকে।

—তোমার স্বভাব আমি জানি না? তিন পুরুষে ডোমদের গোয়ালে জাবনা খাচ্ছ? যাও না মাঝি পাড়ায়। যা কুড়ানি, কেন্ কি কিনবি। লালু কাকা, তোমাকেও বলিহারি যাই। তোমার মেয়েকে বেইজ্জত করলে দোকানে বসে চিপটেন কাটতে? ভদ্দরলোক সব' ভদ্দরলোকদের গুষ্টি তুষ্টি হয়ে যাবে, দিন আসছে। দিন ঘুরবে, সরকার বদলাবে।

কমল অপমানে হিংস্র।

—এটা গড়াই পাড়া নয় সুবল।

—কোনো পাড়ার কথা নয়। নিজের সম্মান নিজের রেখে চলবি। নইলে গুয়ের পগাড়ে চোবাব। ক্লাব করেছি কি সাধে? দেখবি একদিন।

—শালা, তোমাকে আমি...

—আয় না, দেখে নে না।

কমল ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যায়। বলে যায়, পুরন্দরের বেটিকে আমি দেখে নেব।

—ভাগ্ ছুঁচো! আঁধারে ঘোরে শুধু!

ঈশ্বরের চোখে জল, সে এগিয়ে আসে।

—পরনাম হই সুবল! তুমি যা করলে!

—পরনাম নয় কাকা। বউ মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে শেখো। তোমরা চুপ করে থাকো বলে অত বাড় বাড়ে।

—সুবল! ও বিষে অন্তর জ্বলে ঠিকই। কিন্তু সুবল, বাবুদের কাছে কর্জে বাঁধা, তাদের জমিতে খাটা বিনা গতি নেই, সাহস দেখাবে কে?

—সাঁওতাল মেয়েদের বেলা সাহস পায় না কেন বাবুরা? মাঝিরা তাদের মা বোনের বেইজ্জত সয় না। তোমরা দেহে শক্তি ধরো, এত কাজ করো, মেয়েদের বেইজ্জতে লাঠি ধরো, দেখো সব জব্দ হবে।

—দেখব সুবল! চল্ মা, তোকে বাড়ি দিয়ে আসি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে সুবল।

এ ঘটনাটির পরিণাম কত রকম না হল!

আষাঢ়ে ধান রোয়ার সময়েই আট আনা মজুরি বাড়াতে হল।

আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা।

গড়াইপাড়ায় একটি দোকান খুলল সুবলের দাদা। বাগদিরা, ডোমরা, মাঝিরা সে দোকানে যেতে থাকল।

আর সুবলের ক্লাব থেকে আরেকটা বারোয়ারি পুজোর অনুষ্ঠান শুরু হল। মুখুজ্জে ও গড়াইদের পুরনো বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিল আবার। ফলে একটি তালগাছ নিয়ে প্রথমে দাঙ্গা। তারপর মামলা শুরু হল।

ডোমপাড়ায় অন্তর্বিবাদ এবার অনেক কমে গেল। ঈশ্বর বলল, সুবল গড়াই ছিল বলে পুরন্দর মেয়ে সেদিন রক্ষা পেল। এখন, বাবুরা চিরকাল আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নেয়, আমরা সয়ে যাই। এটা ভব সরেনের মেয়ে হলে কমলের মাথা নেমে যেত। আমাদেরকেও ভাবতে হবে।

সমাজ বসতে পাঁচু পিসি পান সুপারি ঘোরায়। সে বলল, ভাববে তোমরা? রাখাল বাবু বীণার মাকে বেইজ্জত করে। তোমাদের বিধান ভালো। বীণার বাপ বীণার মাকেই গদাগদ পিটাল। এটা বিচার হল?

—যাক গা, সে আগের কথা।

—আগের কথাই আজের কথা। দেখো, আমরা মেয়েরা নদীতে যাব, ঘাস কাটব। দোকানে যাব। মাঠে কাজ করব। মাঠে ভাত নিয়ে যাব। ঘরে বসে থাকলে চলবে?

—তাই চলে?

—বাপ স্বামী-ছেলে-ভাই ভরসা দেয় না, তবে শাস্তি দেয়। এমন কত দিন চলবে? এই যে ব্যাপারটা হল। বুকে হাত দিয়ে বল দোষ কার? কুড়ানির দোকানে যাওয়াটাই দোষ? না কমলের দোষ?

—দোষ কমলের।

—তা যদি জান, তবে ঈশ্বর দাদা, সমাজপতি হয়ে তুমি দাঁড়িয়ে দেখছিলে কেন?

—শোন্ পাঁচু, কুড়ানিকে দোষ কেউ দিচ্ছে না। কথা হচ্ছে যে আমাদের কারণেই বাবুদের বাড় বেড়েছে, এখন হতে জোয়ানদেরও ভাবতে হবে। সমাজ ডেকে সব সময়ের বিচার হয় না। সেদিন সুবল যেমন নিমেষে বিচার সেরে দিল।

রতন সিং হাঁপানির রোগী। বউয়ের, বেটার কামাই খায়, শরীর সায় দিলে ঘরামি কাজ করে।

সে বলল, সুবল হল গড়াই। সে মুখুজ্জেকে মারতে পারে। আমরা মারলে বাবুরা ছেড়ে দেবে? থানা পুলিস করবে না?

কানাই সক্রোধে বলল, অত সোজা নয়।

পুরন্দ বলল, আমাদের মেয়েদের মান ইজ্জত আমাদের দেখতে হবে। পাঁচু ঠিক বলেছে, তারা ইজ্জত নেবে, আর আমরা মেয়েদের দোষ দেখব। তা হবে না।

কানাই বলল, কথার লরজ 'বেটা'! এ সবও আর চলতে দেব না! সুবল পথ দেখাল। পথ নাও।

ঈশ্বর ঈষৎ হেসে বলল, তারা তো মাঠে নামে না। আর মকরন্দপুরে আমরা নব্বই ঘর, তারা তো পাঁচ-সাত ঘর। ল্যাই বিবাদ ভুলে একসঙ্গে চলো, দেখ পথ বেরোবে।

সুবল সব শুনে বলে, ঠিক আছে। থানা আমি সামলে দেব। তোমরা খানিক এক হয়ে চলো। ওদের হল অজাচার। ছাগল পাঁঠা যেমন মা বোন বোঝে না, ওরাও তাই।

এ সব ঘটনার ফলেই পরে সাতাত্তরের নির্বাচনের পর সুবল হয়েছিল অঞ্চল নেতা, পঞ্চায়েতপ্রধান হয় আরো পরে।

কুড়ানিকে কেন্দ্র করে স্থবির অশক্ত গ্রামটিতে কিছু হাওয়াবদল ঘটে।

কুড়ানির জীবন কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

আশ্বিনের মাঝামাঝি বাজনা বেজে উঠেছিল। মকরন্দপুর নেতাজী ক্লাবের উদ্যোগে সুবল বড় বুদ্ধিমানের কাজ করে। ক্লাবঘরের সংলগ্ন মাঠটিতে দুর্গাপুজো লাগায় ধুমধামে। মাঝিপাড়াও চাঁদা দেয়। এবং সুবল দারোগাকে এনে পূজা উদ্বোধন করায়।

ডোমপাড়া তেমন প্রস্তুত ছিল না। ফলে মাঝিপাড়াকে ডাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে।

বিজয়ার দিন সারারাত্রি ধরে ওরা গান গায় ও নাচে। ব্যাপারটি এ অঞ্চলে বড়ই নতুন। পুরনো পূজাটি মার খেয়ে যায়। কেন না এবার জনগণ ক্লাবের পুজোয়। ক্লাবে চাঁদা মন্দ ওঠে না। এবং বড়ঙ্গোর মনীন্দ্রনাথ ফণী দুর্গার মুখটি প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি করে সকলকে চমৎকৃত করে।

বিজয়ার রাতে নাচগানের আসর থেকে কুড়ানি উঠে যায়। বলে যায়, ঘুম লেগেছে মা! আমি ঘরে চললাম।

ঘরে আর ওর পৌঁছানো হয় নি।

কমল অপেক্ষায় ছিল, মাঠ ও ঘরের মাঝখানে ওকে ঝপ করে ধরে। টানতে টানতে ওকে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। গলায় হাত পেঁচিয়ে কায়দা করে ধরে, চেঁচানো যায় নি।

—এবার কোন্ সুবল বাঁচাবে?

এটুকু শুনেই কুড়ানি ওর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। মাথায় প্রচণ্ড জোরে মারে কমল।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কুড়ানি।

সারারাত উৎসবের পর যারা ঘরে ফেরার পথে বাঁশঝাড়ের সন্নিহিত পগাড়ে প্রাতঃকালীন প্রয়োজনীয় কাজটি সারতে যায়, তারাই কুড়ানিকে দেখে। ছিন্নভিন্ন বুক, মুখ, হাত নখের আঁচড়ে। গায়ের জামা ছেঁড়া, সায়া ছেঁড়া, কাপড় দূরে পড়ে আছে। মাথায় চাপ চাপ রক্ত।

ঈশ্বর কাঁধের গামছা পরে ধুতি খুলে দেয়। ঢেকে দেয় কুড়ানিকে।

—মেয়েছেলেদের ডাকো, কাপড় পরাক।

একজন লাঠিতে খুঁচিয়ে তুলে নেয় পাঁকে বসে যাওয়া এক পাটি বাটার দামি চটি।

—সুবলকে ডাক কেউ। গাড়ি আসুক, হাসপাতাল নিতে হবে। আর ওই চটিটা রাখ যত্ন করে। একজনের মুখে পড়বে।

অনেক, অনেক দূর বোলপুর হাসপাতাল। গরুর গাড়ি ঘিরে ঈশ্বর, পুরন্দ, কানাই, বলা ও জগা যায়। গাড়িতে পাঁচু পিসি ও গৌরদাসী। হাঁটতে হাঁটতে পুরন্দ রক্তাক্ত চোখে বলে, দশমী না হতে প্রতিমা বিসজ্জন হয়ে গেল?

পুরন্দ এখন চোখ ঘোরায়, দাঁত কড়মড় করে। ঈশ্বর ওকে চড় মারে।

—শালা, এখন মাথা হারাবার সময়?

—নয়? এখন সময় নয়।

পুরন্দ ভীষণ গর্জনে বলে, মাঘে বিয়ে, মেয়ে যাবে ভীমের ঘরে। চাল, গুড়, সব আমি সাজুত করছি, তা আমার মেয়ে যে বিসজ্জনে গেল। মাথা হারাব না আমি?

পুরন্দ হা হা করে কাঁদে।

—সমাজপতি গো! এর বিচার কে করবে?

সুবল গড়াই আসে নি।

কাকভোরে সে গিয়েছিল ছেলেদের নিয়ে। মুখুজ্জে বাড়ি থেকে 'কমল বেরা শালা! তোর ঘরমে আগুন দেব' বলে গর্জাতে থাকে।

ভিড় জমে যায়, ভিড় জমে যায়।

মুখুজ্জে কর্তা গাড়ু গামছা হাতে বলে, কমলের জ্বর, সে বেরোয়নি কাল।

জগা বলে, ভালো কথার কাজ নয়, দে আগুন!

এমন সকালেও ভিড় জমে যায়। মুখুজ্জেদের বড়শরিক চন্দ্রকান্ত ভারী গলায় বলেন, কে, কে! কি হয়েছে?

কমলের বাবা রমাকান্ত একদা মালিপাড়ায় বাসনির হাতে কোপ খেয়ে ডান কানের উপরাংশ খোয়া দিয়ে 'কানকাটা মুখুজ্জে' নামে খ্যাত। সুবল বলে কানকাটা মুখুজ্জের ছেলে কমলকে চাই।

মুখুজ্জেদের শরিকে শরিকে বহু দেওয়ানী মামলা বছরের পর বছর চলে। চন্দ্রকান্ত রমাকান্তের বেইজ্জত আঁচ করে বলেন, কমলকে চাই মানে কি? সে কি করেছে?

—আমার ধর্মবোনের ইজ্জত নিয়েছে।

—সে তুমি প্রমাণাভাবে বলতে পার না।

—এই চটিটা তার প্রমাণ।

—চটি? এ হে হে হে!

চন্দ্রকান্ত দালানে দাঁড়াল।

—হামারে আগুন না দিলে...আন তো মশাল!

রমাকান্ত জিভ চেটে বলে, কেস হয়ে যাবে সুবল।

—হোক কেস!

এত কিছুর পর কমলকে বের করা যায়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে। কমলের মুখ, গাল, হাত নখের ঘায়ে ফালাফালা। কুড়ানি ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে লড়েছিল।

—এ চটি কার কমল?

—আমি...আমি...

রমাকান্ত বলে, পুরন্দ কেস করুক।

—আদালত এখানে, বিচার এখানে।

সেই চটি দিয়ে মারতে মারতে সুবল কমলকে নিদম করে ফেলে ও বলে, গলা মাড়িয়ে দেব শালা, কবুল কর্।

—ওর সঙ্গে...আমার...পেম ছিল...

এখন পেম হাগাব। সত্যি কথা বল।

কমল কবুল করে এখন। ওরা মারে, মার খায় না কখনো। বীণার বাপ বলে, দুটো ঘা আমরাও মারি। আমরা শতবার খাই, ওরা একবার খাবে না?

কমল হাত জোড় করে।

—স্বীকার করছি, স্বীকার করছি। হঠাৎ করে হয়ে গেছে কাজটা...

—চল্ থানায়।

—মাথায় মেরেছ তার, বাঁচে কি মরে ঠিক নেই তার। কেস হবে।

কমল রে!

বলে দ্রুত ধেয়ে এসে কমল জননী। আবার ঢুকে যায়। রমাকান্ত বলে, পুলিশ কি শাস্তি দেবে সুবল, চোরের মার তো খেয়েছে। বামুনের ছেলে...

—ডোমের মেয়েদের ইজ্জত বরাবর নেয়, তাই না?

—বাবা সুবল! এক গ্রামে থাকতে গেলে...

—না, বেঁধে ছেঁদে নিয়ে যাব কমলকে। বেঁধে ছেঁদেই থানায় নিয়েছিল ওরা। দারোগা সুবলের পূজা সবে উদ্বোধন করে গেছে। সুবল তাকে আড়ালে নিয়ে বলে, পাওনা পাবেন এখন টাইট দিন।

রমাকান্তকে ভূমিসাৎ করে কমল যায় থানা গারদে।

সুবল বলে, ছাড়বেন না। বোলপুরে কি হচ্ছে তা জেনে আসি। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

হ্যাঁ, কুড়ানির জন্যে পঁচাত্তর সালের অক্টোবরে এত ঘটনা ঘটে যায় মকরন্দপুরে। জরুরি অবস্থা চলছে। কংগ্রেস সমর্থক সুবলের ভূমিকা খুব প্রাধান্য পায়।

কত ঘটনাই যে ঘটে যায়।

ধান রোপন কালে মুখুজ্জেরা বেইজ্জত হয়ে চার টাকা রোজানি দিতে বাধ্য হয়।

রমাকান্তের ছেলে ডোমের হাতে মার খাওয়ার ফলে অন্য শরিকরা ওদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছাড়ে।

কুড়ানি জ্ঞান ফিরে পেয়ে, 'মুখুজ্জেদের কমলা', বলে ডুকরে কাঁদতে গিয়ে ইঞ্জেকশানের ঘুমে আবার ঢলে পড়ে।

তার জবানবন্দীতেই পুলিশ কেস্ করে। তারপর কুড়ানির চিকিৎসা ও অপরাধের জরিমানা বাবদ হাজার টাকা পুরন্দকে দিয়ে খালাস পায় কমল। তার নাকের হাড় ভেঙে নাক চেপটা। ডান হাতের তিনটি আঙুল ভাঙা; মুখে ফাটা ফাটা দাগ।

গ্রাম ছেড়ে চলে যায় কমল।

রমাকান্ত সরোষে বলে, যা কলকাতা। দেখ্ মামারা কিছু জুটিয়ে দেয় কি না। তোর জন্যে...

চন্দ্রকান্ত বলে, লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল। ডোমের মেয়ের ইজ্জত কি ইজ্জত? তবে পাপী ওই কানকাটাটা। সময়ে বিয়ে দিলে...

কথাটি ঠিক বলে না। পাঁচ ছেলের বাপ রমাকান্তই মাঝিপাড়ায় বাসনির কোমর জড়াতে গিয়ে কোপ খেয়েছিল।

কুড়ানির ঘটনা থেকে বাবুপাড়ার পুরুষরা সমঝে যায়। ভয়ও থাকে, বাবুদেরও যে মারা যায় সেটা কমলকে দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল। ডোমদের মনে এখন নতুন সাহস। বাবু সমাজটি রমাকান্তের পরিবার বিষয়ে এ সময় থেকেই খাপ্পা হয়। তাদের প্রাচীন সম্মান এখন ফুটো।

চরণ পাল মাঝারি-চাষি। ডোমদের সঙ্গে তার সদ্ভাবই ছিল। সে একদিন দোকান ঘুরে এসে দাওয়ায় বসে চন্দ্রকান্তর।

—কি হল, পাল?

—কি হল না?

—হলটা কি?

—লালু পালের দোকানের সামনে জগা যাচ্ছে কার সঙ্গে, বিড়ি ধরাচ্ছে, বললাম, সর্ বেটা, যেতে দে! তা জগা বলল, বেটা বেটা করার দিন আর নাই মশাই। পথ ছাড়ার দিনও নাই। যেতে হলে গা ছুঁয়েই যাও। বামুন ছেলে ডোমের হাতের চটি খেল, আর কি জাতের বড়াই সাজে? এই বলে মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল।

—সকলই গেল।

—গেল তোমাদের জন্যে।

—বলতে পারো। এবার বি.ডি.ও. হল যে, সে জাতে ধোপা। তাকেই 'সার' বলতে হবে। আর কি দেখ!

—গ্রামে আমাদের একটা ছেলে কলেজে পাশ দিল না, মালিপাড়া থেকে দুটো ছেলে কলেজে পড়ছে। এভাবে বাবুদের 'বেটা কেটা' বলার সুখ, ডোম মেয়েদের ইজ্জত নেবার সুখ, সবই গেল।

মূল কারণ কুড়ানি।

কুড়ানি যখন হাসপাতালে দুই মাস থেকে পেটে সন্তান নিয়ে ঘরে ফেরে, তার আগেই ভীমের ছেলে সুন্দর চলে যায় ব্যাঙ্গালোর। বাপকে বলেছিল, বিয়ের কথা আর বলবে না। চাও, মেজ ছেলের বিয়ে দাও। বিয়ে করি তো ওদিকেও সমাজ আছে, মেয়ে আছে।

শুয়ে কুড়ানি নীরবে কেঁদেছিল।

ভোমরা বলেছিল, তোর কারণে দাদা বিবাগী হয়ে গেল। আমাদের মুখ পুড়ে গেল।

কুড়ানি ঘরের কাজ করত, চোরের মতো থাকত। দাদা আর বীণার বিবাদও এ সময় থেকে।

—অমন বোনাকে ঘরে তোলে কে?

—আমি তুলি।

—লজ্জা, লজ্জা। মুখ দেখাব কাকে?

—থাক্। তোদের বেত্তান্ত বা কে জানে না?

—কুমারী মেয়ের ছেলে হবে?

—হবে।

—গর্ভনষ্ট করাতে হত।

—খবরদার। ডাক্তারের নিষেধ।

—আমি যেন ওকে সইতে পারছি না।

—তোর খায়, না পরে?

বড়পিসির ছেলেরা কিন্তু অন্য রকম।

কুড়ানির দোষ নেই। যা হবার হয়েছে, আর কথা নয়। জগা বলেছিল, মা! কুড়ানি আমাদের বোন বটে। তার জীবনটাই অকালে নষ্ট হল। এখন দাঁতের বিষ তাকে ঢেলো না। বউ বলো, বউদি বলো, সেদিনে এমন বিপদ সবার হতে পারত।

কানাই গৌরদাসীকে বলত, মা! আমার বোনেরই বিয়ে ভাঙল, জীবন গেল, পরের মেয়ের এত আক্রোশ কেন?

গৌরদাসী বোবা চোখে চেয়ে থাকত।

—বিধবা হলে পরে সাঙা করাতাম মা!

—কে ওকে বিয়ে করবে বল্?

—কুড়ানি লুকিয়ে থাকে কেন?

ননী বলেছিল, দিদির কাপড় নেই, সব ছেঁড়া।

কানাই যেন মুখে চড় খেয়েছিল।

পরদিনই বড়ঙ্গা থেকে এক জোড়া কাপড় এনে ও কুড়ানির গায়ে ফেলে দেয়।

—যা নেই আমাকে বলবি। চোরের মতো ঘরে লুকাস না। তোর কোনো দোষ হয় নি।

প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল। শোলার মালা ভেসে গেল কালীর জলে।

পাঁচু পিসি একদিন বলল, চল্ কুড়ানি, ঘাস কাটতে যাই। মুখ লুকাবি কেন? সমাজ কিছু বলেছে?

তারপর উঁচু গলায় বলেছিল, তো হতে সকল ডোম মেয়ে বউ বাঁচল। সে কথা কে ভাবে? জগার পিসির কি হয়েছিল? তার তো বিয়ে হয় গোপালপুরে, জমিদার মিথ্যে কেসে স্বামীকে জেল খাটাল দুবছর। ফিরল যখন, বউয়ের কোলে ছ'মাসের ছেলে। পারুলের ভাই-এর বিত্তান্তও তাই। চিরকাল বাবুরা পর গোয়ালে জাবনা খেয়েছে, সমাজ মেনে নিয়েছে। তুই কোন্ পাপ করেছিস যে মুখ লুকিয়ে থাকবি। দাদাও তোকে ফেলেনি। বাপও তোকে ফেলেনি। চল্ বাইরে চল্।

পাঁচু পিসিই কুড়ানিকে নিয়ে বাইরে গেল। নদীর ধারে ঘাস কাটতে কুড়ানির বুক ফেটে গিয়েছিল।

—এইখানে সে আসত পিসি।

—ভোমরার দাদা!

—হ্যাঁ...আমাকে দেখতে আসত।

—ভাবিস না, পেটেরটার কথা ভাব্।

—সেও কি আমাকে মন্দ ভাবে?

—সে তো তা বলে নি।

—লজ্জা পেল। দুঃখ পেল।

—বেটাছেলে! আজ না হয় কাল ভুলবে।

—ভুলে যাবে, তাই না?

—না ভুললে কি মানুষ বাঁচে?

—বাবা শুধু কাঁদে।

—পেটেরটার কথা ভাবো মা। সে কোনো দোষ করে নি। সে নির্দোষ প্রাণী।

—হ্যাঁ...ভাবি...

জারজ সন্তান! অত্যাচারের ফলে অবাঞ্ছিত সন্তান। কিন্তু তার জন্যে কুড়ানির কি মমতা মনে! এ তার নিজের, নিজের। তাকে নিয়ে কুড়ানি সব ভুলে থাকবে

কিন্তু জগা সন্ধেবেলা এ বাড়িতে এল।

—মাসি সব বোঝে না মামি। আমরা ধরো মাঠে ঘাটে। মুখুজ্জেরা এত অপমানে জ্বলে আছে। কুড়ানির পেটে ওদের ছেলে, কোনো ক্ষতি করে দিতে পারে।

—আরো ক্ষতি?

—ওরা সব পারে।

জগা ঠিকই বলেছিল।

ভীষণ ক্রোধে জ্বলছিল কানকাটা রমাকান্ত। পুরন্দর মেয়ের কারণে তার কত ক্ষতি হয়েছে। তার সমাজে, সম্পন্ন ও উচ্চবর্ণ চাষী গৃহস্থদের সমাজে রমাকান্তরা পাত পায় না। তাদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত বলছে, লালচ, লালচ পয়সার লালচ! ডোম ঘরে বামুনের ছেলে আগেও হয়েছে। এবারে তো হিস্‌টি অন্যরকম। পাঁচ সাতশো টাকা খরচ করে এর নিকেশ করা যেত। এখন কি হল? চিকিৎসার টাকা দিয়েছ, জরিমানার টাকা দিয়েছ, ছেলে হলে মানুষ করতে টাকা দাও। ওরা তো জো পেয়ে গেছে, ছেড়ে দেবে?

কানাইও বলেছিল, বাইরে ওকে নিও না পিসি।

—তবে পাড়ায় বেরোক?

পাড়ায় বেরিয়ে তবে কুড়ানি বুঝেছিল, না। সমাজ ওকে গ্রাহ্য করে নি। এমন ঘটনা ওদের সমাজে আগেও হয়েছে। আবারও হতে পারে। না হতেও পারে। কে ভাবতে পারে?

ঈশ্বরের নাতনি ভুনি বলল, চল্ ভাই। মুড়ি খাই।

পারুলের বোন কুন্দ বলল, বীণার হিংসে হয়েছে। তার কোল খালি, তুই মা হয়ে গেলি।

—হবে, দাদারও হবে। না হলে বংশ থাকবে না। ঈশ্বরের বউ বলল, হ্যাঁ, পৌত্তুর বলে কথা! কুড়ানি মনে মনে ভাবল, সবই হবে। সবই হোক। দাদার একটা ছেলে বা মেয়ে হলে বাড়িতে একটু আনন্দ হয়।

ঘরে ফিরতে দেখে বাবা ঘর-বার করছে।

—কোথা গেছলি মা?

—ভুনিদের বাড়ি। বাবা।

—যাস্ না মা। সাবধানে থাক্।

সুবল এ ঘটনার পর ক্ষমতা বাড়িয়েছে, তপসিলী সমাজে যুবকরা ওর অনুগামী। ব্লক থেকে রাস্তা হল। মাঝি পাড়া, ডোম পাড়া মাটি ফেলা কাজ পেল। বাবুদের সমাজে সুবল অপ্রিয়। ফলে গণাভিত্তি বাড়াচ্ছে অন্য সমাজে।

সুবলও বলে গেল। কানকাটা মুখুজ্জে বলে কথা! সুবল সবল, তাকে এঁটে উঠতে পারবে না তো। দুর্বলকে জব্দ করতে চায়। গৌরদাসীর মাথায় হাত।

—আরো জব্দ?

—আমি আছি মা। কুড়ানি রে, জল দে।

—মুড়ি গুড় খাবি?

—না মা। শুধু জল।

—তুই যা করে দেখালি।

—ওদের নাক কাটা দরকারই ছিল। ওরাই সুযোগ করে দিল। সেদিন শুয়ারটাকে কাটতে পারতাম। মাথায় আগুন জ্বলছিল।

সুবল জল খেয়ে চলে যায়।

ক্রমে কত কি না ঘটে যায়। যাতে কুড়ানি-কাহিনী পুরনো হয়ে যায়।

রতন সিং হঠাৎই চলে যায় তারাপীঠে।

বলে, ঘর ছেড়ে যাচ্ছি গো, সংসার হতে মন উঠে গেছে আমার। অনেক কাজ করা হয়ে গেল, ছেলেরা সংসারী, মেয়ে সংসারী। লকার মা মরে গেল, ঘরে আর মন নেই।

গ্রামে সকলকে বলে ও দেখা করে রতন চলে গেল। এখন ও ভিখ মাঙবে, খাবে, না পেলে না খাবে।

পুরন্দ বলল, তুই যে যাচ্ছিস কেন? আমরা যে যেতে পারি না, আমরা কি পোকামাকড়? কাদায় পড়ে আছি?

—এই দেখ! তোর তো সংসারে সকল কাজ হয় নি। নাতি হয় নি বেটার ঘরে, মেয়েটা বিকল। তোর কি যাওয়া চলে? মনে ভেবে দেখ্।

—আর মেয়েটা। শোলার মালা ভেসে গেল।

—কুড়ানির ইষ্ট আমি সদাই ভাবি, ভাবব।

রতনের চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ তবে বউয়ের মৃত্যু। কিন্তু তার জীবনকালে দুজনের বাক্যালাপ ছিল না অনেক দিন। লখার মা স্বামীকে 'আমড়া খেকো' বলত।

ভোমরার পেটে ছেলে এসেছিল। খবর জানতে পেরে ভীম সিং তার মেয়েকে নিয়ে যায়।

এটাও একটা ঘটনা। ভীম সিং বলে যায়, ভোমরার ফাঁড়া আছে, ডোমকালীর আশ্রয়ে এখন তার থাকা দরকার।

লালু পাল মাল কিনতে গিয়ে জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে চারশো টাকা খুইয়ে আসে।

আর পাল বাড়ির বুড়ি স্বামীর মৃত্যুর এত কাল বাদে শাঁখা দে, সিঁদুর দে, লাল পেড়ে কাপড় দে বলে অসুমার জেদ করে প্রমাণ করে যে সে পাগল হয়ে গেছে।

ধর্ম ঠাকুরের বটগাছটি ফোঁপরা হয়েও দাঁড়িয়ে থাকত। একদিন সামান্য ঝড়ে বহু পাখি, কাঠবিড়ালিকে নিরাশ্রয় করে উপড়ে পড়ে।

ঘটনার পর ঘটনা।

পাঁচু পিসি বলে, কুড়ানির কোলে আসছে বটে একজন। কত কি ঘটছে গো!

সত্যিই তাই।

একদিন বীণা বলে, জল এনো না তো ঘড়া ভরে এমন সময়ে আছাড় খেলে...?

বীণা একদিন জোর করে কুড়ানিকে একটু পায়েসও খাইয়ে দেয়।

বলে, ভালোবাসা নয় গো! তোমাকে অযত্ন করলে আমি বাঁজা হয়ে থাকব, মা বলেছে। যত্ন তো করারই কথা, তবে বিয়ের পর হলে মনে খেদ থাকত না।

সব বলে কয়ে বীণা হঠাৎ কাঁদে।

—তোমার দাদা আর যেন আমাকে ভালবাসে না।

কুড়ানি ক্লান্ত গলায় বলে, বাসে বউদি। তবে আমার কারণে ভেবে ভেবে দাদা যেন কেমন হয়ে গেল।

—তাই হবে।

এমনি করেই আসে আষাঢ়। তখন সঘন গগন বর্ষার সকালে কুড়ানি বলে, মা! পাঁচু পিসিকে ডাকো।

কুড়ানিকে অনেক কষ্ট দিয়ে তবে ছেলে জন্মায় বিকেলে। আঁতুড় ঘর এবার তোলা হয় নি, ভীষণ বৃষ্টি। দাওয়ার কোণে ঠাকমার জায়গাটিতে আঁতুড় হয়েছিল।

—ছেলে হল গো বউ, শাঁখ বাজাও।

—না পিসি না!

—খুব ছোট করে, তিনবার লক্ষ্ণণ! কুড়ানি রে, তোর জন্মও এই হাতে, তোর ছেলের জন্মও...ওঃ, অনেক কাজই করা হয়ে গেল যেন।

কুড়ানির জীবনে শুধুই ঘটনার পর ঘটনা।

পরদিন রাত ন'টার সময়ে কমলের দুইদাদা আর রমাকান্ত লাফ দিয়ে পড়েছিল উঠোনে।

—সরে যা পাঁচু। ছেলে মেরে ফেলব।

—ছেলে মেরে ফেলবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষের ঝাড় রাখব না।

কুড়ানি ও পাঁচু পিসির আর্তনাদে কানাই, পুরন্দ, জগা ও বলা ছুটে এসেছিল।

ওদের সঙ্গে যারা আসে, তারা পালায়।

চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়ার সবাই ছুটে আসে। পরন্ত মুখুজ্জেদের ঘিরে ধরে সবাই।

—মারবে কেন?

—মারব কেন? ওই মেয়ে হতে সকল রকমে সর্বনাশ হল, তার ছেলে আমাদের ক্ষতি করবে না?

সুবল এসে পড়েছিল।

এবারে পুলিশই কেস করে।

শেষ অবধি নাকি অনেক টাকা হাত চালাচালির পর কেসটি মাঝপথে হারিয়ে যায়।

ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতার পর কুড়ানি ছেলেকে আঁকড়ে ধরেছিল। সবাই তো ঠিকই বলেছিল।

কানাই বলেছিল, মা ছেলে দুজনকেই মারত। যাক, বড় বিপদ থেকে বাঁচল, নাম থাকুক নিরাপদ।

ঘটনাটি ডোম সমাজকে যেন আবার সচেতন করে।

পাঁচু পিসি বলে নিরাপদ। নিরাপদ। বেশ নাম।

সমগ্র ব্যাপারটি ডোম সমাজ, অন্যান্য বর্ণের সমাজ ও মাঝি পাড়াকে ভীষণ নাড়া দেয়। কেন না শিশু সবার প্রিয়। শিশু হত্যা ওদের কাছে মহাপাপ। ভ্রূণ নষ্ট করাও মহাপাপ।

ঈশ্বর বলে, রমাকান্তের কাকার ছেলে দেখ গা বড়ঙ্গো সনা সিং বটে, রেল খালাসি। কোনোদিন মারতে আসে না। এবারে এল কেন, তা বুঝ?

—খুব বুঝি।

—কি বুঝ?

—ওই যে কমল মার খেল, বাবুদের মুখ পুড়ল। জরিমানা হল?

—আর নিজ সমাজেও লাথি খাচ্ছে।

—এ সব কারণেই রাগ হয়ে গেল।

—দু'বার মুখ পুড়ল ওদের।

ভব সরেন বলল, লাজ থাকলে গ্রাম ছাড়ত।

—গ্রামে থাকতেও হবে, আবার সইতেও হবে। এভাবে জনমতও তখন কুড়ানিকে আশ্রয় দেয়।

আর পাঁচু পিসি যেন জেহাদ ঘোষণা করে, ব্যাপারটিকে ও বৈধতা দেবেই।

সাধ হয় নি মায়ের। কিন্তু ছেলের বেলা ষষ্ঠী পূজা, আটকৌড়ে সবই হয়েছিল।

কুড়ানি কি জানত, একদিন নিরাপদর শৈশবের প্রতিটি স্মৃতি তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে?

নিরাপদের জন্মই পুরন্দর বাড়িতে কিছুদিন একটা সুখের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল।

নিরাপদর বয়স ছ'মাস তখন। ননী আর গৌরদাসীর কোলে কোলে ফেরে। কালো কালো ছেলে, মায়ের মতো মুখ।

বড়পিসিও বলে, মাতৃমুখী পুত্র সুখী হয় গো।

ভোমরার মেয়ে হওয়াতক বড় পিসির মন ভালো নেই। পাঁচু পিসি প্রবোধ দেয়।

—প্রথমে মেয়ে, তা বাদে ছেলে হবে।

—কে জানে বলো?

ভোমরার মেয়ে, আর কুড়ানির ছেলে। গৌরদাসী বলে, আমার কানাইয়ের ঘর খালি কেন মা? আমার কানাই কি দোষ করেছে?

কিন্তু বীণার সন্তান সম্ভাবনা যেদিন জানা যায়, সেদিন কুড়ানি যেন হালকা হয়ে যায়।

বীণা নিরাপদকে তেল মাখাচ্ছিল।

—আমিই নাইয়ে দিই।

কি সে সব মরীচিকার দিন! নিরাপদর স্নানের জল রোদে থাকে, তাতে দূর্বা ভাসে। সে জলে থুৎকুড়ি দিয়ে নজর কাটিয়ে ছেলেকে নাওয়ায় দিদিমা।

—হ্যাঁ বউদি, পারবে?

—খুব পারব। নইলে আট মাস বাদে নিজেরটাকে ধরতে করতে পারব কেন?

—কি বললে?

—যা শুনলে।

—দাদা জানে?

—বলি নি।

কি আনন্দ, কি আনন্দ, দাদার বউয়ের ছেলে হবে। কুড়ানির ভাইপো। নিরাপদ-র ভাই।

পুরন্দ শুনে বলল, আসাই তো অনেক গেল। কানাই মাকে নিয়ে ডোমকালীতে পূজা দিয়ে আয়।

—নিরাপদর নামে পূজা দেয়া আগে দরকার।

—সবার নামেই।

এত আনন্দ করতে নেই! নিরানন্দ পেছনেই ফেরে। পাঁচু পিসিরও বোধহয় বাড়িতে জীবন দুঃসহ হয়েছিল। ধান সেবা করতে, ঘর পাট করতে আর তেমন পারত না।

এ বাড়িতে যখন এল, তখন নিরাপদকে কোলে নাচাল।

নাচো তো কিষ্টসনা নাচন দেখি
নাচো তো কিষ্টসনা নয়ন ভরে দেখি।
চরণে নেপুর দেব মাথায় সিখি পাখা।
নাচো নাচো নন্দদুলাল নাচো শ্যামবাঁকা।

ছেলে নাচাল, ঘুম পাড়াল। বীণার চুলে গেরো দিয়ে দিল, কু নজর পড়ে না যেন। বলল আঁধার লাগলে ননদদের নিয়ে পগাড়ে যাস। এ সময়টা সাবধানে থাকা দরকার।

বড়পিসির বাড়িও এক পাক ঘুরে এল। দে সন্ন, মেয়েটাকে দে। এমনি করে তেল মাখাবি ভোমরা, হাত পা শক্ত হয়।

এই তার মুখে হাসি। কিন্তু মুড়ির বাটি নিয়ে হঠাৎ পাঁচু পিসি গম্ভীর, আনমনা, গৌরদাসী গায়ে ঠেলা দিত।

—কি ভাব, দিদি?

যেন অনেক দূর চলে যেত পাঁচু পিসি। সেখান থেকে ঘুরে ফিরে ঘরে ফিরতে দেরি হত। ছাঁটা চুল, রোগা সোগা মানুষটির চোখে জল।

—কান্দ কেনে?

—কাঁদিনা রে বউ, আনন্দ করতে ভয় করে। আনন্দে নিরানন্দ হয় তো! ঘরে ফিরতে মন ওঠে না। পুরাতন অম্বল, চাপা কাশি, আর পারি না। মুড়ি ভাজা নিয়ে বউ কত কথা শোনাল।

—সে তো শোনায় চিরকাল।

কোথায় পেত স্বামী সংসার। আমি যদি না বুকে করে আগলে রাখতাম? এমন দিনও গেছে, মেয়েছেলে হয়ে তাল গাছে উঠে পাতা কেটেছি, ঘরের চাল বেঁধেছি ঝবুর সাথে। এখন পারি না, মনে দেয় না বউ। দেখ! আমার স্বামী নয়, ছেলে নয়, সংসার নয়। কার জন্যে এত খেটে জীবন পাত? মন বলে রতন দাদার মতো আমিও যদি একদিন বলে চলে যাই।

কিন্তু কুড়ানির মায়া বড়, মায়া বউ!

—সেই মায়া রেখো ঠাকুরঝি। মা হয়ে যা পারি না।

—বউ

—কি গো!

—কোনো দিন এসে পড়লে আশ্রয় দিবি তো?

—তোমার দাদার ঘরে তুমি থাকবে।

—ঈশ্বর দাদাকে জিগ্যেস করব।

—হ্যাঁ...সমাজপতি সে!

ব্যাপারটি সমাজপতির দেখবারই বটে। পাঁচু পিসি চলে এলে ঝবু সিং রেগে যাবে। ঘরে কি ভাত জোটে না যে পুরন্দ দাদার ঘরে যাচ্ছ? কোন্ অসুবিধে তোমার?

এ নিয়ে গ্রাম সমাজে কথা হবে। ঝবু পুরন্দর বিদ্বেষী হবে। অনেক কথা ভাববার আছে। ঈশ্বর পাঁচুকে বলেছিল, সংসারে মন নেয় না?

—আর নেয় না।

—গ্রামে বসে পরদুয়ারী হলে পাঁচু, বড় নিন্দা মন্দ হবে। কথায় বলে পরের ভাত খাও, পরদুয়ারী হয়ো না।

—চিরকাল দাদা, দাই বাক করলাম! ওদের ঘরে কচি কচি শিশু, তায় কানায়ের বউও পোয়াতি, আমার ভালো লাগে। বেশ দিব্যি সোয়াস্তি হয়।

ভেবে দেখব গো। এখন থাকুক।

কদিন বাদেই পাঁচু পিসি বলে গেল, এখন ও সব কথা ভুলে যাও দাদা। ঝবুর বউয়ের পা মচকে ফুলে ঢোল। 'দিদি দিদি' বলে কেঁদে মরছে। বুড়িটা অকাজের কন্যে। সেবা যত্ন জানে না মোটে। বলি তুই শুধু হাঁড়ি সামলা। আর সর্বস্ব আমি করব। মানুষ ছেলে ছেলে করে মরে। এই তো এক কন্যে। তিন পুত্র। ছেলেরা কি ঘরের কাজ করে?

ঈশ্বরের বউ বলল, সেই ভালো পাঁচু। তবু দেখ, এখন অবধি চলছে। ছেলেরা যখন কর্তা হবে তখন কি সমাজ এ রকম থাকবে? থাকবে না। মেয়েরাও অন্য রকম। ডুমি বলে, বিয়ে দেবে চাকুরে বর দেখে। কোয়াটারে থাকব, ইস্টোপে রাঁধব। বরের সঙ্গে সিনেমা দেখব। শাউড়ির ঘর করব না।

—কেন শাউড়ি হলেই কি মন্দ হয়? কানায়ের মা নেই? তুমি নেই? সন্ন যে সন্ন, সেও তো এখন কারে পড়ে ভাল হয়ে গেল।

—কে কাকে বোঝাবে?

—আমি যেন আটকে গেলাম। নইলে ডোমকালীর পুজোটি দেবে কানাইয়া...

মনে মনে পুজো দেব মান্‌সা করে থাকে যদি। তবুও ঝপ করে সেরে আসা ভালো। বড় তেজী ঠাকুর।

সলাদানা ডোমকালী। একদিন সেখানে বউ হয়ে কুড়ানির ঢোকার কথা ছিল। কবে, কোন্ পুরাণের যুগে গো? যাবে, যাবে না? গেলে যদি দেখা হয়? নিরাপদকে চেপে ধরে কুড়ানি।

কানাই আস্তে বলে, কেন যাবি? মানসা আমার আর মায়ের। পাঁঠা দেব, পূজা দেব। আমার ওপর ভরসা নেই?

কুড়ানি মাথা নামায়।

—মাদুলি এনো দাদা। বউদি পরবে। নিরাপদ পরবে। বউদি খেতে চেয়েছিল। কচু মুড়কি।

—আনব। খরচ অনেক।

—ওরা সে সময়ে যে টাকা দেয়। আমার টিপ নিয়ে ডাকঘরে আমার নামে রাখলে বা কেন? তুলে নাও।

—বুঝেছি। যা, কাজে যা। ছেলেটার জামা আনব। জাড়ের সময় এখন।

সলাদানা-ডোমকালীতে মা, দাদা আর পাঁচুপিসি গিয়েছিল। পুরন্দ বলল, না। আমার কাজ আছে।

কাজ মানে কি, তা কুড়ানি জানে। বাবা ভীম সিংয়ের সঙ্গে দেখা হবার ভয় করে। কালী নদীর তীরবর্তী ডোমপল্লীর ইতিহাসে কেমন করে ছেদ পড়ে বার বার।

কবে না কি ছিল ডোমরাজা, সকলই তার রাজত্ব। ডোমরা ছিল তার সেনাবাহিনী। শত্রু

এসেছিল যখন, তখন ডোমরাজা দেখে কেবলই হেরে যায়। ওরা ছোঁড়ে কামান। রাজার সেনাদের ঢাল, সড়কি, তীর বল্লম, টাঙ্গি তরোয়াল। এরা লড়ে সামনে গিয়ে। ওরা লড়ে দূর থেকে। তখন দেবদেবতা, আকাশ, মাটি, মানুষ এ-ওর কাছে থাকত।

তা ডোমরাজা বর্ষার কালো মেঘ ধরে নিয়ে তাকে ঘোড়া বানায়। বিদ্যুৎ হয় তার তরবারি। আকাশসমান ঘোড়ার পিঠে তরবারি নিয়ে লড়তে লড়তে, লড়তে লড়তে...কেমন করে একদিন সব বদলে গেল।

ছেদ পড়ে গেল সে ইতিহাসে।

বুড়োরা ছাড়া কেউ তা জানে না। বুড়োরা মরে যাক, সবই বিস্মরণ হয়ে যাবে।

সলাদনার ভীম সিংয়ের বাবা আর মকরন্দপুরের পুরন্দ সিংয়ের বাবা ইকপোর্ থেকে এ-ওর মিতা ছিল। বড় ভালোবাসায় এ-ওর নাম উলকিতে লিখেছিল এ-ওর হাতে। মিতালির এ ইতিহাস চলতে পারত ভীম ও পুরন্দে। দাদা তা হতে দিল না।

যে সুতোটি তখন কেটে যায় সেটি আবার ধরার জন্য কত না তৃষ্ণা ছিল পুরন্দরের। ভোমরা আর জগার বিয়ে দিয়ে যেন সেই মিতালি একটু ফিরেছিল। ফাটলে পড়েছিল পলেস্তারা। সুন্দর ও কুড়ানির বিয়ে হলে? পুরন্দ বলত, কানাইয়ের কুটুমের মতো কুটুম হবে। জগা, বলে ওদিকে ওরা। আর মেয়ে আমার সর্ব সুখী হবে। এমন ছেলে কে পায়!

কিন্তু কমল তা হতে দিল না।

এখন মিতালি নয়, শত্রুতা নয়, মাঝে এক পাঁচিল যেন। পুরন্দ কোন মুখে যেত সেখানে?

সুন্দর তো ভোমরাকে দেখতে এখানে আসে না। ভোমরা বলে, বিয়ের ওপর বিদ্বেষ হয়ে গেল দাদার।

দেখা পেলে কুড়ানি বলত, পরের ছেলের মা। আমার কথা ভাবো কেন? তুমি বিয়ে করো।

মা, দাদা আর পাঁচু পিসি পুজো দিয়ে এল। পাঁচু পিসি বলল, সুন্দরকে দেখলাম। কি ছেলে হারালাম মা। কত ভদ্দরতা করে নমস্কার করল। সবার কথা শুধাল, কে কেমন আছে।

কানাই বলল, তুমি বিয়ে করো দাদা। তোমার জন্যে মনস্তাপ হয়ে আছি।

সে কি বলল?

বলল, বিয়ে মনে মনে করেছিলাম। এখনো বিয়ের কথা ভাবতে পারি না।

বীণা আস্তে আস্তে বলল, মন পড়ে আছে।

কুড়ানি চুপ।

—ভালোবাসা সত্যি হলে...

কুড়ানি মাথা নেড়েছিল।

নিরাপদকে কে দেখবে? ওকে আমি ছাড়তে পারব না, আর অপর বেটাছেলের সন্তানকে সেও মানতে পারবে না। ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করবে একদিন।

—তা বটে। সংসার কি থেমে থাকে?

থেমে থাকে না। তবে অপ্রত্যাশিত আঘাত এসে কিছুকালের জন্য সংসারকে থামিয়ে দিতে পারে।

ডোমকালীর পুজো খুব সুন্দর হয়। বলির পাঁঠার মাংস প্রসাদ সবাই খায়। বীণার হাতে

মাদুলি ওঠে। নিরাপদর গলায় মাদুলি। গৌরদাসী বলে, বৌমা খালাস হলে ছেলে নিয়ে পুজো দিতে যাব। ছেলে হলে নাম কালীচরণ, মেয়ে হলে তারা, পুজুরি বলে দিল।

দেখ, মানুষ কেমন ভবিষ্যতের কথা ভাবে।

পৌষে প্রবল শীত, সামনে মাঘ, গত মাঘে কুড়ানির বিয়ে হবার কথা ছিল। পোয়াল জ্বেলে সবাই হাত-পা সেঁকে। কানাই সকালে বলল, মুড়ি খেয়ে বেরোই। দেহটা জ্বর জ্বর লাগছে। পান্তা খাব না।

মুড়ি খেয়ে দাদা কাজে গেল, বিকেলে ঘরে এল। জ্বরটা বেশ জমে লাগল। মাথায় যন্ত্রণা, চোখ দপ দপ, আদা চা করে দিবি কুড়ানি?

—এখনই। চা-পাতা পিসির কাছ থেকে এনে চা করে দিল কুড়ানি। বলল, সুবল দাদাকে ডাকি?

—ধুর বোকা। জাড়ের কালে জ্বর হয় না?

কুড়ানি বীণাকে বলল, দাদার মাথা টিপে দাও তো বউদি। জ্বরে মাথায় যন্ত্রণা করছে।

পুরন্দ বলল, যে জাড়, জ্বর হবে না? নদীও উত্তর দিকে, ফাঁকা হাওয়ায় কাজ!

রাতে কানাই কিছুই খেল না। বড়পিসিও বলল, ঠান্ডা লেগে জ্বর! দেহে রস হয়েছে। উপোস দিলে দেহ টানবে, কালই দেখবে কত ভালো।

বলা বলল, শনিবারে জ্বর, মঙ্গলে ছাড়বে। দাদার হল, তেমনই ছাড়ল।

গ্রামে জ্বরজাড়িটা এবার বেশি। ঘরে ঘরেই জ্বর। মুদি দোকানে 'জ্বরারিষ্ট' পাঁচশ কিনে খায় সবাই। এক ঘর কবিরাজ ছিল বটে, কিন্তু বাপ মরতে ছেলেরা উঠে গেছে বোলপুরে। ডাক্তার কোনোদিনই নেই। তবে সুবল বলছে, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বসাবে গ্রামে। বড়ঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক্তার বসে না, থাকে না।

গুরুতর কিছু হলে বোলপুর হাসপাতাল।

সাপে কাটলে, জলে ডুবলে, আগুনে পুড়লে, মৃত্যু যে হবেই তা সবাই ধরে নেয়।

কচি কাঁচা, বুড়ো বুড়ি, ঠাণ্ডায় মরে, পেটের রোগে মরে, এ সব মৃত্যুও হিসেবের মধ্যে।

জন্মালে মরতে হবে, অমর তো কেউ নয়।

কানাইয়ের জ্বরকে তেমন গুরুত্ব কেউই দেয় নি।

কিন্তু রাত যখন সুনসান, সব যখন নিশুত, তখন কানাই ডেকেছিল—মা, রে! মাথা গেল রে!

সে আর্তনাদ বড় ভয়ানক। গৌরদাসী যখন ছুটে যায়, ততক্ষণে কানাই অজ্ঞান, অজ্ঞান, ঘাড় শক্ত।

—ছেলে এমন হল কেন? জল ঢাল্ মাথায়, জল ঢাল্ অ কুড়ানি, জগাদের ডাক, সুবলকে ডাক্।

ননী! নিরাপদকে দেখিস!

কুড়ানি আলু থালু দৌড়েছিল পিসির বাড়ি। পুরন্দ রাতকানা, আর দৌড়তেও অক্ষম। তারপর গরু গাড়ি জোগাড়, তারপর বোলপুর হাসপাতাল বসে রওনা হওয়া...

সকাল হয়ে গিয়েছিল।

হাসপাতালের ডাক্তার এনকেফালাইটিস না মেনিনজাইটিস, এ সন্দেহে দোদুল্যমান ছিল।

—জ্বর হয় কবে?

—পরশু বিকেলে।

—মাথার যন্ত্রণা ছিল?

—খুব।

—দু-দিন কেউ বাড়িতে রাখে?

কুড়ানি কাঁদতে কাঁদতে বড়ঙ্গের ডাকঘরে গেল বলার সঙ্গে। টিপ দিয়ে সব টাকা তোলে। তারপর আবার বোলপুর। বড়ঙ্গ থেকে বাস মেলে। টাকা দিয়ে কি হবে, দাদাকে সারিয়ে দাও তোমরা।

সে টাকা নেয় না কানাই। দুপুর নাগাদই তার হয়ে যায়। মোস্ট্‌ সিভিয়ার কেস অফ এনকেফালাইটিস....একই রোগে অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম থেকে নয়জন মরে। এমন রোগ আছে বলে কেউ জানত না। এ রোগের চিকিৎসা কি তা জেনেও লাভ নেই, কেন না চিকিৎসাব্যবস্থা নেই।

ছেলের চিতা দেখতে দেখতে পুরন্দ মাথা নেড়েছিল। এ হাতে আর পূজা দেব না ঠাকুর। বাপ মা রেখে ছেলেকে নাও, তোমার বিচার নেই?

কালী নদীর পানে শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে সামান্য ডোম যদি ঈশ্বরকে 'নো মোর' করে দেয়। তার ফল খুব ভয়ংকর হতে পারে, হয়েছিল।

'কান্নাই, কানাই' করতে করতে পুরন্দ সব কাজের বার হয়ে যায়। পড়ে থাকে মুলো, বেগুন, ছোলা ও পাটনাই লঙ্কার চাষ। দিনেও সে ছেলেকে খোঁজে, রাতেও। জগা ও বলা না থাকলে এবারের চাষ উঠত না। রাতকানা পুরন্দ লাঠির ভরসাতেই বেরিয়ে পড়ে বারবার।

কুড়ানি বাবাকে ক্ষেতের আল থেকে তুলে এনেছিল। মাঘের শীত বাঘের গায়ে, এমন শীত ভোররাতে বাবা উঠে এল কেমন করে?

—রাতেই এসেছি।

—চলো বাবা।

—কানাই আসুক।

—দাদা নেই বাবা।

পুরন্দ অদ্ভুত হেসে বলেছিল, আমাকে হাতে ধরে আনল, বসিয়ে রেখে গেল, সে নেই?

—চলো বাবা, আমরা যাই, সে আসবে।

পুরন্দর গায়ে খুব তাপ, চোখ খুব লাল।

—দেরি করিস না কানাই।

ছেলেকে ডেকে পুরন্দ সিং মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ফেরে।

—আমার বিসর্জনের ঠাকুর। আমার জলে ভাসা শোলার মালা! ভাবিস না মা! কানাই থাকতে তোর আর নিরাপদের কোনো ভাবনা নেই।

হাসপাতালে নেওয়া যায় নি পুরন্দকে। ওষুধ খাওয়ানো যায় নি। রোগটি বেশ নিউমোনিয়া। না বউ, আর একটা টাকা খরচ নয়। তোদের ভাসিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কানাইকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না।

সুবল রেগে বলেছিল, এদেরকে কে দেখবে? তোমার কর্তব্য হয় না সেটা?

কফ বসা গলায় পুরন্দ বলল, ছেলের কর্তব্য করার কথা। একা বাপ কত করতে পারে?

তবু সুবল হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে আনে। জোর করেই ওষুধ খাওয়ায়। কিন্তু এগারো দিন ভুগে ঘোর জ্বর বিকালে পুরন্দ মরে যায়। সবাই বলে, ও বাড়িতে এখন আর ভালো হবে না। যা হবে, সবই মন্দ হবে, স...ব।

—তাই হয়েছিল।

কুড়ানি আর ননী কি চাষ করতে পারে?

গৌরদাসী বলল, জগা বলা যা পারে করলে করুক, নয় পড়ে থাক।

এ কথা তো সত্যি, যে পুরন্দ আর কানাই চলে যেতেই কুড়ানিদের প্রতি ব্যবহার সবাই পালটে ফেলে।

জগা বলেছিল, মামা আর দাদা এনেছিল। তারা থাকতে যা পেরেছি করেছি। এখন মামি! তিন বিঘা আমরা নিজেরটা সামলে যেমন পারব করব। ভাগে করব।

তাই করো বাবা।

সাতাত্তরের নির্বাচন আসছে, এল বলে, সুবল এ সময়ে লাল ঝাণ্ডা হয়ে যায় ও নির্বাচনে মেতে যায়।

কুড়ানির বুঝতে বাকি থাকে না কিছু।

—জমির ধান মা আর খেতে হবে না।

সে কথা সত্যি।

দশ বছরের ননী যখন সতেরো বছরে বিয়ে করে রতনের নাতি রবিকে, রবি যখন চাষ বাস শুরু করে, তখন থেকে জমি আবার ধান দেয়।

সাতটি বছর প্রায় দেয় নি কিছু।

জগারা চাষ করত, ফসল উঠত। ভাগে ঠকাত। সব জেনেও গৌরদাসী নিরুপায়।

কেন না শেষ ঘা মারে বীণা।

পুরন্দর শ্রাদ্ধ শেষ না হতে বীণা যায় ঈশ্বরেব বাড়ি।

আমি শাউড়ির সঙ্গে থাকতে পারব না। একটা সংসারেই এত শনির দশা কে কবে দেখেছে? ভিন্ন করে দাও আমাকে। জমির অর্ধেক, বাড়ির অর্ধেক, একান্নে থাকতে ছেলে হলে ছেলে বাঁচবে না। শাউড়ির আঁচলের বাতাসে অলক্ষ্মী।

—তোমার জমি বুইবে কে, মা?

—পিসির ছেলেরা।

—তারা রাজি?

—খুব রাজি।

—ভাগের মধ্যে যাবে মা?

বীণা বলেছিল, চাষ করে ভাত উঠত। চাষের মানুষরা চলে গেল। এত সাধের বিয়ে...

বীণা মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছেছিল।

—সে সৎ মা, সৎ বোন ভাবত না...

—এরাও ভাবে নি...

—সকলেই সত্যি। ধর্ম জানে আমিও তার মান রেখে চলেছি। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে দুটো প্রাণীর কথা।

চোখে যেন আকাল দেখতে পাচ্ছে, এমনি গলায় বীণা বলেছিল, এখন ও সংসারের অভাব এসে যাবে। সর্বস্ব ছটা প্রাণীর মধ্যে ভাগ হলে আমার কি থাকবে? আমার ভাগে আমি খাব, ওদের ভাগে ওরা খাবে। শাউড়ির ছেলে লঙ্কা, বেগুন, মুলো বুয়ে গেছে। আনাজ উঠে যাক, তা বাদে সে আনাজ যেমন যেমন বেচা হবে, তেমন তেমন ভাগ হোক। তার পর যার যার তার তার। আমাকে আমার কথা ভাবতে হবে।

—এ সময়ে তোমাকে দেখবে কে?

—ভগবান।

কার্যকালে ভগবান দেখে নি।

গৌরদাসী মাথায় হাত রেখে হাপুস নয়নে কেঁদে যায়। ঘর দু' ভাগ ছিলই, ওদিকে দাওয়ায় বীণা রাঁধবে। বাসন কোসন, কাঁথা মাদুর।

—ছেড়ে যাস না বউ।

বীণা নিরুত্তর।

কুড়ানি এক সময়ে সরে যায়। বড় পিসি, জগা, বলা, ভোমরা, ভাবতে পারে না যেন। নিরাপদকে কোলে নিয়েও চলে যায় ওদের সজনা গাছের নিচে, ছেলেকে দুধ দেয়।

বড়পিসি এসে বসে বউদির ঘরে।

এই ঘড়া তোর বিয়ের দান? কিছু রাখে নি তোর শাউড়ি। আমার মায়ের কত পিতলের বাসন ছিল।

পাঁচু পিসি অবসন্ন গলায় বলে, বোসে বোসে ভাগ করে নিয়েছ সন্ন। ঘুঁটে পুড়লে গোবর হাসে। আবার গোবর নিজেই ঘুঁটে হয়। তোমার দাদা ভালো ছিল বলে মাথা তুলে চলছ আজ। শোকাতাপা মানুষটাকে শেল বিঁধে কথা বোল না ভাই। তুমি যা চেয়েছিলে তা তো হল।

—আমার কথায় বউ ভিন্ন হচ্ছে?

—না...জানি না...তবে ধর্মে সইবে না।

বীণা তো কাঁদছিল অল্প অল্প।

—বউ! এত ভালোবাসা, নিতে পারলি না।

জগা ও বলা সামনে আসে নি। সন্ন কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

দশ বছরের ননী এখন মুখ খোলে।

—মা ভাত দে।

—দিদি দেবে।

—তুই দে।

—সরবি?

—না, তুই কাঁদছিস বা কেন?

—ঘর ভেঙে গেল, কাঁদব না?

—না।

—এত জনে ছিলাম। বউকে কি ফেলতাম? তোর দিদিকে কি ফেলেছি?

—দিদির যাবার জায়গা নেই, তাতে আছে। আমাদের জন্য বউদি কাঁদে না। তুই কেন কাঁদবি?

কুড়ানি বোঝে, ননী কুড়ানি নয়।

বীণা বাতাসকে বলে, এখনি এই!

কুড়ানি বলে, থাক ভাই।

গলায় আঁচল দিয়ে বলে, ক্ষ্যামা করে দাও ভাই। ননীরও দাদা গেছে, বাবা গেছে, বুক পুড়ে আছে। ননীর জন্য ও বাড়িতে তিন পদ রান্না হচ্ছে না। তোমার আপনজন, তোমার পথ তো এখন...

অথচ বউদির যখন ব্যথা ওঠে, তখন তো বড় পিসি ঘরে নেই। ভোমরা বাপের বাড়ি।

অকালে ব্যথা।

কুড়ানিই পাঁচু পিসিকে ডেকে আনে, গৌরদাসীই বীণার পেটে তেল মালিশ করে।

আটমাস পূর্ণ গর্ভে মেয়ে হল।

পরদিন বড়পিসির কি আতিপাতি। আসলে বড়পিসি বলে দিয়েই সেরে দেয়ার মানুষ। দায় ঝক্কি নেবার লোক নয়। সেই বলে, আলাদা হলেও শাউড়ি ননদ দেখল, এটা মনে রেখো বউ।

অধর্ম কোর না।

—মেয়ে হল!

কুড়ানি বলল, মেয়ে মন্দ?

—বেটার মা হলে...

মেয়ের নাম 'তারা' হয়। আর তিন বছর বাদে নিরাপদ আর তারা হয় প্রাণের দোসর।

বীণা তাতে কিছু বলত না।

কিন্তু কুড়ানির জীবনে সব চেয়ে দুঃসময় এখন আসে।

মা, বোন, নিজে, নিরাপদ। চারটে প্রাণীর ভরনী কুড়ানির ঘাড়ে পড়ে।

শুরু হয় গরু, বাছুর, বাসন বিক্রি ও বাঁধা দিয়ে।

জগা, বলা হিসেব করে যা দেয় তার বাইরে কোনো পথে কিছু আসে না।

গৌরদাসী বোবা হয়ে দেখে যায়। তার অন্নে কতজন খেয়েছে, কেউ একটু মনে করে না? যা পারে করে গৌরদাসী, আর 'ধর্ম কি নেই' বলে বলে। ননী যায় ঘাস কাটতে। পাল পাড়ায় বেচতে।

নির্বাচনের পর সুবল ব্যস্ত মানুষ, তাকে পাওয়া যায় না।

তবে মাঝে মাঝে, 'কেমন আছ সব' বলে যায়।

একদিন ঈশ্বরের কাছে গেল কুড়ানি। মাথার পেছনে ঈশ্বর থাকলে তবু ভরসা।

অনেক, অনেক কথা বলল কুড়ানি।

সব শুনে ঈশ্বর বলল, চল্ দেখি কি করতে পারি।

—বাবুরা কাজ দেবে না!

—ধুর বাবু। চল্ আমার সঙ্গে।

নদী পেরিয়ে ঈশ্বর ওকে ভব সরেনের ঘরে নিয়ে যায় মাঝিপাড়ায়। নদীর এ পার, তবু নাম মকরন্দপুর-মাঝিপাড়া। সবই বলে ঈশ্বর।

—তোমাদের মেয়ে মরদের সঙ্গে কাজে যাক। তোমাদের সঙ্গে গেল ও নিরাপদ, না কি বল?

—পুরন্দর বিটি।

—হ্যাঁ।

—কানাইয়ের বোন!

—হ্যাঁ গো!

ভব সরেন বলে, কাল হতে ইটখোলায় যাক। এখন ধরো ভাদ্র মাস অবধি কাজ হবে। কাজ করুক। বড়ঙ্গের মিত্র বাবুর ভাটা বটে, রোজ চার টাকা। মুড়ি দেবার কথা নয়। মুড়ি আদায় করেছি আমরা। এ ভাটা বারো মাসে সাত মাস চলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বহু দিনের ভাটা।

কুড়ানি ফেরার পথে দোকান থেকে নিরাপদের জন্যে একটি কালো কার কেনে। কোমরে দেবে।

ঘরে এসে কুড়ানি বলেছিল, কাল হতে কাজে যাব মা। ঘর তোমার হাতে, নিরাপদ তোমার হাতে। পান্তা খেয়ে বেরাব।

—কাজে যাবি কোথা?

—ইট ভাটা।

—সেথা যাবি?

—যাব।

—মেয়েরা যায়?

—না। সকল মেয়ে ঘরে বসে তোমার মতো কাঁদে।

সেই তো শুরু মা ছেলের ছাড়াছাড়ি।

ইটভাটায় মাটি বও।

সুবলদের আলু উঠলে আলু বাছো, ভাগ পাবে। যত যা কাজ মেলে, করো।

কত সহজে সম্পন্ন মানুষ ঈশ্বরের বাড়ি কাঁথা মশারি কেচে ভাত বয়ে আনত কুড়ানি। ভাগের ধান বেচে কিনত কাপড়-জামা।

নিরাপদ ননীর সঙ্গে খেত। সন্ধ্যায় খানিকক্ষণ কুড়ানির বুকের দুধ খেয়ে দিদিমার কাছে ঘুমোত।

ভোমরার দ্বিতীয় সন্তান দেড় মাসে মরে যায়। ক্রিমি তড়কা যে রোগ আছে, কেউ জানত না।

ভোমরা এ সময়ে এ বাড়ি এসে বসত।

কুড়ানি বলত, নিরাপদ আমায় ভালবাসে না।

—খুব বাসে।

—খায় ননীর কাছে, শোয় মায়ের কাছে।

—হ্যাঁ, খেলতে খেলতে যে ছুটে আসে 'আমার মা কোথা গেল' বলে।

—আসে?

বড় পিসিও বলল। খুব খোঁজে।

জগাও বলল, ছেলে বড় হলে তোর দুঃখ যাবে।

ননী বলল, সবাই শত্তুর। কেন, এক পালি চাল ভাদ্র মাসে দিয়েছিল সবাই সমান।

ননী যেমন বড় হচ্ছে, তেমন খরখরি স্বভাব। আর, খাওয়ামাখা নেই। দেহ যেন পাকিয়ে যাচ্ছে।

একদিন ননী বলল, আমি কি বসে খাব?

—দাঁড়িয়ে খা।

—এবার চল্ দিদি। টুং কুড়াতে যাব। রোজানি চার টাকা। এ সময়ে টুং তো সবাই কুড়ায়। তাতে অনেক ধান।

হ্যাঁ, টুং কুড়ালে অনেক ধান। ধান কাটা হয়ে গেলে ঝরে পড়া ধান, মানুষ সেই টুং কুড়োয়, ইঁদুর বয়ে নেয় গর্তে। মানুষ আবার সে গর্ত খুঁড়ে ধানও নেয়। সে খায়, ইঁদুর খেয়ে নেয়, পাখপাখালি খায়। গ্রাম সমাজে স্বীকৃত নিয়ম।

—তাই কুড়াব।

এক সময়ে তাদের ক্ষেতে অসৎ মানুষ টুং কুড়াত। সে সময়ে কুড়ানি তাদের মনে মনে করুণা করেছে।

কপালে লেখা ছিল সেও হবে টুং কুড়ানি।

এ কথা শুনে বড় পিসির মাথা কাটা গেল।

—এ কি কথা শুনি?

—কেমন কথা শোনো?

—তুই যাবি টুং কুড়াতে?

—কেন যাব না?

—দাদার নাম ইজ্জত নেই?

—তিনি সগ্‌গে গেছে।

—নামটা তো আছে।

কুড়ানি দাওয়ায় বসল।

ইঁট খোলায় মাটি কাটি। ঈশ্বর জ্যাঠার বাড়ি কাপড় কাচি। চার প্রাণী তাতেও আধা উপোসি। ধান যা পাই, কর্জ শুধতে কাটা যায়, এক মাস বা দেড় মাসের খোরাক ওঠে বড়জোর। আমার মা যতজনকে খাওয়াল, মাখাল, তারা নিরাপদকে দেখেও এক পালি চাল দেয় না। এখন আমার ওপর সংসার। আমি ইটখোলা যাই, কাপড় কেচে ভাত বয়ে আনি, তাতে যদি বাবার মান না যায়, তো এখনো যাবে না। যদি যায়, তবে যাক। আমি অনুপায়।

—আমাদের বা লোকে কি বলবে?

—কিছু না। কেন বলবে?

—মান আমাদের নেই?

—জানি না। পেটের চিন্তার বাইরে, নিরাপদর বাইরে কিছু জানি না।

জগার মনে কথাগুলো ঠিকই বিঁধেছিল।

সে বলে গেল, আমরা তোদের জমি আর চাষ করব না কুড়ানি। ধর্ম জানে ধর্ম ভাগ দেই। তাতে চলে না?

কুড়ানি ঈষৎ হেসেছিল।

—না, বউদির জমিটা ভালভাবে চাষ কোরো জগা দা। বউদি তো তোমাদের গ্রামে এনেছিল, ডাঙা বাস্তু দিয়েছিল, ঘর তুলে দিয়েছিল, তিন বছর খোরাকি টেনেছিল, এর জমি তার জমি ভাগ ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

—থাক, যে করেছিল সে বলতে পারত।

—সেও বলত না। হাতে করে যে করত সেও বলবে না। যাক গে, তোমরা ভালো থাকো, আমাদের কথা ভাব নি, ভেবো না। জমি? জমি নয় পড়ে থাকবে।

—রেকর্ডে ভাগ ব্যবস্থা করবে মামা?

—না, ঘরে ঘরে করবে না।

এর পরেই কুড়ানি সুবলের কাছে যায়।

—ভিক্ষে আছে সুবলদা।

—ভিক্ষে।

—এখন তো আমরা ভিখিরি।

—যাক গে! বল।

—জমি জরিপ রেকর্ড হবে, নয়?

—হ্যাঁ, হবে তো।

—তুমি আমাদের ভাগটা তিন মা-মেয়ের নামে রেকর্ড করিয়ে দেবে, কথা দাও।

—দিলাম কথা।

—তোমার ছেলে কোলে, কথা দিলে।

—দিলাম। দিলাম।

—আর। জগা দাদারা আমাদের জমি চাষ করবে না, বলে রেকর্ড করে দে।

—আমি থাকতে নয়।

—যা হোক, চাষ কাজ তো পারব না। যতদিন না কোনো ব্যবস্থা হয় ততদিন আমাদের জমিটা তুমি চাষ করো। যেমন তেমন দিও।

—আমি!

—হ্যাঁ সুবলদা।

—বেশ...তাই হবে।

—আর...যাতে কাজ পাই সারা বছর, তেমন কিছু যদি দেখ। ছেলেটা...ননী...মা...

—দেখব।

নিশ্বাস ফেলে সুবল।

কানাই...কাকা...সংসারটা ভেসে গেল।

—আমি আমি সুবল দা।

—রোগা হয়ে গেছিস খুব।

—তা হবে। খেতে পাই না। তো। দেখ। সেদিন যদি অত মারদাঙ্গা না হত। তাহলে

ডোমের মেয়েদের ইজ্জত বাবুরা রাজুই নিত, তাই নয়? আবার মারদাঙ্গা হল বলে আমি বাবুদের বাড়ি কাজও পাই না, সেও সত্যি। ঢোক মেরে মেরে বাঁচা...অথচ ভগবানের বিচার দেখ, সবাই ভালো থাকল।

মারলাম আমরা। আমার কারণে মারদাঙ্গা করলে, তুমি তো লীডার হয়ে গেলে।

—বল্, বল্ কুড়ানি। ওঃ বুকটা আমার...

—ছি ছি মন্দ ভাবে বলি নি। তুমি ছিলে বলে বারবার ইজ্জত বেঁচেছে আমার, অপমানের শোধ নিয়েছ। ঠাকুর দেবতা আর জানি না দাদা, তোমার কথা ভাবি।

সুবলের বিবেককে বিদ্ধ করে কুড়ানি চলে যায়। প্রথম নির্বাচনের পর, তখনো সুবলের বিবেক ছিল।

দ্বিতীয় নির্বাচনের পর সেটি খোয়া যায়।

ঘরে ফিরে কুড়ানি বলেছিল, একটু বড় হোক নিরাপদ। ওকে আমি পড়াব, মানুষ করব। হিসেব জানি না, লেখা বুঝি না, মানুষ হতে পারলাম না মা।

—জগা জমি চাষ করবে না?

—না করল?

—কি হবে?

—যা হয় তা হবে।

এরই মধ্যে এসে পড়েছিল পাঁচু পিসি।

এবার কুড়ানি, আমি উঠব গোয়ালে।

—বেশ তো। উপোস করতে এসো।

—উপোস করব কেন? মণ্ডল বাড়ি বাইরের পাট করব, ভাত পাব, মাসে দশ টাকা।

—না পিসি। ঝগড়া বিবাদ হবে।

—তবে থাক্। নে, ওলটা ধর। তেমন ওল্ নয় কুড়ানি। লবণ দিযে মেখে খাবি। গলা ধরবে না।

—এ যে মস্ত গো!

—ধর্, নিরাপদ কোথা?

—তার যে কাজ। কি ধুলো মাখে পিসি?

—মাখুক। ছোটবেলা কি দুবার আসে?

—থালায় কি এনেছ?

মনিববাড়ির ভাতটা। তোদের সঙ্গে খাই। নিয়ে আয় ছেলেটাকে। তোর সঙ্গে খেয়েছি। ওর সঙ্গেও খাই।

—খাও। আমি আমি করে মরণ হবে তোমার।

—নয় তাই হবে। মরণ হতেও তো কারণ লাগে।

নিরাপদ দৌড়ে আসে ও এক থাবা ভাত মুখে দিয়েই বলে, মা! টুং আনবি না?

—আনব। তুই আনবি?

—আনব, এই এত!

নিরাপদ হাত দুটি ছড়িয়ে দেয়। ওর হাসির আলোয় কুড়ানির অন্তর আলো হয়ে যায়।

—জমি তিন মা-মেয়ের নামে রেকর্ড হবে পিসি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, সুবলদাদা ছেলে কোলে দিব্যি করেছে।

—বাঁচলাম যেন।

—কাজও যেমন পারে...দেবে।

—সুবল শতবর্ষ বাঁচুক।

—আর...আমাদের জমি সুবলদা ভাগে চষবে।

—সত্যি?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি।

ননী বলে, ভাতের দুঃখ যাবে দিদি?

—দেখ, আস্তে আস্তে যদি যায়।

—তবে দিদি, টুং কুড়াতে যাবি?

কুড়ানি চোখ বোজে।

—টুং কুড়াব শুধু? ইঁদুরের গর্ত থেকে মাঝিদের মতো এত এত ধান টেনে বের করব। ঝুড়ি ভরে ধান আনব, ভাগের ধান পাব, যেদিন তোর বিয়ে হবে, সেদিন থেকে তোর বর চাষ করবে। ভাতের দুঃখ যাবে।

আর ক-বছর বা? চার পাঁচ বছর?

—নিরাপদ আর আমি তখন মাছ ধরব।

—না রে! নিরাপদ ইস্কুলে যাবে। পাশ দেবে, কাজ করবে, সবাই বলবে নিরাপদর মা।

কুড়ানির চোখে জল গড়ায়।

নিরাপদ ডাকে, মা!

আর গৌরদাসী বেরিয়ে আসে থালা নিয়ে।

—জল আন্ ননী, কুড়ানি বোস্। এসো ঠাকুরঝি এক পাতে খাই। কতদিনে বুকটা যেন হালকা হল গো।

কুড়ানি নিরাপদকে দুধ দেয়, নিজে ভাত খায়। স্বপ্ন হয়তো, সবই স্বপ্ন। কিন্তু নিরাপদ, ননী, মা, সকলকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখলে কিসের জোরে কুড়ানি টুং কুড়ানি হবে?

সামনে কি আছে?

জানে না, কুড়ানি জানে না।

এখন সামনে মাড় ভাত, শাকসেদ্ধ, লঙ্কা পোড়া লবণে মাখা। কুড়ানি ছোট ছোট গ্রাসে খায়, আর পাঁচু পিসি বলে, টুং কুড়াতে আমিও যাব।

কুড়ানি কাহিনী বয়ে চলে, বয়ে চলে।

হঠাৎ বুক থেকে মুখ তুলে নিরাপদ বলে, তারপর?

কুড়ানি হেসে কেঁদে বলে, তুই বল্?

নিরাপদ বলে, টুং।

—তবে টুং।

হিমেল বাতাস, ধানের সুবাস। এবার ধান উঠলে খড় আর বেচা নয়, চাল দিতে হবে। কিন্তু আবারও নিরাপদ বলে, তারপর?

—পরে বলব।

উত্তরটা জেনে এসে ছেলেকে ঠিক বলবে কুড়ানি একদিন।

সম্পর্ক

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে করবীর মনে হল আট মাস বাদে নভেম্বরেই তাঁর জন্মদিন। ক্যালেন্ডারের দরকারি তারিখগুলো উনি দাগ দিয়ে রাখেন। বছর বছর ছেলেমেয়েরা আসে না। আসবে বলে করবী প্রত্যাশাও করেন না। বড়ছেলে দীপ আর শিবানী যেহেতু কলকাতাতেই থাকে, ওরা আসে। ছোট ছেলে আবির দিল্লীতে থাকে, বছরের যে কোনো সময়ে ওর জন্মদিনের চিঠি আসতে পারে।

গত বছর ও তিনটে কার্ড পাঠিয়েছে।

অক্টোবরে একটা এল। সারসের ছবির নিচে কোনমতে হাতে লেখা, 'নভেম্বর আসার আগেই!'

ডিসেম্বরে ইউনিসেফের কার্ড। 'মনে হচ্ছে নভেম্বরে উইস করি না!'

ডিসেম্বরে আবার কার্ড উটি থেকে। ওর 'ডানস অফ দি এলিফ্যান্ট গড' নামক ছোট্ট তথ্যচিত্রের একটা স্টিল। একটি নিঃসঙ্গ হাতি আকাশের পটচিত্রে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়ে, জামাই, তাদের দুই মেয়ের কার্ড কিন্তু ঠিক দিনে এসে যায়। নীলি খুব কর্তব্যপরায়ণ।

আর করবী? কার্ডও কেনেন না, উপহারও নয়। দুই ছেলে, এক বউ, তিন নাতনি, মেয়ে, জামাই, সকলের জন্মদিনে চিঠি লেখেন।

দিয়া লিখেছিল। দিদা! বাংলা হাতের লেখা চিঠি পড়তেও ফানি লাগে।

লাগুক। আবির তো কম্পুটার, ই-মেল, সবই করে দিতে চেয়েছিল। বড় অর্ডার পেয়েছিল, একশোটা নানা আকারের, মাপের, ধাতুর গণেশ চালান যাবে কুঞ্জাপ্পার গ্যালারিতে। প্যারিসে। বলেছিল, টাকার কথা ভেব না তো!

করবী রাজি হয় নি।

কেন রাজি হবেন? ই-মেল থাকলেই কি তোমরা প্রত্যহ চিঠি লিখবে? আমি বা কি লিখব? তোমাদের সঙ্গে বলার কথা তো ফুরিয়ে আসছে। উদ্বেগ থাকে, চিন্তা থাকে, টেলিফোন আছে, এস.টি.ডি. করা যায়।

চিঠি লেখা যায। সব ঠাকুমা দিদিমা তো ই-মেলে অভ্যস্ত নয়।

নীলি খুব বিবেচক। মাসে একবার ফোন করে। মায়ের ওপর আই.এস.ডি.-র খরচ চাপায় না। প্রতিবারই বলতে কিন্তু ছাড়ে না, মা! আমার শাশুড়িকে দেখ তো! কেমন ই-মেলে যোগাযোগ রেখেছেন। কেমন মাঝে মাঝে বেড়িয়ে যান! তোমাকে তো একবারও আনতে পারলাম না। ছোড়দা মাঝে মাঝে আসে যখন প্যারিসে, লন্ডনটাও ঘুরে যায়।

করবী নীরব থাকতেন।

মনে মনে একটা তীব্র দুঃখ চাড়া দিত। সত্যি কথাটা বলতে চাইতেন। বলতেন না। কিন্তু একদিন বলেছিলেন। এমন একটা দিনে নীলি ফোন করেছিল! ঘরে বসেছিল বুবলা।

বুবলা একদা আবিরের বউ ছিল। দুজনেরই জন্ম ১৯৫৪ সালে। বিয়ে হয় ১৯৮৪ সালে। বরাবরই জানা ছিল দীপ বিয়ে করবে শিবানীকে। আর আবির বিয়ে করবে বুবলাকে।

দুজনে রেজেস্ট্রি করে চলে এসেছিল। তখন আবিরের বাবা টগবগিয়ে বেঁচে আছেন। শ্যামবর্ণ মাঝারি মাপের মানুষটির গলা ছিল গমগমে। উনি তো হইচই করে বাঁচেন না।

—চুরি তো করিস নি। বিয়েই করেছিস। আমি বেঁচে থাকতে এ ভাবে...

আবির বলল, ওর বাবাকে এত বছরেও বাগ মানানো গেল না। দুজনেরই প্রায় তিরিশ হল!

—আমার পঁচিশ বছরে বিয়ে! সাতাশ বছরে দীপঙ্কর, উনত্রিশে তুই, একত্রিশে নীলাঞ্জনা! যাক গে...জানতাম বিনয় চিরকাল কাঠ গোঁয়ার!

করবী বললেন, ওরা বসুক! দীপ আর শিবানীকে ফোন করি!

—তা কর! কিন্তু দীপের মতোই ঘটা করে বউভাত দেব। আর...আবির! তুই সে অবধি ছাতের ঘরে থাকিস! মানে...ছাতের ঘরে...এই সব সে মানুষটা দারুণ ভালবাসতেন। বন্ধু রাখালব্রজ, তার ভাই বিজয়ব্রজ, ডাক্তার নীতিনবাবু, করবীর বোন মালতী, তার স্বামী শুভেন্দু। করবী, পল্টু দত্ত নিজে। সাত মাথা এক হয়ে পরামর্শ হল।

তারপর ধুমধামে বউভাত। স্কুল বাড়ি ভাড়া নিয়ে কত ঘটাপটা!

সময়টা ১৯৮৪। কেটারিংয়ের দিন এসে গেছে। কিন্তু পল্টু দত্ত তো ১৯২৩ সালে জন্মেছেন, ১৯৫০-এ বিয়ে করেছেন। বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ যে কোনো অনুষ্ঠানে তাঁদের সময়ের নিয়ম মেনে চলেছেন।

দীপ আর শিবানীর বিয়ের সময়ে স্কুলবাড়ি ভাড়া নিয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ডেকে ধুমধামে খাইয়েছেন।

ওই সময়ে পল্টু দত্তের খুব মনে থাকত, তাঁর বিয়েতে বৌভাতে কি কি খাওয়ান হয়। এ বাড়িতে উৎসবের খাদ্যতালিকা তেমনই চলে আসছে। পোলাও থাকবে মাছের সঙ্গে। মাংসের সঙ্গে লুচি। কিন্তু শুরু হবে ধপধপে সাদা ঘি-ছিটানো ভাত, শাক, ছ্যাঁচড়া, তিন রকম ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, নিরামিষ ডাল, তারপর পোলাও এবং মাছ, তারপর মাংস এবং লুচি, চাটনি, দইয়ের সঙ্গে বোঁদে। দু'তিন রকম মিষ্টি।

বিজয়ব্রজ ও নীতিন এ বাড়ির কাজে ভোরবেলা কোলে বাজার থেকে কিনবেন বড় বড় কাতলা এবং কসবার মাংস।

যাকে বলা হত যজ্ঞি। করবীর মা আর মামিমা, বেশ ক'জন গিন্নিবান্নি নিয়ে যজ্ঞি সামলাতে আসতেন।

শিবানী ও দীপের বিয়ে ১৯৭৬ সালে। শিবানী সুন্দর নাক কুঁচকে বলেছিল, এ বড়ই অপচয় বাবা!

পল্টু হেসে বলেছিলেন, তোমরা তো করছ না, করছি আমি। আমার আনন্দ।

করবী বলতেন, ওই রকম মানুষ! কি করবে বলো।

—এই এত লোকজন। সকলেই আপনজন? তখনই তো করবী দেখতে পাচ্ছিলেন, সময় পালটে যাচ্ছে, বাবা-মা এবং একটি সন্তানের ছোট্ট ইউনিট চলে এসেছে মানসিকতায়।

বলেছিলেন, কে আপনজন নয়? দীপরা তো দেখেছে, পিসি মাসি মামা দিদিমা সবাই

আসছেন, থাকছেন। কলকাতায় বাড়ি থাকলে মানুষজন বাইরে থেকে আসবেই। দীপের বাবার বন্ধুরা? ওঁরা তো পরিবারেরই লোক।

—আমাদের আদর্শ কিন্তু...মিনি পরিবার!

—সেও তো ভালই!

কিন্তু গালিচায় সেজেগুজে বসে গয়নাগাঁটি উপহার নিতে শিবানীর খারাপ লাগে নি। দুপুরে পাতে পাতে ভাত দিতেও খারাপ লাগেনি।

দীপের বৌভাত, নীলার বিয়ে ১৯৭৭-এ। এরপর পন্টু আর হইচই করবার সুযোগ পান নি।

আবির আর বুবলা আবার সেই সুযোগটা এনে দেয় ১৯৮৪ সালে। ততদিনে পন্টু দত্তের দম কমেছে, সামর্থও।

তবু পাড়ার প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল ভাড়া নেওয়া হয়। দীপের মতো ঘটাপটা না হলেও, ভালোই হয় আয়োজন।

শুধু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অনেক কম। ততদিনে দীপ ও শিবানীর একমাত্র মেয়ে দিয়া জন্মেছে। 'সম্পর্ক' শব্দটার মানে প্রত্যহ বদলাচ্ছে।

শিবানী ও দীপের বিয়ের সময়ে ওরা দুজনেই বিজ্ঞাপন আপিসে কপি রাইটার।

তারপর কত তাড়াতাড়ি সব অন্যরকম হয়ে গেল। শিবানীর দাদা মিত্রদের জমি ও বাড়ির ফার্মে ঢুকে গেল। ফ্ল্যাট তৈরি করা ও বেচা যে এত লাভজনক তা দেখে শিবানীর বাবা তাঁর বাড়ি বেচে ছেলের হাতে টাকা তুলে দিলেন। পন্টু তো অবাক।

—বাড়ি বেচে ফ্ল্যাট?

—সময়ের সঙ্গে তো চলতে হবে। মানলাম আমাদের বাড়ি বড়। কিন্তু সম্পত্তি তো জয়েন্ট। আমার কাকার ছেলেরা, আমরা একমত হয়েই...

—তবু...

করবী পন্টুকে অবাক করে বললেন, ভালোই তো! একই বাড়িতে থাকতেন, বহুকাল হাঁড়ি আলাদা। এখন একটা দশতলা বাড়িতে যে যার ফ্ল্যাটে থাকবেন।

—কিন্তু...

—এখন আর তোমার মতো ভাবনা করে না লোকে, সব ছিমছাম, হাতের কাছে সব, ঝরঝরে জীবনযাত্রা।

—শিবানীও কি...

—ফ্ল্যাট তো পাবেই। দিনকাল বদলে গেছে। কন্যাসন্তানকে বঞ্চনা করলে ফেঁসে যাবেন। আপনি এ বাড়ি বেচলে মেয়ের ভাগও থাকবে। হ্যাঁ, দীপ ও শিবানী 'বারিধি' অ্যাপার্টমেন্টেই চলে যায়। কিছুকাল দীপ আর শিবানী ভেজিটেবল-ডাই রঙ নিয়ে কি সব শেখে টেখে। তারপর ওদের বাড়ির উলটো দিকেই ওদের ভেজিটেবল-ডাই শাড়ি, কামিজ, কুর্তা, সালোয়ার, লুঙ্গি ইত্যাদির মাঝারি, লাভজনক দোকান। এখন রমরমা বেশি।

বাইরে থেকে আনে ও বেচে।

করবীর মনে কোথাও উদ্বেগ থাকে দীপের মেয়ের জন্যে।

তাঁদের একতম তৃতীয় পুরুষ। অবশ্য মেয়ের দুটি মেয়ে আছে।

আছে নিশ্চয়, কিন্তু অনেক দূরে।

দীপের মেয়ের বেলা পল্টু নাম দিয়েছিলেন প্রমদ্বরা।

করবী বলেছিলেন, নামটা ওরাই দিক না?

কৌশল করালাম, বুঝলে না? দীপাঞ্জন একজনকে 'দীপ' করতে পার। প্রমদ্বরাকে কি করবে?

কাউকে কিছু করতে হয়নি।

দীপ ডাকত, দিয়া! দিয়া!

মেয়ের নাম দিয়াই হল।

দিয়া!

ওই নামটি ঘিরে করবীর উদ্বেগ থাকে। শুধু মনে হয়, দিয়ার কি হবে!

বয়স তো মোটে চব্বিশ। এর মধ্যে কত না অভিজ্ঞতা হল!

বৌভাতের পাট মিটেছিল। বুবলার মা-বাবা তাঁদের অসম্মতি ও অমত তো বহুদিন জানিয়ে রেখেছিলেন। শত নিমন্ত্রণেও আসেন নি। বুবলার দাদা এসে একটা গলার হার দিয়ে গেল। বলে গেল, কিছুই খেতে পারব না, শরীর ভাল নেই।

কেন যে ওঁদের এ বিয়েতে এত বাধা ছিল, করবী জানতেন না।

পরে শুনেছেন, আবির কোনো কাজের মতো কাজ করে না। বংশের কৌলীন্যও নেই! কেন না সবাই জানে করবীর কাকা কোন বিধবা নার্সকে বিয়ে করেছিলেন সেই কবে! নার্সটির একটি শিশু কন্যাও ছিল।

করবী অবাক হয়ে বলেছিলেন, কাকা নেভিতে ছিলেন, বিয়ে করেন ব্যাঙ্গালোর। বাড়ি করেন বম্বেতে। তিনি তো সম্পর্ক রাখতেন না?

পল্টু বললেন, মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় না। কাজ করবে, বাপ-মাকে দেখবে, তাই চায়। বিনয় যে কাঠগোঁয়ার, সে আমি জানি না?

আজ করবীর মনে হয়, বুবলার বাপের বাড়িও নেই। আবিরের সঙ্গেও...

অথচ বিয়ের পর ওরা এখানেই ছিল। পল্টু সবসময়ে বলতেন, এ বাড়িতে বুবলা নাম চলবে না। এমন সুন্দর নাম পারমিতা, সে নামেই ডাকবে।

বুবলা! দীপাঞ্জন দীপ। আর নীলাঞ্জনা নীলি. ইস! ভাল ভাল নামগুলির কি অপচয়!

সব নাম পল্টু দত্তের রাখা। অভিধান খুলে নাম বেছে রাখতেন। চেনাজানা সকলকে নবজাতক বা জাতিকার নাম বিতরণ করতেন।

আবির বলত, বাবার নাম প্রমোদচন্দ্র আর ডাক নাম পল্টু, বাবা ক্ষেপে আছে কবে থেকে!

হ্যাঁ, ছিল এক সময়! সুন্দর সুন্দর বাংলা নামের সময়! নাম হয়তো এখনও দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের কল্যাণে ডোডো, তোতো, তাতা, তিন্নি, মিম, রী ইত্যাদি ইত্যাদি নামই এখন মুখে মুখে ফেরে।

তা সেদিন তো বুবলা ঘরে বসে।

সেদিন পল্টু দত্ত বেঁচে নেই। বুবলা তখন আর আবিরের বউ নয়। নীলির ফোনটা তখন আসে। খুব বৃষ্টি ছিল। বুবলা এসেও পড়ে, থেকে যেতে বাধ্যও হয়।

বৃষ্টি! বৃষ্টি! রাস্তার জল, ট্রাম বাস বন্ধ! বুবলা গোলপার্কের হস্টেলে ফিরতেও পারবে

না। বুবলা বসে আছে। তা ভুলে গিয়ে করবী নীলিকে বলেছিলেন, না নীলি! প্লেনে আমি যাব না। তোমার বাবার সঙ্গে যখন যাওয়া হয়নি...

থাক ওসব কথা! তোমার বাবার বড় শখ ছিল...ওঁর এত সাধ' প্লেনে যাবেন...

ফোন নামিয়ে রেখে করবী বাথরুমে গেলেন, মুখ চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। মুখ মুছে বেরিয়ে এসে বললেন, চল বুবলা, খেয়ে নিই।

—আমি সুরভিদিকে বলছি।

বুবলা নেমে গেল। এ বাড়িতেই তো ছিল। সকলেই ভালোবেসেছিল। পল্টু দত্ত সর্বদা খুঁজতেন ওকে!

—পারমিতা! একটা তোয়ালে দাও তো মা!

—পারমিতা! তোমার স্কুলের সময় হয়ে গেল!

—আমার সামনে ওকে 'বুবলা' বোল না। বুবলা হেসে বলত। মায়ের নামটি কি সুন্দর। বলুন তো? ডাকনামের দরকারই হয়নি!

—ডাকনাম ছিল কি না, ওঁকেই জিজ্ঞেস কর। ওদের বাড়িতেও নামের বেশ কার্পণ্য। ইনি বড় খুকি, মালতী ছোট খুকি, অতসী রাঙা খুকি! আর দুই ভাই আনন্দ আর আশিস, বড় খোকা আর ছোট খোকা!

—ছাড়ো তো সেকালের কথা!

কত আনন্দের ছিল সে সব দিন!

কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পল্টু দত্ত কি কম শোক পেয়ে গেলেন? আবির আর বুবলার বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯৮৮ সালে। সন্তানরা পিতামাতাকে এমন শাস্তি কেন দেয়? বুবলা একটি ছোট প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়ে চলছিল। পরে ছেড়ে দেয়। আবির জুট টেকনোলজির কাজ ছেড়ে দিয়ে ওর বন্ধু জয়ের সঙ্গে ভারতীয় কিউরিও সংগ্রহ ও বিদেশে চালানের কাজে মেতে উঠল।

রাতে ওদের কথাবার্তা বেশ শোনা যেত!

আবির—জান, এবারকার অর্ডারে আমি আট হাজার টাকা পাচ্ছি?

বুবলা কি বলত, শোনা যেত না। ওর গলা ধীরে ধীরে ওপরে উঠত।

—একটা সন্ধ্যাও তুমি বেরতে পার না কেন?

—আমার খাতা দেখতে হয় আবির?

—তা বলে কোনোদিন কোথাও বেরনো যায় না? বিয়ের আগে কি ঘোরাঘুরি করতে, মনে আছে?

—হ্যাঁ, বাইশ বছর বয়স থেকে...

—কেমন ঘরকুনো হয়ে গেছ!

—বাঃ! পুজোর ছুটিতে হিমাচল ঘুরলাম! গরমের ছুটিতে কেরালা! আমাদের বেরনো মানে তো গণেশ খুঁজে বেড়ানো।

—বাইরে যাব, খেয়ে ফিরব!

—চল! খাতা নয় রাতে দেখব।

—না, কি দরকার!

পল্টু ও করবী এ-ওর দিকে তাকাতেন।

অবশেষে পল্টুই ডাকতেন ছেলেকে।

—কি বলছ, বাবা!

—সুরভি তো যাবে মেয়েকে দেখতে। আমার খুব ইচ্ছা, তোর মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করি।

—কর না!

—না, নির্জনতা চাই। আমার ইচ্ছা, তুমি আর পারমিতা ঘন্টা তিন চার ঘুরে এস।

আবির কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসেই ফেলত। তারপর একসময় ওরা বেরিয়ে যেত।

করবী যখন নীলির ফোন নামিয়ে রেখে বুবলার সঙ্গে খেতে নেমে গেলেন, দুজনের মধ্যে কোনো অন্তরঙ্গ কথাই হয়নি। নেমে গেলেন দেড়তলাতে। পল্টুর শখে দেড়তলাতে রান্নার ঘর, খাওয়ার ঘর।

বুবলা একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারপর এগিয়ে এসে বসল। এ ঘরটা তেমনই আছে আজও। জানলার পর্দা পালটে গেছে। এক পাশে সাইনবোর্ড। করবী বুঝতে পারছিলেন, বুবলার ভিতরে কোন তোলপাড় চলছে। চলতেই পারে। চার বছরের মধ্যেই ওদের বিয়ে ভেঙে যায়। কতকাল দেখা নাই। তারপর যোগাযোগ, সেও পল্টুকে কেন্দ্র করে। সে যোগাযোগের পরেও আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ পল্টুর মৃত্যুর পর বুবলা ওঁকে একটা চিঠি লিখেছিল। ঠিকানা দেয় নি।

আজ কলকাতা ডুবে আছে। বুবলা রাস্তা দিয়ে জল ভেঙে যাচ্ছিল। শেষে বারান্দার নিচে ফুটপাথে দাঁড়ায়। করবীর কি মনে হল, সুরভিকে বললেন, পারমিতা নিচে দাঁড়িয়ে ভিজছে। ওকে ডেকে আন।

—ওকে?

—হ্যাঁ সুরভি। সন্ধে হয়ে এসেছে। রিকশাও চলছে না। পথের ওদিকটা খোঁড়াখুঁড়ি চলেছিল, পা পিছলে পড়ে যেতে পারে।

—আশ্চর্য কথা বাপু! যে ছেড়ে চলে গেছে...

—ডেকে আন। আর ও সব কথা আমার সামনে বলবি না।

—যা বলো! তোমার বাড়ি!

করবীর বলতে ইচ্ছে হল, হ্যাঁ, আমারই বাড়ি! আজ উনি নেই, দীপ তার নিজের ফ্ল্যাটে থাকে, আবির থাকে দিল্লীতে। নীলি কবেই চলে গিয়েছে লন্ডনে। বাড়ি তো আমারই এখন। ইস্কুল থেকেও অবসর নিয়েছি। বিশাল স্বাধীনতা আমার। কিন্তু এত একলা হয়ে যেতে তো চাইনি।

পারমিতা একটা কথাও না বলে উঠে এসেছিল। তিরিশ বছরে বিয়ে হয়েছিল। এখন তো অনেক বয়েস। শ্যামলা রং, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চোখে মুখে ঘরোয়া লাবণ্য। চোখের পল্লব খুব ঘন। চুল কালো, চোখ বাদামি।

না, সালোয়ার কামিজ পরতে দেখেন নি। শাড়িই পরত। গুর্জরী ছাপা শাড়ি। মোটা একটা বেণী, পায়ে চটি। এক হাতে একটা মোটা বালা, আরেক হাতে ঘড়ি।

১৯৮৪-তে বিয়ে, ১৯৮৮-তে বিচ্ছেদ, ওই বছরগুলো যদি ভুলে যাওয়া যায়, তাহলে

আজকের দৃশ্যকে স্বাভাবিকই মনে হতে পারত। তা তো নয়। বুবলা ওর আর আবিরের সেরামিকের ডিনার সেট (জয় দিয়েছিল) করবীর শখে কেনা পাতলা কাচের সুদৃশ্য গ্লাস। দীপ তো তার বিয়ের উপহারগুলো নেয়নি।

বুবলা যেন বুঝতে পারল। করবীকে একটা মিউজিয়াম সামলে রাখতে হচ্ছে।

সুরভি সামান্য সময় নিল। তারপর বলল, বুটি আর একটা তরকারি! ঢেঁড়স ভাজলাম। একসময় ঢেঁড়স ভাজা তো ভালবাসতে!

করবী ভাবলেন, দেখ! সুরভি কেমন মনে রেখেছে। তাঁর তো মনে ছিল না বুবলা ঢেঁড়স ভাজা ভালবাসত।

—তোমরা খাচ্ছ না কেন?

—খাচ্ছি। সুরভি, ওকে একটু চাটনি দিও।

বুবলা অস্ফুটে বলল, আপনি নেবেন না?

—নেব একটু। খাও।

—হ্যাঁ।

নিশ্বাস ফেলে বুবলা উঠল। ঘরের কোণের বেসিনে হাত ধুয়ে নিল। না, এ বাড়ির নিয়মকানুন ঠিকই রয়ে গেছে। একরকম। হাত ধোবার জন্য ছোট 'জয়' বা লাক্স। হাত মোছার জন্য হ্যান্ডলুমের ছোট তোয়ালে। দেয়ালের তিন দিকে তিনটে বাঁধান ছবি। একটিতে এক সাজি ফুল, একটিতে আবিরের বন্ধু গগনের আঁকা গাছ, আরেকটি হল কোনো ক্যালেন্ডার থেকে কেটে বাঁধান প্রাচীন কলকাতার ঘোড়ায় টানা ট্রামের ছবি। বুবলার মন বলল। স—ব একরকম আছে কেন?

বাইরে বৃষ্টি, একটি টেবিলের দু'ধারে বসে আছেন দুই মহিলা। একজন একদা শাশুড়ি ছিলেন অপরজনের। অপর জন ছিল পুত্রবধূ। আজ সে সম্পর্ক নেই। বৃষ্টিই কি বুবলাকে তাড়িয়ে এনেছে আজ? দুজনেই এককথাই ভাবলেন।

করবী এই ২০০০ সালের নভেম্বরেই সত্তর পার করবেন। কিন্তু বুবলা ভালই জানে, আবিরের মা মনে মনে যথেষ্ট তরুণ। বুবলা ১৯৮৮-তে এই বাড়ি ছেড়ে গেছে। কত বছর হল?

করবী আজ রাতে যেন জাদুশক্তি পেয়েছেন। বুবলাকে চমকে দিয়ে বললেন, তা বারো বছর হয়ে গেল বুবলা! 'এক যুগ' বলতাম আমরা। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ তো হয়ে গেল আবিরের বাবা থাকতেই। সেই বিপদের দিনে তুমি না থাকলে...আর আজ তুমি কোন মতে ফিরতে পারতে না। জানি না, সকালেও বিষ্টি হবে কি না!

সুরভি আবার ঢুকল চাটনি নিয়ে। বলল, কি যে বলো? মঙ্গলবারে জল নামলে বিষ্যুতে ছাড়ে। সে ধর পরশু ছাড়বে।

—কাল তো অনিমা আসতেই পারবে না।

—পারে কখনও? সেই কোথা থেকে আসে।

—তুমি আর মানব খেয়ে নাও গে। আলো থাকবে বলে মনে করি না।

—মানব ফেরে নি। ফিরবে কি করে? কি দুর্যোগ বলো! তবু ভাল যে ঝড় হয় নি। জলের সময় জল দিবি, অসময়ে আকাশ ঢালছে দেখ।

—খাও বুবলা।

—হ্যাঁ, খাচ্ছি।

—ফিরতে না পার, এখান থেকেই কাজে যেও।

—কোন্ ঘরে শোবে বউদি?

—বুবলা আমার ঘরেই শোবে। আরেকটা খাট তো আছে।

বুবলার দিকে না চেয়েই বললেন, মালতী মাঝে মাঝে আসে। থেকে যায়। আর...নিচটা ভাড়া দিলেও ওপরে চারটে ঘর। বড় বেশি জায়গা!

—হ্যাঁ! গ্রিলের দরজা করিয়েছেন সিঁড়ির মুখে ওপরেও।

করবী ঈষৎ হাসলেন। বললেন, সবাই সাবধান হতে বলে। অথচ সবাই জানে এ বাড়িতে চুরি করার মতো আজ কিছু নেই। 'করুণা টেলারিং'-কে একতলা ভাড়া দিলাম দশ বছর আগে। ওদের দোকান এখন খুব বড়। এখানে সারাবছর স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরি হয়। ওদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বিজয় বাবু!

—আপনি এখন আর 'আহ্বান' সেন্টারে যান না?

—যাই। সোম, বুধ আর শুক্র। অফিসে বসি।

—পড়ান না?

—ছাত্রী পাই না। খাওয়া হয়ে গেল? চল, উঠি।

বুবলা হঠাৎ বলে ফেলল, সেই ছবিগুলো এখন রেখেছেন?

করবী একটু হেসে বললেন, আছে, তাই থেকে গেছে। বাড়ি নতুন করে সাজানর ইচ্ছা তো নেই! ঘোড়ায় টানা ট্রামের ছবিটা তুমি পছন্দ করতে। নেবে?

—আমি? আমাদের হস্টেলে এক ঘরে তিন জন আছি। জায়গা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে করবীর মনে হল, ওঁর বাড়িতে জায়গা অনেক। অনে—ক! থাকবার মানুষ বড় কম।

বুবলা ওঁর একটা শাড়ি আর ঢলঢলে জামা পরে বসে আছে। মায়া হল। খুবই মায়া হল।

—চল বুবলা ঘরে যাই।

—কাল বৃষ্টি যদি না ধরে?

—ধরবে না। বেরতে পারবে না। কাজের জায়গায় ফোন করে দিও, হস্টেলেও।

—আমাদের তো রুগি নিয়ে কারবার! আমার কাজ...অফিসের। না গেলে শুনতে হবে, বৃষ্টি দেখে থেকে গেলে না কেন!

—পারলে যেও।

দুজনেই ওপরে উঠে এলেন। করবী স্বগত বললেন, ঠিকে লোক তো আসবে না, মানবও ফিরল না।

—নিরাপদ তো? এমন একলা থাকেন? করবী হেসে ফেললেন—বিপদ কিছু হয় নি। আর নিচে করুণা টেলারিংয়ের দুজন থাকে। আছিও অনেক কাল। নাও। এলাচ খাবে?

—দিন।

—চুল আঁচড়ে ঢিলা বেণী বেঁধে নাও। তারপর শুয়ে পড়। রাতে কিন্তু একটা নো পাওয়ার বালব্ জ্বলে। অসুবিধা হবে না তো?

—না...আবির আসে না?

—গত বছর দু'দিন। শুধু ঘুরে বেড়ায়। একজিবিশান করে। এ বছর না কি নেপালে থাকছে বেশি। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে?

—মাঝে মাঝে একটা পিকচার কার্ড। ওর কিন্তু বেশ নাম হয়েছে।

—তোমার মা-বাবার খবর কি?

—বাড়ি প্রোমোটারকে দিয়ে ছিলেন। চারটে ফ্ল্যাট পেয়েছেন। দাদা, ছোড়দা ও তপোব্রতর।

—তোমার বড়দাদার ছেলে!

—হ্যাঁ।

—তোমার কথা ভাবলেন না?

—আমি তো ওঁদের বাধ্য মেয়ে ছিলাম না!

করবী একটা ওষুধ ও জল খেলেন। তারপর বললেন,—অমন কুণ্ঠিত হয়ে থেক না বুবলা। সংকোচের কি আছে? আজকাল এ রকম বিবাহবিচ্ছেদ আখছার হয়। অবশ্য তারপর বউ ও শাশুড়ি...কিন্তু আমরা তো ঠিক বৌ ও শাশুড়ি নই। বিয়ের কত আগে থেকে এসেছ...

বুবলা মুখ ফিরিয়ে থাকল।

—সময় তো বদলে গেছে। আজ একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আসতে বাধ্য হয়েছ।

—খুব অপ্রস্তুত লাগছে।

করবী নিশ্বাস ফেললেন, না লাগলেই ভাল বুবলা! উনি চলে যাবার পর চিঠি লিখেছিলে...বৃষ্টি পড়ছে। বড় ঘরে দরজার ওপর জানলাগুলোর ওপর লাল-নীল-হলুদ কাচের ডিজাইন।

—ঘরের রং সাদা হয়ে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

—নইলে আলো তেমন খোলে না।

—ওঁর ঘরটা বন্ধ থাকে?

—মাঝে মাঝে 'আশ্বাস'-এর ঘরোয়া মিটিং হয়!

—আপনার কথা আমার খুব মনে হয়।

—এলেই পার। সহজ হও। অসহজ হয়ে কি লাভ আছে কিছু? এখন এ রকমই হবে সম্পর্ক।

—হ্যাঁ, আপনি তখনও বলেছিলেন।

—অথচ আস নি।

—আবিরের বাবার জন্য আসি নি। ফোনও করি নি। উনি তখন আঘাত পেলেন!

—হ্যাঁ, উনি তো অন্যরকম ছিলেন!

করবী জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। সুদূর শৈশবের ও বালিকা বয়সের কথা মনে পড়ে। কোথায় চলে গেল সে সব দিন! করবীর বাবা রংপুরে ছিলেন তিন বছর। বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ত দিনের পর দিন। মা ভিজতে ভিজতে রান্নাঘরে যেতেন আর আসতেন। করবীদের গার্জেন এবং সকল কাজের সৈনিক ঝগরু চলত নিজের মাথায় গামছা বেঁধে, মায়ের মাথায় ছাতা ধরে।

আসার সময়ে মা ধরতেন ছাতা, ঝগরু বয়ে আনত ভাতের ডেকচি। মাংসের ঝোলের

ডেকচি। বর্ষা যখন এমন টানা চলবে, তখন খিচুড়ি তো রোজ চলে না!

বৃষ্টি চলছে চলছে, করবী এক পা তুলে নেচে নেচে

'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

ধান দেব মেপে'—ছড়া বলছিলেন, মায়ের হাতে চড় খেয়েছিলেন। করবী চেঁচিয়ে বলেছিলেন, আমি তো বৃষ্টি থামবার জন্য ছড়া বলছিলাম! 'নেবু পাতায় করমচা / হেই বৃষ্টি থেমে যা' তা তুমি বলতেই দিলে না। রংপুরে বড় সুখে ছিলেন করবী। ইস্কুলটা বাড়ির পাশে। কত না গাছ গাছালি! করবীদের বাড়িতে জবা, টগর, শিউলি, অপরাজিতা...

—শুয়ে পড়ুন!

—হ্যাঁ বুবলা...তুমি এলে...নইলে তো একাই থাকি। মালতী অবশ্য মাঝে মাঝে আসে।

—আপনার ছোট বোন?

—অতসী আবিরের বাবার মৃত্যুর পরে পরেই চলে গেছে। হার্টে ব্লক হল! থাকলেও ওর আসা হত না। কুচবিহার থেকে যাওয়া আসা! স্বামী-স্ত্রীর চাকরি, তাতে ছেলে চলে গেল আমেরিকা! মেয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়া!

ওঁর স্বামী একা হয়ে গেলেন।

শৈবাল বেশ সামলে থাকতে পারে। ওর ক্লাব আছে। বন্ধুবান্ধবও অনেক! একতলা ডাক্তারকে ভাড়া দিয়েছে। রাজনীতিতেও আছে। অতসীর বৌমার দিদিকে তুমি চিনবে। বিশাখা নাম ছিল। তোমার সঙ্গে...

—কলেজে পড়ত।

—এবার শুয়ে পড়া যাক।

শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে করবী বললেন, তুমি আবার বিয়ে করার কথা ভাব না?

—আবার!

—একেবারে একা একা বাঁচা খুব ক্লান্তিকর বুবলা!

—আপনি তো একাই আছেন।

—ছেলেরা, শিবানী ওদের দরকারে পাব। 'আশ্বাস' কেন্দ্রে একটি মেয়ে আসে, ডিভোর্সি, তায় মেয়ের মা! আমরা খুব বুঝি, ও ঠিক কেরিয়ার নিয়ে বেঁচে থাকার মতো মনের জোর রাখে না। রঞ্জা খুব আসে।

—হ্যাঁ...ঘুমোই।

দুই

করবীর ঘুম আসে নি অনেকক্ষণ!

স্বামীর ছবিটা দেখলেই কষ্ট হয় বেশি। তাঁর তো আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্যরকম! ছেলেরা বিয়ে করবে, বৌরা থাকবে। চাকরি করতে চায় তো করতেই পারে। পন্টু দত্ত, যাকে বলে উদারচেতা। করবীও তো 'প্রতিভা বিদ্যাপীঠে' প্রাথমিক বিভাগে কাজ করতেন।

পন্টু বলতেন, সোজা কথা নয়। পুত্রবধূরা এসে দেখেছে শাশুড়িও কাজ করতে বাইরে যান।

বাইরে বলতে দূরে নয়। পাড়ার ইস্কুল প্রতিভা বিদ্যাপীঠ। এক সময়ে ভালো ছিল পাশের হার। কাছেই স্কুল, করবী যেতেন। সে সময়ে পল্টুর সহযোগিতা ছিল অসামান্য। করবী যখন ফিরতেন, স্বামী বেরিয়ে যেতেন ব্যাঙ্কে। তখন বাড়ি একতলা। ১৯৫০-এর কলকাতায় কাজের লোকজনও মিলত। সুরভির মা আর সুরভি সারাদিন কাজ করে ফিরে যেত।

পরে সুরভির পনেরো না হতে বিয়ে নিয়ে পল্টু খুব অসন্তুষ্ট হল। অদ্ভুত জীবনের আবর্তন; কত পরে সুরভি ওর ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানেই আসে। ওর মা ওদের নিয়ে আসে।

—কোথায় যাইতাম বৌদি? কি করতাম? বিনবিন করে কাঁদছিল সুরভির মা, বলে যাচ্ছিল কাঁপা ও সুরেলা গলায়—ইলেকটিক মেস্তারির জীবন! বিয়াবাড়িতে পেনডাল-এর কাম করতে আছিল, কে জানত এমন নিদারুণে শক খাইয়া মরবে! দিছে, কোম্পানি দু'হাজার টাকা দিছে, কিন্তুক অরে রাখাই তো মুশকিল! মাইনা লাগব না, থাকব, কাম করব, খাইব, উয়াতেই মেলা! আমি যে অবাগিনি! একখানা ঘর, পোলা থাকে, আমি থাকি দাওয়ায়। অরে লইয়া...!

—তোমার সেই ছেলে কোথায়? যাকে বাড়ি করতে টাকা দিলাম?

দাদা! হেয় ত বউ লইয়্যা চইলা গেল! নিজেরোই পোলা, কিন্তুক দুইটাই বেইমান। পায়ে ধরি দাদা! আপনাদের লাখান মানুষ দেখি নাই!

করবীর জীবনে কত না ঘটনা, কত না অদ্ভুত সব ব্যাপারের সমাহার! সুরভি সিঁড়ির নিচে থাকার জায়গা পেল। পল্টু বললেন, যেমন হয়, রঙিন কাপড় একটা দাও ওকে। তাকান যাচ্ছে না যেন। আর পড়াও ওকে।

রঙিন কাপড় পরা, মাছ খাওয়া, ইত্যাদিতে খুব তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে গেল সুরভি। ওর লেখাপড়া প্রথমভাগেই আটকে থাকে। তবে প্রথমে মেয়ে খানিকটা শেখে করবীর স্কুলে। মানবও ভর্তি হয় খুব তাড়াতাড়ি ছেলে ও মেয়ে জায়গা পেল সিঁড়ির উপরের ঘরে। সুরভির মেয়ে রিনা সালোয়ার কামিজ পরে স্কুলে যাচ্ছিল। লেখাপড়া ও সেলাই শেখা। অতএব ওকে সরোজনলিনীতে ভর্তি করাও হয়। কিন্তু রিনা স্কুলে যাবার নাম করে রাস্তায় ঘুরছে জেনে সুরভি মেয়েকে ঘরে বসাল। করবী একবারও বলেন নি, মেয়ের মতো থাকবে এখানে।

পল্টু একথা বলতেন, মাঝে মাঝে। রিনা মুখ নিচু করে পায়ের নখ খুঁটত। ছেলেমেয়েকে শেখান, ওকে রিনাদিদি বলবি।

রিনা দীপকে বলত, ছাড়ো তো! কিসের দিদি? তোমাদের খাটে ঘুমাই? তোমাদের সঙ্গে খাই? এ কথার যৌক্তিকতা করবীর গালে চড় মারে। না, এমন নেকামো করা অন্যায়। সত্যিই কিছু রিনা ওঁদের মেয়ে নয়। নতুন সালোয়ার দিলে সুরভিও বলে, কি লাভ মামি? পল্টুকে দাদা এবং করবীকে বৌদি বলে সুরভির মা। অতএব সুরভি ওঁদের মামা ও মামি বলে।

—লাভক্ষতি আবার কি? একটা নতুন পোশাক মাত্র!

—না মামি! ও মেয়ের বাক্সে নখপালিশ, ঠোঁটের রং, সব আছে। নতুন নতুন জামা কাপড়ে মাথা বিগড়ে যাবে। বোঝ না তুমি?' ওর বিয়ের বাই চেগেছে।

হ্যাঁ, রিনাকে নিয়ে আড়াই/তিন বছর বহু ঝামেলা হয়। অতঃপর পাড়ার ইলেকট্রিক দোকানের মিস্ত্রি, রিনার মনের মানুষ যে, তার সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া হয়।

ষোলো না পুরতে বিয়ে! করবী ও পল্টুর মতে জেনে শুনে পাপ করা! সুরভি বলল, রাখ

তো? ওর বাপ থাকলে দু'বছর আগে, বিয়ে দিতাম। দুঃখ এই, এ-ও ইলেকটিক মিস্তিরি। ভাগ্যে ছেলেটি ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিল। তাই ওকে একটা লাইসেন্স করে দেওয়া যায়। পল্টু দত্তের বন্ধু রাখালব্রজ। তাঁর ভাই বিজয়ব্রজ সুরভির জামাই মোহনকে এক নির্মীয়মাণ হাউসিং প্রকল্পে কাজ জুটিয়ে দেন কনট্রাক্টর ফার্মে। আজ রিনার বর নিত্যনতুন প্রোমোটারদের স্নেহভাজন ও পঞ্চসায়রে ছোট্ট একটি বাড়ি করেছে। রিনার মেয়ে ওখানকার স্থানীয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। রিকশাভ্যানে ইস্কুল যায়। রিনা কচিৎ কখনও আসে। কানে সোনার রিং ও নাইলন পরে।

সুরভি যায়। দিনে দিনে ফিরে আসে।

মানব যায়। দিনে দিনে ফিরে আসে।

জামাই সন্ধ্যার পর মদ খায়। যে বিষয়ে রিনা খুব প্রশ্রয়শীল। বলে, 'পুরুষ মানুষ! খাটাখাটনি করে খেলেই বা!'

মানবই বাড়ির ছেলে হয়ে গেল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে কাজ জোগাড় করে দিল দীপ। ও জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির বাড়বাড়ন্ত হয়। সে কারণে মনিব ওকে পয়মন্ত মনে করে। মানব করবীদের টেলিফোন ও ইলেকট্রিক বিল দেয়। দরকারে মেরামতি মিস্ত্রি আনে। অনেক কাজ করে। বাড়ির কেয়ারটেকার বলতে গেলে। ছেলেদের পড়ার ঘরটিতে ও থাকে। যাতে রাতে করবীকে দেখাশোনা করতে পারে। পল্টুর মৃত্যুর সময় ও খুব করেছে।

সুরভির ইচ্ছা ছেলের বিয়ে দেয়। মানব বলে, হবে হবে।

সুরভির ইচ্ছা ও মনে চেপে রাখেনি। বলে সোনারপুরে তখন যে জমি দাদা কিনে দিল, সেখানে একটা ঘর তুলে নিলে হোত। তা মানব বলে, থাকতে পারব না। এতকাল শহরে থেকে...

করবী জানেন সুরভির মনের কথা। বলেন, তোমাকে আমি ভাসিয়ে যাব না। একটা সার্টিফিকেটের টাকা পেলে একতলায় পেছন দিকে বাথরুম, রান্নাঘর করে লিখে দেব। নয়তো মা-ছেলের নামে আরেকটা সার্টিফিকেট কিনবে! সুরভি নিশ্বাস ফেলে বলে, তা তুমি টনকো আছ। কিন্তু জীবনমরণের কথা মামি! তোমার ছেলেমেয়ে কি...

—বাড়ি তো আমার নামে

—যা হয় কর, ভাসিয়ে দিও না।

—না সুরভি!

বোঝেন ওর উদ্বেগ বোঝেন করবী। এই বাড়িতে বসবাসের কেউ থাকবে না। তাঁর ছেলে দীপ নিজে ফ্ল্যাট কিনেছে, ওখানে ওরা পুরনো হয়ে গেল। আবিরের দিল্লী জোড়া বন্ধু। সেও সরকারি ফ্ল্যাট কিনবে, হয়তো কিনেছে। থাকবে না, এটাই মেনে নিতে হয়। যে যেখানে নোঙর ফেলে। সেখানই থেকে যায়।

বাড়ির মালিক তো করবী। বিজয়ব্রজ মাঝে মাঝে বলেন, প্রোমোটারকে আপনিই দিতে পারতেন। সকলে ফ্ল্যাট পেত। আপনিও পেতেন!

—আর আমি মরলে সে ফ্ল্যাট বেচা হত।

—তাই তো হয়!

বিজয়ব্রজ হা হা করে হেসেছিলেন—আজকাল কে কার সঙ্গে থাকে বলুন?

—থাকবে বা কেন! যে যেখানে কাজ করবে...

—সেই তো কথা! আগে কাজ নিয়ে কেউ রাজ্যের মধ্যে, রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যে যেত। এখন দাদার ছেলে ক্যালিফোর্নিয়া, মেয়ে শিকাগো, আমার জোড়া মেয়ের একজন অস্ট্রেলিয়া, অন্যজন সিঙ্গাপুর আর একতম পুত্র এক পাঞ্জাবিনীকে বিয়ে করে দুন ভ্যালিতে ফরেস্ট ফার্মিং করছে।

—এটা এ সময়ের বাস্তবতা!

—দেখুন!

—দেখুন বই কি!

—ঘটনা তার চেয়েও ঘোরাল! আমাদের পরিবারে মধ্য নাম কুমার বা চন্দ্র বা নাথ নয়, ব্রজ। পল্টুদা কত গাল না, দিত। যাক, ছেলের নাম তো পল্লব।

—সে তো জানি।

—তার ছেলের নাম কি জানেন? ভিক্রম ব্রিজ, অর্থাৎ বিক্রম ব্রজ! আমার পুত্রবধূ বলেছেন, ব্রজ থাকলে নামটা কত মহিমা পায়! যাকগে, পল্লবকে জানালাম, ওই পর্যন্তই থাক। তোমাদের সময় নক্ষত্রগতিতে দৌড়চ্ছে। বিক্রম ব্রজ যখন বড় হবে সেন পদবীটাও বোধ হয় থাকবে না। ব্রিজটা পদবী হয়ে যাবে।

করবী হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, আপনাদের পল্টু 'কালস্য গতি' নামে যে আত্মজীবনী লিখে গেলেন, সেটা ওঁকে ব্যস্ত রাখত।

—হ্যাঁ, আসুন এখন আমিও কলম ধরি! আপনি!

—এখনও তো অনেক কাজ করি, ব্যস্তই থাকি।

কিন্তু আজ নয় তো কাল, বাড়ি'' কথা ভাবতেই হবে। করবীব পূর্তবিভাগীয় এঞ্জিনিয়ার বাবা কাশীপুরে যে 'পূর্বাচল' বাড়ি করে গেলেন, দাদারা তা বেচে দিয়েছে। সেটা এখন একটা ঝাঁ চকচকে হোটেল ও গ্যারেজ। যথারীতি বাড়ির সঙ্গে বাগান ইত্যাদি ছিল। ফলে জমিও অনেক। এ বাড়ি পুরনো, পাড়া, পুরনো, বাড়ির গায়ে বাড়ি। এখানে যা হোক, একটি ছাড়া হাইরাইজ ওঠেনি। বাডির সামনে লেখা 'দত্তভিলা', যদিও দত্তরা সব ছিটে ভিটে চলে গেছে। আর নাম পর্যন্তই। পল্টুই তো বাড়িটা বড় করেন। বাড়ি বলে পল্টু দত্তেরই বড় টান ছিল। এ বাড়িতেই সবাই থাকবে। বাইরে চাকরি করলেও আসবে যাবে। অথচ 'বাইরে' বলতে শুধু কি সাগর পার? ইচ্ছে করলে এক শহরে বাস করেও দূরে। বাইরে থাকা যায়। আবার পাশাপাশি বাস করেও দূরে চলে যায় মানুষ।

তাঁরই তো বোন মালতী, ওর স্বামী সীতাংশুর সঙ্গে কথাই বলে না। ওদের মধ্যে কি নিয়ে মনান্তর, করবী জানেন না।

—তোরা থাকিস কি করে?

—আমার সময় কেটে যায়। আমরা শাড়ি বিক্রির কাজ করি না? তাছাড়া সমিতি করি।

—সীতাংশু কি করে?

—বাবা! করপোরেশনের কাউন্সিলারের তো মিটিং আর জনসভা আর রাতদিন লোক আসে যায়! ও ভালোওবাসে এ সব।

—জয় আসে?

—যখন সময় পায়! ও কাজ করে, বউ কাজ করে। ছেলের পড়া নিয়ে নীরার দুশ্চিন্তা আর টেনশান! ওদের জীবনের কথা ভাবতে গেলে আবার নিজের জীবন কিছু খারাপ লাগে না। করবীর বা কি নিজের জীবন খারাপ লাগে? লাগে না। লাগতে পারত, লাগে না। সত্যি বলতে কি, 'আশ্বাস' সেন্টারে কাজ করেন বলে মহিলাদের নানারকম সমস্যা ও অভিযোগের জগৎটা ওঁকে জীবনে খুব আগ্রহী করেছে। এ এক অজানা জগৎ বলতে গেলে। 'আশ্বাস' কতটা ভরসা জোগাতে পারে। তাই ভাবেন খুব। এখন সমানে ভাবছেন, জীবনটা প্রয়োজনীয় করে তুলবেন কেমন করে।

এবার ভাবতে হবে এর চেয়ে ইতিবাচক কিছু করা যায় কি না। শুচি মেহতা অনেকদিন ধরেই ওঁকে বলছে, আন্টি, আমাদের বয়সী মেয়েদের আনতে হবে। আমরা থাকতে দিতে পারি বড়জোর চার পাঁচজনকে। তাও ঠিক যত্ন নেওয়া হয় না। থাকার ব্যবস্থা এলেবেলে। হ্যাঁ আইনের সাহায্য দিই। কাউনসেলিং করি,—আজকাল যে কোনো কাজই পেশাদারি ভাবে করতে হবে।

—শুচি! তুমি নিজেই পার একটি সেন্টার খুলতে।

—এখনই তো পারব না। জানেন তো, অনেক ব্যাপারে আমি বেশ সেকেলে রয়ে গেলাম! বুমিকে এখনো আয়ার হাতে ছেড়ে রাখতে পারি না। বুমির বাবাকে বা কি বলব! ও তো যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

করবীরও বলার নেই কিছু। মেয়েদের আশ্বাস ও সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যেই 'আশ্বাস' গড়ে তোলা।

তার মূলেও গীতিকা গাঙ্গুলী। বলা যায়, গীতিকা 'আশ্বাস' গড়তে চেয়েছিলেন। করবীরা ওঁর পাশে এসে দাঁড়ান। বস্তুত গীতিকা, দীপিকা, দুই বোনই খুব লেখাপড়ায় ভালো। ওঁদের বাবা জামাইদের কাছেই রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীপিকার স্বামী ইকনমিকসের উজ্জ্বল অধ্যাপক। দীপিকা পড়াতেন ইতিহাস। দুজনেই চলে গেলেন দিল্লী। এখন ওঁদের পরিবার হল জাতীয় সংগীত। দুই জামাইয়ের একজন মারাঠি, একজন পাঞ্জাবী। বাড়ি করেছেন করোলবাগে। নাতি নাতনিরা ভারতীয় বিয়ে করেও অনাবাসী। সকলের সঙ্গে সকলের দিব্যি যাওয়া-আসা আছে। দীপিকা দিল্লীতে কোনো সংগঠনে আছেন।

গীতিকা একদা ডিবেট করতেন। ছাত্র রাজনীতি করেছেন। তারপর আই এ এস করে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে ঢুকলেন। বিয়ে করলেন আরেক আই এ এস কোহ্‌লিকে। আর মেয়ে আনমিতা বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু সুচন্দনকে বিয়ে করে। কোহ্‌লী খুব খুশি। আমার স্ত্রী বাঙালি। কলকাতা একটা মহান নগরী। আমার মেয়ে তো আই এ এস হল না। তবে জামাই কাজ করছে লার্সন টুব্রোতে, মেয়ে জার্নালিজ্‌ম পড়েছে। কোথাও ঢুকবেই ঢুকবে। এমনি করেই তো 'ওয়ান ইন্ডিয়া' ধারণাটা ছড়িয়ে যাবে। আর এই যে কম্পানির ফ্ল্যাটে ওরা থাকবে, সেটাও খুব ভাল। আমরা ওদের জীবনে নাক গলাতে যাব না। তবে হ্যাঁ, তৃতীয় পুরুষের জন্যে আমরা দুজনেই তৃষিত।

সুন্দর, রুচিসম্মত, সুশোভন বিয়ে। রেজেস্ট্রি, সামান্য হোমযজ্ঞ, 'আগুন তো শুদ্ধ করে।'

সুচন্দনদের আলিপুরের বাড়িতে দিন তিনেক নানা রকম রিসেপশান। এগুলো সুচন্দনের বাবা-মা'র তরফে উপহার। উপহার উটিতে সাতদিনের হনিমুন।

আনমিতা বা আন্নু, সুচন্দন বা বাবাই, এদের, বিয়ের গল্পটা টেলি-বিজ্ঞাপনের সুখী দম্পতি, সুখী শিশু. আহ্লাদ ও পরিপূর্ণতায় ডগমগ গীতিকা ও কোহ্লি, সুচন্দনের রোড কন্ট্রাকটর রোটারিয়ান পিতা এবং লেডি'জ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মা। এঁদের মিলিয়ে মিশিয়ে সুন্দর একটা ছবি হতে পারত।

মিনি-পরিবার সুখী পরিবারই তো হবার কথা। এমন স্বামী-স্ত্রীর একটি সন্তানই হবে। এখন শিশু-কন্যার ওপর খুবই জোর দিচ্ছে মিডিয়া। 'সম্পর্ক' শব্দটার ওপর জোর।

যেমন হবার কথা, তেমন হচ্ছে না। গীতিকা সেটা প্রথমে বোঝেন নি। ক্রমে দেখলেন, আনমিতা যদি আসেও, ঘড়ি দেখে সন্ধ্যায় ওকে সুচন্দন নিয়ে যায়। কোনো দিন কোনো কারণেই আনমিতা এখানে রাতে থাকে না। তাও ভালো লাগত। মেয়েকে ছেড়ে জামাই থাকতে পারে না, এরকম ভাবতে মা-বাবার ভাল লাগে।

কোহ্লি মাঝে মাঝে বলতেন, ভোরে গাড়ি নিয়ে বাপ-বেটি ময়দানে যেতাম, হাঁটতাম। এখন ওকে খুব মিস করি।

গীতিকা বলতেন, মিসেসের সঙ্গে হাঁটা। আমাদের জীবন এক রকম। ওদের জীবন আরেকরকম।

—মিসেসের ব্যস্ত জীবন! বাড়িতেই ফ্রি-হ্যান্ড করে নেন! দুজনেই হাসতেন। করবী মনে করতেই পারেন, ওঁদের বাড়িতে আনমিতার নানা বয়সের অনেক ছবি। স্বামী-স্ত্রী হাসতেন আর হাসতেন।

মেয়ে যে নিজের একটা কেরিয়ার করবে, সেটা ওঁরা জানতেনই। সুচন্দনের জন্মদিনে ওদের বাড়ি গিয়ে প্রথম কোথাও একটা ধাক্কা খান। সুচন্দনের বাবার বাড়িতেই পার্টিটা হয়। প্রথমত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ওঁদের চেনাজানা মানুষ বলতে গেলে ছিল না। আনমিতা বাবা-মার কাছে বসতেই পারছিল না। সবটা সময় ওকে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে হচ্ছিল।

সুচন্দনের বাবা, বেয়াই-বেয়ানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময়ে বারবার ভুলে যাচ্ছিলেন স্বামী ও স্ত্রীর কে শিক্ষামন্ত্রকে, কে হোম সেক্রেটারি।

বিশাল হলঘরে কত না জিনিস সাজান। সুচন্দনের বাবা কোহ্লি ও গীতিকাকে সগর্বে দেখাচ্ছিলেন, এই মার্বেলের হাতিটা আমার ঠাকুর্দা কেনেন। ওই যে টিবেটান ওয়াল হ্যাংগিং, ওটাও খুব পুরনো.—

এরপর ওঁরা যখন একটু বসেছেন। বেশ কাছে এসে সুচন্দনের ভগ্নীপতি নিচু গলায় বলল, সব ধাপ্পা! আসলে আভিজাত্য কিনতে চাইছেন, তাই ফ্যামিলির কথা বলছেন। এ সবই এখান ওখান থেকে কেনা।

বাড়ি ফিরে গীতিকা বলেছিলেন, আশা করব সুচন্দন ওর বাবার মত নয়।

—ভাবছ কেন? দেখে কি আন্নুকে অসুখী মনে হল?

—কি জান! কালচারের ব্যাপারে যদি ফারাক থেকে যায়, তাহলেই মুশকিল। আন্নু তো 'মানি কালচার' দেখে নি। ও অন্যরকম মূল্যবোধে বড় হয়েছে।

—ভেব না।

—চাপা মেয়ে, চিন্তা হয়। তবে সুচন্দন আন্নুকে নিয়ে খুবই গর্বিত।

—সবাই আপনজন। অথচ জামাই শ্বশুরকে হেয় করছে। শ্বশুর বলছেন পরিবারের আভিজাত্য দেখে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে...

—বুঝেছি, তোমার দুঃখ হচ্ছে, ওঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না। হাঁটার অভ্যেস তো নেই ওঁর!

—আমার আর মনে হচ্ছে, সরকারি অফিসারদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে ওঁরা খুশি নন।

কিছু করার নেই। যাক গে, মেয়ে বড় হয়েছে, নিজের ভালোমন্দ ও ভালোই বোঝে, ভালোবেসে বিয়ে করেছে, সুখী হোক।

—কি জান গীতিকা। রিটায়ার করে কি করব, সেটা এখন থেকেই ভাবতে হবে। নইলে বাজে খরচ হয়ে যাবে।

—আর যা কর, এক্‌সটেনশান নিও না।

—না না। একটু বেড়াব, তারপর তোমার ইচ্ছা মতো কোনো কাজ করব। সমাজসেবায় কাজের কি অন্ত আছে?

—এ বাড়িতেই করব, কেমন?

হয়তো করতেন। হয়তো করতেন না। কিন্তু বিয়ের পর এক বছর কয়েক মাস যেতে না যেতেই আনমিতা ও সুচন্দনের প্রথম কলহ হয়। গীতিকা বলেন, সে সময়ে দুজনেই দিল্লীতে মাত্র দিন তিনেকের জন্যে গেছি। ফিরে এসে দেখি আন্নু এখানে চলে এসেছে। কেন এসেছে তা বলে নি। কি হয়েছে তা বলে নি। শুধু বলেছিল, আমি স্নান করব, খাব, ঘুমোব। দয়া করে ফোন কোর না, ফোন ধোর না। সুচন্দন এলে আমাকে ডেকো না।

ওর চোখে একটা বিস্ময় ছিল। যেন অদ্ভুত কোন আঘাত পেয়েছে। যা ও প্রত্যাশা করেনি। একটা খবরের কাগজ টেবিলে রেখে বলেছিল, সময় পেলে দেখ।

কোহ্লি বললেন, সব ঠিক আছে। স্নান করে আয়, একসঙ্গেই খাব।

স্নান করে নিজের হাউসকোট পরে যে আনমিতা টেবিলে এসে বসল, সে অনেকটা স্বাভাবিক। বলল, একদম চিন্তা কোর না। খাই তো ভালো করে। মা, এত ভাবছ কেন? গভীর চিন্তার কিছু হয় নি।

—ভাবছি না। তোর তো মজা! ইচ্ছে হল চলে এলি। আমাদের ঝগড়া হত, গুটিগুটি এক বাড়িতেই ফিরতাম।

—হ্যাঁ...দাদু দিদিমা বেঁচে ছিলেন না...মাসিও দিল্লীতে...

—তোমরা বরাবরই কলকাতায়?

—দূর, আমি এখানে তো তোর বাবা বাঁকুড়ায়! আবার উনি এখানে তো আমি অন্য কোথাও...নইলে তোকে হস্টেলে রাখতাম?

—দাদুর কিন্তু বুদ্ধি ছিল। বাড়িটা কি সুন্দর ভাগ করে তোমাদের দু'বোনকে দিয়ে গেলেন! কখনও এ বাড়ি বেচে কোথাও যাবার কথা ভেবেছ?

—না তো! হঠাৎ এমন প্রশ্ন?

—ঠিকানাটা ফ্যাশনেবল নয় তো! আলিপুরও নয়, আবার সুচন্দনের পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটও নয়।

—কি আর করা যাবে! আরেকটা রুটি নে?

—কিছু পারলে না তোমরা। আদ্যিকেলে বসার ঘর, খাওয়ার ঘর। পূর্বপুরুষের মার্বেলের হাতি নেই! জান, আমরা দশ দিন আলিপুরে আছি...ওর বাবা কাকে যেন ধরে এনেছেন...আমাদের ফ্ল্যাটটা ওরা সাজিয়ে দিচ্ছে।

—অফিস থেকে?

—ওর বাবা সব করিয়ে দিচ্ছেন...জাংক বুককেস নিয়ে...

—সেটা কি আন্নু?

আন্নু হাসতে শুরু করেছিল,—তাও জান না? বাইরের ঘরে ওয়াল টু ওয়াল বুক কেস? বাংলা ইংরেজি। দুটো ভাষায় কয়েক শো বই! কোনোটা সোজা, কয়েকটা হেলে আছে। দেখলেই মনে হবে সর্বদা ও সব বই পড়া হয়। আমি বলেছিলাম, সে আবার কি? বই বাইরের ঘরে সাজাবার জিনিস না কি? কি বোকা বোকা ব্যাপার! তাতেই...

আনমিতা একদম চুপ। স্বামী-স্ত্রী এ-ওর দিকে তাকালেন।

—তারপর থেকেই যুদ্ধ...তোমরা কি জানতে, তোমরা জাস্ট সরকারি অফিসার? ওর বাবার ফার্মে কতজন তোমাদের ডবল মাইনে পায়? তোমাদের...টাকার...তোমাদের নীল রক্ত নেই!

এরপর আনমিতা কাঁদতে থাকে। খুব কাঁদে। হায়! গীতিকার অভিমানী মেয়ে তো ঘরে গিয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদত। স্বামী ও স্ত্রী এ-ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তারপর কোহ্‌লি বলেন, সব ঠিক আছে আন্নু! চল শুয়ে পড়বি চল।

—মা আমার কাছে শোবে?

—নিশ্চয়।

পাঁচ বছর বয়স থেকে যে মেয়ে নিজের ঘরে শোয়, নিজের সব কাজ নিজে করে, কত বার বাপ-মা বাইরে গেলে একা থেকে গেছে বাড়িতে, তার মুখে এ কথা শোনা বড় কষ্টের। এ তো প্রথম বার।

সব কিছুর মূলে আসলে ওর লেখা একটি প্রবন্ধ, যা লিখতে অনুরোধ করে ওর বন্ধু ভায়োলেট। লেখাটি ভারতে শিশুকন্যা হত্যা বিষয়ক। অত বড় কাগজে ওর লেখা বেরনো। আরও লেখার অনুরোধ সহ চিঠি। যা যা আনমিতা ভেবেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই নেবে সুচন্দন। তাই নিয়েই প্রথম কলহ। আর হঠাৎ সুচন্দন বলেছিল, ফেমিনিজম কেন, তার চেয়ে মৌলিক কিছু লিখতে পারতে।

কথাটা বোকা বোকা, ঈর্ষা মাখান, আর হঠাৎ আনমিতার মনে হয়েছিল, সুচন্দন হয়তো ওর বাবার চেয়ে খুব অন্যরকম কিছু নয়। তারপর ফ্ল্যাট সাজান, একদিন ধুমধাম করে ফ্ল্যাট মুহরৎ করার কথাবার্তা, আনমিতা ধাক্কা খাচ্ছিল।

আর ধাক্কা খেলে আনমিতা কোনদিন নিজে বোবা হয়ে থাকে নি।

—ওর তো বোঝা উচিত ছিল...

বাবা-মা দুজনেই কয়েকদিন বাদে সুচন্দনকে ডাকলেন। বললেন, তোমরা দুজনেই শিক্ষিত, বয়সও পঁচিশ, নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি নিজেরাই ঠিক কর। আমরা তোমাদের বন্ধু হতে চাই। এ সম্পর্কের ভিত হল পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

সুচন্দন সব কথাই চুপ করে শুনে গেল। তারপর বলল। ভাবছি আমরা একটু বেড়িয়ে আসব।

—ছুটি পাবে?

—দেখি! আসলে বাবাও একটু অন্য রকম! এই ফ্ল্যাটে 'হাউস ওয়ারমিং' পার্টিটা হয়ে গেলে...

—খুব না কি সাজাচ্ছ?

—বাবা সাজাচ্ছেন। ওঁরা আন্নুকে এত ভালবাসেন!

—হঠাৎ গীতিকা ও কোহ্লি বুঝলেন, সুচন্দন পরের প্রজন্মের ছেলে! ওর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা খুব কঠিন হবে। বললেন, সে পার্টি কবে?

—এই তো, সাতাশে!

—ব্যাড লাক। আমি তো দিল্লী যাব! আর ও এখন চিফ সেক্রেটারি, আমার চেয়ে ওর ওপর চাপ বেশি।

—দুজনেই গভরমেন্টে গেলেন!

—বিশ্বাস করেছি, ওই একটা জায়গায় সৎ ভাবে কাজ করলে কিছু কাজ করা যায়! আমরা তো বুড়িয়ে গেলাম। তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েও আসছে।

—হ্যাঁ...গভরমেন্ট কানেকশান কাজেও লাগে!

—তোমার বাবা তো প্রচুর কাজ পান গভরমেন্ট থেকে।

—কেন না উনি আগমার্কা কন্ট্রাক্টর!

—হ্যাঁ...অবশ্যই...

আনমিতা হঠাৎ বলল, এত ঐশ্বর্যের জাঁকজমক। এটা কেন ট্রাডিশনালি রিচ করবে না।

—বাবা ট্রাডিশান কিনছেন।

—কেনা যায়?

—সব হয়ে যাবে আংকেল! বাজারে শুধু বেচা হবে আর কেনা হবে। দিন আসছে। ট্রাডিশন, পরম্পরা এ সব শব্দও নতুন হয়ে দেখা দেবে।

—তুমি কি তাই চাও?

—আমি বা আপনি কি চাই, তার তো মানে থাকবে না কিছু। এগুলো ঘটনা, ঘটবে। চল আনমিতা। রাগ পড়েছে?

—আমি না হয় পার্ক স্ট্রিটেই যেতাম!

—চল না, পর্দা তো তুমি পছন্দ করবে, আর তোমার স্টাডি রুম? জান তো এয়ার ইন্ডিয়ার হাউস জার্নালে লেখা পাঠালে...

আনমিতা চোখ কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকাল। তারপর বলল, আলিপুরেই যেতে বলছ?

—যা বলেন...

—আমি এখানে ক'দিন থাকব এখন।

আনমিতা গটগটিয়ে উঠে গেল। না, সেদিনও ওর বাবা-মার মনে হয়নি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে। অপমানিত সুচন্দন বলেছিল, মেয়েকে এটা শেখান নি যে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয়। সবাই করে আন্টি!

কোহ্‌লি হেসে বললেন, বেজায় স্বাধীনচেতা! গীতিকা বললেন, আমরা তাই চেয়েছিলাম। আর, কখনও তো ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নি!

সুচন্দন আর কথা বাড়ায় নি। কি বা বলতে পারত ও!

ওকে বিয়ে করেছে স্বমতে, সেটা তো স্বাধীনতার অপব্যবহার নয়।

ও বলল, আমি আপনাদের যত জানতাম চিনতাম, আমার মা-বাবাকে ও ততটাই জানত। কোহ্‌লির মায়া হল। বললেন, ছাড় তো ইয়ংম্যান। তোমরা চেয়েছ, পরস্পরকে বিয়ে করেছ। আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমরা তো এজেন্ট লাগিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম না!

—বাবা অবশ্য বিয়ের পর মেয়েদের স্বাবলম্বিতার ব্যাপার বোঝেন না। ওই আর কি আভিজাত্য!

—ও সব ধারণা অচল এখন। চল, তোমায় পৌঁছে দিই।

—না না, অফিসের গাড়িতেই এসেছি।

এখানে শুরু। শেষ তিন বছর বাদে। সুচন্দন এক বছরের মাথাতেই নতুন কাজ নিয়ে বাঙ্গালোর চলে যায়। সেদিন বাঙ্গালোর সবুজ শহর।

বাঙ্গালোর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শহর। আনমিতা টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে 'বাঙ্গালোরের চিঠি' লেখে। মা বাবাকে লেখে, আমরা খুব ভালো আছি।

কোহ্‌লি আর গীতিকা ওদের দেখেও এলেন। নিজেরা বলাবলি করলেন, ওরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। কলকাতায় সুচন্দনের পরিবারের খরিদ করা আভিজাত্যের চাপে ছেলেও হাঁপিয়ে উঠছিল। কি সুন্দর লাগত দেখে। সুচন্দনও ব্রেকফাস্ট তৈরি করে। কত ভালো ভালো বন্ধু হয়েছে ওদের। ছোট্ট একটা ফিল্ম ক্লাবে যায়। সুচন্দন এখন ফিলমোৎসবের একজন মুরুব্বি! সুচন্দনের বাবা মা-ও ঘুরে এসে বললেন, না, ছেলে আমার ফার্মে ঢোকে নি বটে, তবে রাইজিং হাই। এখন, বুঝলেন কোহ্‌লি! দেখবেন, ওদের ছেলেমেয়ে বাংলাও বলবে না, সরকারি চাকরিতেও ঢুকবে না।

'সরকারি চাকরি' কথাটা তাচ্ছিল্যভরেই বললেন।

সবই ক্রমে ক্রমে সত্যি হয়। কিন্তু আনমিতার সন্তানসম্ভাবনা হওয়াতে মহানন্দে স্বামী-স্ত্রী জানায়, আমরা সাতদিনের জন্যে কলকাতা আসছি। আগাগোড়া গাড়িতে যাব, সঙ্গে জিত অরোরা থাকবে, ন্যাশনাল মোটর রেসের জিত! কিছু ভেব না। আগে মাদ্রাজ, পরে কলকাতা, পথে থামব আর বিশ্রাম নেব।

কোহ্‌লি আর গীতিকা, সুচন্দনের বাবা আর মা মাথা নাড়লেন। পাগলামি! বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ, তারপর কলকাতা! প্লেনে আয়। ট্রেনে এ.সি. ফার্স্টক্লাসে আয়! এখন আন্নুর কত সাবধানে থাকা উচিত!

ওদের গাড়ি কলকাতা পৌঁছয় নি। ওই সব হাইওয়েতে নিরন্তর মালবাহী দানব-দানব ট্রাক যায়, ট্রাক আসে। দুর্ঘটনা কর্ণাটকের সীমানার মধ্যেই ঘটে। পরে, অনেক পরে জানা যায় গাড়ির আরোহীরা বা চালক, কাউকে চেনার উপায় ছিল না।

কোহ্‌লি তাঁর বেয়াইকে নিয়ে দৌড়ন। সঙ্গে কোহ্‌লিদের বন্ধুরা ছিলেন, ওখানকার পুলিশ খুব সাহায্য করে। সুচন্দন ও আনমিতার বন্ধু ও সহকর্মীরাও ছিল। সবাই এক কথাই বলল, জিতের নতুন ফরাসি গাড়ি মুহরৎ করার জন্যে এ রকম ট্রিপ নেবার দরকার ছিল না।

খুবই শোচনীয় অভিজ্ঞতা। কি থেকে কি হল, কেন ওরা এমন খ্যাপামিতে রাজি হল, কে বলবে! পথে থেমে থেমে তিনদিনে কলকাতা। সাতদিন বাদে আবার ফেরা! দুটি পরিবারই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটা হয়, তার আশপাশে অনেক গাছ, অদূরে একটা প্রাইমারি স্কুল। ট্রাকের চালক ও হেল্‌পারও বাঁচেনি।

এতবড় ধাক্কা কোহ্‌লি নিতে পারলেন না। এই প্রথম হার্টের গোলযোগ দেখা দিল। স্ত্রীকে বলছিলেন, এস, রিটায়ার করি। মিনিংফুল কোনো কাজের কাজ করি। বাড়িটা তো আছেই।

বাড়িটাই অসহ্য হয়েছিল। দীপিকাদের অংশটায় ভাড়াটে থাকে। ওঁদের অংশটাতেও অনেক ঘর দোর। হিসেব ছকে বাড়ি তৈরি হয়নি। আজকের ভাষায় জায়গার বিশাল অপচয়। চওড়া ঝুল বারান্দা, পোর্টিকো, চওড়া ঢাকা বারান্দা সামনে রেখে বড় বড় শোয়ার ঘর। একেকটি ঘর আজকের ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।

লম্বা ছুটি নিলেন দুজনেই, অবসর নেবার আগেই। গীতিকার আরও ঘা খেতে বাকি ছিল। কোহ্‌লি আনমিতাদের জীবনের এমন অর্থহীন অপচয় নিতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যু অতর্কিতেই হয়।

মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে শক্ত হয়। গীতিকা দীর্ঘদিন হিমঘরে বন্ধ হয়ে থাকার পর আবিষ্কার করলেন, তাঁর বাঁচার ইচ্ছা, কিছু করার ইচ্ছা আজও আছে। এই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই 'আশ্বাস' গড়ে ওঠে।

কিন্তু, করবী আজ জলভাসি কলকাতার পথের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছেন, 'আশ্বাস'কে সত্যিই ঢেলে সাজতে হবে।

সুচন্দনের বাবা মা ওর নামে সেবাশ্রম সংঘে টাকা পাঠান। গীতিকার সঙ্গে যোগাযোগ তেমন নেই। যদিও, আজও গীতিকার মনে হয়। আনমিতার মৃত্যুতে তাঁর ও কোহ্‌লির অর্থপূর্ণ কোন কাজটা যেন 'আশ্বাস'-এর কর্মধারায় প্রতিফলিত হচ্ছে না। করবী এবং অন্যদের তিনি কাজের মতো কাজ দিতে পারেন নি।

করবী হঠাৎ নিজেকেই বললেন, ওঁকে বুঝতেই হবে। দেয়ালে ঝোলান ছবিগুলোর মানুষদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা ব্যক্তিগত। 'আশ্বাস'-এর মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

বুবলা বলল, ঘুমোননি? হঠাৎ কথা বললেন?

—সে কি, তুমিও ঘুমোও নি?

—ঘুম আসছে না। শুধু ভাবছি, কি করব? এই অঝোর বরিষণ, এই অদ্ভুত ভিজে বাতাস, ঘরের প্রায়ান্ধকার চেহারা, করবীকে যেন সাহস দিল। যেন হঠাৎ মনে হল, সন্ধ্যা থেকে অনেক সৌজন্য করা হয়েছে। কিন্তু বুবলার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেন নি।

বললেন, কি হয়েছে বল তো? কি ভাবছ, কি করবে?

—আমি বড় গোলমালে পড়েছি।

—কি বলছ, খুলেমেলে বলো না! খুলে বলো, দেখা যাক সমস্যার সমাধান হয় কিনা! সব কিছুই, বিশ্বাস করলে খুলে বলতে পার। আমি আবিরের মা বলে একচোখা হব না। তুমিও সে অধ্যায়টা ভুলে যেতে পার। আমরা দুজন মেয়ে। বসতেই পারি মুখোমুখি, কথাও বলতে পারি!

করবীর গলাটার বয়স যেন কমে গেছে।

—এস আমার পাশে শোও।

বুবলা উঠে এল। ওঁর পাশে শুল। না কাঁদলেও কথায় ছোটমেয়ের অসহায় কান্না ছিল।

—কি হয়েছে, খুলে বলো? কোনো ছেলের সঙ্গে...

বুবলা সবেগে মাথা নাড়ল।

—আবির আর তুমি ছাড়াছাড়ি হবার পর অনেক বছর তো গেল। ১৯৮৪-তে বিয়ে, ১৯৮৮-তে বিচ্ছেদ। দুজনের বয়সই ছিল তিরিশ। এখন ছে'চল্লিশ। তা বুবলা এতদিনে কারও সঙ্গে একটা মানবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো গড়ে উঠতে পারত?

বুবলা চুপ করে রইল। তারপর বলল, আপনাকে আমি সত্যি কথা বলিনি। আবির আমাকে ফোন করে, চিঠি লেখে। এই বারো বছরে ও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেছে।...আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর ও লীলা নামে একটি মারাঠি মেয়ের সঙ্গে বেশ...কিন্তু দু'বছর ধরে ও আমাকে বলছে, আবার তো আমরা বিয়ে করতে পারি।

হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক সেনের মেয়ে তো একজনকে বিয়ে করল, ডিভোর্স করল, আবার বিয়ে করল, আবার ডিভোর্স করল। সবসময়েই ছিল উদ্‌ভ্রান্ত, ড্রাগও ধরেছিল। তারপর আত্মহত্যাই করল।

—আবির কিন্তু বারবার লেখে।

—তুমি কি মনে কর?

—মানবিক সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেছি এতদিন জয়ের সঙ্গে। ভয় পাই, পারলাম না।

—সম্পর্ক ব্যাপারটাও তো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে! যাকগে, যে কাজ কর, তাতে মন শান্তি পায়? মনে হয় যে অর্থপূর্ণ কিছু করছ?

—আমি 'কানহা মেডিক্যাল সেন্টার ও ক্লিনিক'-এ নার্সিং মেট্রন: গরিব ঘরের সামান্য ট্রেনিং প্রাপ্ত মেয়েদের নাম লেখানো থাকে, রোগী বুঝে আমরা ওদের পাঠাই। টাকাটা ওদের খুব দরকার, সংসার চালায়। নার্স হলে বেশি টাকা পেত। নার্সও আমরা অন্য সেন্টার থেকে আনিয়ে দিই। এই আয়ারা সাতটার মধ্যে পৌঁছে যায়, কাজে পাঠাই। যদি কোন রোগী পায়, যাঁকে অনেকদিন সেবা করতে হবে, সেটা লাভজনক হয়।

—তোমার তৃপ্তি হয়?

—এটা তো চাকরি মাত্র। এতদিনে চার হাজার পাচ্ছি। তবে ওই মেয়েদেরও মানবিক সমস্যা থাকে। ও একটা অন্য জগৎ। তবে হ্যাঁ, এর চেয়ে অর্থপূর্ণ কিছু করতে ইচ্ছে করে বইকি, যে জন্য লিগাল কাউনসেলিং গোছের কিছু করব ভাবছি।

—বুবলা, এখন তুমি অপরিণত। মেডিলিগাল কাউনসেলিং শিখে কি করবে?

—অত্যন্ত বিপন্ন রোগীদের বিপন্ন আত্মীয়দের অন্তত সাহায্য করা যাবে।

—এতে ডাক্তাররা আছেন?

—নিশ্চয়, রোগীদের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে...

—ওরা কেস করবে?

—হ্যাঁ।

—তাই যদি কর, আবিরকে তা বলে দাও।

—আসুক...বলব...

বুবলা ঈষৎ হেসে বলল। আবির আর আমি বন্ধুই ছিলাম। ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদ, কিন্তু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা আবছা সম্পর্ক রয়েই গেল। ওর 'এলিফ্যান্ট গড'-এর ছবির পরেও ও গণেশ নিয়ে আরেকটা ছবি করবে।

—আমি কিছু জানি না।

—বলি, আমাকে বলো কেন? ও বলে, বলে বলে অভ্যেস হয়ে গেছে।

হঠাৎ করবীর মনে হল, সত্যিই তো! ওঁরা জানতেন, সম্পর্ক একরেখ হয়। কিন্তু সম্পর্ক এখন ভাঙছে, জুড়ছে, দূরে যাচ্ছে, কাছে আসছে, কত রকম!

—আবির বাড়ি বেচার কথা বলে না?

—আমাকে তো বলে নি।

—চল, একটু শুই। ভোর হবে, আকাশ দেখ, তেমনি ঘোলাটে, আর বৃষ্টির বিরাম নেই।

তিন

পরদিন ঝপঝপে বৃষ্টি কিন্তু কমল। মানব ভাসতে ভাসতে এসে হাজির। বলল, কাল রাতে আর...

—ছিলি কোথায়?

—অফিসেই।

—খেয়েছিলি?

—ওই আর কি! ইস দিদিমা! ছাতের দরজার ফাঁক দিয়ে জল নেমেছে অনেক!

সুরভি বলল, দেখিস পরে! জামাকাপড় বদলা!

—বৃষ্টি ধরলে বাঁচি।

হ্যাঁ, সত্যিই জল নেমেছে সিঁড়ি দিয়ে। নিচের প্যাসেজ থই থই। করুণা টেলারিংয়ের গগনবাবু আকাশ দেখে বলল, কাল ছেড়ে যাবে। আর জল যখন টানবে, কর্পোরেশনের ইস্কুল পুরনো লজ্ঝি, সব ধসে পড়বে।

—কিন্তু এ বাড়ি?

—না না। চুনসুরকির গাঁথনি, দু'তিন বছরে রং-মেরামত করায় বড় ছেলে, এখনও জান আছে।

করবী সুরভিকে বললেন, ওপরের ঘরে যত ভিজে জামাকাপড় মেল। পাখার বাতাসে যেমন শুকায় শুকাবে। দেখ! সকালে কি খেতে দেবে। দুপুরে খিচুড়ি কর, বেশি ল্যাঠা কোর না।

সুরভি নিশ্বাস ফেলে বলল, মানবের সঙ্গে ছোট বৌদি ঘরদোর সারছে। খুব পরিষ্কার-পরিষ্কার বাই ছিল তখনও।

—হ্যাঁ, তা ছিল!

পল্টু দত্তের প্রিয় পুত্রবধূ পারমিতা। করবী ঠিক করলেন, স্নান করবেন, জামাকাপড় ছাড়বেন, তারপর স্বামীর ঘরে বসে ওঁর 'কালস্য গতি' বইটার কাজ করবেন। পল্টু দত্তর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বাঁধিয়ে রেখেছেন।

নিজে কপি করে যাচ্ছেন। এরপরে ডি.টি.পি-তে কম্পোজ হবে। এখন তো তাই হয়। একদা কাঠের ঠকঠকি, হাতে হরফ বসিয়ে কম্পোজ, নির্ভুল বানানে চমৎকার সব বই বেরোত।

তা করাই যেত। কিন্তু করবীর ইচ্ছে, নিজ খরচে শ'পাঁচেক বই ছাপান, ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুদের বিতরণ! লাভ কি? অর্থমূল্যে কিছুই নয়। তবু থাক, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিদের যারা বাংলা পড়বে, তারা জেনে রাখুক, কোথাও তাদের শিকড় ছিল, যখন 'পরিবার' শব্দের মানে ছিল খুবই বিস্তৃত। বাবা-মা ও একটি সন্তানের দিন ছিল না।

জানুক সেদিনের বাংলা ও বাঙালির কিছু পরিচয়।

স্বামীর স্মৃতিতে এটাই ওঁর তর্পণ।

তারপর? পল্টু দত্ত মনে করতেন তাঁর জীবনটা নৈরাশ্যে ভরা। করবী দেখবেন, এ বাড়িতে হাসি, গান, কর্মময়তা ফিরিয়ে আনা যায় কি না।

পল্টু ইংলন্ড ও আমেরিকার ম্যাপ খুলে দেখতেন। বড় সাধ ছিল একবার বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হোক। খুব চাইতেন, কাছে নাই বা থাকুক, ছেলেমেয়ে বউ জামাই নাতিনাতনি আসুক মাঝে মাঝে।

মহানন্দে পল্টু দত্ত বাজার করেন!

ইদানীং খুব বিমর্ষ হয়ে থাকতেন বলে করবী বললেন, একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নিয়েছ বলে এত মনমরা কেন?

—কি কাজ? আমার মতো বিকল মানুষকে দিয়ে কোনো কাজ হয়?

—হয়। আত্মজীবনী লেখ।

—আমি? আমি কি দেশের কেউকেটা?

—না। তুমি তুমিই। তোমার আত্মজীবনীতে তোমার-আমার সময়টা ধরা থাকবে।

পল্টুর গলাটা ক্ষীণ ও কোমল।

—পারব?

—আমি তো তোমাকে কোনো কাজ না পারতে দেখি নি!

—বড় দমে গেছি করবী! সন্তানদের কাছ থেকে...

—সময়টা যে বড্ড পালটে গেছে গো! আমরা যেমন বড় হয়েছি, যা জেনে বড় হয়েছি, এদের সম্পর্ক তো অন্যরকম!

—হ্যাঁ, ওদের হিসেবের খাতায় বাপ-মা থাকে না।

—তা নয়। টানও আছে, আসেও মাঝে মধ্যে। ওরাও তো বলতে পারে। তোমাদের সময়ে তোমরা একভাবে বেঁচেছ। আমাদের সময়ে আমরা আমাদের ভাবে বাঁচছি।

—আমি তো ওদের স্বাধীনতা...

—তুমি তোমার সময়ে চাকরি সূত্রে এখানে সেখানে, দেশঘরের সঙ্গে সম্পর্ক অত থাকত না। আমরা বছরে ২/১ বার যেতাম। বাবা-মা মারা গেলেন, সে তো এখানেই।

—হ্যাঁ, বাড়ি কেনার টাকা বাবাই তো দেন! ভাবলে অত্যাশ্চর্য লাগে, ১৯৪০ সালে এ বাড়ি দশ হাজার টাকায় কেনা হয়। পরে আমি বাড়িয়ে নিই।

—তখন টাকা ছিল না দেশে, টাকার দামও ছিল।

—হ্যাঁ, প্রোমোটারকে বেচ, অনেক পাবে এখন।

—থাক ও সব কথা।

—পারমিতার কথাই মনে হয়। মেয়েটা...

—লেখ, লেখ। এক সময়ে মানুষ সামান্যে সুখী থাকত। কাছের কে, দূরের কে, বুঝত না। পাঁচজনকে নিয়ে বাস করত। আমাদের ছেলেমেয়েরাও তেমনি ভাবেই বড় হয়েছে। তোমার পিসির ছেলেরা এখানে থেকেই পড়েছে...

—আমি তোমার কত অনুগত ছিলাম, বলো?

—এখনও আছ। যাক গে, লিখতে শুরু কর। ভালো লাগবে। কাপাসিয়া গ্রামের কথাও লিখ!

—বাবাও স্কুল ইন্‌সপেক্টর, বদলিও হন, আমরা কতগুলো স্কুলে না পড়েছি! শেষে বাবার ইচ্ছায় শ্যামানন্দ আশ্রম বিদ্যাপীঠে গেলাম দুই ভাই।

লেখ! সকালে ফেনা ভাত, বিকেলে চিড়ে মুড়ি, দুধ কলা! পূজায় দুটো শার্ট, দুটো ধুতি!

—ছেলেমেয়ে পড়বে আর বলবে, হাউ টেরিবল!

—বলুক!

সত্যিই পল্টু দত্ত খুব মন দিয়ে লেখেন। খানিক লেখেন, আর বন্ধুদের শোনান। রাখালব্রজ, বিজয়ব্রজ, নীতিন ডাক্তার, করবীর পিসতুতো দেওর রমেন, সবাই আসত রবিবারে। সুহাস খুব খুশি। মানব আর ও মিলে পল্টুর ঘর ঝেড়ে মুছে রাখত। মুচমুচে চিড়ে ভাজা আর চা আনত। নীতিন বলতেন পল্টু! অতিরিক্ত ভাজাভুজি ছাড়।

—খাই না তো?

করবী ঈষৎ হেসে বলতেন, ১৯২৩ সালে জন্ম! ৬৯ বছর বয়সেও চালিয়ে যাচ্ছেন।

পল্টু বলতেন, কেন? নীতিনের নিয়মে ধর সিদ্ধ তরকারি, কম লবণের রান্না খাই।

—তারপর মোচার চপ, গরগরে মাছের ঝাল!

পল্টু বললেন, আমার বাবা একাত্তর বছর বয়সেও একটা কাঁঠাল খেতেন। যাক গে, শোন!

"বালক বয়সে আমরা আটহাতি ধুতি পরতাম, গামছা পরে পুকুরে সাঁতার কাটতাম, পাঠশালে যেতাম মুড়ি কদমা নিয়ে। কলাপাতা বা তালপাতায় লিখি নি। মোটা বালি কাগজে খাগের কলমে লিখতাম।। পরে স্টিলের নিবযুক্ত হাতল কলমে প্রোমোশান পেলাম। প্রথম দিন পাঠশালে যাবার কালে মা কপালে দইয়ের ফোঁটা দেন। বলতে পার, বাবা যখন স্কুল ইনস্‌পেকটর, ছেলে পাঠশালে কেন? ওই পাঠশালে বছর চারেক পড়লে অঙ্ক, বাংলা, সরল ব্যাকরণ, উৎকৃষ্ট শেখা যেত। তারপর স্কুলে গেলে অসুবিধা হত না। বাবা নিজে ইংরেজি শেখাতেন ঘরে।..."

রাখালব্রজ বললেন, এ যে আমার জীবন গো!

—শুনতে ভাল লাগছে?

—খুবই ভাল লাগছে।

তা দেখ, সাধারণ মানুষের জীবন কথা লেখার উৎসাহ দিলেন তোমাদের বৌঠান। এখন বেশ উৎসাহ পাচ্ছি। এটা তো সত্য কথা যে ১৯৫২/৫৩ সালে মাসে দুশো টাকা পেলেও বেশ চলে যেত।

—আমি অবশ্য...

—বেশিই পেতে, বৌঠানও...

—তিনি একশো টাকা পেতেন। তুমি চিরকাল আমাকে বড়লোক ভেবে গেলে, এই বাড়িটার জন্য। বাড়ি তো আমার বাবা, স্বর্গীয় আমোদচন্দ্র দত্ত কেনেন দেশের জমিজমা বেচে! যাঁর বাড়ি তিনি দুঃখে কাশীবাসী হন স্বামী ও স্ত্রীতে। রেল দুর্ঘটনায় ছেলে-বউ-নাতি সব মরল, মেয়ে বিধবা হল...বাড়ি রাখতে চান নি।

লেখাতে খুব উৎসাহ পান পল্টু দত্ত। বিছানায় বসে চৌকিতে খাতা রেখে লিখতেন। আর প্রত্যেকদিন করবীকে তা শুনতে হত। সুহাস, মানব, করুণা টেলারিংয়ের গগনবাবু, কে শুনত না?

করবী বলতেন, দেখ তো! এত যে হাহাকার করতে, এদের দেখ! কেমন নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বল তো?

করবীকে বেজায় অবাক করে একদিন গীতিকা চলে এলেন। বললেন, শুনতে এলাম।

—আমার লেখা আপনি শুনবেন?

—কেন শুনব না? আপনি যে আপনার সময়ের কথা লিখছেন। এটা তো খুবই দরকার। লিখে আনন্দও পাচ্ছেন। তবে এটা থেরাপিও বটে। অনেক ভুলতে পারছেন।

—করবীই কলম ধরাল।

—আমি ধরাই নি বাপু। স্কুল ম্যাগাজিনে, কলেজ ম্যাগাজিনে অনেক লিখেছ।

—আর তোমাকে চিঠি লিখতাম না? সন্তান হতে বাপের বাড়ি গেছ, তো বড় বড় চিঠি লিখতাম।

গীতিকা হেসে ফেললেন, করবী? তুমি?

—গীতিকা দি, আমি আবার চিঠি লেখায় খুবই অক্ষম।

গীতিকা সদুঃখে একটু হেসে বললেন, বিয়ের পর থেকেই দুজনে একসঙ্গে! একজন ট্যুরে গেলে আরেকজন লিখতাম! সংক্ষিপ্ত চিঠি। আন্নু খুব বড় বড় চিঠি লিখত। এখন... সেগুলো পাড়ি! যাক গে, পড়ুন।

"আমি কিন্তু যমের হাত থেকে কিনে নেওয়া ছেলে। শুনেছি আমার জন্মের আগে মায়ের দুটি সন্তান জন্মের পরেই মারা যায়। তখন আঁতুড় হত যেমন তেমন। স্বাস্থ্যসম্মত প্রসবাগারের ধারণাই ছিল না। তা আমার জন্মকালে বাবার এক পিসি আমাকে একটি টাকা দিয়ে কিনে নেন। তাঁর পদবী ছিল বসু। ফলে আমার নাম প্রমোদচন্দ্র দত্ত বসু। কিন্তু কলেজে গিয়ে নব্য যুবক হলাম। তো নাম থেকে বসু বাদ দিলাম। নামকরণে আমার দুঃখ ছিল। প্রমোদচন্দ্র, বিনোদচন্দ্র, উমারানী, অন্নপূর্ণা, নামগুলি তো আধুনিক নয়! ভালোই হয়েছে। পল্টু নামেই আমাকে চেনে জানে সবাই। আমার মা, বাবার ওই পিসিকে খুব সম্মান করতেন। উনি কিনে নিলেন আমাকে, যমের নজরও সরে গেল। পরের সন্তানরা বাঁচল। দেশের বাড়িতে যে শিবমন্দির ছিল, সেখানে 'হরমোহিনী দেব্যার নামে একটি মণ্ডপ করে দেওয়া হয়।"

গীতিকা যেন কোথায় চলে গিয়েছিলেন। বললেন, খুব ভাল লাগল। আমি মাঝে মাঝে আসব। বইটার নাম কি দেবেন?

কালস্য গতি। লিখতে বসে বুঝলাম, কালের গতিকে মেনে নিতেই হয়। তাতে শান্তি মেলে।

হ্যাঁ, মেনে তো নিতেই হয়।

চার

সুহাসের কথামতো মঙ্গলবারের বৃষ্টি বৃহস্পতিবারের বিকেলে কাটল। সুহাসের গর্ব দেখে কে? খনার বচন কি মিথ্যা হয়? আপনারা খনার বচন পড়েনও না, মানেনও না। খনার বচনে কিন্তু সবই সত্য কথা।

বুবলা নিশ্বাস ফেলে জামা কাপড় পরল। বলল, সেন্টারে তো গেলাম। না হস্টেলেই যাই।

—সকালে যেও।

—না না...

—জল তো নামে নি।

—মানব এগিয়ে দেবে?

—বুবলা! যুক্তির কথা শোন। এই ভবানীপুর থেকে গোলপার্কের হস্টেল! যানবাহন নেই, জল থই থই! কাল সেন্টারে যাও, কাছেই তো। বিকেলে চলে যেও।

বুবলার মুখটা ঝলমল করে উঠল। বলল, আপনার অসুবিধে হবে বলেই...

—আমি তো আনন্দই পেলাম। মানব কোথা থেকে ডিম জোগাড় করেছে। সুহাসের তৈরি আলুর পরোটা আর ডিমের ডালনা রাতে খাব। আমার পক্ষে একটু লোভ হয়ে যাবে। তা হোক!

—আপনার শরীরে তো...

—না, অসুখ বিসুখ নেই। অবশ্য সাদাসিধে খাই। উনি খেতে ভালবাসতেন খুব। তুমিও তো বেঁধে খাইয়েছ।

—হ্যাঁ...আবিরও ভালবাসত।

—আবির যথেষ্ট যোগাযোগ রাখে, তাই না?

—এই দু'বছর হল। ওর জন্যেই...

—জয়ের কথা ভাবতে পারলে না?

হয় তো সাহস পেলাম না। আবিরের সঙ্গে কতকালের বন্ধুত্ব...তারপর বিয়ে...জানেন, যে কাজ করি তাতে যদি আনন্দ পেতাম, এ রকম মনে হত না। নিজে কিছু করলে...কি বা করতাম! না আছে টাকার জোর...থাকি যেখানে, একটা ঘর নেবার সামর্থ নেই! বেশ ক্লান্ত লাগে!

—বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগই নেই?

—না

—আবিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেও নেই?

—না। আর...আবির এখন তো...ওর অস্থিরতা অনেক কমে গেছে। মনে হয় কিছু আশাভঙ্গ ঘটেছে। দুঃখও পেয়েছে।

—কেরিয়ারের দিকে তো...

—যথেষ্ট ভাল করছে।

হঠাৎ বুবলা বলল, আমাকে কেন বার বার লেখে, ফোন করে? বলে, দিল্লীতে ওর ময়ূরবিহারের ফ্ল্যাটটা ছোট অথচ সুন্দর। আমি কি করব? ও বলে বন্ধু হয়ে থাকার কথা...

বুবলা কেঁদে ফেলল, বন্ধু হয়ে একত্র বসবাসের কথা আমি ভাবতেও পারি না।

—তুমি ওকে ভুলতেও পারনি।

—ভুলতে ও দিত না। এখনও দেয় না। কি স্বার্থপর, তাই বলুন? তখন বনিবনা হলই না, এখন কাছে আসতে চাইছে...

—ধর বিয়ে করতে চাইছে...

—তা তো বলে না। শুধু চিঠি লিখবে, নয় ফোন করবে, জানেন। সমানে প্রেজেন্ট পাঠায়? আমি খুব শক্তপোক্ত নই, খুব বিভ্রান্ত লাগে, ভয় হয়।

—ভয় কেন?

—যদি দুর্বল হয়ে পড়ি? তারপর ওর সঙ্গে...তারপরও যদি বিচ্ছেদ হয়? যেমন তেমন একটা কাজ আছে...একটা বেড আছে হস্টেলে...কলকাতা তবু চেনা জানা...আমার আর ওর বয়স ছেচল্লিশ মাসিমা!

করবী মনে মনে ভাবলেন, সেটাই ভরসা। বললেন, ভাববে না। তুমি যা কর, আমি জানব ঠিক করেছ।

—লোকে বা কি বলবে!

—লোকে আমাকে কি কম বলে? বিধবা হলাম, ছেলেমেয়ে কাছে নেই, হালকা ছাপা শাড়ি পরি, 'আশ্বাস'-এর কাজ করি, স্বামীর বন্ধুরা আজও আসেন, লোকের কথা শুনতে গেলে চলে না।

—আপনি আছেন নিজের বাড়িতে।

—একটা কথা বলব?

—বলুন?

—হস্টেল ছেড়ে আমার এখানে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাক। টাকা দিয়ে থাকবে, খাবে। আমার স্বার্থ কি, আমি সঙ্গী পাব। আর ওঁর বইটা ছাপাবার ব্যাপারে সাহায্য পাব। 'না' বোল না বুবলা! এটা হবে দুটি দীর্ঘ পরিচিত মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। চলে এস।

—কিন্তু...

সারা জীবন ভয় পেয়ে কাটালে। আর ভয় পেও না।

—দাদা! শিবানী! নীলি!

—আমি তো আছি, তাই না? আমার জন্যেই তোমাকে চাইছি বুবলা!

বুবলা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল। করবী ওর মাথায় হাত রেখে বসে রইলেন।

সম্পর্ক ছিঁড়ে যায়, দূরে চলে যায়, কাছে ফিরে আসে নতুন চেহারা নিয়ে, এ রকমই তো হবে এখন।

পাঁচ

দিন সাতেক পর শিবানীকে দুপুরে দেখে করবী রীতিমত চমকিত। খুবই অচেনা লাগছে কেন। ছেলে-বৌদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বের। একথা ওরাই বলে।

শিবানী সালোয়ার-কামিজ তো পরেই। চুলও কেটেছে। একটু হেসে 'হাই' বলে ও মস্ত একটি পলিথিনের ব্যাগ নামাল। বলল, অনে—ক ফল এনেছি, তুমি খাবে।

—হঠাৎ এত ফল?

—এমনি। কতদিন তো আসি না।

—ব্যস্ত থাক, সে তো বুঝি শিবানী। তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ। ডায়েট করছ না কি?

—না...একটু বসি। এত ক্লান্ত লাগছে।

—কি হয়েছে শিবানী? দিয়া ভাল আছে তো?

শিবানী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। করবী ওকে কাঁদতে দিলেন। না, কাছে থাকে না। আলাদা থাকে নিজেদের জীবনে। কিন্তু করবী তো জানেন, শিবানী দীপাঞ্জনকে কি ভালোই না বাসে। দীপের সঙ্গে ওর মিলও দেখার মতো। দুজনে এখনও এ-ওকে চোখে হারায়।

—দীপ কিছু বলেছে?

—ও তো কিছু বলে না। নাক গলায় না। দিয়ার ছোটবেলাটা তো দেখেছ। কি প্রশ্রয় না দিত! দিয়ার সঙ্গে আমাদের একটা স্বাভাবিক সম্পর্কই গড়ে উঠল না।

—শিবানী! দিয়াকে সেদিন যা চায় তা না দিয়ে একটু সাইকোথেরাপি করা উচিত ছিল।

—বুঝতে পারি নি। বাবার সঙ্গেও অনেক তর্ক করেছি...

চোখ মুছে হেসে বলল, তখন তো ভাবতাম, সাইকোথেরাপি করায় পাগলেরা।

—সময়টা যে অন্যরকম শিবানী! যাক গে দিয়ারই কিছু হয়েছে?

—হ্যাঁ। তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছি।

—অভীর সঙ্গে সম্পর্কটা আছে, না গেছে?

—বলব, চা খাই। তুমি খাবে?

—খাব। ভালো দিনেই এসেছ। আজই সুহাসের সেই বন্ধু কুচো নিমকি আর কুচো গজা বেচতে এসেছিল।

—এখনও আসে?

—আসবে না? ওটাই তো ওর কাজ!

—সত্যি মা! হিংসে হয়। বাড়িটাকে আটকে রেখেছ সেই সত্তর সালে!

—তারও আগে। ১৯৫০ সালে বিয়ে হয়ে এলাম। একটু অলিগলি বলেই হোক, বা যে কারণেই হোক, পাড়াটা, এমন কি এলাকাটাও খুব বদলায় নি। হাইরাইজই বা ক'টা? যাঁরা আছেন, তাঁদের বাড়ির কেউ না কেউ থেকে গেছে। সুহাসের মিতিন, তা তিরিশ বছর ধরে দেখছি ওকে। এ রকম বাঙালি মধ্যবিত্ত পাড়া, যতদিন থাকে, ততই ভালো!

—এ বাড়িটা বড্ড বড় মনে হয় না?

—হয়। দিয়ার কথা...

সুহাস ঘরে ঢুকে বলে, সেদিন ছোট বৌদি, আজ বড় বৌদি।

—বেশ পরের পর, তাই না মামিমা?

—তাই। ওদের বাড়ি, ওরা তো আসবেই। চা করেছ?

—করছি। কবে আর তিনটের সময়ে চা খাও বলো? করে আসছি। আর দেখ! কাল অবশ্য করে মিস্ত্রি আনবে মানব। জলটা হয়ে গেল। দেখছি নিচের বাথরুমের জল মোটে সরছে না। বলবই বা কি! সুধাকরের কাজে বিশ্বাস ছিল। ওর ছেলেটা কেবল ফাঁকি মারতে জানে।

—করে যে, এই তো যথেষ্ট ভাগ্য সুহাস! কর্পোরেশনে চাকরি পাবার পরেও বাড়ির কাজ করে কেউ আজকাল? ও তো করছে।

—বড় বউদি থাকবে না কি?

—সে দেখা যাবে। চা ঘরেই আন।

শিবানী নাক চোখ ওড়না দিয়েই মুছল। ভেজা গলায় বলল, বিপদ হলেই তুমি!

—একটা কথা বলতে তো মানুষ লাগে।

—দীপের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওর শুধু টেনশান হয়। যত সমস্যা। স—ব আমাকেই...

করবী সস্নেহে তাঁর বড়ছেলের বউয়ের দিকে চাইলেন। একরকমই থেকে গেছে স্বভাবটা। যতই কেজো কর্মী হোক। ক্রমে ক্রমে দশকে দশকে চলতি সময়ের সঙ্গে চলুক, কোথাও একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। কেন যে আছে, তাও জানেন করবী।

—দিয়ার জন্য নিজেকে দোষারোপ কোর না।

—দিয়ার দাদুও তো দুঃখ পেয়ে গেলেন।

—ওঁর স্বভাব ছিল অন্যরকম। বোঝালেই বুঝতেন। তাছাড়া বাইরেটা অন্যরকম হলেও, ভেতরে খুব সায়েব ছিলেন। ছেলে বৌরা নিজেদের মতো থাকবে, তা মেনেও নিতে পেরেছিলেন।

—আমাকে কাউনসেলিং করছ?

—কাউনসেলিং করবার যোগ্যতা কোথায়? যদি 'আশ্বাস' ঢেলে সাজান যায়, কাউনসেলিং কোর্সটা করব। হেসো না। আমার তো মনে হচ্ছে, সারাজীবন এর সমস্যা তার সমস্যা এ সব হাতে কলমে সমাধান করতে চেষ্টা করি, তখন কোর্সটা করে নিলেই পারি।

—বাবার বই কত দূর রেডি হল?

করবী মৃদুস্বরে বললে, ওঁর হাতের লেখাটা তো ছাড়ব না। দেখছি, স্পষ্ট করে লিখছি। কম্প্যুটারে টাইপও করাচ্ছি, সে কপিটাই প্রেসে যাবে।

—হাতের লেখাটা?

—বাঁধিয়ে রেখে দেব আমার কাছে। ছবি তো অনেক পেলাম। সব দিতে পারব না। কয়েকটা দেব।

—তোমাকে দেখলে হিংসে হয়।

—কেন?

—কেমন আত্মস্থ থাক। দেওয়ালে তোমাদের, আমাদের, আবিরের, নীলির বিয়ের ছবি রেখেই দিয়েছ।

—কি রাখব? নিখিল বিশ্বাসের একটা ছবিও আছে। কবে যে কিনেছিলাম!

—হ্যাঁ, হিংসে হয়।

—যাও শিবানী, চোখে মুখে জল দাও। একটু ভালো লাগবে। চা খাও শান্ত হও। তোমার কথা শুনব। করবীর কেশের ঐশ্বর্য দেখে সবাই হিংসে করত। এখন সাদা চুল বেশি, কালো কম। তাই অনেক কাল বাদে অনেক কাজ করছেন, যা একদা করতেন। গতকাল রাতে চুলে নারকেল তেল মেখেছিলেন, আজ শ্যাম্পু করলেন। শীতবস্ত্র রোদে দেবেন ক'দিন বাদে। কিন্তু আলমারি গোছালেন এই সেদিন।

পল্টুর আত্মকথা পড়তে পড়তে হঠাৎ ওঁর মধ্যে একটা জরুরি উদ্বেগ খোঁচাচ্ছে। যা করবার আছে করে ফেল, প্রত্যহের ছোট ছোট রুটিন কাজগুলো কর,—মনে রেখ, বর্ষা নামলে বিকেলে আমি বারান্দায় ঘড়ি ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটতাম। ম্যাডক্স স্কোয়্যারে তো যাওয়া যেত না। খুব গুছিয়ে কাজ করলে করবী! বাকি সময়টাও কাজই করতে পারবে। পল্টু তো জানেন না, আজ করবীর কাছে একলা কে বসে আছে। সেদিন বুবলা, আজ শিবানী, এ-টুকু যাওয়া আসা থাকলেও উনি শান্তি পেতেন!

সুহাস দীপ আর শিবানীর বৌভাতে পাওয়া মিনার কাজ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বড় জয়পুরী ট্রে এনেছে। দেখ কাণ্ড! সুহাসেরই কি মনে থাকে কবেকার কি জিনিসপত্র ঘষে মেজে রাখার কথা? ট্রে-তে সাজান কুচো গজা। কুচো নিমকি, সেও কাঁসার ফুল তোলা বাটিতে। সুহাস সগর্বে বলল, উনি আর কি দেখেন! আমি সব মেজে ঘসে সাফ করে রাখি। কি গো বউদি! চিনতে পারছ? অন্তত ট্রে-টা চেনার কথা।

শিবানী মৃদু গলায় বলল, পারছি।

—ওনার কথা আর বোল না। মামা চলে যেতে বলে, স—ব বিলিয়ে দেব, নয় বেচে দেব। আমি সে কাজ করতে দিই নি। এমন জিনিস কি পাওয়া যায়?

করবী বললেন, শুধুই তো জমেছে। আমার বিয়ের দানের বাসন।

—তখন দাবিদাওয়া ছিল?

—এঁদের তো ছিল না। বাবা বড় মেয়েকে...তখনকার নিয়মে...তারপর মা বলো, পিসশাশুড়ি বলো, ঢালাঢুলির বাসনের বা কত নাম! কাঁসি, বেলি, ফুল গামলা, মনেও থাকে না। বাসনগুলো যেন পঞ্চাশ দশকের বাঙালি ঘরকন্নার ইতিহাস! এখন ব্যবহারই হয় না।

—আমিও তো দেখেছি!

—চা ঢালো, আমাকে দুধ চিনি দিও না।

শিবানীর বয়স ছেচল্লিশই হল? যেন বড্ড বেশি কাঠ কাঠ হয়ে গেছে। কি যেন বদলে গেছে, চেনা যাচ্ছে না।

সুহাস বলল, গল্প কর। আমি গম ভাঙিয়ে আনি।

—এ বাড়িতে ঢুকলে বড় অন্যরকম লাগে। আমরা তো একটা ঠিকে লোক নির্ভর! দুজনেই ব্যস্ত।

—ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলে। কাজের জগৎও গড়ে নিয়েছ! তোমাদের পোশাকেরও যথেষ্ট নাম।

—হ্যাঁ। "দিয়া'জ"! ওরই তো সব।

—দিয়ার কথা কি বলছিলে?

—কি যে বলি! চা-টা খাই! কি সুন্দর নিমকি! অবশ্য ভাজাভুজি তত খাই না! ক্যালোরি মেপেই খাই!

—মোটা তো কোনোদিন ছিলে না।

হঠাৎ করবীর মনে হল, শিবানী বোধ হয় কিছু চাপা দিতে চাইছে। কিসের মুখোমুখি হতে চাইছে না যেন। নিশ্চয় দিয়ার কিছু হয়েছে।

—শিবানী! দিয়ার কি হয়েছে?

—দিয়া...দিয়া...অভী ওকে ছেড়ে...

শিবানী আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল, কি হবে ওর? এ আমার কি হল তাই বলো! এ কি হল?

সুহাস দৌড়ে এল। কল্যাণী টেলার্সের গগন বাবু চেঁচালেন, মাসিমা! সুহাস, কার কি হল? শিবানী থামতে পারছে না। যখন যা চেয়েছে তাই করেছে। অভীর সঙ্গে থাকতে গেল, পইপই করে বলেছি, এমন সম্পর্ক থাকতে পারে না...

করবী বললেন, সুহাস, ওকে টেনে সোফায় বসাও। আমি দরজাটা বন্ধ করি। টি.ভি.-টা চালিয়ে দাও।

কিছুক্ষণ 'দিল মাংগে মোর' ইত্যাদির চিৎকারের ধামাকা।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে করবী একটু জোরেই বললেন, কিছুই হয়নি গগন! ব্যস্ত হয়ো না।

ঘরে এসে দেখেন, সুহাস ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছাচ্ছে। শিবানীর কান্নার দমক একটু স্তিমিত! শিবানী বলল, সরি, মা!

'মা' বলে ও বহুবছর ডাকে না। আগে 'মাসিমা' বলত, এখন কিছুই বলে না।

—সরি হবার কিছু নেই। সুহাস, ট্রে-টা নিয়ে চলে যা। শিবানী! দিয়ার বিষয়ে তুমি যাই বলো, আমি অবাক হব না। ও চিরকালই ওই রকম। অসম্ভব স্বার্থপর, তাতে বুদ্ধি কম। আর তোমরা যদি ওকে ছোটবেলা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিতে! তাও করলে না।

—বুঝি নি।

—বোঝ নি। আমাদেরকে শত্রু ভেবেছ...যাক গে! এখন বলো কি হয়েছে।

—কি যে বলি!

—বলতে তো হবে। আমি হয় তো কিছুই করতে পারব না। তবু আমাকে বলবে বলেই তো এসেছ। আর দিয়ার ব্যাপারে ভীষণ উদ্বেগ ছিল তোমার শ্বশুরের। ব্যথাও পেয়েছেন খুব। ভুল বুঝে তোমরা সরে থাকলে, তাতেও...শিবানীকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে। কে বলবে, ও আর দীপ একটা বিজ্ঞাপনের আপিসে ঢুকেছিল একসঙ্গে! ও যে লেখাপড়ায় ভালো ছিল, দেখে বিশ্বাস হয় না। আলখাল্লার মতো রংচঙে সালোয়ার-কামিজ, টেরাকোটা বালা, কানে বিশাল রুপোর রিং, বেগুনি টিপ,—ভালো দেখালে কথা ছিল। ওকে ভালো দেখায় না, বেচারি!

আর ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাওয়া...''দিয়া'জ'' নামক পোশাকের দোকান অবশ্য ভালো চলছে। ভারতের সব রাজ্যের বিয়ের কনের পোশাক ওরা বেচে। বাংলা সিরিয়ালে ওদের পোশাক নাকি ব্যবহার হয়।

—কি হয়েছে দিয়ার? অভীর সঙ্গে...

শিবানী চোখ মুছে বলল, কত নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম ওদের দেখে। বম্বেতে অভীর ফ্ল্যাট কি সুন্দর!

—অভী তো ওর চেয়ে বিশ বছরের বড়!

—ওটা কোনো ব্যাপারই নয়।

—বিবাহিত তো বটে!

—সে তো অল্প বয়সের বিয়ে।

—সব একসঙ্গে থাকে?

—থাকে কখনও? অভী ব্যাঙ্গালোরের হোটেল ওর বউকে দিয়ে দিয়েছে। অবশ্য বলতে পার, হোটেলে ওর যা শেয়ার তাই দিয়েছে। ওর বউ...বড়লোকের মেয়ে।

—হোটেল ওর বউয়ের?

—বউয়েরই তো। অভীরও শেয়ার ছিল।

—ছেলে মেয়ে?

—দুজনেই ছেলে। ব্যাঙ্গালোরেই ম্যানেজমেন্ট পড়ছে।

—অভীর বয়স কত?

—পঞ্চাশই হবে, বেশি নয়।

—করবী বললেন, দিয়ার বয়স চব্বিশ!

—ও তো দিয়াকে ভালোবাসে মা!

—শিবানী, শিবানী! দিয়াকে পড়ালে বোধহয় চারটে স্কুলে। কোথাও ও স্কুলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। দিয়ার অভিযোগগুলোও ছিল অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। ওর জন্যে একজন টিচারকে চাকরি ছাড়তেই হল...

হ্যাঁ, এ রকমটা যখন ঘটে, দিয়ার বয়স মাত্রই এগারো। একেবারে নিষ্পাপ মুখ, চোখে জল, গলা কান্নায় ভেজা। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে তাক ধুমাধুম ঝগড়া করে ওরা ওকে ছাড়িয়ে আনে। কাগজে প্রচুর লেখালিখি হয়। সেই শিক্ষিকা কাজ চেড়ে চলে যান।

—তখন বুঝি নি।

—অত্যাচার আর অসভ্যতার অভিযোগ ও তো সকলের নামেই করত। সেটা অসুস্থতা, চিকিৎসা করা যেত। থাকগে, অভী তো বউকে ডিভোর্স করে দিয়াকে বিয়ে করেছে?

শিবানী ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়ল।

—বউ তো ডিভোর্স দেয় নি!

—কুড়ি বছর না হতে শমীকে বিয়ে, বম্বে গিয়েই ডিভোর্স। তারপর মডেল হবার চেষ্টা, আর অভীর সঙ্গে সম্পর্কটা এখন বসবাসের?

—তাই।

সংকোচ করো না। আমি নীতিবাগিশ নই। আমাদের সময়েও ডিভোর্স, পুনর্বিবাহ, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যায়, স্বামী স্ত্রীকে, এসব দেখেছি। এখন একত্র বসবাস চলছে, অনেকদিনই চলছে। আমি কিছুই দোষগুণের দেখি না। সময় এ রকমই। আর এখন এইসব ঘরে ঘরে একটা সন্তান থাকলে, সে ছেলে বা মেয়েও মা-বাবার উচ্চাশার শিকার হয়...

—আমরা তো...

—শোনই না শিবানী? এই একতম সন্তানদের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনাও করি, আবার কাগজে যা বেরোয় তা ফাইল করে রাখার কাজটা আমিই করি। একতম সন্তানদের ওপর অবিচার হয়ে যায়, ওরা হয়তো অত খাওয়ান, মাখান, অজস্র বিলাস-দ্রব্যের চেয়ে ছোটবেলা থেকে মা-বাবার সাহচর্য পেলে ভাল হত। বাবা-মা তো ঘুষও দেয় সমাজের কোনো স্তরে।

—আমরা...

—ওরাও হিসেবি ও স্বার্থসর্বস্ব হতে শেখে। যা চায়, তা না পেলে ভয়ংকর জেদ ধরে। যেমন চলতে চায়, তেমনই তো চলতে দিয়েছ দিয়াকে! আঠারো না কুড়ি হতে ঠিক করল সমুদ্রকে বিয়ে করবে। বিয়ে করল শমীকে...

শিবানী আঙুলগুলো মুচড়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, অভী ওকে ছেড়ে গেছে,—অভীর স্ত্রী মারা গেছে,—বম্বের এই ফ্ল্যাটও নাকি ওর বউয়ের এস্টেটে চলে যাবে...

—দিয়ার ফোনেই তো সব জানলাম। দিয়া...দিয়ার...

—সন্তান হবে?

—হ্যাঁ।

—আমার কাছে কেন এসেছ, তোমরা যাও, ওকে নিয়ে এস এখনই। এখনই তো পরিবারের সহায়তা দরকার।

—দিয়ার বাবা চলে গেছে টিকিটের খোঁজে। আজ বিকেলেই যাবে।

—ঠিকই করেছ তোমরা, ওকে নিয়ে এস।

—তোমার কাছে...ওকে নিয়ে...ক'দিন থাকতে পারি?

—ওখানে ও থাকবে না?

—ও...শুধু বলছে...আমাদের ঘৃণা করে...অভী আর ওর সম্পর্ক ভাঙার জন্যে আমরাই দায়ী...আমরা চাই নি ও সুখী হোক...কি অর্থহীন আবোল তাবোল প্রলাপ।

—প্রথমেই তো মনে হচ্ছে ওকে কোথাও ভর্তি করা উচিত।

—আগে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক...তারপর চিকিৎসা...ওখানে গার্গী না কে যেন থাকে তোমাদের আত্মীয়?

—আমার মাসতুত বোনের মেয়ে। সে দিয়াকে দেখতে পারে না, দিয়াও তাকে...

—তোমার মা, দাদা, ভাই, সকলেই তো এখানে একই বাড়িতে যে-যার ফ্ল্যাটে।

—দিয়াকে কেউ দেখতে পারে না।

—এখনো বলতে পারছ না, দিয়া কাউকে সইতে পারে না।

—তোমাকে খুব অ্যাডমায়ার করে।

সেই কবে চলে গেছ তোমরা! থাকল বা কোথায়, দেখল বা কতটুকু!

করবী ভাবলেন। তারপর বললেন, এস ওকে নিয়ে। তবে শিবানী! ওকে বাকি জীবন চিকিৎসায় থাকতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ মানতে হবে। দীপ ওকে আনতে পারবে?

—দাদাও যাচ্ছে। ওকে দিয়া পছন্দ করে।

—তুমি গেলে না?

—আমি না কি ওর সবচেয়ে বড় শত্রু! এ কথা শুনতে শুনতে...

—চল, তোমাকে ট্যাক্সি করে এগিয়ে দিই। এখন তোমার বাড়িতেই ফোন আসবে।

করবীর মন বলল, দিয়া কিছু না করে বসে!

শিবানী বলল, দিয়া যদি কিছু করে বসে?

কাপড়টা পালটে আসি! তুমি গাড়িতে আসনি?

—ও আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। কি যে হয়ে গেল দিয়ার! এখনও...এত অপরিণত!

—ওর দাদু তো তাই বলতেন।

এই দিনের কথা করবীর খুব মনে থাকবে। বাকি জীবনই সঙ্গের সাথী হয়ে থাকল শিবাণীর বিধ্বস্ত মুখ, ওদের বাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে শিবানীর দাদা ও ভাইপোর থমকে থাকা চেহারা। ট্যাক্সি থেকে নেমেই ওদের দেখে শিবানীর চিৎকার, দিয়া নেই?

করবী কোনমতে নিজেকে সামলালেন। শিবাণীকে জড়িয়ে ধরলেন।

ওর দাদা গৌরাঙ্গ বলল, চল ভিতরে চল। সবাই দেখছে। ভিতরে লিফট উঠছে, অজ্ঞান। ভাইপো ডাক্তারকে ডাকতে গেল। ঘরে ঢুকে শিবানীকে সোফায় শুইয়ে করবী ঠোঁট কামড়ে কেঁদে যাচ্ছেন, ওর মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

গৌরাঙ্গ বলল, এখন টেনস হয়ে থাকে সব সময়। আগেই খারাপটা ধরে নিল।

—কি হয়েছে?

—গার্গী ফোন করেছিল। আজ সকালেই দিয়া কি সব খেয়ে...

—আত্মহত্যা করেছে?

—চেষ্টা করেছিল। তখনই নিচের নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বেঁচে গেছে, খুব ক্ষতি হয়নি। গার্গীকে ওখানে যেতে বলেছিল অভী। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফোন করে বলেছিল ওর কাছে যেতে, রাতে থাকতে। গার্গী থাকছিলও। দিয়া ওকে চলে যেতে বলছিল। ভাগ্যে গার্গী কাজ থেকে ছুটি নিয়ে থেকে যায়!

—গার্গী ওখানে যায়?

—অভীর সঙ্গে কাজ করত; দিয়ার সঙ্গে ওর কারণেই...

—একটু জল দাও।

ডাক্তার এসে পড়লেন, দেখলেন, ইঞ্জেকশান দিলেন। নাড়ি দেখলেন, চোখের পাতা তুলে চোখ। বললেন, ঘুমোবেন, এখন ঘুমোবেন। যদি জেগে ওঠেন, একটু গ্লুকোজ, হরলিক্স...

—নার্স পাঠাব?

করবী জল খেয়ে বললেন, দেখি!

গৌরাঙ্গের ছেলেটির চুল উলটে পোনিটেল বাঁধা। বেজায় আঁট জিন্স ও 'ইট্স মী' ছাপা টি-শার্ট পরনে। ও করবীকে বলল, 'নিচেই ওঁর নার্সিংহোম।'

দিয়া ও অভীর বাড়ির নিচেও নার্সিংহোম, দিয়ার বাবা মা-র বাড়ির নিচেও। কিন্তু...

—দীপ তো পৌঁছয় নি।

—বাবা তো পিসিকে নিয়ে কালই যাবে মর্নিং-এ।

—পৌঁছে দীপ ফোন করুক।

—দিদা, তুমিও যাবে?

—না রে, অতটা পারব না। দীপ ফোন করুক!

গৌরাঙ্গের স্ত্রী হুড়মুড়িয়ে ঢুকল, বাব্বাঃ। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে এ কি খবর! মাসিমা, আমরা তো জানতামই না দুপুরে ওরা গেল কোথায়। দীপদা যে বম্বে গেছে, সেটা ফোন করেও বলে নি কেউ। ও মা! আপনি বা এলেন কখন? কেউ বলেও নি।

করবী ক্লান্ত চোখে চাইলেন। গৌরাঙ্গ অথবা তার স্ত্রী, কাউকেই বহুদিন দেখেন নি। ও তো শিবানীরই বয়সী। দেখছে ঘরের অবস্থা থমথমে, কলকল করে কথা বলে যাচ্ছে।

—কি হয়েছে রে আপ্পু?

আপ্পু অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিল। শিবানীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বলল, দিদা! বেডরুমে নিয়ে যাই।

—চল, আলোটা জ্বেলে দিই।

শিবানীকে শুইয়ে দিল আপ্পু। বলল, মা আর পিসি, ডায়েট করে করে...নো ওয়েট অ্যাট অল!

বাইরের ঘরে এলেন। বললেন, তোমার নামটি ভুলে গেছি মা! ঝুমুর, না নূপুর?

—আমি ঝুমুর। কি হয়েছে মাসিমা?

—ওই তো, অসুস্থ হয়ে পড়ল...দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল আমার কাছে...

—টু ব্যাড! আপ্পু তো একটা ফোন করতে পারতিস?

—মা! আমি তো পিসোর সঙ্গে ঘুরছিলাম। করবী একটু হেলান দিয়ে বসলেন। গৌরাঙ্গ ঢুকল। বলল, নার্স আটটায় আসবে শুনে "দিয়া'জ" থেকে মিতাকে নিয়ে এলাম। দরকারে-অদরকারে মিতা থেকেই যায়! আগে একটু চা কর গো মা!

লম্বা, শক্তপোক্ত, ছাপা শাড়ি ও টিপ পরা মেয়েটি বলল,

দাদার মা?

—হ্যাঁ, ওর কাছেই গিয়েছিল।

ঝুমুর বলল, আমি চা করছিলাম...

—মিতার তৈরি চা-ই খাও।

—বাব্বা! লাউঞ্জটা একেবারে নতুন সাজিয়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্ষমাপ্রার্থীর মতো করবীর দিকে চাইল। তুমি কি করবে গৌরাঙ্গ? বাড়ি ও জমির কারবারে সময় বুঝে নেমেছিলে সেই কবে! তোমার মনটাই গ্লোবাল! নইলে একতম ছেলে নিয়ে আণবিক-পরিবার বানিয়ে বসে আছ? বউও চুল কালো করে শূন্যে টোপর বেঁধে কোথাও কাজে যাচ্ছে। ছেলের মাথায় পোনিটেল? তোমার চেহারাতেও প্রমোটারি দ্যুতি বেরোচ্ছে।

লজ্জা পেও না।

মিতা চা, বিস্কিট ও কাজু নিয়ে এল।

—ও কাল যেতে পারবে গৌরাঙ্গ?

—ডাক্তার বলছেন, না গেলেই ভাল। ও তো কথা শুনবে না। আর দীপের শরীরও ভালো যায় না। দুজনেরই প্রেসার চড়া, ওষুধ খায়।

—না গেলেই ওর মনও শান্ত হবে না। আমি তো কোনো কাজে লাগব না, পারলে যেতাম। গৌরাঙ্গ বলল, আমি যাব। এ সময়ে আমি থাকলে দীপের একটু ভরসা হবে।

—খুব শক্ত মনের ছেলে তো ছিল না।

—আপনি ভাববেন না। আপনি শিবানীর কাছে ঘুমান। মিতা রেঁধে দেবে। শিবানীকে খাওয়ালে ওই খাওয়াতে পারবে।

—বাড়িতে একটা ফোন করি। সুহাস ভাববে।

—আমি হাত মুখ ধুয়ে ব্যাগ গুছিয়ে আসি।

—সকালে ওকে নিয়ে চলে যাব। তবে রাতে কিছু খাবে। ওষুধ সঙ্গে নেবে।

—বেচারি শিবানী!

—আমার বোন খুব বেচারি নয় কিন্তু! দিয়ার পাগলামিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে...কি বলব বলুন? দুজনে 'মেয়ে মেয়ে' করে ঝগড়া করে করে নিজেদের জীবনটা...বোনকে তো আমি ভয় পাই। আমরা বলুন, ফ্ল্যাটের যে কেউ বলুন, সবাই না কি দিয়ার কারণে ওদের হেয় চোখে দেখে। ওফ্, বিট্রেয়ার! দাই নেম ইজ ওম্যান!

গৌরাঙ্গ মোটা তোয়ালে রুমালে ঘাড় ও মুখ মুছল। বলল, আপ্পুকে আমি কন্ট্রোলে রেখেছি। বেণীই বাঁধ আর গিটারই বাজাও, ভালো রেজাল্ট করতে হবে। এম. বি. এ. পড়বে এবং কাজ করবে। বাপের পয়সার ভরসা করলে ফরসা করে দেব। দেখলেন তো ঝুমুরকে? রান্নার বই না দেখলে সুক্তো রাঁধতে পারে না। আমি আর দীপ, ঠিক আছি। শিবানী আর ঝুমুর? জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, পুজো, বিজয়া! এছাড়া মুখদেখাদেখি নেই। অথচ এককালে আমরা ট্রেনে চেপে কত ঘুরেছি!

—তোমার ছোট ভাই?

—তিনি ছ'তলায়। এক বিলডিংয়ে এলাম সবাই। সম্পর্ক ভালো থাকবে বলে. আজ দেখুন! সম্পর্ক রাখে তো দীপ। আপ্পু ওকে খুব ভালোবাসে! ঘুরে আসি।

—ডাক্তার কি আসবেন?

—দরকারে মিতা ফোন করবে। নার্সিংহোম নিচে। নিজে থাকে সিক্স-ডি-তে।

করবী বুঝতে পারছেন এ বাড়িতে সম্পর্কগুলি কি জটিল!

দীপ আর শিবানী মেয়েকে নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক কত জটিল না করেছে।

আর শিবানীর ভাইরা-ভাই বউরা, আপনজনদের সম্পর্কেও অনেক ছায়া পাঁচিল। সত্যি পাঁচিল ভাঙা যায়। ছায়া পাঁচিল তো রয়েই যায়। দীপ আর শিবানী কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অক্ষম। প্রথম যখন চলে আসে ওরা, পল্টু কি দুঃখ পেয়েছিলেন। ওরা সম্পর্ক আর রাখবে না, দেখ।

করবী বলেছিলেন, তুমি আর পুরনো ধারণা নিয়ে বসে থেকো না তো! ওদের সময় অন্যরকম, তা বোঝ না কেন? সবাই মিলে একসঙ্গে থাকার মানসিকতা চলে যাচ্ছে।

—তাই ভাবি! এত কিছু হয়ে গেল ছয় আর সাতের দশকে...

—ওদের প্রজন্মে যারা রাজনীতি নিয়ে ভাবেনি, তারা এখন নিজেদের মত বাঁচতে চায়।

পল্টু অসহায় গলায় বলেছিলেন, হ্যাঁ, দীপ টাকা আমার চেয়ে বেশিই পায়! তবে এ বাড়িতে তো কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না। ভালো জায়গায় বাড়ি, এমন পাকা গাঁথনি....

—ওরা মনে করে এটা জায়গার অপচয়। যাক গে, যদি ওরা দুজনে কাজ নিয়ে বোম্বাই যেত?

—সেই তো কথা গো! ওরা তো যাচ্ছে এই শহরেরই কোথাও।

আসবে, যাবে, আমরাও যাব।

সম্পর্ক সে ভাবে থাকেনি। পল্টুর মৃত্যুর পর সবাই এখানে। সুহাস বলল, সকলের শোকে তাপিয়ে তাপিয়ে সে লোক চলে গেল! কে জানে, দীপ আর শিবানীর সম্পর্কই বা কি রকম!

রাত দশটা নাগাদ মিতা এসে শিবানীকে জাগাল। একটু সুপ খাওয়াল। শিবানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে করবী বললেন, দিয়া...ভাল আছে। শিবানীর চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু ও ঘাড় নেড়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

মিতা বলল, আপনি চলুন, হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়বেন। নার্সকে আসতে নিষেধ করলাম।

—কিছুই আনি নি।

—দিদির হাউসকোট দেব।

—দীপ ফোন তো করবে।

—নিশ্চয় করবেন। বাইরের ঘরে ধরবেন? এ বাড়িতে দুটো ফোন, ঘরে ঘরে ফোনের ব্যবস্থা।

তারপর বলল, কি দুর্ভোগ এদের!

—তুমি মাঝে মাঝে থাক?

—থাকতেই হয়। এখানে তো...আমি ঝাড়া হাত পা মানুষ। বাড়িও নারকেলডাঙা। থেকে গেলে সুবিধাই হয়। ওরা যখন বাইরে যায়...

—চল, দেখিয়ে দাও সব।

স্নানই করলেন করবী। শিবানীর হাউসকোট পরলেন। মিতার জোরাজোরিতে টেবিলে বসে একটু খেলেন।

—তরকারি কেন? একটু দুধ রুটি খেলেই হত?

—দুধ তো এরা খায় না। রাতে খায় যত কৌটার জিনিস। সুপ, হেনতেন, নয় তো ম্যাগি। আমি এলে রেঁধে নিই। দাদাও খুব খুশি হয় রান্না তরকারি খেয়ে।

—শিবানী বরাবর তো খেতে ভালোবাসত। এখন হয়তো খায় না।

—আপনাকে এ বাড়িতে বেশি দেখি নি।

—খুব তো আসি না।

—দাদার মুখ আপনার সঙ্গে মেলে। দাদা...ফোন বাজল।

করবী চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন, ফোন ধরলেন।

—হ্যালো, হ্যালো বাচ্চু!

—দীপ, আমি মা! শিবানী ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোচ্ছে?

—হঠাৎ খবরটা শুনে...

—বুঝেছি। মা! নার্সিংহোমের বাইরে থেকে ফোন করছি। দিয়া ভালো আছে।

—ভালো আছে তো? বিপদ...নেই আর?

দীপ একটু চুপ। মাকে এটুকু ভেঙে পড়তেও ও দেখেনি!

দীপ বলল, কাল শিবানী যেন আসে। গৌরাঙ্গ গার্গীকে জানিয়ে দেবে কখন আসছে। দিয়াকে অন্তত সাতদিন থাকতে হবে।

—সুইসাইডের চেষ্টা! পুলিস কেস হবে না তো?

—ও তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—তোমরা মেয়েকে নিয়ে এস। ওকে চিকিৎসা করাও।

—স-ব হয়ে যাবে। মেনি থ্যাংকস মা!

ফোন নামিয়ে রেখে করবী মিতাকে বললেন, গৌরাঙ্গ আর শিবানী তো কাল যাবে।

—আপনি ওঁকে জানাতে চান? দাদা নিশ্চয় গৌরাঙ্গ বাবুকে খবর দিয়েছে। ওঁরা দুজনে দুজনের বন্ধু... যেমন দেখি, তেমন বলছি!

করবী ভাবলেন আমিও কাল যাব। ওরা দিয়ার খবর জানাবে নিশ্চয়।

—চল মিতা, শুয়ে পড়ি।

—হ্যাঁ, আপনারও ধকল গেল।

—তবু এসেছিলাম বলে জেনে গেলাম।

করবী শিবানীর খাটেই এক কোণে শুয়ে পড়লেন। না, তাঁর এত ক্ষমতা নেই। এমন একটা সংকটের মোকাবিলা এরা করতে পারে। এদের জীবনও যেন নিরন্তর ছুটে চলা। এ রকম ছুটের পর ধসে পড়ার কথা। যদি ধসে না পড়ে, সে লোক অতি-মানব।

থাকুক, ওরা নিজেদের মতো থাকুক।

আমি আমার মতো থাকি।

মানবিক, বা রক্তের আত্মীয়তা, সম্পর্ক, এ সবের ব্যাখ্যা দিয়াদের কাছে আরও অন্যরকম। কি করা যাবে! 'সম্পর্ক' শব্দটার মানে উলটে পালটে যাচ্ছে। এ বড় অদ্ভুত সময়। পল্টু যেমন লিখেছেন তাঁর বইয়ে। "এখন চেনা মুখ অচেনা হয়ে যাচ্ছে, কি করতে পারি? যাকে জানতাম অমল বলে, সে উদ্ধত গলায় বলতেই পারে, 'আমার নাম তড়িৎ। অমল, অমল করছেন কেন?' অথচ আমি জানি ও অমল। আমার স্ত্রী বলেন, আমার ঘড়ির কাঁটা ডাইনে নয়, বাম দিকে ঘোরে। হয় তো তাই হবে। নচেৎ পুরাতনের জন্য এত হাহাকার করি কেন?"

পল্টু, প্রথম মৃদু হার্ট অ্যাটাকের পর কেমন যেন গা ছেড়ে দেন। আবার 'কালস্য গতি' আরম্ভ করে একটু একটু করে আত্মস্থ হলেন।

একটু একটু করে...

একটু একটু করে ভোরও হল। শিবানী উঠল। এখন ও বেশ বুঝতে পারছে সব। বলল আমি না গেলে তোমার ছেলে...ও তো নার্ভাস! তারপর মিতাকে বলল, দাদা ফোন করল। আমাকে ডাকতে পারলে না? ওষুধ ফেলে গেছে!

মুখে বলছে, ব্যাগে জামাকাপড় নিচ্ছে। কত ভালো হয়েছে এখনকার অনেক কিছু! সালোয়ার কামিজ পরে চলাফেরার সুবিধে কত!

বলল, তোমাকে আমরা নামিয়ে দিয়ে যাই?

—পাগল না কি? তুমি বেরিয়ে পড়।

—মিতা, দিদাকে ব্রেকফাস্ট করে দিও...আর চাবি জয়তীকে দিও। মনে নেই ফ্রিজে কি আছে।

—তুমি চা-ও খেলে না?

—না না। এয়ারপোর্টে...

—সম্ভব হলে আমাকে একটু ফোন কোর।

—হ্যাঁ...অবশ্যই. .সাতদিন রাখবে...

গৌরাঙ্গ হুড়মুড়িয়েই এল। করবীকে বলল, আপ্পু আপনাকে পৌঁছে দেবে।

করবী ঘাড় নাড়লেন। চোখে মুখে জল দিয়ে কাপড় তো পরে নিয়েছেন। মিতাকে বললেন, আমি এবার যাব। এ রকম পরিস্থিতি তো কখনও হয়নি। মানে...

—আমার বাড়িতে ও গেল...

—চা খাবেন তো? আমি তো খাব।

—কর!

চা নিয়ে, মিতা চুল আঁচড়ে ব্যাগ নিয়ে এল। বলল, আমি আপনার বাড়িটাও দেখে আসি? শুনেছি অনেক, দেখি নি। আসার সময়ে একটু বাজার করেও আনব। যা হয় রেঁধে খেয়েই যাব দোকানে।

—এখানেই ফিরবে?

—শিবানীদি কিচ্ছু ভুলবেন না। দোকানে ফোন করবেন। জয়িতাদি আমাকে বলে দেবেন।

—তুমি ওখানে কি কর?

—ফিটিং-এর অঙ্ক কষি। কোমর, আস্তিন, বগল, ঝুল, কোনটা বাড়বে, কোনটা কমবে, দায়িত্বের কাজ! খদ্দেরদের সঙ্গে ট্রায়াল রুমে থাকা, খুব কষ্টের।

—ভালোই তো চলে।

—চলবে না? মেগা সিরিয়ালে "দিয়া'জ্"-এর পোশাক চলছে। লাখ লাখ লোক দেখছে। খুব চলছে।

—অজানা জগৎ! চল, যাই।

—একটু করিডোরে দাঁড়ান, ঘর বন্ধ করি। করবী দেখলেন পরপর ফ্ল্যাটগুলি। শিবানী এত মানুষের মধ্যে থেকেও কত একা! ওদের ফ্ল্যাট তো ওঁর বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট। অত বড় বাড়িতে করবী কিন্তু যথার্থ একা নন। এমন গমগমে জায়গায়, এত লোকের মধ্যে, অত ছবি ও মূর্তি টব ও টেরাকোটা ইটের দেয়ালের মধ্যে বাস করে শিবানী ও দীপ যত একা!

বুবলা কি অতই একা?

মিতা বলল, চলুন মাসিমা।

বলতেই হবে, করবীর বাড়ি দেখে মিতার চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

সুহাস তো দৌড়ে এল। করবীর হাত থেকে ব্যাগ নিতে নিতে বলল, কেমন খবর ওখানকার?

—দিয়া একটু অসুস্থ। ওরা দুজন সকালে গেল। আমি রাতটা থাকলাম।

—ভালো করেছ। যা হোক এমন সময়ে তুমি কাছে থাকলে...

এঁকে তো চিনলাম না।

—ওদের দোকানে কাজ করে। খুব যত্ন করেছে আমায়, আবার পৌঁছতে এসেছে।

—চল গো মেয়ে, একটু বসবে।

পালিশ সিমেন্টের লাল নিচু নিচু ধাপ দিয়ে উঠতে উঠতে মিতার চোখ গোল হয়ে যাচ্ছিল।

ওপরে উঠে ও দেখছিল পুরু দেওয়াল, দরজা-জানলার ওপরে লাল নীল রঙা কাচের ডিজাইন, বসার সোফা, চেয়ার, টেবিল, কাচের আলমারিতে সাজান একদিনের 'প্রবাসী', 'পরিচয়', কত কি মাসিকপত্র বাঁধানো। মিতা বুঝতে পারছিল এই মহিলাটি অন্যরকম। সুহাসকে দেখেও ওর সম্ভ্রম হল। সাদা ছাপা পাড় শাড়ি পরেছে, ভিজে চুল পিঠে ছড়ান, হাতে সোনার বুলি। সুহাস বলল, কি দেখছ গো মেয়ে? আমি সুহাস। ইনি আমার মামি।

—সুহাস ওকে জলখাবার দাও। বাজার করে রেঁধে খাবে বলছিলে মিতা। আজ এখানেই খেয়ে যাও।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাত আমার হয়ে গেছে। ছেলেও তো খেয়ে বেরোবে। ভাত ডাল নেমে গেছে, মাছটা করে দেব।

—এখানে খাব? ওঁর কষ্ট...

করবী হাসলেন। বললেন, এ বাড়িতে এমন চলেই। যদি কখনও কেউ আসে, খেয়ে যায় তো!

—এই, এত বড় বাড়ি...?

—আমার।

—যেন সেকালের রাজবাড়ি।

—না না, তবে সেকেলে বাড়ি তো বটেই।

—এমন বাড়ি থাকতে ওরা...

—অসুবিধেও আছে। কোথায় রান্নাঘর কোথায় জল, বাড়ি ঝাড়তে মুছতে দিন যায়...

—ওরা বলে এখানে ফ্ল্যাট তুলবে।

—সে দেখা যাবে। আমি স্নানটা সেরে আসি। তুমি কাগজ দেখ।

মিতা মনে মনে ভাবল, উচ্চশিক্ষিতাই হবেন। ঘরে এত বই, লেখার টেবিল, পুরনো কেতার আসবাব সব! সুহাস এসে বলল, এখন তোমাকে খাইয়ে দিতে পারব। এখনই খাবে?

—উনি আসুন! আচ্ছা, নিচে কি ওনার দর্জির দোকান।

—ওরা পুরনো ভাড়াটে।

—বাড়িতে কে কে থাকেন? এত বড় বাড়ি!

সুহাস একটু অসন্তুষ্ট হল।—আমরা থাকি! এ-ও-সে আসে যায়! তুমি কোথায় থাক গো?

—নারকেলডাঙা।

—সেথা হতে হেথা আস কাজে?

—আসি।

—বাড়িতে সবাই আছেন?

—এক মাসির বাড়ি থাকি, খরচ দিই। আপনি এখানে অনেক দিন আছেন?

—তিন পুরুষ চলছে। মা ছিল, আমি এলাম, আমার ছেলেও এখানে থাকে। বাড়ির লোক হয়ে গেছি গো।

করবী চুলে তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকলেন। বললেন, সুহাস আমাকে একটু দুধ আর কর্নফ্লেক্স দাও। আর মিতাকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে তাও। মিতা তো সকালে স্নান করেই এসেছ, তাই না?

—তাই। যেখানে থাকি, বাথরুম একটা, চারপাঁচ জনের ব্যাপার! ঝপাঝপ সেরে নিতে হয়। খেয়েদেয়ে ঘরে এসে মিতা করবীকে প্রণাম করল। কাল ওকে খুব রুক্ষ, অবিশ্বাসী এবং আলগা মনে হচ্ছিল। হয়তো এমনটি হবারই কথা। অল্প বয়স থেকেই নখে দাঁতে লড়াই করে চাকরি, বাসস্থান, সবই পেতে হয়। ওরা আর কত নরম ও মধুর হয়ে থাকতে পারে! থাকবেই না কেন?

—আবার এস এদিকে এলে, কেমন?

—আসব।

করবীর মনে হল, এরকম কর্মঠ, গম্ভীর একটি মেয়েকে তো ওরা বাড়িতেই জায়গা দিতে পারে।

না, মনটা শান্ত করা দরকার। ঐ কেমন হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কগুলো! পল্টু যেমন ভাবতেন, সবাই এক সঙ্গে থাকবে, ছেলেরা কাজ করবে, বউরাও।

বলতেন, বরং তেতলায় দুটো ঘর তুলে নেব। আমরা আমাদের মতো থাকব। মানে, বয়স হলে...প্রতিদিন সূর্যোদয় দেখব। জান তো, উদীয়মান সূর্য দেখলে চোখ ভাল থাকে?

—তুমি ১৯২৩-এ জন্মেছ। সময়টা ১৯৭৬, এত স্বপ্ন দেখ না।

—কি যে বল, স্বপ্ন নিয়েই বাঁচি। তোমার স্বপ্ন নেই?

—সে যবে ছিল, তবে ছিল। সময়ের বদলকে মেনে নিতেই হয়। দীপ, আবির, ওরা আরেকটা প্রজন্ম।

পল্টুর পাণ্ডুলিপিটিতে হাত রেখে বসে থাকলেন। যখন মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাণ্ডুলিপি যে কপি করছেন, তার পাতা খুলে দেখেন।

"শৈশবে রক্তামাশায় ভুগতাম। ঠাকুমার দিদি, আমাদের বড়ঠাকুমা আমাদের বাড়ি থাকতেন। কুকশিমা পাতার রস চিনি মিশিয়ে খাওয়াতেন এবং তাতেই আমি আরোগ্য হই। ইনি রোগে সেবা, এবং গাছগাছড়ার ওষুধদানে পারদর্শী ছিলেন। গ্রামে তাঁর উপর খুব ভরসা ছিল। ওনার ঘরে শিলনোড়া, খলনড়ি, হামানদিস্তা ইত্যাদি গোছানো থাকত এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় বসে বই পড়তেন। 'মাসিক বসুমতী'-র অনুরাগী পাঠিকা ছিলেন..."

করবী যেন এই সব লেখা পড়লে স্বামীকে খুব কাছে পান। সরল, শক্ত সমর্থ, সাদাসিধা মানুষ! ছোট ছোট আশা পূর্ণ হয় নি। মনোভঙ্গেই মারা যান। এ বেদনা আজও করবীকে বিদ্ধ করে।

করবীকে সম্মান করতেন কত! ছেলেমেয়েদের নিয়ত বলতেন, মা স্কুলে পড়ান, বাইরে বেরোন, মায়ের কাছে অযথা আবদার কোর না। আমি আমার গেঞ্জি গামছা নিজে কাচি। তোমরাও স্বাবলম্বী হও।

শেষ রোগশয্যায় বললেন, কোনদিন কিছু চাইলে না।

করবী বলেছিলেন, অনেক দিয়েছ।

—তোমার আরও বেশি প্রাপ্য ছিল।

—অনেক দিয়েছ। এমন সৌভাগ্য কম মেয়ের হয়।

শ্রদ্ধা করেছ... সম্মান...

হ্যাঁ। অনেক পেয়েছেন করবী। দুজনে দুজনকে এত বুঝতেন। এখনও মন পূর্ণ হয়ে থাকে।

কিন্তু দিয়ার বা কি হবে! শিবানী ও দীপ কি নিজেদের জীবনকে একটা শান্ত, সুস্থ মাত্রা দিতে পারবে?

করবী হাই তুললেন। অনেক, অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পল্টু ও করবীর কাছে এ বাড়ি বড় ভালোবাসার বাড়ি।

না, ছেলেরা লাখ লাখ টাকা পাবে বলে প্রোমোটারের হাতে বাড়ি তুলে দেবেন না। পল্টুর এ-বাড়ি দরকার নেই। বাড়ির মালিকানা শ্রীমতী করবী দত্তের। তিনি বাড়ি বিষয়ে যা ঠিক করবেন, তাই হবে।

আপাতত বুবলা এসে এখানে থাকলে বাঁচা যায়। ওকে বলবেন, খরচ দিয়ে পেয়িংগেস্ট হয়েই থাক। ও সঙ্গে থাকলে করবী হয়তো 'আশ্বাস'-কে বেশি সাহায্য করতে পারবেন। পাণ্ডুলিপিটি কপি করার কাজটাও কাউকে দেবেন। তাহলে কাজটি এগোবে।

ছয়

দুপুরে ঘুমিয়েই পড়েছিলেন করবী। কাল রাতটা ছিল দুঃস্বপ্নের। ঘুম হয়নি। শুয়ে ভাবছিলেন, এই যে মানবিক ও স্বাভাবিক সম্পর্ক জটিল হয়ে যাচ্ছে,—দীপ আর শিবানী আর দিয়া, এতে কি তাঁর কিছু করার ছিল না? বড়ই কি নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন? ওই যে দিয়া বলত, নাক গলিও না তো! ব্যাপারটা আমার।

ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথা! ছোটবেলা কিছুকাল আসত শনি রবিবারে। কি ভালোবাসত গরম লুচি আর বেগুনভাজা! পল্টু ওকে নিয়ে সগর্বে ম্যাডক্স স্কোয়ারে যেতেন। বন্ধুদের বলতেন, আমার নাতনি!

ওর বাবা-মা কোথাও গেলে এখানে রেখে যেত। এখনও মনে পড়ে, ছাতে ও স্কিপিং রোপ নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

পল্টু ছেলে-বৌকে বলতেন, ওর বন্ধু নেই ওখানে?

—একেকজন একেক ব্যাকগ্রাউন্ডের, মিশবে কার সঙ্গে?

—কার যেন নাম বলে, বুলতি!

—তোমাদেরও বলেছে?

—বলেছে তো!

—বাবা, কি বলেছে?

খায় দায়, বিকেলে ওরা তোমাদের বিলডিং-এর পিছনের মাঠে গিয়ে খেলা করে!

শিবানী ফুঁসে উঠে বলেছিল, চারটি মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে পারে বটে! আগে বলত, মিমির সঙ্গে খেলছি, এখন বলে বুলতি!

পল্টু আঙুল তুলেছিলেন, মিমি বা বুলতি নেই কোথাও?

—কোথ্‌ থেকে থাকবে?

দীপ নরম গলায় বলেছিল, খুব কল্পনাপ্রবণ তো!

শিবানী আবার বলল, সকাল থেকে রাত অবধি আমাদের রুটিনে চলে। বন্ধু আসবে কোথা থেকে? আমরাই তো ওর বন্ধু। ছোটবেলা বাবা-মাকে পায় না বলে...দেখুন না, বিল্ডিংয়ের পিছনে যে মাঠ ছিল, তাতে বাড়ি উঠছে। আমাদের বিলডিংটা ইংরাজী 'এল'-এর

মতো। মাঝে ছোট একটা বাগানও আছে। তাতে কারো ঢোকাই বারণ। পিছনে মাঠ আছে, যে খেলবে?

পল্টু অত্যন্ত বিচলিত হলে চশমা খোলেন, মোছেন ও পারেন। চশমা মুছে পরলেন ও বললেন, তোমরা বাবা-মা হওয়ার অযোগ্য! কি নিঃসঙ্গ মেয়েটা! কল্পনায় ও পিছনের মাঠ বানাচ্ছে, ওর সমবয়সী কল্পিত শিশুদের সঙ্গে খেলছে! দেখ শিবানী! মেয়েকে 'মিথ্যাবাদী' বোল না। রোজ বিকেলে কষ্ট করে লেকে বা দেশপ্রিয় পার্কে নিয়ে যাও। তোমরা শিক্ষিত, এ টুকু বোঝ না মেয়েটা বড় নিঃসঙ্গ। তাই কল্পনা করে যে ওর বন্ধু আছে। তোমরা ওর ট্রাজিডিটা বুঝলে না। ভাবলে, দামি স্কুল। অজস্র খেলনা, হেনতেন দিলেই মেয়ের উপর কর্তব্য করা হল।

শিবানী আর দীপ ভয় পেয়েছিল। পল্টু এমন রুক্ষ স্বরে কথা কচিৎ বলেন।

করবী বললেন, থাক! দিয়া শুনতে পাচ্ছে।

—দীপ! নিজের ছোটবেলাও ভুলে গেলি, তোরা ছিলি তিন জন। বর্ষা বাদলে নিচতলায় খেলতিস। যাক গে, ওর কথাগুলিকে অবিশ্বাস করছ, এ তো মেয়ে বুঝতে পারছে। আরও বড় হতে হতে ও মনের কথা লুকাবে, তোমাদের বিশ্বাস পাবে না, এরপর যা চায় তা না দিলে...

—অনর্থ করে। যা চেঁচায়!

—স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। ছেলেপিলে স্বার্থপর হয়ে যায়, চেঁচামিচি যে করে, সে তোমাদের মনোযোগ আদায়ের জন্য। দিয়াদের প্রজন্মে এ সব গণ্ডগোল হবেই। ভয় হয়, ও প্রবলেম চাইল্ড না হয়ে দাঁড়ায়।

—তেমন হলে এখানে রাখতাম, কিন্তু এখানে তো ইংরিজি মিডিয়াম স্কুল নেই।

—না না, প্র্যাট মেমোরিয়ালে হবে, হার্টলেতে পড়ছে, আমাদের হাউসিং-এ কেউ বাংলা স্কুলে পড়ায় না।

—প্রবলেম চাইল্ড না হয়ে যায়!

তাই তো হল। একটু বড় হবার পর দেখা গেল কথায় কথায় কি মেজাজ! উলটো পালটা মিথ্যা কথাও বলে। অথচ চেহারা এতই নিষ্পাপ, এমন সুন্দর! ওই মেয়ে মাকে চোস্ত ইংরেজিতে গাল দেয় তা কে বিশ্বাস করবে?

ডাক্তারের কাছে নাও, ওকে দেখাও, চিকিৎসা করাও, এ সব কথায় বাপ-মা কান দেয় নি। অভীর উপর দিয়ার প্রবল আকর্ষণ দেখে করবীর মনে হত, দিয়া বোধ হয় কোনো বয়স্ক পুরুষকেই ভালোবাসতে পারত।

সে সম্পর্কও থাকল না।

বোঝেন যে থাকতে পারত না। অভী দিয়াকে যতই ভালবাসুক, বাইশ/চব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবন, বড় বড় ছেলে, স্ত্রী, এতসব কিছুকে কি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায়?

জীবনে জীবন যোগ করলেও তো বিয়োগ করা যায় না। তার পিছনে ফেলে আসা জীবন তো অভীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আর দিয়া করতে গেল আত্মহত্যা। আবার আবির ও বুবলা যুক্ত হল, এ-ওকে ছেড়ে গেল, আবার শুনছেন আবির বুবলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। করবীর মন থেকে কেউই তো দূরে সরে যায় নি। এরা তাঁর রক্তের রক্ত, জীবনের

জীবন। নইলে দিয়ার খবরের জন্য এমন উৎকণ্ঠা কেন হচ্ছে? দীপরা যদি বুদ্ধি করে ওকে নিয়ে আসে বড় ভাল হয়। যা চেয়েছে তাই করতে দিয়েছে বা কেন?

একতম সন্তান হলেই তো সবাই এমন হয় না! করবী যে কী করবেন ভেবে পান না। অলকানন্দার স্বামী সাইকিয়াট্রিস্ট। ওরা, কজন তরুণ ডাক্তার একটি সেন্টারও করেছে। তার সঙ্গে কথা বলবেন?

নিরর্থক চিন্তা। ওরা যা করবার করবে।

এমন সময়েই সুহাস প্রায় দৌড়ে ঢুকল।

—ফোন বাজছে, শুনতে পাও নি? আসছে, ধরতে যাচ্ছি, কেটে গেল। এ রকমটা দু'বার হল। চা অবধি খাও নি, শরীর খারাপ করছে?

—চিন্তা করতে করতে...

—তার চেয়ে ছোট বৌদিকে নিয়ে এস। কালই অত দৌড়দৌড়ি হল। রাতে ঘুমোওনি ওখানে। আচ্ছা, বড়বৌদি কি ঘরদোর খুব সাজিয়েছে?

—তুমি অনেককাল, যাওনি, তাই নয়?

—সেই যেবার ওদের দোকান বড় করে উৎসব করল। কত সিনেমার লোকজন এল। তুমি বাড়িতেই বসলে, আমি সব দেখে এলাম!

—হ্যাঁ...সাজায় তো...

—দিয়া কোথায় গিয়েছিল...এস, ফোন ধরো।

করবী হ্যান্ডফোনটা নিলেন।

—কে? দীপ কথা বলছ?

—হ্যাঁ মা!

—দিয়া?

—ভালো আছে। বিপদ কেটে গেছে। তবে খুব ঘুম পাড়িয়ে রাখছে, ড্রিপ দিচ্ছে।

—তোমরা কোথায় আছ?

—গার্গীরা ওদের কোন্ বন্ধুর অফিসের গেস্টহাউসে রেখেছে। গৌরাঙ্গ থাকায় সুবিধা হয়েছে। ও তো সব চেনে জানে!

—শিবানী?

—তারই তো হিস্টিরিয়া। যাক গে, গৌরাঙ্গ সামলে নিচ্ছে।

—যদি আস সবাই, যদি মনে কর এ বাড়িতে থাকলে সুবিধা হবে। দিয়াকে নিয়ে এস।

—জানাব মা, এখনও তো নার্সিংহোমের ভিজিটারদের ঘরেই সারাটা সময় থাকছি।

—নিজেরা স্নান খাওয়া কোর। সবাই অসুস্থ হয়ে লাভ নেই।

—হ্যাঁ মা! তুমি ভালো থেকো, ছেড়ে দিচ্ছি। করবীর বার বার মনে হল, কি যেন ও বলল না। ওর গলায় কোনো উদ্বেগ ছিল। থাকলেও বা উনি না করবেন? টেলিফোন করেও তো কিছু জানা যাবে না। পল্টুর দিদির নাতি চিত্রসেন রায় বোধ হয় বম্বেতে কি কাগজে ছিল। যোগাযোগ নেই। ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানেন না। বিজয়ব্রজকে ফোন করে আসতে বলা যাক। উনি অনেকটা এখনকার সময়ের জটিলতা বোঝেন।

অবশ্য বিজয়ব্রজকে ফোন করতে হয়নি।

কেন না ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে বুবলা এসেছিল একটু পরেই।

—মাসিমা! একটা খবর...

—কার?

'মাসিমা' বলত একদা। বর্ষায় ডোবা কলকাতায় সেদিন এল, থাকল, কিছুই বলে নি। শিবানীও একদা 'মাসিমা' বলেছে। সেদিন কি 'মা' বলেছিল? এ কি হয়েছে করবীর? পুত্রবধূরা কবে কি বলত, তাই ভেবে অবাক হচ্ছেন কেন?

—কার খবর, বললে না তো? আবির আবিব ভাল আছে?

—ও কি বম্বে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ, খুব অদ্ভুত লাগছে ভাবতে। বম্বেতে বরাবরই যায়। যায় না কোথায়! কখন কেরালা, কখন নেপাল, কখন কোদাইকানাল! তা এবার গিয়ে হঠাৎ দিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়।

—দেখা হয়েছিল? কবে গেল?

—গিয়ে তো শেষ অবধি নার্সিংহোমে। দাদার সঙ্গে দেখা হল। দাদারা বেশ বিপদে পড়েছেন।

—আমার টেনশন হচ্ছে বুবলা।

—টেনশন করবেন না। আপনি তো বিচলিত হলেও প্রকাশ করেন না।

—ওদের বাবাই বারবার বিচলিত হয়েছেন। মন ভেঙে গেছে বারবার। সত্যি বলতে কি, তোমাদের আমি সমালোচনা করিনি, বলিনি মুখে কিছু। ওঁকে আঁকড়ে রাখতে হত। খুব সৌভাগ্য আমার। বড় ভয় ছিল। আমি চলে গেলে ওঁর কি হবে, যাক গে! আমার মনে হচ্ছে...

—কি?

ছেচল্লিশ বছর বয়েসেও বুবলার চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। শান্ত আর মৃদু একটা স্থায়ী লাবণ্য একটু রয়ে গেছে।

—সেদিন অত বলো নি। মনে হচ্ছে আবিরের সঙ্গে তোমার যথেষ্ট যোগাযোগ আছে!

—ও তো বারবারই ফোন করে, লেখে...

—তুমিও অকর্মণ্য, আরেকটা বিয়ে করে উঠতে পারলে না। আবিরও গোটা কয়েক এক্সপেরিমেন্ট করেছে মনে করি। সবই অবশ্য শোনা কথা!

—এবার বলি?

—বলো, সুহাসকে চা দিতে বলো।

বুবলা বেরিয়ে গেল। আজ যত্ন করে চুল বেঁধেছে। ছাই রঙা দক্ষিণী তাঁতের শাড়িতে গেরুয়া পাড়। গেরুয়া ব্লাউজ। মুখে চোখে যেন শান্তি, কোনো নির্ভরতা।

—সুহাস আসছে। আমাকে চা করতে দিল না।

—তুমি চাকরিটা ছেড়েছ, তাই না?

—কি করে বুঝলেন?

—একটু চিকচিকে হয়েছো। কোথাও যেন জোর পেয়েছ।

—বড় বেশি খাটাচ্ছিল। একঘেয়েও হয়ে গিয়েছিল। তেমন টাকাকড়িও দিত না।

—আছ তো ওখানেই।

—হ্যাঁ...এখনও...আর কিছু না...

করবী মন থেকে তিরিশটা বছর ঝেড়ে ফেলে দিলেন। সেই করবী হয়ে গেলেন। সংকটে পড়লে যে অন্যরকম হয়ে যেত। ঝটপট সিদ্ধান্ত নিত, অন্যদের সক্রিয় করতে পারত। বললেন চা খাব, তোমার কথা শুনব, তুমিও আমার কথা শুনবে।

সুহাস চা, আর সুজয়ের বেকারির মচমচে বিস্কিট আর চীজ রেখে গেল। বলল, আসছ যাচ্ছ, এসে থাক না বাপু। এ মানুষটার বয়স তো সত্তর চলছে! কবে থেকে বলে বুঝিয়ে, এর তার ভাঙা সম্পর্ক জোড়া দেয়। মামাকে নিয়েই...

—সে সময়ে বুবলা না থাকলে কোথায় যেতাম?

—তারও তো বিভ্রম হল। তার পারমিতা থাকবে।

—রাতে একটু ভাল করে রাঁধ তো!

—আজ ভাতই খাবে দু'চামচ। মানব মাছ এনেছে। কি সুন্দর আড় ট্যাংরা, খু-ব তাজা।

—মাইনে পেলেই...মানবের মাছ কেনা চাই! এত মানা করি...

—সে তোমার কথা কত শোনে!

সুহাস চলে গেল।

—আজকাল ধমক দিচ্ছে।

—দেয়, দেয় না, মোটামুটি সংসারটা যে ওর, তা বিশ্বাস করে ও শান্তি পায়। বলো!

—চা-টা খুব ভালো।

—ওই তো একমাত্র বিলাসিতা! 'আশ্বাস'-এ আসে স্নেহা রূপারেল। ওদের চা-বাগান আছে। ভাল চা দিয়ে যায়।

আবির গিয়ে তবে জানল। আমাকে বলল, দিয়া তো ভালো থাকবে। বিপদ নেই। কিন্তু বিশাল বিপদ চাপিয়ে গেছে অভীর ঘাড়ে। পুলিশকে এক লম্বা চিঠি লিখেছে। ফলে পুলিশ কেস হতেই পারে।

—ছি ছি, দিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করল, শুনেছি ওদের সম্পর্ক অনেকদিনই ভাঙছিল।

—অভী ওকে চিকিৎসা করাতে চাইছিল। দু'একবার নিয়েও যায় ডাক্তারের কাছে। দাদা-বউদি জানেন। সেখানে বাবা-মা-ওর প্রাক্তন স্বামী, সকলের নামে এত অভিযোগ, যে ডাক্তাররা বলে ওর এসব ধারণা খুব পুরনো, দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা করাচ্ছিল বলেই অভীর উপর এত রাগ। বছর খানেক ওদের ঝগড়া, চেঁচামেচি দিয়ার আত্মহত্যা করার শাসানি। এসব চলছিল।

—তবে তো অসুস্থই। আমি 'ছি ছি' বললাম এজন্য যে, ভাবলাম যে থাকতে চায় না, তাকে ধরে রাখার জন্যে দিয়া আত্মসম্মান হারাচ্ছে।

—সে চিঠি পুলিশের কাছে। একটাই বাঁচোয়া, দিয়া বলছে, ও সব রাগের ঝোঁকে এমনি লিখেছি, মনের কথা নয়।

—এখন কি হবে?

—আবির তো গিয়ে পড়েছে, ওর চেনাজানা লোকজন আছে। দাদাই খুব ভেঙে পড়েছেন। ওদের বাথরুমে ওষুধ রাখার ক্যাবিনেটে কত শিশি ট্র্যাংকুলাইজারের। বেচারি ওরা!

—আর শিবানী কেমন আছে?

—ওঁরও তো হিস্টিরিয়া।

—শিবানী পরশু হঠাৎই এল দুপুর তিনটেয়। তখনই খুব বিচলিত। শেষে ওকে পৌঁছতে গিয়ে খবর পেলাম। শিবানী অজ্ঞান হল। রাতটা থাকলাম। পরশু, না তরশু? সকালে এলাম। গৌরাঙ্গ ওকে নিয়ে বম্বে গেল। কি বলব! আমার কিছু করারও নেই। শুধু বলেছি ওকে নিয়ে ফিরে এস। ওকে দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা করাও। মানসিক বিশৃঙ্খলায় দীর্ঘ চিকিৎসা দরকার। এ কাজটা যদি পনেরো বছর আগেও করত! কিছু করতে পারি না, চিন্তা তো হয়!

ঈষৎ মলিন হেসে করবী বললেন, ফোনে দীপের কথা শুনে বুঝলাম ও খুব উদ্বেগে আছে। দীপ তো চিরকাল শান্তিপ্রিয়, ঝামেলা এড়িয়ে যায়। সে ছিল আবির! ছোটবেলা থেকেই জটিল পরিস্থিতি সামলাতে ওস্তাদ। ক্লাস সিক্সে পায়ে লোহার গজাল ঢুকে গিয়ে ভীষণ অবস্থা। ও ডাক্তারখানা গিয়ে অ্যান্টি টিটেনাস নিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে তবে বাড়ি ফিরল।

বুবলা বলল, তা তো জানি। এখন বোধহয় চিন্তায় অত আত্মনির্ভর নেই।

—তাই তোমাকে চাইছে।

—কেন যে পাগলামি করছে! বারোটা বছর কি মুছে ফেলা যায়?

বারো বছরের প্রথম বছর থেকেই কার্ড পাঠাবে, এক লাইন দু'লাইন চিঠিও লিখত। আমি জবাব দিতাম না। এ রকম যদি করবে, তবে তখন কেন বলল, আমরা বন্ধু থাকলেই ভালো থাকতাম, বিয়ে করা ঠিক হয়নি?

—বলতে হয়, ছাব্বিশ বছর বয়সেও ওর বয়ঃসন্ধির ব্যাপারটা কাটে নি।

বুবলা যেন অসহায়, মাসিমা! ছেচল্লিশেই কি কেটেছে? কেন যে বন্ধুদের সঙ্গে কেরালা গেলাম! মানে ওরা স্বামী-সন্তান নিয়েই গিয়েছিল,—ওদের আপনিও চিনবেন। বিনীতা, জয়া, মীনাক্ষী! মীনাক্ষী আপনাকে একবার...

—ডিকশনারি বেচে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ...কখন বই। কখন বাটিক ছাপা শাড়ি, কখন হেয়ার ড্রায়ার...

—এখন কি করে?

—জানি না, যোগাযোগ নেই মানে, বাংলাদেশের সঙ্গে ওর স্বামীর কি সব ব্যবসা আছে। দমদমে বাড়ি করেছে শুনতে পাই।

—কেরালা গিয়ে কি হল?

—ত্রিচুরে নাট্য উৎসব দেখতে গেলাম, সেখানে ওর সঙ্গে দেখা। এমন মিশে গেল সবার সঙ্গে...ও তো যায় হয় গণেশ নয় হাতির মূর্তি জোগাড় করতে! সকলকে নিয়ে গেল ডিনারে। আমি কি অপ্রস্তুত, কি বলি! ও তো ওই রকম, বলছেত, বৌভাতে বাবা খাইয়েছিলেন, আজ আমি খাওয়াচ্ছি। কিন্তু বুবলা কি অপ্রস্তুত তাই দেখুন! আমি তো বুঝি না, ডিভোর্স হয়েছে বলে বন্ধুত্ব থাকবে না কেন? সেবার আমার বেড়ানটাই নষ্ট হয়ে যায়।

—বুবলা, তোমার অবস্থা খুব বুঝতে পারছি।

—ডিভোর্স করে কে? ওরই তো জেদ ছিল বেশি। সর্বদা বলত, বিয়েটা এমন বন্ধন হবে জানলে...

—কোনোদিন বলো নি।

—কেমন করে বলতাম? আমার পরিবার তো আমাকে অস্বীকারই করে বসল। সে সময়...আপনারা ওর বাবা-মা, কি করে বলতাম? ডিভোর্সের আগে আমি তো গিয়ে উঠলাম বাবার কাছে, তিনি শুধু বলেন, কনটেস্ট কর। টাকা দিক আবির। ওদের টাকা আছে। তারপর মীনাক্ষীদের বাড়ি...তারপর আমার স্কুলজীবনের শিক্ষিকার বাড়ি...আমাকে কি ভাবে এখানে...ওখানে...

—সে বাড়ি মনে পড়ে! তোমাকে খুঁজে খুঁজে সেখানেই তো গিয়েছিলাম।

—টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিন হাজার। বলেছিলেন, কাজ করে শোধ দিও। আমি শুনি নি। তখন তো আমি আবিরের সঙ্গে সম্পর্কিত, কাউকে বিশ্বাস করি না। ভীষণ অভিমান, বলেছিলাম, আমার মতো মেয়েরা সাময়িক আশ্রয় পায়, এমন জায়গাও তো নেই!

আশ্বাস...আশ্বাস...আশ্বাস...আশ্বাস...

করবী যেন একটা আলো পেলেন!

—এত সবের পর ডিভোর্স!

—উনি আর আমি ভয়ানক আঘাত পাই। সে সময় উনিই আবিরকে বলেন, সে মেয়েটাকে বেরিয়ে যেতে হবে, আর তুই এখানে বসে বসে বাড়ির ভাত খাবি, নিজের ঘরে ঘুমাবি, আর ডিভোর্স করবি? যা যেখানে হয় যা! পারলে তার পায়ে ধরে ফিরিয়ে আন...

—শুনেছি, ওই বলেছে।

—এসেছিল?

—একবার। কিন্তু সেদিন ও পা ধরলেও আমি ফিরতাম না। খুব, খুব অপমানিত হয়েছিলাম। আমার স্কুলের চাকরি ছাড়াল, আমি বিজ্ঞাপনের অফিসে কাজ পেলাম, করতে দিল না। পুষ্পা মেহতা ঘর সাজাবার ব্যবসা শুরু করবেন। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে দিল না। আমরা দুজনে না কি হস্তশিল্প কিনব আর বেচব, যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আমি কিছু করব না।

—কেন, কেন অমন করত? চিরকাল তো আমাকে কাজ করতে দেখেছে?

—সে তো ও ভোলে নি। বলত, ছোটবেলায় মাকে বাড়িতে পাইনি। আবার তুমিও চাও কাজ নিতে...আমি তোমাকে সব সময়ে কাছে চাই। কি কাছে চাওয়ার নমুনা? সে তো দিনের পর দিন জয়ের সঙ্গে ঘুরত! বেশ করেছ, যা চাও তাই করেছ। এখন, বারো বছর বাদে আবার আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন?

—ওর বক্তব্য কি?

—আমরা না কি বন্ধু হতে পারি। ও না কি অনেকদিন আগেই বুঝেছে আমার মত...ও বাকি জীবনটা তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়...দিয়ার মতো ওকেও বাকি জীবন হাসপাতালে রাখা উচিত।

—তুমি যদি বিয়ে করতে ...

—আমি পুরুষদের বিশ্বাস করতে পারি না। আর দেখতে তো পাই! আপনি আর বাবা...কি রকম শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল...কেন যে...

—বুবলা! আবিরের বাবা প্রবল মনোকষ্ট পেয়েছিল। তারপর দেখ, দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের পর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কি অদ্ভুত ভাবে ঘটল! তুমি সে সময়...এত রাত্তির বোধহয় থেকেও যাও বাধ্য হয়ে...

—অত রাতে...সেদিন ফেরা যেত না।

—আমিও অবুঝের মতো জেদ করেছিলাম। পরদিন তো জোর করেই থাকতে বলি...

করবী মলিন হাসলেন, ক্ষমাপ্রার্থীর গলায় বললেন, তোমাকে দেখে উনি খুব স্বস্তি পেয়েছিলেন, তোমার বিষয়ে আমাদের একটা অপরাধবোধ ছিল।

বুবলা ওঁর দিকে তাকাল। তারপর আস্তে বলল, আবিরকে বলেছি এখানে ফোন করতে। খবর তো আপনার পাওয়া দরকার। আর...

—তুমি এখানে এসে থাকতে পার না কিছুতে? শোন, তোমাকে লিখব বলে ভাবছিলাম, নয় পেয়িং গেস্ট হয়েই থাকলে? সব সময় ভাবি, যে যার মতো স্বাধীন থাকাই ভাল। আর আমি তো স্বাধীনই...

গলা নেমে এল করবীর, খুবই স্বাধীন। সবই ওঁর জন্য...কিন্তু দিয়ার কাণ্ড...দীপ আর শিবানী...ও বাড়িতে কারও সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, তবে গৌরাঙ্গ দীপকে খুব দেখে। মন থেকে দুশ্চিন্তা এড়াতে পারছি না।

বুবলা বলল, আমি আজকে কিছু আনি নি। আবিরের ফোন পেয়েই চলে এলাম। কাল কাজের আগেই সব এনে এখানে রেখে যাব। বিকেলে চলে আসব।

সুহাস দরজা দিয়ে মুখ গলাল। বলল, এখনই বলো তো তোমার সঙ্গে যাই। সব নিয়ে আসি। কি সব খবর! মামি কি করে দৌড়দৌড়ি করে বলো? এখানেই তো কাজে আস, কাছাকাছি হবে!

—না সুহাস, ওর সুবিধা মতো আসবে।

এখন করবীর মনে হল আবিরের বউ বলে নয়, বরাবরই বুবলার ওপর মানুষ হিসেবেই ছিল স্নেহ। বুবলার চেয়ে উনি চব্বিশ বছরের বড়। কিন্তু একটা বয়সের পর মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

—কাল আমিও 'আশ্বাস'-এ যাব।

সংগঠনটা ঢেলেই সাজাতে হবে। আসলে পল্টুর বইটা কপি করার কাজে বড় বেশি ব্যস্ত থেকেছেন।

পল্টু অনেক কিছু না জেনে চলে গেছেন, সেটা এক পক্ষে ভালই হয়েছে।

—বুবলা, মানব আসা অবধি থাক। ও তোমাকে এগিয়ে দেবে। অন্য সময় হলে বলতাম না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, হঠাৎ যদি ফোন পাই! আবির তোমাকে ফোন করে কোথায়?

—কেন? হস্টেলে তো ফোন আছে। নার্সিংহোমেও করে অবরে সবরে। অনেক সময় নিয়ে ফোন করতে চাইলে বলি আমিই করব বাইরে থেকে।

—এখানে কাজ করছ কতদিন?

—ন'বছর হবে। ট্রেনিং নিলাম প্রাইভেট ইন্সটিটিউট...সেটাও এদেরই। বি.এ. ডিগ্রি দেখে ওরা ওদের খরচেই নার্সিং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং দিল... প্রথমে কাজ করলাম সোদপুরে, তারপর এখানে।

—সোদপুরে?

কলকাতা, সোদপুর, হাওড়া, সল্টলেক, এদের নার্সিংহোম ও মেডিক্যাল সেন্টার বারোটা। ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চারটে। বাগড়ি মার্কেটে ওষুধের ব্যবসা, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া দেয়,

শিগগিরই খুলছে জিমন্যাসিয়াম কয়েকটা। আর...আসল, বা আদি ব্যবসা সিমেন্টের।

—বাব্‌বা!

—এ রকমই তো হয় এখন। এই রাস্তায় বড়সড়ো কয়েকটা বাড়ি কেনার ইচ্ছা ওদের খুব।

পল্টু লিখেছিলেন, 'চিকিৎসা ও শিক্ষা এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সরকারি চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার অধঃপতনই ইহার কারণ। সরকারি চিকিৎসার অবনতির জন্যই বেসরকারি মালিকানায় চিকিৎসা-ব্যবস্থা অতি দুর্মূল্য। একটি ব্যবসায় বললে হয়। যাদের ভোট দিয়ে সাদরে আনলাম, তারা প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংস করল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাব্যবস্থাকেও। শিক্ষকরা পড়ায় না। ছাত্রের শিক্ষার ভিত্তি থাকে কাঁচা। সরকারি হাসপাতাল সংখ্যায় বাড়িয়ে হাসপাতাল পরিচালনা শক্ত ও উন্নত করলে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসায়ের এমন বোলবোলাও হত না। জীবনের সায়াহ্নে এ সব দেখে অক্ষম আমি দুঃখ পাই।'

করবী বললেন, এরা সাম্রাজ্য করে ফেলেছে।

—তাই! এখন অনেকেই করেছে।

—অথচ সেদিন...বুবলা, ফোন!

দুজনেই হুড়মুড়িয়ে গেলেন। করবী ফোন ধরতে গিয়ে বুঝলেন, ওঁর হাত কাঁপছে।

—কে দীপ?

—আবির। মা! বুবলা আসে নি?

—এসেছে। তুমি আমাকে বলো।

—মা, ওকে বললে ভালো হোত। তুমি...

—আমি ঠিক আছি। দুঃসংবাদের জন্যে প্রস্তুতও আছি।

—অভী আত্মহত্যা করেছে।

করবী ফোনটা টেবিলে রাখলেন, বসে পড়লেন।

বুবলা ফোন তুলে নিল। বলল, বলো।

করবীর সামনে দিয়ে ছবির পর ছবি ভেসে যাচ্ছে। সমুদ্র আর দিয়া বাসের মাথায় চেপে মাইসঙ্গোর যাচ্ছে। ওদের বন্ধুরাও আছে। দিয়া কাউকে না বলে চলে গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে।

শমী আর দিয়া। ওদের বিয়ের রিসেপশান কোন হোটেলে। সব ছবিতেই দিয়া আনন্দোচ্ছল. ঝলমলে সৌন্দর্য। অভী আর দিয়া, দীপ দেখিয়েছিল। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক প্রৌঢ়, কাঁচাপাকা চুল, চোখে মুখে ব্যক্তিত্ব, গম্ভীর মুখে স্মিত হাসি। দীপ দেখিয়েছিল।

—বয়স অনেক?

—দিয়ার পক্ষে ভালো মা! ও সেটল হয়ে যাবে। দিয়ার উদ্যোগই ছিল বেশি। অভী সেটাকে সম্মান করেছে।

সেই ফোটোতে অভীর চোখের দৃষ্টি ছিল গম্ভীর ও প্রশ্নাকুল। অভী...আত্মহত্যা... করবী চোখ বুজলেন।

—মাসিমা! মাসিমা! শরীর খারাপ লাগছে। চোখ বুজেই করবী বললেন, না! অসম্ভব বিপন্ন লাগছে...আমি এ রকম জঙ্গলে হাঁটতে শিখিনি...মানবিক সম্পর্কের এ কি জটিলতা।

—চোখ খুলুন, আমার ভয় করছে।

—তোমার ভয়ের কি আছে বুবলা?

হায়! একটি মানবিক সম্পর্ক গড়া কত কঠিন! এরা কি করছে। পল্টুর সাদা হাফশার্ট ও ধুতি পরা ফোটোটার দিকে তাকালেন। সীতাংশু। ওঁর ভগ্নীপতি, এক সময়ে ছিল শৌখিন ফোটোগ্রাফার। ওর তোলা ছবি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রদর্শনীতে বেশ প্রশংসা পায়। রবিবার ছিল, ওরা এসেছিল, পল্টু বললেন, আজ জোড়া ইলিশে কুলোবে না। আরেকটা আনি।

—আরেকটা, পল্টুদা?

—আরে! পরিবারের প্রথম 'ফোটোশ্রী'। ঘরোয়া অভিনন্দনে ইলিশ ভাজা, সর্ষে বাটা, টক! আজকের সম্মানে কলাপাতা। করবী রান্না করবে।

কি আনন্দ পল্টুকে দেখ। বেঁচে থেকেই খুশি। ছাতে উঠে সূর্যোদয় দেখতেন। ম্যাডক্স স্কোয়ারে হাঁটতে যেতেন। ফেরার সময় ল্যান্সডাউন বাজারে ঢুকতেই হবে। বাজারের সময় বাঁচাতে ফ্রিজে মাছ মাংস রাখায় ঘোর আপত্তি।

করবী মনে মনে বললেন, আজ বুঝছি, তুমি চলে গিয়ে বেঁচে গেছ। খুব বেঁচে গেছ। এত তুমি সইতে পারতে না।

—বুবলা!

—মাসিমা!

—উনি লিখেছেন, "জঙ্গল নেই, অরণ্যের প্রাণী বিপন্ন বোধ করে। আমার জানাচেনা সময় পালটে যেয়ে এখন আমিও তেমন কোনো প্রাণীর মতোই বিপন্ন।" এটা...আমার ধারণা আবির বোঝে।

—আবির!

—হ্যাঁ, সেই জন্য ও ওর তথ্যচিত্রের ওই ফোটোটা পাঠায়। নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ হাতি।

আবার টেলিফোন। আবির। —মা! দিয়া পুলিশের কাছে অভীর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে। অতএব দিয়াকে নিয়ে পড়ে থাকার কোনো দরকার হবে না। ২/৪ দিনে একটু বল পেলেই চলে যাবে ওরা।

—আর...অভী?

—সে নিজের আত্মহত্যার সমর্থনে নিজেকে অভিযুক্ত করে দিয়াকে বিপদমুক্ত করে রেখে গেছে।

—অভীর ছেলেরা কি দিয়াকে ছেড়ে দেবে?

—আমি ব্যাঙ্গালোর যাব। ওদের সঙ্গে কথা বলব। অভীর ফ্ল্যাট থেকে দিয়ার সব চিহ্ন মুছে নিয়ে ওদেরকে চাবি দিয়ে দেব।

—স...ব তুমি করবে?

—আর কে? দাদা, বা বউদি, বা গৌরাঙ্গদা, এদের এসব অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। আমার সঙ্গে অবশ্য পাণ্ডুরং থাকছে। তুমি চিনবে না। ওখান থেকে তোমার কাছে আসছি, সব বুঝিয়ে দেব। তুমি তো হাবুডুবু খাচ্ছ।

—খাব না? এত অর্থহীন অপচয়?

—এখন মানবিক সম্পর্ক মূল্যও পায়, অপচয়ও হয়।

—তুই বাংলায় কথা বলছিস শুনে...

—গ্রেট! তুমি ১৯৮১-র পর এই প্রথম 'তুই' বললে। শোন, কোনো কারণেই একলা থেকো না। দরকারে তোমার 'আশ্বাস'-এর পুরো ফৌজকে বাড়িতে রাখ। ভীষ্ম খুশি হতেন।

করবী মাথা নাড়লেন। আবির আড়ালে পল্টুকে "'ভীষ্ম" বলত। বলত, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে প্রগাঢ় ব্যক্তি। কিন্তু এ কি হল? আবির যেন অমোঘ ভাবে ওঁর কাছে চলে আসছে? বুবলার দিকে চাইলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, আবির কিন্তু প্রচণ্ড ভাবে ফিরে আসছে।

—আপনিও বুঝলেন?

—কিছুই বুঝলাম না। শুধু মনে হল মাঝের বারো বছরটা ও মুছে ফেলে দিয়েছে।...আর আমি একলা থাকব কিনা...তাই নিয়ে ওর চিন্তা।

—জানি না ও কি ভাবছে। কিন্তু আমাকে সে ভাবনায় না রাখলেই ভাল।

—করবী ওর হাত ধরলেন। বললেন, বুবলা! তোমার আর আবিরের ব্যাপারে আমি বহিরাগত, একটা কথাও বলব না। আর তোমাকে কাছে পাওয়ার যে ইচ্ছা, সেটাতে তৃতীয় কারও জায়গা নেই।

—কিন্তু ও কি বলল?

—বলছি।

সবটুকু বলে করবী বললেন, যা ভালো লাগছে, তা হল, এই প্রথম আবির এমন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিচ্ছে। দীপ, শিবানী বা গৌরাঙ্গদের ওপর কিছু রাখছে না।

—ও কিন্তু দাদার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রাখে।

সাত

এই সব কিছুর পর যে কোনোদিন জীবন ও চিন্তা স্বাভাবিকতার স্তরে আসবে, এতটা আশা করেন নি।

ভাবা তখন সম্ভবও ছিল না। শুচিকে ফোন করে বললেন, বম্বের কাগজ তো তোমরা পাও! বুঝতেই পারছ, অভীর কথা বলছি। যদি একটু পাঠাও!

কাগজগুলো নিয়ে শুচি দু'দিন এসেও ছিল। কিন্তু তার আগেই আবির চলে এল।

বুবলা আর করবী খেয়ে উঠেছেন। বুবলা আজ এক সপ্তাহ হল এখানে বেশ গুছিয়ে বসেছে। করবীর ঘরেই শোয়। কিন্তু ওঁকে এতটুকু বিরক্ত করে না।

সুহাস এখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—সত্যি শেখার মতো শিক্ষা মামিমা! কাকভোরে উঠে স্নান করবে। ধপধপে করে ছাড়া কাপড় কেচে ছাতে মেলবে টান টান করে। নিচে এখন চা তৈরি করে খাবে। তোমারটা নিয়ে যাবে। গতরাতের তিনখানা রুটি একটু গরম ডাল দিয়ে খাবে, বেরিয়ে যাবে কাজে। আবার আসার সময়ে একটু বাজার করেই আনে। দেখ! আগেও ঝাড়পোঁছ করত, এখনও করে।

—তোমার বেশ আরাম হয়েছে।

—ভালোও লাগছে। ঘর গেরস্তালির...কি সুন্দর করে আটা মেখে দেয়। রুটি নরম হচ্ছে

কত। মানবের সঙ্গে ওর আপিসের গল্প করে। আলাদা টি.ভি. দেখি বলে অবাক হয়েছিল। পষ্ট কথাটাই বললাম। মানব কিনে দিয়েছে! আমার ঘরে বসে আমি 'জন্মভূমি' দেখি, বাংলা সিরিয়াল দেখি।

—দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও যাও।

—তা বলেছি। বেশ লাগছে গো! মনে হয় যেন কতকাল ধরে এখানে আছে!

—'ছোট বউদি' বলছ না তো?

—মানা করেছে, 'দিদি' বলি। বলে আমি এখানে পেয়িং গেস্ট! বেশ কথাটা, পেয়িং গেস্ট!

—বরাবরই তো শান্ত, ভালো মেয়ে! ওকে বেশি আতিপাতি কোর না। বেশি মনোযোগ দিলে থাকবে না। ওর একটু শান্তি দরকার।

—আমি নিশ্চিন্ত তোমার কথা ভেবে। ও আছে, কথা বলছ, মামার বইয়ের কাজ করছ। সেদিন গীতিকামাসি বলল, এমন মেয়ে এলে 'আশ্বাস'কে ঢেলে সাজি!

—হ্যাঁ। আমার খুব ভাল লাগছে।

—তা, করবী আর বুবলা খেয়ে উঠেছেন, দুজনে কিছুক্ষণ বই পড়েন। কথাবার্তা বলেন, বুবলা এখানে বেশিদিন কাজ করবে না। এবার কি করবে, তা দুজনেই ভাবেন।

করবী সবে বলেছেন, কাজ তো অনেকদিন করলে! মাস দুই বিশ্রাম নাও, আস্তে আস্তে দক্ষিণের ঘরটাই নয় গুছিয়ে নাও। তারপর আবার কাজ করবে।

—যে কাজ করলে মন ভরে ওঠে, তেমন কাজ...

এমন সময়েই কলিং বেলটা বাজল। তারপরই দরজা খুলল মানব। সুহাস আর মানবের কথার্বাতা, ঠিক পল্টুর তরুণ বয়সের গলা যেন! সিঁড়ি টপকে কে উঠছে?

—মা?

আবির!

আবির মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কিউটিকুরা পাউডারের গন্ধ!

বুবলার দিকে চেয়ে বলল, হাই!

বুবলা অস্ফুট কিছু বলল।

করবী ওকে বসালেন সামনে। না, থ্যাবড়া নাক, একটু পুরু ঠোঁট, বেশ সবল চেহারা, চুল ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা। চশমাটি খুব কায়দার। জিন্‌স আর পাঞ্জাবি, কপালের কোণে কাটা দাগটা তেমনি আছে।

—এখন...আবির?

—বম্বে থেকে। প্লেন তো এল সাড়ে সাতটায়। কিন্তু যত ভিড়, শহরে ঢুকলে, বাইপাসটা সত্যিই ভাল। যাক গে, খাব। আগে স্নান করব। অসুবিধে থাকে টোস্ট চা হলেই চলবে!

সুহাস বলল, তোমার চলবে ছোড়দা, আমার চলবে না।

ইশ্, কালি পড়ে গেছে মুখে।

—সুহাসদি! আগে চা খাব, যাকে বলে চা! কড়া লিকার, অল্প দুধ, এক চামচ চিনি, রীতিমতো বাংলা চা।

মানব বলল, মামার ব্যাগ কোথায় রাখব?

—দক্ষিণের ঘরে রাখ। আর বিছানাটা...

বুবলা বলল, আমি দেখছি। অবশ্য আমি ও ঘরের বাথরুমে স্নান করি, সব পরিষ্কারই আছে।

বাড়িটা যে কত বড়! এই বড় বড় ঘর পরিষ্কার রাখা!

—আবির! ওখানে...?

—খুব ভাল লাগছে মা, খু-ব! এতদিন যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। এখানে এসে যে কি শান্তি! সব স—ব বলব চা খেতে খেতে।

—মানব! মাকে বল পটে চা দিতে। রাতে কি খাস, রুটি?

—নিজে রাঁধি তো, ভাতেই সুবিধে।

—মানব...

বুবলা বলল, আমি বলে আসছি। প্রেসার কুকারে ভাত করবে, কোনো কষ্ট হবে না।

আবির শুধু দেখছিল, আর দেখছিল। বলল, মা! আমাদের সব ছবি তেমনি টাঙানো আছে এখনও!

—ছবি আছে, তোদের খেলাধুলোর কাপ আর মেডেল...

—মানপত্রটা বাবাকে কে দিল?

—ওঁদের চতুরঙ্গ ক্লাব থেকে, বিদায়ী সেক্রেটারিকে।

—ক'দিন থাকলে অসুবিধে নেই তো তোমাদের?

—না। এখন বিপদের সময়।

—এ রকম গণ্ডগোল, ভাবা যায় না। দিয়া দিয়া বলি আমরা। বউদি তো পুরো নিউরোটিক। আর দাদা! এত নার্ভাস, এত ভেঙে পড়ে...

—চা এনেছে সুহাস। সুহাস, শুনেছ তো আবির ভাত খাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দিদি বলেছে।

—দিদিকে পাঠিয়ে দাও।

করবী বললেন, চা তুই ঢেলে নে। বুবলা এলে কথা হবে। ও না থাকলে...

আমি জানতাম তুমি স্টেডি থাকবে, তবু বুবলাকে...

বুবলা এসে করবীর পাশে বসল। বলল, আমি সেদিনই চলে আসি। তুমি ক'দিন থাকবে?

—সে তো আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। সবটা শুনলেই বুঝতে পারবে।

করবী দেখলেন বুবলা খুব শান্ত ও স্থির আছে। ভালো। এখন তো তোমাদের ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ নয়। দিয়া...বিশেষ অভী...

—মা! কেমন ম্যাজিক মনে হচ্ছে। শশী টি কোম্পানির চা, তাই না?

করবী হেসে বললেন, স—ব আগেকার মতো রে। আমি ওই দোকানের চা আনাই। নিজে অবশ্য দামি চা খাই। একজন দেয়। তাতে কড়া লিকার হয় না। কাল তোকে মৃত্যুঞ্জয়ের দই খাওয়াব। সেই মুদিখানা, স্টেশনার্স, স—ব। কতদিন থাকবে জানি না। যাক গে বল।

—মা স্নানটা করে খেয়ে নিয়ে বসি?

—চল, তাই করবি।

বুবলা! ছোট বেলা মা 'তুই' বলত, তো আমরা বাঁচতাম। মায়ের মুখে 'তুমি' শোনাই মস্ত তিরস্কার।

বুবলা ঈষৎ হেসে বলল, বাবা?

—বাবা? রাগলে লাভা বিস্ফোরণ, আর চেঁচাতে গেলেই রাগ পড়ে যেত। আমি বাবা-মাকে জ্বালিয়েছি বেশি। জিজ্ঞেস কর।

—আবির! এবার বল...

আবির চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছল। করবী দেখলেন, তাঁর ছোট ছেলে, যার সঙ্গে পল্টুর মিল সবচেয়ে বেশি, তার কপালে রেখা পড়েছে, চোখের কোলে চিন্তা ও ক্লান্তির অজস্র রেখা। কি বলবে আবির। এ কাহিনী তো এক গোলকধাঁধা, এবং এখনও এটা লেখা। দিয়া যদি একরকমই থেকে যায়, তাহলে এ কাহিনী চলতেই থাকবে। অভীর বদলে অন্য কেউ, বম্বের বদলে হংকং-ও হতে পারে।

মোটামুটি যা সংগ্রহ করা গেছে, অভী আর তার স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়াটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার। ওরা আবার বিয়ে করুক, না করুক, তাতে এসে যেত না কিছু। কেননা অভীর মতে প্রথম বিয়েটা দ্বিতীয় ছেলের চার বছর বয়সেই শেষ হয়ে যায়। বাইরের সবই ঠিক ছিল। ভিতরে দুস্তর ব্যবধান। দুই ছেলেই বাইরে থেকে লেখাপড়া করেছে, ম্যানেজমেন্ট পড়ছে, ক্যাম্পাস থেকে চাকরি পেয়ে যাবে। বাবাকে ওরা 'নো-গুড' জেনেই বড় হয়েছে। যা হোক, ডিভোর্সের প্রথম ও শেষ শর্ত ছিল, দুজনের কেউই তেমন কাজ করবে না, যাতে কাগজে কেচ্ছা বেরোয়।

—দিয়া গিয়ে অভীর কাছে জুটল। তারপর ইত্যাদি ইত্যাদিতে যাচ্ছি না। কিন্তু অভীর ডায়েরি, যা, যাকে ধরেই হোক, পুড়িয়ে দেওয়া গেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, অভীকে দিয়া বিয়েতে রাজি করাতে পারে নি। ফলে ও অভীকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। অভীর স্ত্রীর কাছে অভীর নামে নানা নালিশ জানালো। কি বলব...

ঘটনা এ রকম, কয়েক বছরেই ওদের সম্পর্ক খুব বিষাক্ত হয়। বলে নেওয়া ভালো, দিয়া কিন্তু সন্তানসম্ভাবিতা নয়। জরায়ুতে ফাইব্রোসিস টিউমার ওর ঋতুবন্ধের কারণ। এ জন্য অপারেশান করাতেই হবে।...যাই হোক, অভী বুঝতে পারছিল দিয়ার মানসিকতা পরিণত নয়, ও লিখে গেছে শরীর পরিণত, দেহের প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক কামনা আছে। মন অপরিণত এবং বাইরের মানুষ সম্পর্কে আতঙ্ক ও অবিশ্বাস ওকে হিংস্র করে তোলে। অনেক ভেবেছি, আমার ওই বয়সের একটি মেয়ে থাকতেই পারত। থাকলে ওকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতাম। আরো দেখতাম, আমার ওপর নির্ভরও করে। আঘাতও করে অদ্ভুত ভাবে। কেন করে, তা বলতে পারব না।

অভী দিয়াকে গাইনি দেখিয়েছিল। ওটা যে ফাইব্রোসিস তা দিয়া জানল যখন, তখনই ক্ষেপে যায়। অভীর স্ত্রী এর মাসখানেক আগেই মারা গেছে। ওর ব্যাঙ্গালোরে যাওয়া দরকারই ছিল। দিয়া তখন ফোন করে করে সকলকে বলতে থাকে, ওর জন্য আমি সন্তানসম্ভাবিতা, আমাকে বিয়ে করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য ও আমাকে পাগল প্রতিপন্ন করতে চাইছে, হেনতেন।

যে সুইসাইড নোট লিখেছিল, সে সব কথাই ও পাঠিয়ে দেয় একটি কাগজে, তারা সেটা ছাপেও। অভী ওকে ডাক্তার পাটিলের মানসিক চিকিৎসার ক্লিনিক নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা

করে। সে কথা দাদাকে জানায়। ব্যাঙ্গালোরে ও এক সপ্তাহ থাকত। দিয়ার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে যায় নি।

অভী ওর নিরাপত্তার জন্য গায়ত্রীকে থাকতে বলে যায়। ওঁর ছেলেদের কাছে জানলাম, অভী বলেছিল, মেয়েটি নিশ্চয় সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। কোনো স্থায়ী সম্পর্ক গড়তে ও অক্ষম। কিন্তু আমার নৈতিক দায়িত্ব আছে। আমি প্রয়োজনে ওকে বিয়ে করব।

তারপর 'সোশাল মিলিয়ু' ট্যাবলয়েডে ওই খবর। অভী যে হোটেলে থাকছিল, সেখানে মিডিয়া আক্রমণ, এবং ছেলেরা ওকে জানায়, ওদের চোখে অভী মনস্টার। ওদের মার প্রতি অবিচার করেছে, আরেকটি মেয়ের প্রতিও। অভী আত্মহত্যা করার আগে স্যুইসাইড নোটে লিখেছে জালের পর জাল আমাকে ঘিরে ধরছে। সব ছিঁড়ে ফেলে আলোয় বেরিয়ে আসতে পারব না। আমি হেরে গেছি, তাই আত্মহত্যা করছি। আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার ব্যর্থতা।

আর কি!

সব বলে আবির বলল, ব্যাঙ্গালোর অনেক চেষ্টায় ও কষ্টে ছেলেদের মামার সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম শ্রীকান্ত চন্দ্রাপ্পা খুবই শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত এবং বেশি কথা বলতে নারাজ। অভীর শেষকৃত্য উনিই ছেলেদের দিয়ে করিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ঝামেলা এড়াবার জন্যে। জান না মরে গেলে শেষকৃত্য কে করল। সেটা সম্পত্তির মামলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভদ্রলোক, এঁদের পরিবারই হোটেলের ব্যবসা করেন। অভী এঁর বন্ধুই ছিল, পরে ভগ্নীপতি হয়। বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। আপনার ভাইঝিকে আপনারা দেখুন, ওই বাড়ি ছেড়ে দিন। আমার ভাগ্নেরা তো ওই কাগজের এবং আপনার ভাইঝির বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস করতে চায়। সে সব আমি হতে দিচ্ছি না। আপাতত আমেরিকা পাঠাব আমার ছোট ভাইয়ের কাছে। এত টাকার সম্পত্তি ওদের। টাকার ম্যানেজমেন্ট তো শিখতে হবে। এই গেল অভীর কথা।

একটু চুপ করে থেকে আবির বলল, অভী একটা সেইন্টলি মানুষ ছিল। আমাকে 'ডান্স অফ দি এলিফ্যান্ট গড' ছবি করতে খুব সাহায্য করে।

তারপরেই বলল, মা! স্নান করি, খাই। দাদাদের কথা পরে বলব। আগে ফাইব্রোসিস অপারেশন করাও! তা ওদের অদ্ভুত সব যুক্তি। কলকাতায় করবে কোথাও। গোপনে। নইলে দিয়ার বদনাম হবে। মানসিক রোগের চিকিৎসাও ওদের চেনা জানা... ভীষণ বিপদটা কেটে যেতেই ওরা শামুকের মতো খোলে ঢুকে পড়েছে। ভীষণ দেখলে দুঃখ পেতেন!

—যা স্নান কর।

আবির স্নান করতে গেল। বুবলা আস্তে বলল, আবির না গেলে কি কেলেঙ্কারি না হত!

—আবিরকে দেখে আমি স্বস্তি পেলাম।

অনে—ক বিষয়ে ওর বাবার মতো। উনি সব শুনতেন। সমস্যাটা ধরতেন, সমাধান করার চেষ্টা করতেন।

সুহাস আর মানব দুটো ট্রে নিয়ে ঢুকল। সুহাস বলল, আজ এ ঘরেই থাক। টাকা দাও মামিমা, কাল সকাল সকাল মানব টাটকা মাছ আনবে।

খরশোলা পেলে আনিস। ভালোবাসত। করবী উঠে ব্যাগ আনলেন। টাকা দিলেন।

এই মাছও ছোড়দা ভালোবাসবে।

তোমরা যাও সুহাস, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

ঢলঢলে 'সেভ নেচার' ছাপা সাদা টি-শার্ট ও পাজামা পরে আবির ঢুকল। বলল, আমার কিন্তু স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছে।

বুবলা বলল, কেন, আমি বসে আছি বলে?

মোটেই না। তোমার থাকবার কথা তো ছিলই।

—আমি মাসিমার পেয়িং গেস্ট, তা জান? অনেকদিন আগেই তা ঠিক হয়েছে?

—দারুণ! গরম ভাত, গরম ডাল, আচার, বেশ করেছ বুবলা। হস্টেলে যে কষ্টে থাকতে, ইশশ! কাটা পোনা আর বেগুন, আলুর ঝোল! মা, সুহাসদিকে একটা কেটারিং সার্ভিস খুলে দিই। আমি, তুমি ও আর বুবলা পার্টনার!

বুবলা আতংকিত। ও উঠে দাঁড়াল। বলল, মাসিমা দেখছেন! ও ধরেই নিয়েছে ও যা করবে, আমি তাতেই রাজি।

—আহা! একটা ব্যবসার প্রস্তাব। খাবারের ব্যবসায়ে পুরো লাভ থেকে যায়।

—গণেশের ব্যবসা কে করবে?

—স—ব বলব। মা! আমি দাদাদের বলেছি, তোমরা সবাই কাউনসেলিং কর। তোমাদের মাথাও খারাপ। দিয়া হাসপাতাল কেস। ওর চিকিৎসা আগে দরকার। তোমরাও ওকে নিয়ে...

—ওরা কি শুনবে?

—শুনতে পারে। এখন তো আমার কথায় 'হ্যাঁ' বলবে! কত কমবুদ্ধি হলে জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলে! কোথায় রাখবে, কি করবে, তা নিয়ে তুমি ভাবতে যেও না; আমাদের কথা শুনবে না।

—হাই তুলছিস, এবার গিয়ে শুয়ে পড়।

—বাসনগুলো তুলে দিই।

—থাক না। সকালে নিয়ে নেবে। তুই শুয়ে পড়, আমরাও ঘুমোই। অনেক শান্তি পেলাম।

হ্যাঁ মা। আর বুবলা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। বরঞ্চ কাল কোনো হোটেলেও চলে যেতে পারি।

—না...ঠিক আছে।

বিছানায় শুতে শুতে বুবলা বলল, ও ঠিক ঘুমোবে মাসিমা! নিজেই বলে, রাতদিন ঘুরি, সর্বত্র ঘুম হয়। আপনার কোনো অসুবিধে মনে হচ্ছে?

অন্ধকারে করবী বললেন, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিশ্চয়। তবে যে জন্য এসেছে, সে কাজটাও তো অন্যরকম।...চলে যাবে তো বটেই। তুমি যেভাবে পরিস্থিতিটা মেনে নিলে, আমার খুব শ্রদ্ধা হয়েছে। আজ নো-পাওয়ারটা নিভিয়ে দাও। বাব্বা! এত টেনশান হচ্ছিল...

—কি শোচনীয় সব ঘটনা! মানবিক সম্পর্কেও অদ্ভুত সব জটিলতা দেখা দিচ্ছে। সেসব মেনেও নিতে হচ্ছে। দিয়া কি কোনোদিন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে? মনে মনে স্বামীকে বললেন, তুমি ঠিক সময়েই চলে গেছ। ২০০০ সালের ধকল তুমি নিতে পারতে না।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। মনে কি শান্তি! আবির আজ কতদিন পরে এল। আবার একদা ফোটোয় যাকে দেখেছেন, সেই অভীর জন্যে বড় কষ্ট। একটা জীবনের কি অপচয়!

আট

আবির তিন দিন, চার রাত থাকল। বাড়িতেই থাকল, বেরোল না কোথাও। করবী, বুবলা আর আবির একসঙ্গে খান, গল্প করেন, বুবলা কাজে বেরিয়ে যায়। যাবার আগের দিন আবির বলল, মা! বুবলার কাজটা বাজে।

—ছেড়ে দেবে, আর তো এগারোটা দিন।

—তারপর?

—আমি বলেছি, দু'মাস আরাম কর, বিশ্রাম নাও। আমার কাছে পেয়িং গেস্ট হয়েই থাকবে, তাই ওর শর্ত। আমি তাতেই রাজি। প্রাপ্তিটা আমার।

—তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা...ভাবতে পারিনি।

—কিন্তু আবির, আমি আর তোমার বাবা বরাবর ওর বিষয়ে উদ্বিগ্ন থেকেছি। বাড়ি ছেড়ে চলে গেল...

—বাবা আমাকেও বের করে দেয়...

—ও তো ছিল একেবারে একলা।

আবির নিরুত্তর।

—আর কোনো যোগাযোগ ছিল না?

করবী ক্ষীণ হেসে বলল, তোমার বাবাই যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে গেলেন বলতে পার। সবটা তোমরা জান না। আর তোমার নেই চিঠি লেখার অভ্যাস, দীপ আর শিবানীকে বিপদে পাই, তবে বিরক্ত করি না।

—হ্যাঁ... আমি ভালো ছেলে নই।

—আমার বলার অধিকার নেই, তবু বলছি,—বুবলা তো আর কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়তেই পারল না, আবার বিয়ের কথা ভাবলও না।

—আমাকে কেন বলছ?

—তোমারই তো বোঝা উচিত! বহুদিন ধরে ও একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। এবাড়ি ছাড়ার পর থেকেই। তাই আবির! ওর পক্ষে যা সম্মানজনক তেমন শর্তেই ওকে এখানে থাকতে রাজি করাতে পেরেছি। ও কত ভালো, তা তুমি জান। আমি মনে করি এখানে থাকলে ও ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে যাবে, মনটায় প্রলেপ পড়বে। হয়তো কারও সম্পর্কে বন্ধুত্বের কথাও ভাবতে পারবে।

আবির ওঁর হাতে একটু চাপ দিল।

—বুঝেছি মা।

—তুমিও আত্মস্থ হও। ভাব। আমি কি তোমাকে আঘাত দিলাম?

আবির মাথা নাড়ল। ও কেমন করে বোঝাবে। দূরে চলে না গেলে এই বাড়ি, মা বুবলা, এমন কি খাওয়ার ঘরে টাঙান ঘোড়ায় টানা ট্রামের ছবির কাছে ফিরে আসতে পেরে কত শান্তি, তাও জানতে পারত না। বম্বেতে দাদার চোখে অসহায়তা দেখেও কষ্ট হয়েছিল। হয়তো, হয়তো সময় পেলে বুবলাও ওর বন্ধুত্ব মেনে নেবে। ও এ বাড়িতে এল, তাও বাবা আনলেন।

—তাই!

সেটা পণ্টুর দ্বিতীয় করোনারি অ্যাটাক। সকাল থেকে শরীর ভাল লাগছিল না, বিকেলে বেরোলেন না, বারান্দাতেই হাঁটলেন। ঘরে এসে বললেন, আচ্ছা! এই যে দীপ আর শিবানী এক শহরে বাস করেও দূরের মানুষ হয়ে গেল, এই যে আবির আর পারমিতা...এ সব কারণে চিন্তা করে দুঃখও পেলাম। আবার শরীরটাও ভাঙলাম। তা দেখ, এ সব কথা আমি বইয়ে লিখিনি। না লিখে কি অন্যায় করলাম?

'সমাপ্তিটা তোমার কেমন লাগল?

—আমি তো সন্তুষ্ট।

—শেষ প্যারাটা পড়, আমি শুনি।

—পড়ছি। কি ছেলেমানুষী যে করছ। "ছোট ছেলের বিবাহের কথা লিখেছি। ওর বউভাতে, আমাদের বাড়ির নিয়মমতো খাদ্যতালিকা পরিবেশন করে বেশ আনন্দ হল। মনে করি, এটাই আমার জীবনের শেষ কর্তব্য পালন। পুত্র স্বমতে বিবাহ করতেই পারে। পিতার কর্তব্য তার বধূকে যথাযোগ্য সমাদর ও লৌকিকতায় পরিবারে স্বাগত জানান। আমার মতো ভাগ্যবান পুরুষ কমই দেখা যায়। গৃহিণী আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কুশলী সচিব। রথ চালাই আমি, ঘোড়ার লাগাম ওঁর হাতে। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে কলহ করেছি যৎসামান্য। আমার জীবনে প্রাপ্তিই বেশি, অপ্রাপ্তি যৎসামান্য। সাধ্যমতো সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছি। শ্রদ্ধেয় জনদের শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছি। তিনজনই নিজ নির্বাচনে বিবাহ করেছে। আমরা উৎসবটুকু করেছি।

পরম সৌভাগ্যবশে পুরাতন বন্ধুরা আজও আমাদের বন্ধু। যেন পরিবারের একজন। এত প্রাপ্তি যার, সে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে দৌড়াতে পারে না, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘতা মেনে নেয়। আমার প্রপিতামহ কলকাতা দেখেন নি। পিতামহ কলকাতা এসে বললেন 'ধর্মহীন দেশ' এবং ফিরে গেলেন। পিতামহী একতম সন্তান বাবাকে রেখে মারা গেলেন। কিন্তু পিতামহ দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি! বাবাকে মানুষ করার জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করলেন। সেই বংশের ছেলে হয়ে বাবার দানে আমার কলকাতায় নিজ বাড়ি, এ শহরে চাকরি, সবই হল। ঘরে যিনি এলেন তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

বাবা ম্যাপ দেখিয়ে আমাকে লন্ডন, প্যারিস, ইত্যাদি শহর চেনাতেন। আমি বিমান ভ্রমণ করি নি। যদিও আমার কন্যা লণ্ডনেই থাকে। তবে ছাত্র জীবনে বিবাহের পূর্বে হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে কেদার-বদরী ভ্রমণ করেছি। সপরিবারে ভারত ভ্রমণ করেছি।

কালস্য গতি কে রোধ করতে পারে? ঈশ্বরকে প্রণাম, আমার সামান্য জীবনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।"

—আরও কি লেখা উচিত ছিল?

—না, যে সব কারণে ব্যথা পেয়েছ, তা না লেখাই ভাল। সম্ভব হলে তোমার মায়ের কথা আরেকটু লিখতে পারতে। আমার কথা একটু কম লিখলে আমি স্বস্তি পেতাম।

—ভাবব, ভাবব। বিজয় আর রাখাল বলে, তারাও আত্মকথা লিখবে, নীতিন ডাক্তার বলে, বৌঠান লেখাটা ধরিয়ে তোমার থেরাপি করলেন।

সেদিন রাতে পণ্টু দুটি মাত্র রুটি খান, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন।

পরদিন করবী পণ্টুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন, রুটিন-চেক করাবেন, ডাক্তার অনুমতি করলে দুজনে পুরী যাবেন এক সপ্তাহের জন্য। তার ব্যবস্থা করবেন এসব কাজ ছিল।

কিন্তু সকাল আটটা নাগাদই পল্টু বমি করে অজ্ঞান হয়ে যান। নীতিন ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। বললেন মানব, দাদুর কাছে বোস! ওই মেডিক্যাল সেন্টারে আমিই যাই। ফোনে কাজ হবে না।

সুহাসকে নিয়ে করবী দৌড়ন রিকশা নিয়ে কানহা মেডিক্যাল সেন্টারে। সেটা ঠিক হাসপাতালও নয়, কল দিলে ডাক্তার আনবে কি না। এ সব ভাবতে ভাবতে ওখানে বুবলাকে দেখেন, ওর হাত চেপে ধরে বলেন, পারমিতা! ওঁর কি হল, বমি করেই অজ্ঞান...

বুবলা বলে, আপনি যান, আমি এদের বলে ডাক্তার আহুজাকে নিয়ে আসছি। আজ ওঁর এখানে আসার দিন, তেমন রুগী নেই, আপনি যান...

ডাক্তার নিয়ে বুবলাই আসে, পরে ফোন করে নার্সও আনায়, অক্সিজেন হেন তেন, পল্টু চোখ খুলে বুবলাকে দেখে যেন কৃতজ্ঞ হন, ভরসা পান।

সারাদিন, সারারাত বুবলা বসে থাকল। রাত এগারোটায় করবীকে বলল, আপনি ওই সোফাটায় শুয়ে পড়ুন, আমি আছি।

—তুমি...

—উনি আমার আঙুল ধরে আছেন।

পরদিন সকালে ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পরেই আবার একটু বমি হয়। তারপর ডাক্তার এসে কিছু করতে পারে নি।

দীপ আগের দিন থেকেই ছিল। কিন্তু ওই সময়ে বাড়ি ছিল না। শিবানী থাকতে পারে নি। পল্টু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুবলা চলে আসতে পারে নি। মানব ফোন করে সকলকে খবর দিল। সারাদিন বুবলা করবীর কাছে। যখন বাইরের লোকজনও চলে এল, বুবলাকে দেখে সপ্রশ্ন তাকাতে থাকল। বুবলা সুহাসকে বলে চলে আসে।

পরে ও আসেনি। সুন্দর একটা চিঠির উপসংহারে লিখেছিল। 'আপনার যে কোনো দরকারে আমাকে ফোন করবেন।'

আবির সে সময়ে দিল্লীতে নেই। তিনদিন বাদে ও এল এবং কাজকর্ম শেষ হওয়া অবধি ছিল। তারপর তো সেই দুর্যোগের বিকেলে, সেই যে এল, দু'দিন, দু'রাত থেকে যেতেই হল। করবী বলে যাচ্ছিলেন, আবির শুনছিল।

'তুমি তো ওকেই ফোন কর। দিয়ার খবর দিতেও আসে, আমার কাছে থাকতেও আসে।

—বুঝেছি।...মা!

—বল?

—বাবা বড্ড দুঃখ পেয়ে গেছেন, তাই না?

—খুবই দুঃখ পেয়েছেন। বইটা বেরোলে পড়ে জানতে পারবি কেমন মানুষ ছিলেন। কেন পরিবারকে আঁকড়ে থাকার জন্য এত হাহাকার ছিল। মানসিকতাটাই ছিল ও রকম। সবাই থাকবে, সকলে সকলের সুখ-দুঃখে ভাগ নেবে।

—ওই ধারণাটা তো চলে না এখন।

—নাই বা চলল, মানুষটা ওই রকম মন নিয়ে জন্মেছিল, তুমি আমি কি করব বলো?

—তুমি তো ও রকম নও?

—আমি খুব সাধারণ মানুষ আবির। আমাদের দুজনেই যে সময়ে বড় হয়েছি, সে সময়ের

ফসল। যারা দু'পয়সা দিয়ে ট্রাম চড়েছে, পুজোয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজারিবাগ গিয়ে অশেষ আনন্দ পেয়েছে, এত আন্দোলন দেখেছে, দেশকে স্বাধীন হতে দেখেছে, তারা সাদামাটা চালে ধীর গতিতে চলতে জানত।

—এখনকার সঙ্গেও তো মানিয়ে নিয়েছ।

—এটা তো বাস্তব জ্ঞান। যৌথ পরিবার থাকবে না। বিয়ে হবে, বিচ্ছেদও হবে,— মিনি-পরিবার শুধু নিজেদের কথা ভাববে, এ তো বাস্তবতা। আর এর মধ্যে অনেক ভালোও দেখতে পাই। মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। দিয়ার মতো তো সকলে নয়। দেখ না, মানবিক সম্পর্ক কি রকম বদলে যাচ্ছে। আমি আর বুবলা দুজনে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে মিশতে পারি। এমনটা আগে ভাবা যেত? তুই চলে এলি। বিজয়বাবুরা, শিবানী, তোর মাসি, হয় তো সুহাসও, ওরা কি চমকে যায় নি? তোমরা স্বামী-স্ত্রী নও। আমি আছি, একই ছাতের তলায় ক'দিন কাটালাম, সবাই ভিরমি খাচ্ছে না?

—সত্যি মা, সিরিয়াস কথাগুলো এমন সহজে বলো!

—জটিল করে লাভ কি?

—নীলি কোন খবর রাখে না।

—আমিই বা ওর কোন খবর রাখি? আসেও নি কতদিন।

—আমি অবশ্য দু'বার ঘুরে এসেছি।

—ও বলেছে, তুমি গেলে দেখা করো। আমাকে টিকিট পাঠাতেও চেয়েছিল, কড়া গলাতেই 'না' বললাম।

—'কড়া গলা' কেন?

—তোরা বুঝবি না। সে লোকটার কি আকাঙ্ক্ষা ছিল, একবার প্লেনে চড়ে বিদেশে যাবেন। যদি যেতে বলত দুজনকে! হয়তো পারে নি। ওঁর সে সাধ অপূর্ণ ছিল, আমি সে সাধ মেটাতে পারি না। বুকে বেঁধে।

—বাবা...প্লেনে চড়ে নি?

—দেশে ঘুরতেই পারতাম। ষাট পেরোলেই হাফটিকিট। শেষ গিয়েছি দার্জিলিংয়ে। ওটুকু আর...ট্রেনেই গেলাম। বিজয়বাবুরাও গেলেন, ভালোই কেটেছিল।

—বাবা এক সময় হেঁটে হিমালয় গিয়েছিলেন!

—ছাত্র জীবনে। ফুটবল খেলেছেন, গঙ্গায় সাঁতার কেটেছেন। হেঁটে হেঁটে ময়দানে তো খুব যেতেন।

—আমি...যে কি করি!

—আর কিছু না কর, একটু চিঠি লেখ, বা ফোন কর...

—যোগাযোগ থাকে কি করে?

—বললাম কম্পুটার, ফ্যাক্স, ই-মেইল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...যেবার অনেক কমিশন পাই।

—আমার কি কাজে লাগবে বল?

—মা!

—বল?

—আমি তোমার ফিনান্সের খবরও রাখি না—তুমি তো পেনশান পাও?

—এগারোশো টাকা।

—ওই ভাড়া থেকে?

—হাজারে ঢুকেছিল, পনেরো শো-তে উঠেছে।

—এটা কোনো টাকা হল?

—ওঁর যা রেখে গেছেন, একটা ইনসিওরেনস্ মেচিওর করলে চলে যায়। ওঁর পেনশানটাও পাই। ভাবিস না, ইনভেস্টও করছি।

—কিন্তু...

—ভাবিস না। বাড়িটা তো আমার। সুবিচারই করে যাব।

—দাদারা বড্ড চুপচাপ, অথচ এসেছে।

—ওই, কাউকে না জানিয়ে কোথাও ভর্তি করবে দিয়াকে।

সে মেয়েই বা কি অবস্থায় আছে জানি না। তুই কি দিল্লীতে ফ্ল্যাট কিনেছিস?

বঙ্কু কিনেছে, অর্ধেক টাকা আমি দিয়েছি। দুটো বেডরুমের সরকারি ফ্ল্যাট, শেয়ার করে থাকি। বঙ্কুকে তুমি চিনবে। গীতিকা মাসিমার স্বামী ছিলেন, সেই মিস্টার কোহ্‌লির ছোট ভাইয়ের ছেলে।

—জানি না, তাই জিগ্যেস করছি, তোর কি মদ খাওয়ার অভ্যেস আছে?

—মা, আমি অ্যালকোহলবিরোধী ফ্রন্ট, ড্রাগবিরোধী ফ্রন্টের ভেটেরান মেম্বার। সিগারেট তো ধরিই নি। তাছাড়াও পরিবেশ রক্ষা, মানে গ্রিন আন্দোলনে আছি। আমি আর সীতার একসঙ্গে ঘুরি। ও আনে আদিবাসী গহনা, আমি গণেশ। বাইরেও বেচি, দেশেও।

—টাকা তো পাচ্ছিস, সুখী হয়েছিস?

আবির আস্তে বলল, মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক তো গড়ে তুলতে পারি নি। মেয়েরা আমাকে বিশ্বাস করে না। ওদের অভিযোগ আমি ওদের মধ্যে আর কাউকে খুঁজি।

—আবির! আবির! তোমার বয়স ছেচল্লিশ। তুমি ষোলো বছর বয়সে পড়ে নেই।

—জানি। আসলে বুবলার ওপর তখন ...

—ধৈর্য রাখ, পরে বলিস।

—হ্যাঁ... আর জ্বালাব না।

—এখানে তুমি ফোনও করতে পার, ইচ্ছে হলে আসতেও পার। ক'দিন বিশ্রাম নিতে এমন জায়গা পাবে?

—আসব মা। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ভাগ্যে বাবা বাড়িটা বাড়িয়ে নিয়েছিল ... কিন্তু মেরামত করাও?

—পারছি না এখনই। অথচ দরকারও খুব। একটা পুরো রং ফেরান, মেরামত, জলের পাইপ পালটান...

—কত টাকা দরকার?

—সে কম করে ষাট-সত্তর হাজার তো হবে।

—আমি পাঠাব, তুমি নেবে।

—অত টাকা, আবির?

—নেবে। টি. ভি. তো আছে, এবার এলে ভি. সি. আর কিনব। আমার সাতটা ডকু আছে।

'ডানস্ অফ দি এলিফ্যান্ট গড' আর 'টু গণেশস্' দেখবে।

—পুরস্কার পেয়ে তো জানাস। আমার সব ফাইল করা আছে। উনি তোর ওপর, দীপের ওপর, নীলির ওপর ফাইল রাখতেন...বার বার দেখতেন...

করবীর গলা কোথায় হারিয়ে গেল। কাটা ঘুড়ির সুতো যেমন আকাশে হারিয়ে যায় ঘুড়ি নিয়ে ঝড়ের মুখে।

—যাই, ফোন করে বড় কর্তার খবর নিই, একবার ঘুরে আসি।

বুবলা আছে জানলে...

—বাড়ি নিয়ে কোনো কথা যেন না ওঠে। আমার...একটা স্বপ্ন আছে।

সপ্রশংস গলায় আবির বলল, গ্রেট, মা, সত্যি গ্রেট। সত্তর পুরে যাবে এখনও স্বপ্ন ধরে রেখেছ।

—বয়সে কি হয়? মনে মনে আমি অল্পবয়সী। না, স্বপ্ন ধরে রাখি নি। তৈরি করেছি।

—দাদারা যদি ফ্রি থাকে। ওদের রাতে খেতে বলব?

—তোর যা ইচ্ছে।

—দেখি ঘুরে আসি। বুবলার ছুটি তো রাত আটটায়।

—হ্যাঁ, বারো ঘন্টা। অবশ্য প্রায়ই ছ'টায় বেরিয়ে আসে বলে কয়ে।

সুহাস বলল, ওঠ তো তোমরা। মামি কি আজ স্নানও করবে না? ঘরে বসে কথা বলো। ছোড়দা কি খাবে আজ?

—যা খাওয়াবে, তাই খাব।

—ওখানে কি নিজে রেঁধে খাও?

—ওখানে অনেকেই রেঁধে খায় সুহাসদি। রান্না কি বলছ, আমি আর আমার বন্ধু ঘর ঝাঁট দিই, কাপড় কাচি, বাসন মাজি, একবার চল না, রেঁধে খাওয়াব।

—আমি যাব দিল্লী!

—নিশ্চয়, একবার যাবেই তুমি।

—বেশ, যাব। আজ একটু থোড়ের ছেঁচকি করি।

—চমৎকার...এ সব ওরা খেতে জানে না।

—রেঁধে যে খাও, এটাই বড় কথা। বড়দা আর বউদি তো কি সব হাজিবাজি খায়, ম্যাগি, নয়তো টোস্ট আর কৌটার সুপ! আর মুড়ি মুড়কির মতো ওষুধ খায়। দুজনার স্বাস্থ্য শরীর দেখলে না?

—হ্যাঁ...ভালো থাকে না। ঘুরে আসি মা।

শিবানী আর দীপ বাড়িতে ফেরে নি। গৌরাঙ্গর বউ অবশ্য বলেই ফেলল, এয়ারপোর্টের পথে কোন হোটেলে আছে। গৌরাঙ্গও সেখানে থাকছে, রাতে শুতে আসছে।

আবির বলল, ওখান থেকে সল্টলেকে কোন সাইকিয়াট্রিকের বিশিষ্ট ক্লিনিকে ভর্তি করবে দিয়াকে। টিউমার অপারেশানও করাবে কাছাকাছি। আগে কি করবে কেউ জানে না। বুবলা বলল, এটাই তো স্বাভাবিক। দিয়া ওখানে ফিরলে খুব কথা উঠবে।

আবির বলল, উঠেছে তো! গৌরাঙ্গদার বউই নানা কথা জানতে চেষ্টা করছিল। বেচারি

দাদা আর বউদি! সব ঢাকা চাপা দেওয়া যাবে না। করবী বললেন, ওই ডাক্তারই বলবেন, বম্বে বা অন্য কোথাও দিয়াকে বেশিদিন রাখা যায় কি না!

—মা! অভীর শ্যালক এ ব্যাপারে আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভালোই করেছেন। যে নেই, সে নেই। আর এই না-থাকার মধ্যে দিয়ার মস্ত ভূমিকা তো থেকেই গেল।

করবী বললেন। ছেলে দুটোকে সব ভুলে নিজেদের জীবনের কথা ভাবতে হবে। বাঁচতে শিখতে হবে।

আবির বলল, এমন পরিস্থিতিতে পড়লে এই বয়সের ছেলেরা প্রতিহিংসায় পাগল হতে পারে। ওরা রাগে গুমরে আছে, ওদের মামাও। বল তো কেন?

—তুই বস।

আবির ভুরু কুঁচকে কি ভাবল, বেচারি অভী! মনে হল বাবাকে হারিয়ে ওরা যত না শোকাহত, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ, ওদের মায়ের বাড়ির লোকজনও, ফ্যামিলির নাম ধুলোয় গড়াগড়ি গেল। কেচ্ছা কেলেংকারি হল।

বুবলা সতেজে বলল, সেটা তো সত্যিই। যাদের ওখানে অত নামডাক, সব সম্পত্তির সাম্রাজ্য, সেখানে বিশাল স্ক্যাণ্ডাল হল না? এ রকম স্ক্যাণ্ডাল একটা পরিবারকে ভেঙে দেয়। আমাদের রাজ্যেই দেখ না, এই যে কিশোর দুটো ছেলে কাগজে পড়ছে, তাদের বাবার খুনের জন্যে তাদের মা এবং বাবার বন্ধু দায়ী, তারা স্কুলে, বা পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না।। অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। তোমার দাদা আর বউদি যতই ভুল করে থাকুন। এমন পরিস্থিতির ধাক্কা ওঁদের ভেঙে দেবে। বাড়ি বেচে, দোকান তুলে দিয়ে কোথায় যাবেন মেয়েকে নিয়ে?

আবির বলল, হ্যাঁ সত্যিই বলছ। যা ঘটে গেল, এত ধাক্কা সামলে আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে আসা... করবী বললেন। অভীর জন্যেই খারাপ লাগে বেশি। ওর কি আপনজন কেউ নেই?

—জানি না মা। বাইশ বছরে বিয়ে, ছাব্বিশের মধ্যে দুই ছেলের পিতা, সে বিয়ে তার পরেও ভেঙে গেল... তারপর দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল, দাঁড়িয়ে গিয়েওছিল, এর মধ্যে দিয়া... দুজনেরই ভুল।

বুবলা বলল, যে মারা গেছে, সে তো এ সবের বাইরে চলে গেছে। যার রইল, সংকট তো তাদের, তাই না? ধর, দিয়ার ওপরেও এর ছাপ পড়বে। তার সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে, যদি না হয়...

করবী বললেন, অনেকগুলো জীবন ভেঙে চুরে গেল। যাক গে, কাল সকালে যাবি, আজ রাতের খাওয়াটা এ সব কথাবার্তায়...

—চল, হাত ধুই।

ওপরে এসে আবির বলল, ও বেলা মেট্রো ডেয়ারির আইসক্রিম আনলাম, এখন খাব তো? বুবলা বলল, আসছি। কিন্তু মোটা হয়ে যাব, আইসক্রীমে ক্যালোরি খুব বেশি।

—হতে পারে, কিন্তু ফাটাফাটি আইসক্রিম। সুহাসদি আর মানবকেও দিও।

পরদিন সকালের ফ্লাইটে আবির ফিরে গেল। বলে গেল, আবার আসব মা! ভাল থেকো।

বাই, বুবলা! বুবলা হাত নাড়ল।

করবী বললেন, ক'দিন যেন অন্যরকম ছিলাম।

—কষ্ট হয়, মাসিমা?

—হবে না বুবলা? এতদিন পরে...

সুহাস বলল, ঘরে ঘরে ঘুরে সব দেখত, আর দেখত! মানুষজন থাকলে তবে না বাড়ি?

করবী ভাবলেন, এবার আমাকেও ভাবতে হবে। ওদের বাবা চলে গেলেন, ওই বইটা নিয়ে পড়ে থেকে থেকে....না, বাকি জীবনে কি করব, দায়দায়িত্বের ব্যাপারে বা কি করব, করে ফেলতে হবে।

নয়

"কল্যাণীয় আবির, তুমি সত্তর হাজার না পাঠিয়ে আশি হাজার পাঠালে! বিজয়বাবু ইসমাইল মিস্ত্রির ভাই মহম্মদকে এনেছিলেন। সে দেখেছে, তেমন গুরুতর মেরামতির কাজ নেই। লিখছি আর ভাবছি। দিয়া বম্বে থেকে লিখেছিল, দিদা, আজকাল কেউ হাতে চিঠি লেখে?—

যাক, তোমার পড়তে কষ্ট হবে না। নভেম্বরে আমার জন্মদিনের অনেক আগেই বাড়ির কাজ হয়ে যাবে। আর সে সময়ে তোমাদের জানাতেও পারব, বাড়ির বিষয়ে কি করব ইত্যাদি। মুশকিল কি, তোমার বাবা ধরেই নেন, এ বাড়িতে ছেলেরা থাকবে। আমার বাবার ধারণাও তেমন ছিল। কিন্তু আমার ভাইরা সবই প্রোমোটারকে বেচে দেয়। বিজয়বাবুর ছেলে দেরাদুনে, মেয়ে তো বিদেশে, অনাবাসী। আমার ছেলেরা অনাবাসী নয়, কিন্তু এ বাড়ির দরকার তাদের নেই। তোমার বাবা বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি বলে কষ্ট পেতেন। আমি কিন্তু বাস্তববাদী। বুঝি, এ বাড়ির সম্পর্কে আমার মানসিক অনুভূতি যা, তা তোমাদের থাকতে পারে না। আর যে যার কর্মক্ষেত্রে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। জেনো, যে, আমি বাড়িটির সদ্ব্যবহারই করব। দীপদের খবর দিই। দু'মাস যাবৎ দিয়া সেই হোমে আছে। আগের চেয়ে ভালো বলে শিবানী বলে। কিন্তু গৌরাঙ্গ বলছে, মনের এ অবস্থা ক্রনিক হয়ে গেছে। ওকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে বাকি জীবন। সুসংবাদ এই, মা-বাবার উপর রাগটা কমে গেছে। সেই অপারেশনটি সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। এখন তো অপারেশন পদ্ধতি অনেক সহজ। দীপ আর শিবানী এখন মাঝে মাঝে আসে। বুবলা বিষয়ে মনে প্রশ্ন থাকলেও কিছু বলে না। বুঝতে পারি, ওরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অনেকদিন বন্ধুর মতো কথা বলে নি। এখন চেষ্টা করছে। তবে তোমার টাকা পাঠানো, বুবলার উপস্থিতি ওরা মনের মতো কোনো অঙ্ক কষতে চাইছে। বলতে সাহস পাচ্ছে না।

বুবলার খবর,—এখন দক্ষিণের ঘরটায় ও থাকে। সেন্টার ছেড়ে দিয়েছে। হাজার বিশেক টাকা পেয়েছে, আমি ব্যাঙ্কে রাখতে বলেছি। ওই ঘরে টেবিলে বসে ও তোমার বাবার আত্মজীবনীটা কপি করে। পড়ে তার মধ্যে ডুবে যায়। আমাকে মাঝে মাঝে জিগ্যেস করে, 'আপনি শাপলার অম্বল খেয়েছেন?' অথবা 'আপনার শাশুড়ি সত্যিই শঙ্খ পদ্ম পাড়ের মোহিনী মিলের কাপড় পরতেন?' অথবা, 'নৌকোয় রাঁধাবাড়া করে খেত মানুষ?' অথবা, 'বিয়াল্লিশে ঘূর্ণিঝড়, আবার সেই বছরই আগস্ট আন্দোলন'?

বুবলা কপি করছে। এরপর বই ছাপানতে সাহায্য করবে। ডিকশনারিতে প্রুফ সংশোধনের

ছবি ও নির্দেশ খুব মন দিয়ে পড়ছে আর শিখে নিচ্ছে।

আর আমি ভালো আছি। তুমি ভালো থাক। সময় পেলেই চলে আসবে। সীজারকে নিয়েই আসতে পার। দীপ বলল বলে জানলাম, তুমি ফোনে ওদের খবর নাও। ওদের বলেছি, দিয়ার ডাক্তার অনুমতি দিলে দুজনে দিন সাতেক ঘুরে এস। গৌরাঙ্গ ওদের অভিভাবকের মতো, দীপকে সত্যি ভালোবাসে।

বাড়ি মেরামত হয়ে গেলে ছাতের মরা গাছ ও পুরনো টব ফেলে দিয়ে একটু বাগান করব। আজ এই পর্যন্ত আবির। বিশাল চিঠি লিখলাম। ভালো থেকো, নিজের যত্ন নিও। তোমাকে এখন দেখলে উনি খুব খুশি হতেন।

ইতি—মা।

পুঃ চিঠির উত্তরে চিঠি লেখে মানুষ, শত শত টাকা পুড়িয়ে ফোন করে না।"

দশ

আজকের দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির কাজ ঠিক সাতাশ দিনে শেষ হল। অনেক ভেবে করবী নিচে, পিছন দিকে কেন একটি দুই কামরার ফ্ল্যাট করলেন, তা নিয়ে বিজয়ব্রজ একটা প্রশ্নও করেন নি। মুচকি হেসে বলেছেন, বুঝেছি।

তারপর বললেন, কি সব অপবাদসূচক প্রবাদবাক্য বলুন তো বৌঠান? মেয়েদের না কি বুদ্ধি থাকে না। স্ত্রী বুদ্ধি না কি ভয়ংকরী।

—ভয়ংকরী নয় ঠাকুরপো, প্রলয়ংকরী।

—ইশ! যা করলেন, সে তো আমি পারতাম না। পল্টুদা থাকলে আজ...

—নেই বলে কি হুতাশ করে যাব? উনি বলতেন, কাজ কর, সকর্মক থাক।

করুণা টেলারিং-ও বর্তে গেল। এই রাস্তার উপর সাড়ে সাতশো স্কোয়্যার ফিট বাড়ি পেল! আপনি আমাকে এ সময় কাজের ভার দিয়ে ব্যস্ত রেখে মহা উপকার করেছেন। আমার স্ত্রী বলছেন, আপনি হলেন বার্ধক্যের থেরাপি।

—ও সব কথা থাকুক। আজ আমাদের প্রমীলা সভা। আপনার থাকা চলে না।

—ওপরের ঘর এখন শুধুই বসার ঘর। করবী পল্টুর ঘরে অর্থাৎ তাঁর একদিনের শোবার ঘরে চলে গেছেন। গীতিকা ঢুকে বললেন, আমি মাটিতে বসতে পারব না।

আমরা সোফতেই বসব। বুবলা, খাতাটা? গীতিকা বললেন, সইও করব?

—করবেনই তো। আপনার সঙ্গে কথা বলেই তো....এস শুচি। খাতায় সই কর।

—কি ব্যাপার আন্টি? 'আশ্বাস'-এর জরুরি মিটিং?

—হ্যাঁ, জরুরি মিটিং শুচি।

স্নেহা, অলকানন্দা আর স্নিগ্ধা এক সঙ্গেই ঢুকল। অলকানন্দা বলল, পরিবেশটা পাল্টে গেছে, আন্টি একটু রোগা হয়েছে।

—হব না? বাড়িতে মিস্ত্রি লাগলে কি অবস্থা হয়? শোন, ইনি পারমিতা রায়। আমার পেয়িং গেস্ট। ওঁর কাজের ফাঁকে আমাদেরও সাহায্য করছেন। আমরা সবাই তো আছি। অনসূয়া?

—কথাটা গীতিকাদি শুরু করুন।

—তুমিই বল।

—বলছি, আর আমি চাই, তোমরা...পারমিতা, ওদের কাগজ দাও। ওদের যা মনে হবে, লিখবে। পারমিতা, আমার অনুরোধ, তুমিও লেখ। আমি শুরু করি?

—করুন আন্টি!

—আমি বছর দুই একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলাম।

—এখন চাইছি 'আশ্বাস'কে একটা কেজো কর্মা সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে। সংগঠনটা পাকাপোক্ত না হলে আমরা কাজ করতে পারব না।

শুচি বলল, ঠিক কথা! আমি তো কবে থেকে...

—ছোট্ট সংগঠন। তাই থাকুক। আমরা নিগৃহীতা ও বিপন্ন মেয়েদের সাহায্য করব। সুহাসের মাসতুত বোনের মেয়ে লক্ষ্মীর মতো কোন মেয়ে বাচ্চা নিয়ে আসতেই পারে, আমরা ক্রেশ করব। নামটা হবে 'আশ্বাস', অনামিতা কোহ্‌লির স্মৃতিতে নিবেদিত।

গীতালি চোখ তুলে তাকালেন।

—গীতালিদির বাড়িতেই থাকবে সংগঠন। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ব্যবহার করা যেতেই পারে। আমাদের অফিস মিটিংয়ের জন্য। আশ্বাসকে নতুন চেহারা দিতে গেলে, রেজিস্ট্রেশান তো আছে, মেমোরেন্ডাম, আর্টিকল, এ সবও আছে। আমার প্রস্তাব, গভর্নিংবডি, নতুন প্রস্তাব নিক। আমরা যেহেতু বিপন্ন মেয়েদের কথা ভাবছি তাদের শিশুদের কথাও ভাবছি, নতুন সদস্য আনি গভর্নিংবডিতে, যাঁরা সত্যিই এ সব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। একটু সময় দেবেন। গীতালিদি নিশ্চয় তেমন কিছু মানুষের নাম দিতে পারবেন। হ্যাঁ, শুচি কি বলবে?

—গভর্নিংবডি নতুন করে ঢেলে সাজালেই হবে না। কাজের ব্যাপারে...

—আমি যা ভেবেছি, 'আশ্বাস'-এ মেয়েরা আসেন, তাঁদের সাহায্য করার জন্য লিগাল কাউনসেলিং কোর্স করেছে এমন দুজন থাকুক। শুচি আর স্নিগ্ধাও কোর্সটা করে নিতেই পার। শিশুদের কথা উঠছে কিসে? দেখেছি তো মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়েও বেরিয়ে আসে।

গীতিকা বললেন, ওরাই তো আমাদের কর্মক্ষেত্র। ওরাই আসে, আসবেও।

তাই, গীতিকাদি রাজি আছেন উপরের হল ঘর, আরেকটা ঘর, সম্পূর্ণ নিচতলাটা দিয়ে দেবেন। নিচেও হলঘর আছে। সেখানেও আমরা লিগাল কাউনসেলিং-এর ব্যবস্থা চালু রাখতেই পারি। আর খুব দুর্গত মেয়েদের আমরা অন্যান্য শেল্‌টারে পাঠাই। ওপরের হলঘরে এমন বিপন্ন মেয়েরা তাদের বাচ্চাদের, বড়জোর দশ জনকে রাখতে পারবে, নিয়ে থাকতে পারবে। আর, মিসেস মেহতা, চন্দনা গুপ্তা, জয়শ্রী সংঘ রাজি আছেন, একটি দুটি মেয়েকে কর্মমূলক প্রশিক্ষণ দেবেন।

আমাদের ডাক্তার আসবেন ও দেখবেন সপ্তাহে একদিন, সে ব্যবস্থা রাখব। আমাদের কর্মীরা হবেন তরুণ, মানে পঞ্চাশ-চল্লিশ-তিরিশ, সবাই তরুণ, এঁরাই পরিচালনা করবেন।

চাই এঁদের মধ্যে একজন ডিরেকটর। যিনি ১১-৫ টা সময় দেবেন। চাই অ্যাকাউন্টেন্ট ক্লার্ক, তিনিও ১১-৫টা থাকবেন। আমরা কম্প্যুটারও কিনব। অবশ্যই থাকবে দুজন রাতদিনের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং একজন সকল-কাজের কাজী।

—তোমরা ভাববে, এটা অবৈতনিক হতে পারে না। তা আমরা বুঝি। আমি করুণা টেলারিংকে নিচে সাড়ে সাতশো স্কোয়্যার ফুট বেচেছি। এর টাকা 'আশ্বাস' ট্রাস্টে থাকবে।

সাম্মানিক কাঠামো তৈরি হয়ে গেলে এর ইনটারেস্ট থেকে সকলকেই কিছু দেওয়া যাবে। আরও ফান্ড তোমরাই তৈরি করতে পারবে নিজেরা ভেবে। আমি আর গীতিকাদি পিছনে সরে যেতে চাই। তোমরা নিজেরা আলোচনা কর, তেমন মেয়েদের আন যারা আজও কোনো না কোনো ফিলডে সাহায্য করবে। হ্যাঁ...কম্প্যুটারটা হবে আমার উপহার। গীতিকাদি, ঠিক বলেছি?

—নিশ্চয়। গোড়ার দিকে ফান্ডে নিশ্চয় আমিও কিছু দেব।

অলকানন্দা চোখ বুজে বলল, একটা 'আশ্বাস' ফুড সাপ্লাই সেন্টার করতে পারতাম। খাবারের ব্যবসায়ে...

করবী বললেন, এবার আলোচনা তোমরা ও বাড়িতে করো। গীতিকাদি, আগে ট্রাস্ট তৈরি করুন বেশ ভাল ও কর্মঠ লোকজন নিয়ে। আজকের আলোচনার পর আবার বসুন আপনারা। নতুন রেজিস্ট্রেশনও হবে, আনমিতার নাম সহ। তারপর ও বাড়িকে আরও কর্মোপযোগী...

শুচি বলল, আন্টি, ইংলিশ বলুন।

—আপডেট করতে হবে। আমাদের মধ্যে থেকেই ফার্নিচার জোগাড় হয়ে যাবে। আর গীতিকাদি থাকবেন প্রেসিডেন্ট।

গীতিকাদি বললেন, আনমিতার নামে 'আশ্বাস'-এর লাইব্রেরি হবে। মেয়েদের বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সহ আরও নানারকম বই থাকবে। আমি অবৈতনিক লাইব্রেরিয়ানের চাকরিটা নিয়ে নিলাম।

স্নিগ্ধা বলল, আপনার বয়সে?

—বাহাত্তর কোনো বয়স নয়। আমার দশটা-পাঁচটা করার অভ্যাস আছে, ওতেই আমার স্বস্তি। আনমিতার...বাবার নামে.....একটা লিগাল এইড ফান্ড করে দেব। কিন্তু মেয়েরা! 'আশ্বাস' যেমন আছে, তেমনি ছোট, কর্মঠ, আঁটসাঁট সংগঠনই থাকবে। চালাবে তোমরা, ইয়ং ট্যালেন্ট খুঁজবে।

করবী বললেন—এই পর্যন্তই। বাকিটা...তোমাদের হাতে। এবার একটু চা খাও। পারমিতা এদিকে এস। এই হল পারমিতা। যার সঙ্গে আলোচনা করে আমি এত কথা বলতে পারলাম! ও এই বক্তব্যটা লিখেও ফেলেছে। যা বাংলা কম্প্যুটারে টাইপ করা হয়েছে। সঙ্গে একটা ইংরিজি অনুবাদও পাবে। এটা গীতিকাদিকে দিলাম। উনি সকলকে দেবেন। এবার চা খাই আমরা!

দীনদয়ালের কচুরি আর মৃত্যুঞ্জয়ের সন্দেশ নিয়ে এল মানব, সুহাস আর বুবলা। গীতিকা মানবকে দেখে বললেন, চিনতেই পারিনি ওকে। করবী হাসলেন। বললেন, বড় প্রিয় নাতি আমার।

গীতিকা করবীকে বললেন, আমি যেন আমার শোকের মধ্যে বন্দি হয়ে গিয়েছিলাম।

—আমিও তো...কিন্তু গীতিকাদি। আমরা যে ওদের চেয়ে তরুণ, সেটা তো ওদের দিয়ে মানিয়ে ছাড়ব।

সবাই হাসলেন। করবী বললেন, ৩০শে নভেম্বর আমার জন্মদিন। পয়লা ডিসেম্বর....না, পয়লা জানুয়ারি থেকেই আমরা কাজে নামতে পারব তো?

—পারতেই হবে। লাইব্রেরি এখানেও করা যেতে পারে।

সে দেখা যাবে।

এমন একটি সুন্দর সন্ধ্যার সমাপ্তিকে পূর্ণতর করার জন্যেই যেন রাতে আবিরের ফোন এল।

—মা! গণেশের মুখোশ কিনতে পুরুলিয়া যাব, পারলে ঘুরে যাব।

—অবশ্যই।

—আজ বুবলার জন্মদিনও।

—নে, ওর সঙ্গে কথা বল।

—না, ওরা কথা বলুক। করবী ধীরে সরে গেলেন।

একাদশ

শীত এবার এখনো পড়ে নি। কিন্তু বিকেলের রোদ মলিন হয়, ছাতে দাঁড়ালে দেখা যায় ডিশ অ্যান্টেনা আর হাইরাইজ। কিন্তু মুখ তুললে তো দেখা যায় চিরদিনের আকাশ। হাতে সারসার টবে বুবলা আর মানব যে সব চারা বসিয়েছে, তাতে ফুল ফোটেনি। চাল ছড়িয়ে দিলে পায়রার ঝাঁক নামে। নিমগাছের ডালপালা যেন খুব কাছে বলে মনে হয়।

সন্ধ্যা না হতে করবীর ঘরে অতিথিরা এসে পড়ল। অতিথি তো দীপ, শিবানী, বিজয়বাবু, নীতিন ডাক্তার, আবির, আর একজন বিশেষ অতিথি, দিয়া।

দিয়ার সঙ্গে ওকে দেখাশোনা করার মেয়ে সারিকাও এসেছে। দীপ আর শিবানী সল্টলেকে ওদের এক অনাবাসী বন্ধুর ফ্ল্যাটেই থাকছে। দিয়াকে মাঝে মাঝে আনতে পারে, দরকারে কাছে যেতে পারে। মেন্টাল হোমের ডাক্তার মনে করেন, ওকে স্বাভাবিক ও চেনা মানুষের পরিবেশে মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

ওর স্কিজোফ্রেনিয়া ও পারসিকিউশান ম্যানিয়া যে অনেক অগেই ধরা যেত, চিকিৎসা বারো বছর বয়স থেকে শুরু করা যেত, তাহলে দিয়া একটা সুযোগ পেত স্বাভাবিক হবার। এটা শিবানী ও দীপ মেনে নিয়েছে। শিবানী খুবই স্তিমিত। যেন শান্তও।

দিয়া করবীকে দেখে আস্তে বলল, হাই!

—এস আমার কাছে বস।

—তোমার জন্মদিনে তুমি গিফট নাও না কেন?

—ওই যে ফুল এনেছে তোমার মা।

—বাড়িটা নতুন হয়ে গেছে, তাই না?

—হ্যাঁ...তুমি আসবে, তুমি থাকবে মাঝে মাঝে.....

—সারিকাও থাকবে। সারিকা আমার চুল আঁচড়ে দেয়, নখ কেটে দেয়, নেল পালিশ লাগিয়ে দেয়...

—খুব ভালো মেয়ে।

—আমি তোমার লাইব্রেরিটা দেখি?

—সারিকা, ওকে নিয়ে যাও মা।

শিবানী দম ছেড়ে বলল, ওকে কি রকম দেখছেন মা?

—ভালোই তো। যেন আরও সুন্দর হয়েছে।

—হ্যাঁ...। চেহারা তো...

সুহাস বলল, মামি! তোমার শাশুড়ির মতো যেন! তিনিও তো সুন্দরী ছিলেন।

—হ্যাঁ সুহাস।

বিজয়ব্রজ আর নীতিন ডাক্তার এসে পড়লেন। নীতিন বললেন, এমন জন্মদিন সবাই করুক! নো উপহার, কিন্তু গ্রেট ইটিং। বউঠান সত্যি...

দীপ বলল, কাকা, আপনিও করুন না জন্মদিন।

—বল তোদের কাকিমাকে। মারতে আসবে।

—বউঠান! পারমিতাকে তো দেখছি না?

দীপ ও শিবানী এ-ওর দিকে চাইল। করবী বললেন, আইসক্রিম আনতে গেছে ওরা দুজনে।

—গুড! আবিরের বুদ্ধি আছে। মেট্রোর আইসক্রিমের প্রচার ওই করবে।

নতুন রং করা ঝলমলে ঘরে আলো কত উজ্জ্বল, পল্টুর ছবিটি নতুন ফ্রেমে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সেই পুরনো আসবাব, সব রং পালিশে নতুন নতুন।

দীপ বলল, বাড়িটা নতুন লিজ অফ লাইফ পেল।

—হ্যাঁ দীপ! আবির সাহায্য না করলে...

—আমি তো জানতাম না।

—সে সময়ে তোমরা খুব বিপদে...আবির নিজেই বলল....যাক গে, একটা দরকারি কাজই হয়ে গেল। কাজের কথাটা বলব, তা আবির আসুক!

—আবির এসে গেছে!

আবির নিজেই বলল। সবাই বেশ চমকিত, কেন না আবির খালি হাতেই ঢুকল। বলল, বুবলা ওগুলো ফ্রিজে ঢোকাচ্ছে।

দাদা তোরা এসে গেছিস? না বিজয় কাকা, মিষ্টি পান আনতে ভুলে গেলাম। ডাক্তার কাকা, আপনারই জিত। কাঠের গণেশ মহারাষ্ট্রের চেয়ে পীরবনিতে ভাল বানায়। তবে এখন ওরা ভালো কাঠ পাচ্ছে না। থাকবে না, এসব জিনিস থাকবে না। ধনিরামের নাতিরা পেপার পাল্পে গণেশ বানাচ্ছে।

—আবির, বোস। আমি কাজের কথাগুলো বলে দিই।

ঘরটা বেশ টনটনে হয়ে উঠল। সবাই জানতে চায়।

—নীলিকে লিখে জানাব। তোমাদের— দীপ, শিবানী, আবিরকে বলছি।... বিজয়বাবুরা জানেন...বাড়িটা তোমার বাবা আমাকেই দিয়ে যান। সে অবশ্য তোমরা জান। ওঁর জীবিত কালেই দীপ নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে গেল। আবিরও ডিভোর্সের পরই চলে যায়। নীলি ও তার স্বামী ও দেশেই থাকবে। ওদের 'দেশ' সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে, মেয়েদের নেই। তাছাড়া নীলি ওঁকে লিখেছিল, দিল্লীতে জমি কিনেছিলাম, বেচেও দেব। নীলির সঙ্গেই সম্পর্ক বড় কেটে গেছে। চার বছর আগে এসেছিল, মাঝে মাঝে এসেছে, কিন্তু চণ্ডীগড়ে বিকাশদের বাড়ি, সেখানে থাকে, একটু ভারত ভ্রমণও করে। কলকাতায় ওদের কষ্ট হয় এ বাড়িতে। সেটাও স্বাভাবিক।

সে কথা নয়। উনি জেনেই গেলেন, এ বাড়িতে ওঁর সন্তানরা থাকবে না। তাতে মন

খুব...আমার মতো শক্ত মানুষ ছিলেন না...আমি বলতাম, এটা আজকের বাস্তবতা। ওরা নিজেদের মতো থাকতে চায়...অবুঝ হয়ে যেতেন, কেন? আমি তো কাউকে বাধা দেই না? তোমাকেও দিই না, ওদেরও দিই না, এই সব আর কি! আবিরের ব্যাপারে....যাক অতীত ঘেঁটে লাভ নেই। যে জন্য বলা, উইলে উনি আমাকেই এ বাড়ির সর্বস্বত্ব দিয়ে যান। সে তোমরাও জান, তোমাদের কপি দিই, হয়তো রেখেছ।

—মা, এ সব তো জানি আমরা।

—না দীপ, সব জান না। আমারও তো বয়স অনেক হল, সত্তর পুরে গেল! এ কথা ঠিক, তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমি যেন ওই শোকে আটকা পড়ে যাই। কয়েক বছরই লাগল নিজের জাল কেটে বাইরে বেরোতে। তারপর তোমার বাবার লেখা...অনেক ভাবলাম। সেবার আবিরকে বলেছি, বাড়িটা তোমাদের কাছে বসবাসের জায়গা নয়। জানি, এবাড়ি প্রোমোটারকে দিয়ে দিলে বিশাল লাভ হয়। সবাই ফ্ল্যাট পাও, ইত্যাদি...

শিবানী বলল, আপনি যে তা চান না তা বাড়ি মেরামত করা দেখেই বুঝেছি।

আবির সে সময়ে বলল, ভালোই হল। আমি... ঠিক করেছি...তোমাদের বাবা চাইতেন, এ বাড়িতে মানুষজন থাকুক...অনেক ভেবে নিচতলায় যতটুকু ওরা ব্যবহার করে, সেটুকু ওই করুণা টেলারিংকে বেচে দিলাম।

—মাত্র পনেরো লাখে! ওই স্ট্রাকচার!

—হ্যাঁ দীপ! তোমার মেয়েকে উনি খুব ভালোবাসতেন। ওর কাজে লাগবে বলে তিন লাখ ওর জন্য তোমাদের দিয়েছি। তোমাদের ব্যবসা আছে, ফ্ল্যাট আছে, আর কি আছে জানি না। অবশ্য আমার কি ভাবে চলেছে, তা তোমরাও জান না। এটা অভিযোগ নয় সমালোচনা নয়। আমরা খুব যুক্তিবাদী পরিবার, এ-ওর ব্যাপারে মাথা গলাই না, সত্যিই খুব সত্য, আমি.. খুব...কৃতজ্ঞ থাকি!

করবীর গলা নেমে এল। চশমা খুলে চোখ মুছতে হল।

—আমি তো ওঁর কথা ভুলতে পারি না। যা ঠিক করেছি—তা ঠাকুরপোরা জানেন, বাড়ির ভেতরেই পিছন দিকে যে ছোট দু'খানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম সহ তৈরি করালাম, ওটা সুহাস আর মানবকে দিয়েছি।

শিবানী আজকাল সহজে আপ্লুত হয়। বলল, এটা ক'জন পারে মা? খুব ভালো করেছেন।

—সুখে-দুঃখে তো ওরাই আছে, বিজয় বললেন।

—উনি বহুকাল আগে সোনারপুরের কাছে সুহাসকে দুকাঠা জমি কিনে দেন। সুহাস বলে, জমি ফিরিয়ে নাও। আমি 'না' বলেছি।

বিজয়ব্রজ বললেন, সে জমি যদি দখল না হয়ে গিয়ে থাকে, এখন তার দাম অনেক।

—সে ওরা বুঝবে।

—আর এই বাড়িতে আমার জীবিত কালে আমি থাকব.....'আশ্বাস'-এর কিছু কাজ হবে। বুবলা নিজে অরাজি না হলে আমার কাছে থাকবে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর এ বাড়িটা 'আশ্বাস' ট্রাস্টিকে দেবে, বিপন্ন মেয়েদের...

একটা 'নিরাপদ আশ্রয় আবাস' হবে তোমার বাবা ও আমার নামে। এই বাড়ি দানের, এবং যে কাজে দান, তা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা দেখার দায়িত্ব তোমরা দু'ভাই শিবানী,

ঠাকুরপো-রা নেবে। এবার...তোমরা বলো!

সবাই চুপ। বেশ কিছুক্ষণ চুপ। বিজয় ও নীতিন গা ঢেলে বসে আছেন। দেওয়ালে পল্টুর ছবি। পল্টু দেখছেন, সবাই এখানে। দীপ আবিরের পাশেই বসেছিল। ও ভাইকে একটু ঠেলা দিল। তারপর প্রথমে আস্তে, পরে জোরে হাসল। তারপর দুই ভাইয়ের সে কি হাসি!

হাসি থামিয়ে দীপ বলল, খুব ভালো করেছ মা! তিন মাস আগে এ কথা জানলে মনে মনে গুমরোতাম। কিন্তু যে ধাক্কা খেয়েছি...দুনিয়াকে দেখার চোখই পালটে গেছে।

আবির বলল, আমি তো খুব খুশি। যাক গে, একটা প্রভিশান রেখ, আমরা যাব-আসব, থাকব।...বলা যায় না হয়তো আমি আর বুবলা এই 'নিরাপদ আশ্রয় আবাস' পরিচালনা করব।

—তুই আর বুবলা?

—তা আবির, আবার কি...

বিজয় বললেন, হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ!

নীতিন বললেন, বউঠান গ্রেট! ছেলেরাও গ্রেট!

শিবানী বলল, অ মা! আবির আর বুবলা?

করবী বললেন, নয় কেন? সম্পর্কের ব্যাখ্যা তো বদলে যাচ্ছে। বুবলার নাম আমি ইচ্ছাপত্রে কোথাও রাখি নি? যদি ডিভোর্সের পর আবার সেই স্বামীকেই বিয়ে, বিয়ে না করে একত্র বসবাস, এত রকম মানবিক সম্পর্ক আজকের বাস্তবতা হয়, তাহলে বুবলা আর আবির• কি করবে ওরাই ঠিক করবে। 'সম্পর্ক' শব্দটার আজ হাজারটা মানে হয়, হয় না?

—চলুন বউঠান, খাই!

—শেষ সারপ্রাইজটা দিই?

বুবলা একটা বড় ট্রে-তে কয়েকটা বই নিয়ে ঢুকল।

করবী বললেন, ওঁর লেখা 'কালস্য গতি', প্রেস থেকে কয়েকটা অ্যাডভান্স কপি নিয়েছি।

বিজয়, নীতিন, দীপ, আবির সবাই হাতে হাতে নিল। এই সময় সারিকা দিয়াকে নিয়ে ঢুকল, দিয়া বলল, কি ভাল খেয়েছি! দাদুর বই! আমাকেও দাও। আই ডু রিড বেংগলি!

ভাসা ভাসা নিষ্পাপ চোখ। হতভাগিনী দিয়া।

করবী ওকে একটা বই দিলেন।

খাবার ঘরে যেতে যেতে বিজয় বললেন, এতবড় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন সুখী পরিবার দেখেছ নীতিন?

আবির বলল, দাদা! কাকা কি বলছে? শুনলি?

দীপ বলল, কান দিস না।

একটি রাতকহানি

মানভূম বা অন্যত্র রাত জেগে একজন রাতকহানি বলে। সবাই শোনে। রাতকহানিতে শিয়াল যুগিবুঢ়াকে এক বাছুর দেয়। সে বাছুরের পুরীষে সোনা আর রূপা পড়ে, গোবর পড়ে না। কখনও বা রানির সন্তান হয় বকের ছানা, সাত ভাইয়ের বোন বিধুমুখীর দুঃখে কাক-শিয়ালে কাঁদে। রাতকহানি রাতেই ফুরায়, দিনের আলোয় ঘুমোতে যায়, রাতে জেগে ওঠে।

রাতকহানি সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়, মেঘ-আকাশ-মাটির মতো থেকে যাওয়া এক প্রবহমানতা।

বুধনা-কাহিনিও এক রাতকহানি। তার কাহিনি রাতে, বা লকাপে, বা মর্গে লেখা হয়। বা সলিটারি সেলে। সে থাকে না, তবু সে থাকে, রাতকহানির যেমনটি হওয়ার কথা। নিশ্চয় একদা সে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে ফিরে আসছে বারবার, নিজের জীবনকাহিনি লিখছে বারবার, স্ব-গ্রাম, থানা ও ব্লকের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কখন সে মথুর, কখন সে হরি, কখন সে রাখাল, কখন সে ভদ্র, এ বড় সমিস্যের কথা হে জয়দেব! তুমি তো জানতে চেয়েছিলে, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক শিশুর মতো তোমার অপাপবিদ্ধ চোখ, সে চোখে এমন বিস্ময়, তোমাকে বলতে পারিনি এ রাতকাহানি।

আজ তুমি কতদিন নিজেকে চিন্তায় ক্ষয় করছ, তুমিও জান না। তাই বর্তমান যা কিছু, তা তোমার কাছে অনস্তিত্ব। মনে করতে পার শুধু বাল্যকালের কথা। সবসময়ই অবাক হও। তোমার সেই বছরগুলো গেল কোথায়!

কোথায় যে যায় জয়দেব! তোমার অবাক ও নিষ্পাপ চাহনি, সতত ক্ষমাপ্রার্থী আঙুলে তৃষ্ণার্তকে জলদান, নিরন্ন কালো মানুষদের উচ্ছল অভ্যর্থনা দেখে প্রচণ্ড বিস্ময়, আর ১৯৯৮ সালে হায়দরাবাদে তোমার কথাকওয়া আঙুলে আমার হাত জড়িয়ে প্রায় নিঃস্বর প্রশ্ন, 'বুধন'?

এমন প্রশ্নই তো এ কাহিনিকে রাতকহানি করে দেয়। তুমি যদি জানতে বুধন কত বড় হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে কত দূরদূরান্তে শতাধিক বছর ধরে বন্দি মানুষদের কাছে! সে সব মানুষরা বুঝতে পারছে কারাগারেরও মৃত্যু ঘটে।

জয়দেব, এ রাতকহানি তোমাকে শোনাই, তোমার চোখকে, আঙুলকে, হঠাৎ ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে বিধৃত তোমার আশ্চর্য মুখকে।

তুমিও তো এক রাতকহানি, নও? নিরন্তর ওপরে ওঠার ভয়ংকর রেসের বাস্তবতা দিয়ে তোমাকে ধরা যায় না।

এক

মর্গনামা

মর্গের তাকে ময়লা বয়ামে ঘোলাটে ফর্মালিনে রক্ষিত 'ভিসেরা' বা আন্তরযন্ত্রগুলি, রাত বারোটা বেজেছে। কাঁটা ডানদিকে সরেছে কি সরেনি এমন সময় ঠিক জেগে উঠে ও ডাকাডাকি করে, বুধন। বুধন। বুধন!

ঈশ্বর বা ইশোয়ার ডম সে ডাকাডাকি শুনতে পায় ও প্রত্যহ প্রেতভয়ে কাঁপে।

এ বড় আশ্চর্য যে এই আটটি বয়াম এই জাদুমুহূর্তে নিজেরা উঠে আসে এবং সিমেন্টের ময়লাচিটেধরা দুর্গন্ধি তাকে পাশাপাশি জায়গা করে নেয়।

ইশোয়ার তার স্পন্‌সর নগ্‌দি ডম, মহাবীরজী, কামিখ্যা কালী, সকলকে ডাকে। এই কয়েক পলে আতঙ্কে ওর হৃৎপিণ্ড পেটে নেমে গিয়ে ডুবডুব্ করে, অন্ত্রকুণ্ডলী উপরে উঠে আসে, মূত্রাশয় চলে আসে কণ্ঠনালিতে, ফুসফুস পিঠে ঠেলা মারে।

অদেহী নগ্‌দি বলে, বলেছি না, বারোটা টং করে বাজল, কাঁটা হেলেনি, এ সময়টা ওনাদের? মুখ গুঁজে পড়ে থাক, চেল্লাস না।

—ভয় করে, ভয় করে, ভয় করে।

—কীসের ভয়?

—ভয় করে।

—ওদের সঙ্গে কথা বল্!

বয়ামগুলিতে রক্ষিত ভিসেরাগুলি চেঁচায়। বু—ধন! বু—ধন! বু—ধন!

—সে নাই রে বাপ সকল। তার আঁতের থইলা কলকাতায় গিছিল।

—বু—ধন!

—তোরা কারা?

—আমি হেম শবর!

—মঙ্গল শবর!

—মড়িরাম শবর।

—আমি হরি শবরের বউ বটি, শান্তি শবর!

—ভটু শবর... সিন্দ্‌রিহাটে মেরেছিল!

—হরি শবর, বো—রো! বো—রো!

—রাখাল শবর!

—সুভদ্দর শবর আজ্ঞা...!

—সবাই! বুধনকে! খুঁজ কেন?

—সে গেল কোথা?

—আমি জানি?

—জ্বলাইন দিলি, না তুপে (পুঁতে) দিলি...

কি জানে ইশোয়ার? ভয়ে তার চোখের মণি উলটে যায়, গলায় গঁ গঁ শব্দ হয়। কি বলবে সে? বুধনের ময়না হল দু'বার,—দু'বার মাটির নিচে দিল,—একবার জ্বালাল,—তারপরেও কেন্দার বড়বাবু 'নোটিশ' দিল

"১) শ্রী সহদেব সবর বুধু সবরের পিতা

২) শ্রীমতী শ্যামলী শবর স্বামী—বুধু ওরফে বুধন শবর

সর্ব্বসাকিম অকরবাইদ

থানা কেন্দা, জেলা পুরুলিয়া

"আপনাদেরকে জানানো যাইতেছে যে অদ্য ইংরাজি ৫।৩।৯৮ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার

সময় মৃত বুধু সবরের মৃতদেহ যাহা পুরুলিয়া মর্গে আছে, তাহার সৎকার্য্য মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইবে। আপনাদের উপস্থিতি একান্তই দরকার, সেকারণ আপনাদেরকে জানানো যাইতেছে যে অদ্য ইং ৫।৩।৯৮ বিকাল ১৭,০০টার সময় পুরুলিয়া মর্গে হাজির হইবেন।

আদেশানুসারে

স্বাঃ ...।"

ইশোয়ার বলল, বাপ সকল! তার বউ তো আসে নাই।

—টাইন বিকাল ১৭টা! বাপ্ রে!

খুব হাসি শোনা যায়।

—সতেরো নয় বাপ সকল! দুপুর বারোটার পর পাঁচ ঘন্টা, তা সরকার বলে সতেরো!

—তাতেই শামলি আসে নাই!

শামলি নিজের নাম স্বাক্ষর করে লিখেছিল,

"সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার মৃত স্বামীর সৎকার্য বিষয়ে আপনার প্রেরিত নোটিশ আমি পাইলাম।

আমার মানসিক ও শারীরিক অসুবিধার জন্য আমার মৃত স্বামীর সৎকার্যে উপস্থিত থাকিতে পারিব না।

নিবেদন ইতি আপনার বিশ্বস্ত

শ্রীমতী শামলী শবর"

—তবে? ম্যাজিস্টারের সামনে সৎকার্যটি হল।

এমন সময়ে বুধন নিঃস্বরে বলে, হলটা কোথায়? প্রথমে তো জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিল, সুমিতি খবর পেয়ে সবারে এনে ফেলল। তা শামলি জ্বালাতে দিবে কেন? গ্রাম আর সুমিতি শামলিরে বাঘের মত আগুলে রেখেছে। টাউন থানার মধু-মধু বোল কি বা! আহা হা! বুধনটা গলায় ফাঁস ল্যিল! আপ্তঘাত হয়ে গেল! লে, টাকা লে শামলি! জ্বলাইন দে! তা বাদে অপঘাতে মিত্যু কি বা! পাচিত্তির পূজা করে দে!

তা সুমিতি ঘাড় ঘামাল না। বলল, আপনকার কি আছে মশাই? আপনি কি! হিন্দু তো বট! মরলে জ্বালিয়ে দাও। এরা মাটিতে তুপে দেয়, পাথরের 'চিন্' দেয়! এ রাজ্যের ধর্ম। ধর্ম নয়? না! বুধন অকড়বাইদ যাবে। তা বাবদ ভাই-ভায়াদ (আত্মীয়কুটুম), গ্রামের সব থাকবে। যেমন নিয়ম তেমন করবে।

—জ্বালালে মশাই! পুলিশে স—ব করত।

—পুলিশই তো সব করল। বাকি রাখল কি? চল শামলি, গ্রামে ফিরি!

ইশোয়ার তার আগেই বুধনকে ময়না করেছে। এখন নিয়ম কত রকম! বুধন! তুই কি হুড়কা দিয়ে গেলি বাপ! হুকুম এল, ডম নয়, ময়না করবে ডাক্তার! ডাক্তার কবে ময়না করে? ময়না করে ডম! রিপোর্ট দেয় ডম! ডাক্তার লিখে। লে, আদালতের রায় মানছে কে? যত মর্গ, তত ডমের রাজত্ব!

এখন নিয়ম, ময়না চলবে, তার ভি ডি ও উঠতে হবে।

ভিডিও-তে দেখা যাবে, ময়না করছে ডম, চঁড়াক চঁড়াক ছুরি চালাচ্ছে, পিছনে দূরে

চেয়ার, প্যান্ট পরা পা, সে পায়ে জুতো,—ঠেঙো ভূত বললে হয়। মুণ্ড দেখা যায় না। ডাক্তার।

ইশোয়ার ময়না করেছে, সেলাই করেছে, তা বাদে তুই গাড়ি চেপে গ্রামে গেলি।

শুনলাম, আগে তুপেছিল, সেটা ধর্ এক নম্বর থাকে বলে 'সৎকার্য' তা হল।

বুধন নিঃস্বরে বলে, কোথায় হল?

—হেই দেখ্ বুধা, একটা মানুষের কতগুলো সৎকার্য হয় তা বল?

—আমিও তো তাই বলি। তা বাদে জ্বলাইন দিল।

—তবে দুইবার হল।

—আবার তুপল, আবার উঠাল, আবার তুই চিরাফাঁড়া করলি!

—করলাম।

—তা বাদে সৎকার্যটি কি হল?

—তোর বউ এল না বলে সৎকার্য হয় নাই?

—কেউ দেখেনি, জানেনি, তা দেখ্ ডম! আমিও জানি না কি হয়েছে। এইটি মহা চিন্তা ডম! তাতেই আমিও ঘুরে বুলছি...সর্বত্তর...আর আমার আঁতের বুতল পায় না বলে উরা—অ চিল্লাচ্ছে।

—বাপ্ রে! শবর একটা জাত বটে! মারলে মরে না, তুপে দাও, জ্বালাই দাও, ঘুরে ঘুরে আসে।

এই সময়ে নানা স্কেলের কোরাসে পুরুষদের গান শোনা যায়, এ বড় রঙ্গিলা গীতি,—

বাঘমুড়ির পাহাড়ে তৈরল তৈরল বাঁউশ হে
উঠ বেহায় ঝাঁক তরাড়্যা কাট বঁড়র বাঁউশ হে!
বাঘমুড়ির পাহাড়ে ঝিলিক পাথর আছে হে
ঝিলিক পাথর নিজার নাই, গীত বড় যাড্যাই হে!

ইশোয়ার বলে, ভগবান! ভগবান! ভগবান! আমি সামান্য ডম গো! কারেও মারি না, মড়া কাটি।

এমন সময়ে কলরোল ! কলরোল ! কলরোল ! তারপর নৈঃশব্দ। দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা বারোটার জাদুপ্রহর থেকে মুক্ত হয়ে ঝাঁকি মেরে ডানপাশে সরে।

আজকের মতো ইশোয়ার ঘুমোয়।

বয়ামগুলি যেমন নিশ্চুপ ছিল, তেমনই থাকে। শটন নিবারণের জন্য ফর্মালিনে রাখা ভিসেরাগুলিও ঘুমাতে যায়।

ঘুম! ঢকাঢক চুল্লু মেরে নিশ্চিন্ত ঘুম! বুধন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮-এর নয় তারিখে শামলিকে জড়িয়ে তার দেহের তাপ নিতে নিতে ঘুমিয়েছিল। দেহের তাপে বড় সুখের ওম্ গো। চালের ছিদ্র দিয়ে মাঘের শেষের শীতল বাতাস, সে ওম্ কেড়ে নিতে পারেনি।

দুই

বড়বাবুনামা

বড়বাবু, যে একদা নিজেকেই "রায়রায়ান" খেতাব দিয়েছিল, ছিল, তারও ছিল এক ছাত্রজীবন। অনেকদিন যাবৎ সে চর্বি ও মাংসপেশির যুগল মিলনে ফেটে যাচ্ছে। বাজারচলতি 'ফ্রি'

সাইজের শার্টও তার গায়ে এঁটে বসে। শোনা যায়, তাকে জামা কিনে পরতে হয় না, মদ কিনে খেতে হয় না, এমন অনেক কিছুই তার কাছে পৌছে যায়। ইতিশ্রুতি, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কোনও গহ্বরে সে মাঝে মাঝেই শবর-শব উৎসর্গ করে আর অন্ধকারে গঠিত দুই বিশাল হাত কে যেন উপরে তুলে ধরে। সে হাতে কখনও কারেন্সি নোট, কখনও অন্য কোনও ভোগ্যপণ্য। এ সব কথা রাতকহানি, না সত্যি, না মিথ্যা, না আদ্যোপান্ত কোনও অশ্বেতর পুলিশবিদ্বেষীর বানানো, তা জানা কঠিন। কেন না এ শুধু শুনে যায়, এর ছোট ও দুর্বোধ্য চোখ দুটি নিরন্তর ঘোরে আর ঘোরে।

এ স্বলাইনে সবসময়ে বড়বাবু থাকে না। কোনও কর্তব্যনিষ্ঠ জিলা পুলিশ সমাহর্তা একে বিভাগীয় শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু ও আবার সগৌরবে বড়বাবুর চেয়ারে ফিরে এসেছে।

কেমন করে এমন ঘটে, সে কাহিনি এত পুরাতন, যে তার শিকড় যতই টান, দেখা যায় কোথায় কোন্ গভীরে তার মূল আছে, তা জানা যায় না।

জানতে চায় না কেউ। অথচ সে কাহিনিই এ সসাগরা ভারতভূমে এক বিরাট মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস। কেন না একদা কেউ কিছু মানবগোষ্ঠীকে "অপরাধপ্রবণ" বলেছিল। যারা বলেছিল, তারা রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু একশ বিশ বছর বাদেও ওরা চিহ্নিত।

চিহ্নিত যখন, তখন সে অপরাধ করতেই যাতে বাধ্য থাকে, সেটা থানাও দেখবে। কেন না অপরাধ-অন্ধকারের নিয়ন্ত্রারা তাই চান। তাঁরা সব কিছুর নিয়ন্ত্রা।

শবর, তোমার মুক্তি নেই। তুমি লুটডাকাতি না করলে বাবুদের সম্পত্তি বাড়ে না। তোমার নলকূপে হয় পাইপ থাকে না, নয় কেঁচো বেরয়। তোমার কাজ হল লুটে, ডাকাতি করে যা পেলে বাবুদের দাও। তুমি পাবে এক বোতল মদ আর দশ-বিশটা টাকা। এ কাজ না করলে রুদ্ররোষ নামবে তোমার উপর!

আর মাঝে মাঝে শবর মারে। ওদের রাখো সন্ত্রাসিত। শবর! চুরি করলেও মরবে, না করলেও মরবে। তুমি তো জানো কোন্ বাবুর সঙ্গে কোন্ থানার সাজশ। যদি বলে দাও? আর ওই তোমাদের সুমিতি শবরদের বুকে সাহস এনে দিচ্ছে। শবর থানার কথায় আর ডাং মারতে চায় না।

দ্বিতীয়ত, এ চিহ্নিত মানবগোষ্ঠীর সদস্যরা যেখানেই থাকুক, এদের "সবক" শিখাতে মাঝে মাঝে এদের মারতেই হয়। যারা থানা ও থানানিয়ন্ত্রাদের অনুগামী, তারাও মারা পড়ে পুলিশি নিয়মে। যাতে অন্যেরা সন্ত্রাসিত থাকে।

বড়বাবু পছন্দ করে না তার বিষয়ে ব্যবহৃত জানোয়ার-নৃশংস-ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দাবলী।

এ কাজ, সে করে চলে সম্পূর্ণ নির্মোহচিত্তে। যেমন ভাবে সে কুকুর ঠ্যাঙায়, থানায় জল দেয় যে ভারী, তাকে লাথ মেরে আবার টেবিলে বসে, সিগারেট ধরিয়ে আগন্তুককে বলে,—তারপর? বাস থেকে আপনি নামার পর পকেট মারল?

নির্মোহ, নিরপেক্ষ, অর্জুন যেন! শোনা যায়, মেয়েমানুষ মেরে জ্বালিয়ে দিয়ে ফেরার কালেও তো ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোরগা কিনেছিল। বড়বাবুর মনে আছে, জেলার সাংবাদিকের কাছে এ ঘটনা বলতে গিয়ে সে কীভাবে তার বিবরণ বলেছিল। কী নিখুঁতভাবে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, যেন সামনে কোনও লিখিত রিপোর্ট আছে, সে বলে যাচ্ছে।

সাংবাদিকটি অকপট বিস্ময়ে বলেছিল, কোনও এনকোয়ারি হয় না কখনও?

—হবে না কেন, হয়। পুলিশকে কী মনে করেন আপনারা? লিখবেন তো কিছু বানানো কথা! আপনার জুবিলি প্রেসে ছাপা ওই জঘন্য কাগজ কে পড়ে? জনমত তৈরি করবেন? ছাড়ুন তো! কলকাতার বাঘা বাঘা কাগজ পারে না। আপনার কাগজ কী করবে? এত চুরি-ডাকাতি, এত ছিনতাই, পুলিশকে তো গাল দিচ্ছেন সর্বদা! ডিউটি করে পুলিশ, বুঝলেন?

বড়বাবু সেদিন হেসেছিল। কে যেন বলেছিল, ফিচারে মেলে না, হাসিটা কিন্তু হাসিটা...হাসিটা কার মত তা জানা হয়নি।

বলতে পারে। অভিনয়ে তো ক্ষমতা ছিল! পুলিশ না হলে অভিনেতা হত। অবশ্য এখন মনে হয়, যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে।

ওই ছোকরা কিন্তু ছাড়েনি। আশিকেলে বাসি কথা খুঁজে বের করে সাজিয়ে লিখেছিল। বড় কাগজের জেলা প্রতিনিধি হয়ে লিখবে তা কে জানত?

"এই জেলার অধিবাসী এবং জেলা পুলিস মনে করে শবর মারলে সঠিক কাজ করা হয়। কোনও কোনও থানা অথবা কোনও কোনও বিশেষ অফিসার পরপর পুলিসি আইনের তোয়াক্কা না করে যেভাবে শবর হত্যা করে চলেছেন, বোঝা যায় তার পিছনে আছে রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী মানুষদের মদত। আমরা শবর সন্ত্রাস বাবুর কথাই বলতে পারি। ইনি যে থানায় থাকেন, সেখানেই চুরি-ডাকাতি বেড়ে যায় এবং ইনি অপরাধ নিবারণে যে পটু, তা প্রমাণ করতে শবর নির্যাতন ও হত্যা করেন। বলে থাকেন, আইন ও শৃঙ্খলা রাখতে এ কাজ করা হচ্ছে।

সরকারের তো একটিই ঘোষণা, প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে...

কিন্তু কয়েকটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে বছরের পর বছর চলে দলিত শ্রেণির মানুষদের হত্যা নির্যাতন, উৎখাত।

৭।২।৯২ সালে ভাঙাগদাগামী এক কন্ট্রাক্টরের লরি লুট হয়ে যায়। ইনি সে সময়ে পঞ্চন থানার বড়বাবু। ওঁর থানা ও বানবাজার থানা রাতে আমোদরপুর শবরটোলা আক্রমণ করে। একই সময়ে পুরুলিয়া-বানবাজার রোডে কয়েকটি দোকান লুট হয়।

যারা লুটের মাল কিনে ও বেচে ধনী হয়, তারা চায় পুলিসের টর্চ শবরদের মুখে পড়ুক, পুলিসের গুলির টার্গেট থাকুক শবররা।

অর্জুন শবর যেমন বলেছিল, এ তো সাপ-লুডোর খেলা! আজ শবরদের চোখ ফুটছে, তারা হস্তশিল্প বানাচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, জোয়ান ছেলেরা ভাড়া খাটে না দশ-বিশ টাকার জন্য। তাই শবরদের পুলিসেও খায়, সাপ-লুডোর সাপেও খায়। মই পিছলে নিচে পড়ে তারা। আমি চিরকাল এই দেখছি।

তা দোকান লুট হল তো অভয়পুর শবরটোলা জ্বালানো হবে জেনে অভয়পুর ছেড়ে শবররা পালাল। এমন তারা পালায়। বনে-জঙ্গলে ঘুমায়। অভ্যাস আছে।

পঞ্চনের এই বড়বাবু আর বানবাজার থানা পুলিস একজোটে আমোদরপুর শবরটোলা ঘিরে ফেলে রাতে। একটি বিধিমুক্ত স্কুল ও একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সময়ে চিরনির্যাতিত শবরকেও প্রতিবাদী করতে পারে। বড়বাবু চেঁচায়, সরাবন শবর বেরাক! ধরা দিক! নচেৎ তাকে মাতৃগর্ভে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

শবররা বলে, রাতে শবরটোলা হানা দিতে দেব না। এখানে কী আছে? লরি লুটের মাল?

দোকান লুটের মাল? সে সব কার গুদামে ঢুকেছে, তা তো বাবু জানে। শবরঘরে কী আছে?

পুলিশ কিছু গুলি চালায়। শবররা পালাতে থাকে। এ সময়ে বড়বাবু পলায়মান হরি শবরকে ধরে তাকে উলঙ্গ করে ফেলে। জনসমক্ষে উলঙ্গ করলে মানুষটা ফাঁদে পড়া পশুর মত আর্ত অসহায়। হরির বউ শান্তি শবর স্বামীকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে ছুটে আসে। অতঃপর বড়বাবুর নির্দেশে শান্তি শবরকে লাথি এবং রাইফেলের বাট মারা হতে থাকে। মহিলা মারা যায়।

সেদিন কি বড়বাবুই পুলিশকে দিয়ে মোটরের টায়ার ও পেট্রল আনিয়েছিল? এখানেই এটা রাতকহানি তৈরি হতে থাকে। দুশো বা চারশো টাকার মদ আনায় বড়বাবু। শান্তিকে জ্বালিয়ে দেয়।

এর ভাগ্যতারকা নিয়ত ওপরে উঠছে। ১৯৯৪ সালে এ যকন সুবলরামপুরের বড়বাবু রাধাকুলির গহন শবর, তার মেয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে থানাতে এসে নালিশ জানায়, জনৈক ধনী ব্যক্তি সুমিত্রাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেছে, সে অন্তঃসত্ত্বা। পিতার আবেদন, এ অবিচারের বিষয় পুলিশ ব্যবস্থা নিক।

এই বড়বাবু তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করে তাকে সে রাতে পুলিস লকাপে রাখে। এ সুমিত্রা শবর না হয়ে "ভদ্র সমাজের" মেয়ে হলে..."

না, বড়বাবুর কাজের পিছনে কারণ থাকে।

"অন্য সমাজের মেয়ে" হলে বলাটা অবিচার। বড়বাবু কি শবর-মেয়ে কম দেখেছে? অন্যগ্রহের জীব যেন! তেরো বা চৌদ্দ হতে না হতেই ওরা বালিকা থাকে না। দেখা যায় কি স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ চলাফেরা!

বাপ-মায়েরও কত সস্নেহ প্রশ্রয়!

—ওর মন হয়েছে, মিশছে, আমরা কী বলব?

বড়বাবুর মন বলে এটা অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়! মেয়েছেলে নিয়ে ওদের কি আদিখ্যেতা! ছেলেমেয়ে এ-ওর গলায় মালা দিয়ে চলে এল, তাতেই নাকি বিয়ে হয়ে গেল। যে সমাজ মেয়েদের এতই স্বাধীনতা দেয়, বিধবারা বিয়ে করে, স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হলে সেটা মেনে নেয়, তারা অন্য মেয়ে, অন্য পুরুষকে বিয়ে করে, সেটাও মেনে নেয়,—এদের সমাজকে কী বলা যায়? অসভ্য বর্বর ছাড়া কী? এতকাল ধরে দেখছে ওদের। মেয়েঘটিত কোনও ব্যাপারে সমাজে কোনও হাঙ্গামা দেখেনি।

আবার লজ্জাবোধও নেই। স্বামী-স্ত্রী এ-ওর হাত ধরে ঘোরে। বিয়ে হল তো একটা ঘর তুলে নিল, আলাদা সংসার পাতল।

কড়াই-শাবল-খন্তা-কুড়াল-খেজুর পাতার চাটাই।

"অ্যাসেট" বলতে তো এই।

বড়বাবু রক্তে রক্তে অনুভব করে, ওরা মানুষ নয়। কোথাও কোনও খামতি আছে।

শবর দেখলেই "জানোয়ার" বলে গর্জনটা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

হ্যাঁ, শবর মেয়েটাকে সুবলরামপুর থানার লকাপে রেখেছিল সারারাত। সমিতি কেস করল বলে জানাজানি হল। মেয়েটা বাপের সঙ্গে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রুক্ষ চুল কপাল থেকে উলটে ঝুঁটি বাঁধা। কী ঘন, ঠাসবুনোট চুল হয় ওদের। চুলের চেহারাও যেন

বন্য। যেন সামান্য বৃষ্টি পেতেই বন্য আক্রোশে ঘন হয়ে গজিয়ে ওঠা সুলা ঘাস। যে ঘাস দূর্বার মত নয়, চেনা কোনও ঘাসের মতনই নয়, বন্য।

ছোট কপালে জোড়াভুরু। নিশ্চল ও পর্দাটানা দুটি চোখ। ভুরু কালো, চোখ পিঙ্গল। ঠোঁটও এঁটে বসা, কথা বলতে অনিচ্ছুক। ভুরুর মাঝে উলকির টিপ। কিন্তু কী স্থির চোখে, কী অবোধ্য তার ভাষা।

রাতে লকাপে কোনও মহিলাকে রাখতে পার না। বড়বাবু মেয়েটার চোখে-ঠোঁটে-দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে অবোধগম্য কোনও প্রাণীকে দেখছিল। আর বড়বাবুর কাছেও মেয়েটি বোধাতীত, স্পর্শাতীত কোনও মানুষ। ওদের ধরে চটকে বা লাথিয়ে ফেলে দিলেও ওদের স্পর্শ করা যায় না।

পরাজিত বড়বাবু ওকে লকাপে পুরে দেয়।

এর ফলে বড়বাবুর ওপর ঘোর অবিচার ঘটে যায়। এস পি-র কাছে চিঠি, কপি টু বড়বাবু, কপি টু কলকাতা। ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে ধর্ষণকারীর বিরুধে অভিযোগ জানাতে এল। তাকেই লকাপে পুরেছ? কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বলবৎ বিজ্ঞপ্তি বলছে, "কোনও মহিলাকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় থানায় ডাকা যাবে না, গ্রেপ্তার অথবা বাড়িতে তল্লাশি করা যাবে না।"

ঘোর অবিচার। পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলো মেখে মেয়েটাই তো বাবার সঙ্গে থানায় এসেছিল।

'মহিলা বন্দীকে স্বতন্ত্র মহিলা লকাপেই রাখতে হবে।'—ই কি অবিচার! মহিলা লকাপ জেলায় কোথায়? আর স্বতন্ত্র লকাপেই কি মেয়েছেলেকে বাঁচানো যায়? যতদিন দেহে গত্তি থাকে, মেয়েছেলে তো বিপদ ডাকে। যে জন্যে তাদের এঁটেসেঁটে রাখতে হয়। বুনো ঘাসের বনকে কে বেঁধে রাখবে?

—জানলা দিয়ে ঘর পালাল, গেরস্ত রইল বন্ধ, প্রবাদটা জানেন? জাল তুললে জল থাকে না, মাছ থাকে। এ এল একজনের নামে অভিযোগ জানাতে, সে ব্যক্তি চায়ের দোকানে উরু বের করে চুলকোচ্ছে আর হ্যা হ্যা করছে,—অভিযোগকারিণীকে লকাপে কেন ঢোকালেন?

এমত সব ছোঁড়া অভিযোগে বড়বাবু সামারিলি বা তড়িঘড়ি বদলি ডি আই বি-তে, কিন্তু বড়বাবুর পিছনের খুঁটিগুলি অ্যাটমবোমা, জেলার নিয়ন্ত্রা। সামনে আসছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। গুড়কো দিতে হুড়কো চাই। শবরদের কারণে এক দক্ষ থানাবাবুর এ হেন হেনস্তা, অতএব বড়বাবু বিরাবাজারে উদয় হয়। বিরাবাজার! বিরাবাজার! সর্বত্র নিয়ন্ত্রাদের রাজত্ব, কুড়ি-বাইশটা শবরটোলা।

ওই এক জাতি বটে। ওরাদেরও কেউ বিশ্বাস করে না, চিনে না, বুঝে না, জানে না। ওরা খুব বোঝে, খুব জানে। তাতেই নিজেরা থাকে শবরটোলায়। নিজেরা নিজেদের মধ্যেই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

যাও! তুমি বিশ্বস্ত, যাও বিরাবাজারে।

বিশ্বস্ত সে, নিমকহারাম নয়। ভিতরে প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় জ্বলে আছে 'শবর' নামের উপর ক্রোধে, ফুসফুসেও আগুন। বিরাবাজারই সই।

দুষ্টলোক বলে, ১৯৯৪-এর পর, বিরাবাজারে বড়বাবুর কর্মকালের প্রথম পর্বে প্রচুর

বাসডাকাতি হয়। ধরপাকড় হয় কম। প্রচুর মাল নিরাপদে, বুক বাজিয়ে কেনাবেচা হয়। 'ক্রাইম'-এর অপর নাম 'স্বাধীন এন্টারপ্রাইজ' অথবা 'বিজিনেস'। এ ব্যবসায়ের সবটাই ঘটে অন্ধকারে। লগ্নীকৃত পুঁজি কালো কালো, সন্ত্রাসিত। হা-গরিব শবর ও শবরসদৃশ অন্যান্য মানুষ। অন-শবররা নিশ্চিন্ত থাকে, কেন না ধরার, বা মারার সময়ে তারা বেঁচে যাবে, শবর মরবে। শবররাও এ খেলার নিয়মরীতি জানে বলে রাত হলে জঙ্গলে, ডুংরিতে, এদিকে ওদিকে, বাসরাস্তার দু'পাশের খাতের জঙ্গলে ঘুমাতে যায়।

বিশ্বস্ত বড়বাবু ১৯৯৭-এর জুন মাসের শেষে রাগালবাঁধের মঙ্গলা শবরকে, মঙ্গলার অজানিত এবং তার জানিত কারণে লকাপে রেখে দেয় সারারাত। 'কারেও জানালে...' হুমকি মঙ্গলার মনে থাকে। যে জন্য সে মুখ খোলে না, কিন্তু মঙ্গলা সে মাসে জেলার কাগজেও 'সংবাদ' হয়ে উঠতে পারে না। সে জন্য তাকে বাইশে শ্রাবণ অবধি অপেক্ষা করতে হয়। সেদিনই সকালে বড়বাবু সেকেন্ড অফিসার, জমাদার, কনস্টেবল, চায়ের দোকানের ছোকরা, দেওয়ালে বিচরমান টিকটিকি। জানলার বাইরের সন্দেহকুটিল আঁকাবাঁকা জাম্বুল গাছ, হাঁটুরের কাছে সিজ করা মোরগা সকলকে বাইশে শ্রাবণ বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছে। পঁচিশে বৈশাখ মনে রাখলেই চলবে? আরে তাঁর মহামৃত্যু যে বাইশে শ্রাবণ, এ খবর ক'টা ও সি রাখে? কালচারের পকেট যে কাটা। সব ফস করে গলে যায়। উঃ! আমরা বি বি আর এন স্কুলে পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, দোসরা অক্টোবর, তেইশে জানুয়ারি, তিরিশে জানুয়ারি, কি পালন করিনি? তোমরা জানো শুধু কালী পুজো আর পাঁঠা কাটা! আমার কি এ লাইনে আসার কথা? ফাইট আর্টসে মন ছিল। নেতাজির ছবি এঁকে স্কুলকে তাজ্জব করে দিই।

তারপরই সেকেন্ড অফিসারকে বলে, যাও না! বাস স্ট্যান্ডে যাকে পাবে তাকেই... দোকানে চুরি বলে কথা...হলেই বা যৎসামান্য...বসে আছি যখন। দোকানির স্বার্থ দেখা আমাদের কর্তব্য হয়।

আর রাগালবাঁধের ইন্দ/ইন্দ্র/ফুরি শবর এবং তদীয় পত্নী মঙ্গলা, সিংভূমের গোবরঘুসি গ্রামে কুটুমঘর সেরে সে সময়েই বাসে ফেরে, নামে, ও রাগালবাঁধপানে রওনা দেয়। কুটুমঘরে খাওয়াদাওয়া, মদ্যপান, গান ও নাচ, সবই হয়েছিল। ফলে দুজনেই প্রফুল্লচিত্তে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল। শবর দম্পতির মত এমন হাত ধরাধরি করে কেউ চলে না। বুড়ো বয়সেও বেজো শবর তার বুড়ি বউকে নিয়ে হাত ধরাধরি করে বনে বেড়াতে যেত। বিয়ে হল তো এ-ওর চোখের দিকে চেয়েই আছে। এ সব দেখলেই তো ওদের ভীষণ অচেনা মনে হয়, ভিতরে গড়ে ওঠে হিংস্র আক্রোশ।

'মাইন্ড-সেট বদলান!' বলেছিলেন বটে এক ডি জি, কিন্তু 'মাইন্ড-সেট' বদলানো কি সম্ভব? যা একাধিক শতকে হয়নি, তা এখন হয় কী করে?

তখন বড়বাবু বলেছিল, ইয়েস সার।

মনে মনে বলেছিল, নো সার! সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

'মাইন্ড-সেটটি বড়বাবু কেন, মানুষকে ধরে রেখেছে। ডি জি কী বুঝবেন? কত অগণন বিষয়ে মানুষ ফাঁকা এজলাসে বিচার করে বসে আছে! এটির সঙ্গে ওটির কোনও মিল নেই।

আইন অনেক করেছ। আইনের দরজা অবধি দৌড়বার ক্ষমতা ক'জনের থাকে? আইন যাই বলুক, ধর্ষণ ক্ষেত্রে জানাই আছে, মেয়েটা টুকুটুকু প্রলোভন না দেখালে অমনটা হত না?

যে মেয়ে ধর্ষিত হয়, মূলে সেই দোষী, মন তাই জানে।

শবর মরে, কেন না ওরা বধ্য থাকতে বাধ্য। এমন অনেক কিছু, অনেক কিছু... বাইশে শ্রাবণ এভাবে শুরু হয় ও পশ্চিমপানে সূর্য ঢলে।

সেকেন্ড অফিসার বিরাবাজার বাস স্টপেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে। চার পুলিশ, এক শবর দম্পতি। জোর জোর হাঁট্ মঙ্গলা, পা ফেলা। কিন্তু ইন্দ্র যতই মনে মনে ডাকছিল 'বেড়া' বা আকাশের ঠাকুরকে, ডুব্ ডুব্ ঠাকুর! এতটুকু আন্ধার দাও। গ্রামেও ঢুকব না, পলাইন্ যাব...' কিন্তু শবর ও সূর্যের প্রত্যক্ষ সংবাহন তো হয় না এখন,—লাফ মেরে সেকেন্ড অফিসার ইন্দ্রকে ধরে গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলেছিল, 'থানা চল্'। এমনটা শবরকেই করা যায়, শবরদের ধরলে, মারলে, তুলে নিয়ে গেলে আশপাশের মানুষদের কিছু মনে হয় না। যেন ওরা ছায়ামানুষ, অথবা এমন আচরণই ওদের প্রতি করার কথা ছিল চিরকাল। শবর এবং নানা নামে শবরদের কপালে এমনটাই ঘটে। হঠাৎ গলায় পিস্তল, 'থানা চল্'। শবর থানা যায়।

ইন্দ্র গিয়েছিল। মঙ্গলাও তার পিছন পিছন যায়। বড়বাবু সেদিন ইন্দ্রর হাত কষে বাঁধে, ওকে টেবিলে তোলে। দড়ির ফাঁস ঢুকে গলায়, টেবিল ঠেলে দেয় এবং ঝুলন্ত ইন্দ্রকে ঘড়ি ধরে এক ঘন্টা মারে। তারপর ওকে লকাপে ভরে দেয়। ১০ আগস্ট জেলা সংবাদপত্র খবরটি ছেপে দেয়। এমন নয় যে তাতে জেলায় বিশাল আলোড়ন জাগে এবং মানুষ প্রতিবাদ করে। বড়বাবু বোঝে এ সংবাদের পেছনে কারা আছে এবং বলে, শবর লকাপে, খবর নিকলে যায়, এ কি রহস্য।—মঙ্গলা থানাতেই ছিল, তা লকাপে, না বাইরে, তা জানা যায় না এবং 'মুখ খুললে জান থাকবে না' গোছের অতিপ্রাচীন, প্রত্যহ ব্যবহৃত হুমকি দিয়ে এগারোই ইন্দ্র ও মঙ্গলাকে ছেড়ে দেয়। ইন্দ্র যখন দেখে তার দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, যা যেখানে থাকবার সেখানেই আছে, বিস্ময়ে চক্কর খেয়ে সে বউ নিয়ে চলে যায়। পরে শোনা যায় ইন্দ্রকে থানায় 'ডেকে পাঠানো' হয়েছিল মাত্র, এটা 'গ্রেপ্তার' নয়, এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধি বা কোনও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি। এটা একটা রুটিন জিজ্ঞাসা। 'কোন দোকানে চুরি' বিষয়ে প্রশ্ন মাত্র।

সাত, আট, নয়, দশ। চারদিন ধরে রুটিন জিজ্ঞাসা? এ প্রশ্নের জবাবে বড়বাবু ইংরেজিতে সাফাই গায়, 'ডিফিকাল্ট টেরাইন', বড় দুর্গম জায়গা!

বিরাবাজারে বড়বাবু শবর শিকারের 'মিশন' বা 'মেশিন' নিয়ে এসেছিল। শবর মেয়েকে লকাপে রাখার ফলেই তাকে যে বদলি করা হয়, তার শোধ নেবে বলে তার ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিজের কাছেই। বিরাবাজারকে শবরশূন্য করতে পারলেই সে শান্তি পেত।

এ জন্য সে চেষ্টা কম করে না। বনাওটি চুরির অভিযোগে বাদাবোনা গ্রামে সে উড়ন্ত চাকির মত হানা দেয় এবং সাতজন শবরকে গ্রেপ্তার করে। পুরুলিয়ার উকিলরা কেন যেন ওর উদ্দেশ্য বা মিশন বোঝে না। তারা বলে ইন্দ্র শবরের ওপর মধ্যযুগীয় অত্যাচার হয়েছে। পাঁচজন শবর ছাড়া পায়। দুজন শবর জেলার জেলে যায়, না বিরাবাজার থানার প্রিয় প্রমোদসূচি অনুসারে সিংভূমের থানার সহযোগিতায় পূর্ব বিহারে কোথাও বাকি জীবন পচতে যায়, তা জানা যায় না। বিরাবাজার থানা এলাকায় শবরের নিরুদ্দেশযাত্রা খুবই ঘটমান বর্তমান যদিও তা অতীতেও ঘটমান ছিল।

১৯৯৭-এর জুলাই-আগস্টেই সে রাগালবাঁধ শবরটোলা অতর্কিতে আক্রমণ করে খন্তা-কোদাল-কুড়াল শুধু নয়, নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-শিশু বস্ত্র-জলের বোতল ইত্যাদি নিয়ে যায়। চন্দ্র শবরের ক্যাসেট-প্লেয়ারও চলে যায়। যদিও তার রসিদ ছিল। সরলচিত্ত বড়বাবুকে বোঝানো যায় না, এ সব নতুন জিনিসপত্র কলকাতার মেলায় পাওয়া উপহার! সে বলে যায় 'চোরাই মাল! চোরাই মাল!' কিন্তু কেন যেন মিডিয়ার মনে হয়, মন্ত্রীমশাই পুলিশকে অযথেষ্ট বেতন দিচ্ছেন বলেই এ সব ঘটছে। বড়বাবুর অভ্যন্তরের বড়বাবু বড় ঘা খায়। 'শবর'কে শিক্ষাদানের মহতী 'মিশন' সে মেশিনের সাহায্যে নয়, নিজের মাংসল, পেশল দুই হাত দিয়ে পূর্ণ করবে এ কথাই বলে তার পৃষ্ঠপোষকের কাছে।

পৃষ্ঠপোষক বলেন, হয়ে যাবে। সময় না হলে কিছুই হবার নয়। আমার যেমন বেটা হল না বলে বেটিকে নেতা বানালাম!

—হবে?

—হবে। টাইন ইজ রাইপ।

—হবে!

এমন সময়েই কেন্দা থানার বুধন শবরের কাণ্ডজ্ঞানহীন ইচ্ছা জাগে বউকে সাইকেলে চাপিয়ে মামাঘর যাবে। মামাঘর, বিরাবাজার থানা এলাকায়।

এ সব প্রলাপোক্তি নয়। বুধনের হঠাৎ-ইচ্ছা, বড়বাবুর জেহাদ এ সবের যোগাযোগের কারণেই বুধন তার আঁতনাড়ি হারায়, ভায়া জন বা আত্মীয়স্বজন ও বউয়ের অনুপস্থিতিতে তার যে সৎকার্য হয়, তা প্রকৃত সৎকার্য নয়, বুধনের এমত বিশ্বাস। মর্গের বয়ানগুলির সঙ্গে কোরাসে ওর ফাজিল গান গাওয়া, ইত্যাদি চলছে—চলবে। এবং বড়বাবুর ইতিহাসে রহস্যময় পর্দা নামে। এ যবনিকা কে তুলবে, কবে এবং কীভাবে, তাও স্পেকুলেশনের বিষয়, বা গবেষণার বিষয়বস্তু। ভোলানাথ শবর অত বোঝে না। সে শুধু গেয়ে যায়,

> 'কিসকুরিবা হায়! খাড়িয়া! শবর ভাই!
> হামর বাঁচার উপায় নাই!

বুধন বলে, 'আছে।'

কেউ কেউ তা শুনতে পায় না। কেউ কেউ শোনে।

তিন

তাম্বুলাভিলাষ নামা

শেষ মাঘের তীব্র শীতে তিন সন্তানের বাপ বুধন শবর ১৯৯৮ সালের দশই ফেব্রুয়ারি তার বউ শামলিকে চাপিয়ে সাইকেলে তার মামাঘর যাচ্ছিল। তার মনে এতই অহৈতুকী ফুর্তি ছিল, যে সে খেয়ালই করেনি যে ঢুকে পড়েছে বড়বাবুর 'ডিফিকাল্ট টেরাইন'-এ। বিরাবাজারে মামাঘর সে যেতেই পারে। কেন না সে অন্য থানার বাসিন্দা + বিশেষ কায়দায় টুপি বুনে সুনাম পেয়েছে + তার মনে বউকে চমৎকৃত করে দেবার বাসনা এক প্রাচীন শবর রোগ।

এই বিশেষ সময়ে মন খুশি থাকারই কথা। বুধন কেন, সকল শবর, অ-শবর গরিব এ সময়ে প্রফুল্ল থাকে।

বুধনের পিতামহ ছিল তেমন শবর যাদের তিন দশক আগেও দেখা যেত। তখনও মানভূমের পাহাড়, প্রান্তর, মাটি আদিম অরণ্যকার সবুজ চেলাঞ্চলে ঢাকা থাকত। শবর সম্বৎসর, খাদ্য আহরণ করত। চলমান পাথরসদৃশ মানুষ যেন। নিমেষে পাহাড়ে বা বনে মিলিয়ে যেতে পারে।

বুড়ারা বলত, বিপদ বুঝলে মায়ের শরণে যাও। মা শবরকে খেতে দেয়।

স্বামী-স্ত্রী দুয়ের পরনে কটিবস্ত্র। মেয়েটির হাতে ছড়, পুরুষের হাতে ধনুক। কত হাজার বছর ধরে ওরা ফলমূল শিকড়, কান্দা, পাখি, ঢ্যামনা সাপ, গোসাপ, ব্যাঙ, শামুক, মাছ সংগ্রহ করছে তো করছেই। ঢ্যামনা সাপের মত বহুমুখী সহায়তাকারী কোন সাপ আছে? চাম খুলে দোকানে বেচ। পাতার খোলে সাপটিকে গুটলি পাকিয়ে ভরে দাও। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালো। ঝলসে নিয়ে খাও। ওরা আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী ব্যাধই থেকে গেছে।

কিন্তু ব্যাঙ বা শামুক বা মাছ বা কাঁকড়া যাই খাও, ঝলসে নিয়ে খাও। যেমন খাদ্যাভ্যাসী মানুষের খোঁজে বিশ্বায়নব্রতী সাইবার নেটীয় মানুষরা বিশ্বের সর্বত্র রেডার চালাচ্ছে। মৌচাক, কাকের ছানা, ঝোর বা বটফল, যা পশুপাখি খায়, তাই শবরের খাদ্য। শিকারের দিনে শিয়াল, নেকড়ে, খরগোশ, স—ব খায়। এ বড় পরিতাপ যে তাদের মা অরণ্যকাকে বাবুরা খেদিয়ে ছাড়ল। ধড়াধড় গাছ কাটল, বেচল, বনভূমি হল ঊষর ও ক্রুদ্ধ কঙ্করিত মরুভূমি।

কী করে বুধনদের আদিপুরুষরা?

রক্ত বলে খাদ্য সংগ্রহ করো। বন নাই, তবু করো। সাপ আছে, কাক আছে, শামুক-ব্যাঙ-কাঁকড়া আছে। বর্ষায় শুকনা নদীতে ঢল নামলে মাছ আছে।

আর আছে উন্দুর বা ইঁদুর এবং কার্তিক থেকে পৌষ অবধি ইঁদুর সংগৃহীত ধান। অন্য সমাজের মানুষজনের সঙ্গ পরিহার করে শবর খোঁজে খাদ্য।

মেঠো ইঁদুরের কাছে এই হল মূষিক জীবনের শ্রেষ্ঠ গর্ব। মাঠের মাটি গর্ত করে ওরা ঘুলঘুলাইয়া বানায়। সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছ তো সামনে দেওয়াল। ইঁদুর চাষির ধানে গর্ত ভরেছে। মেঠো ইঁদুরের জীবনের সুখের কালটি বড় তাড়াতাড়ি ফুরায়। কেন না শবর মেয়েরা লোহার ছড় বিঁধে বিঁধে সে ধানের হদিস বের করে নেয়। ছানাপোনা সমেত ইঁদুর ধরে খাও। সুড়ঙ্গ সন্ধান করে 'উন্দুর ধান' জোগাড় করো। বিশ-তিরিশ-চল্লিশ কিলো ধানও পেতে পারো। নিহত ইঁদুরগুলি হবে ইঁদুর পিঠা। সেঁকবে আর গাইবে মেয়েরা,

'উন্দুর পিঠা খাতে বড় নিঠা লাগে ভাই!'

কয়েক দশকে প্রকৃতিজ ও বনজ খাদ্যের ভাঁড়ারে টান। অতএব শবররা বড় দুঃখে বনপর্ব থেকে বিতাড়িত। বুধনের পিতামহরা খোঁয়াড়ের মত নিচু ঘর করত। ঘর তো 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছিল না। ছিল রাতটুকুর আশ্রয়। দিনান্তে সাপপুড়া, ব্যাঙপুড়া খেয়ে গুঁড়ি মেরে ঘরে ঢুকত।

তারপর নব নব শব্দাবলী ওদের তাড়া করে,— ব্লক, অঞ্চল পঞ্চায়েত, থানা ঘোড়া, সাইকেল, জিপ, মোটরসাইকেল, অশস্ত্র উর্দি, সশস্ত্র উর্দি।

স—ব তিন পুরুষে ঘটে গেল।

প্রয়োজন বা অভাববোধই যাদের ছিল না, কটিবস্ত্র ও অস্ত্র নিয়ে যারা ছিল আদি ব্যাধ ও আদি কৃষক শিবের অনুচর কিরাত,—তারা এখন বিভিন্ন শব্দের প্রজা। এই অঞ্চলে, এই

পঞ্চায়েতে গ্রাম তোমার হে...! একেকটি ভ্যাবাচ্যাকা ঘর বাঁধো। প্যান করো, ধুতি পরো, লুঙ্গি পরো, মেয়েরা পরো শাড়ি।

প্রায়-নগ্নতা শ্রেষ্ঠ ভূষা নয়, আবৃত হও।

তবু, কার্তিক থেকে পৌষ উন্দুর, উন্দুর ধান শবরদের ঘরে ঘরে। সিজো, ভানো চাল খাও। শস্যপ্রহরী রাখাদার শবররা ধানক্ষেতে রাসায়নিক সার দিতে দেয় না। ধান ফলবে জোরদার, যেন শবর যুবতী, তেমনই শ্যামল ও ঢলো ঢলো। কিন্তুক উঁদুর তো পলাবে?

কি করে ক্ষেতের মালিক? দেশাচারও একটা কথা বটে। ইন্দুর ও ইন্দুর ধানে ওদের প্রাচীন অধিকার। শবর কেন, অ-শবরও খায়।

বুধনের ঘরেও ইঁদুর ধান ছিল। বুধন খুব জলিফলি করছিল। ঘরের চালা যেমন হোক, ধান আছে, মানে চালও আছে। তাদের যেমন আছে, তেমন মামাঘরেও আছে। আবার ছেলেমেয়ের মামাঘরেও আছে।

উঁদুর ধান সবার ঘরে ঘরে। এ সময়ে যদি দেখ কোনও ধূলিধূসর শবর মাথা নামিয়ে দ্রুত হেঁটে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে মুখ লুকায়, জানবে ওর ঘরে উঁদুর ধান নেই।

হয়ত বা বউ মরে গেছে। হয়ত বা তার টোলা ছাড়ালেই অন্য কৃষকদের ধানক্ষেত আছে। কিন্তু শবর তো শবরী ছাড়া চলে না। বউ নাই তাই ছড় খুঁচিয়ে ইঁদুর গর্ত বের করবে কে? সযত্নে ধান গুড়াবে কে? কে সেঁকবে উঁদুর পিঠা?

শবরঘরে সুসময়টি এই ধান আহরণের সময়। এ সময়ে সে মজুর খাটবে না। পঞ্চায়েতি কাজ যদি বা জুটে, সে কাজ করবে না। ইঁদুর ধান এখন তার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বুধন বেশ মনে করতে পারে, পিতামহ কত বা পূজার কথা বলে গেছে। সে ছিল শবর সমাজের মাথা। অনেকগুলি শবরটোলাতে ওই পরধান। সবাই তাকে একবার শুধায়।

প্রধান পূজ্য দেবতারা হলেন পাহাড়। পাহাড় বলতে নীলমাধব, কিতাপাট, দলমাপাটি, ঘাড়দুয়ারি, কাপড়গাদি, ছাঁদনদড়ি, বাঁধনদড়ি, চণ্ডীপাট।

সেই সঙ্গে পূজা পান মা জুগনি, বা শীতলা। যিনি হাওয়া ও সৃষ্টি দূষণে অক্ষম, মারী রোগ দিতে পারেন। আছেন শিব, আছেন বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রী বিজলিকন্যা, ঝড়ের দেবতা পবনবীর, জলের দেবতা ইন্দ্রজিৎ।

কোনওদিন হয়ত পূজা হত ভিন্ন ভিন্ন কালে। কিন্তু বন সঙ্কুচিত, জীবনে আচ্ছাদন নেই, শবরদের উদ্‌লা করে পরের দয়ার ওপর নির্ভরশীল করে দিচ্ছে ইতিহাস।

পয়লা মাঘ মানে ওদের নববর্ষ। পয়লা মাঘেই আখানযাত্রা। আবার পয়লা মাঘেই পাহাড়সহ সকল দেবদেবীর এক প্যাকেজে পূজা।

বারবার কোন শবর পারে পূজা করতে? শবরসন্তান সির্জেছ জননী, ঘরে ঘুমাতে দাও না, এ কেমন কপাল লিখেছ?

যা ডুংরি—

যা জঙ্গলে—

যা খানাখন্দে—

বুধনের জানা নেই কবে ও ঘরে ঘুমাবে, কবে জঙ্গলে। এই মনে হয় শান্তির দিন এল

কি বা! আবার শামলি কুক পাখির মত ডানা ঝাপটে এসে পড়ে। ফাটাচটা মাটির ফন্দা দিয়ে ও গবিন কুইরিকে এদিকে আসতে দেখেছে। গবিন যখন মদ আনে, শবরদের সঙ্গে খায়, তখন সে নিজে হো হো করে কাঁদে। এরে ধরা করাই, উয়ার খবর দিই, আমার এ স্বভাব শুধরাবে না রে! থানাবাবু বলে, উয়ারা তোরে মরাইন দিবে। আমি বলি, দিক! আবার দেখ পাঁচটা দশটা টাকা! মদের বুত্‌ল! কেরোচিনের পোরমিট তো হ্‌বার নয়। হলে কি আর...?

কেরোসিনের পারমিটের চেয়ে শবরদের বিষয়ে থানায় খরবদান আখেরে লাভজনক, তা কুইরি জানে।

বুধন আর শামলি এবার পাহাড় পূজাটি বড় রঙে ঢঙে করেছে। শামলি চেহারায় আজও বালিকা। ছিপছিপা শরীর নিয়ে ও বুধনের হাত ধরে পরম প্রেমে ঘোরে। আর, কি বেভ্রম কে জানে! বুধন কিছুদিন ধরেই ওর আদি পিতৃপুরুষের নিঃস্বর নিঃশব্দ উদ্বিগ্ন শাসন শুনছে, পলাইন যা বুধা! লা...

টুকে টুকে হাঁড়িয়া খেলে এমনটা শোনা যায় বটে! এমনটা জগো শবরও শুনেছিল। বেয়াল্লিশের আন্দোলনে বোরো থানার শবর সৈনিক জগো শবররা আন্দোলনও করেছিল, জেলও খেটেছিল। তারপরই ইতিহাস, দেশ ও বাবুরা ওদের ভুলে যায়। সে সময় অরণ্যকা আবার তাঁর আশ্রয় থেকে পালানো শবরদের কোলে ফিরিয়ে নেন।

বুধনের শৈশবে জগো এক জ্ঞানবৃদ্ধ। রাত কহানির কথক। বলত, যখন শুনবি 'পলাইন যা', তখন পলাবি। কান্দো শবর শুনেছিল, পলায় নাই, তার দেখ কত না শাস্তি হ্‌ল।

—আর তুই?

—শুনলাম। পলালাম।

বুধন চোখ কুঁচকে সাইকেল চালায়। না, পিত্তিপুরুষের কথা শুনব না। তুমি নাই, কোথা হাড়জোড়া নদীর ধারে তোমার কিরিয়া কাম করে বুধনের বাবার আজাক বা দাদাবুঢ়া, সা জোয়ান তখন, ক্ষ্যাপা মোষের শিং ধরে ঘুরাতে পারে, সে বলল, মাগন করে ঘাটছরাদটি করব। তা বাদে চল আবার কোথা যেতে বসত করি।

তুমি যখন নাই তখন, কথা কেন বল হে? বুধন যায় মামাঘর, কথা নাহি শুনে হে!

পলাইন যা বুধা! গাড়ি ঘুরা, পলাইন যা!

—পান খাব দু'মানুষে।

—পান খাস না বুধন। ঘর যেয়ে তামাক চিবা—

কিন্তু এ সকলই তো একদা ছিল শবরভূমি, ছিল জঙ্গল। জঙ্গল নাই। কিন্তু শবররা তো এই মাটিতেই শুয়ে আছে। তারা বড় ফাজিল স্বরে গান গায়

কিঁড়ি নিত মন করই কইলকাতার পান হে
কইলকাতার নিঠা পান নিঠা লাগে তাই হে!

পিত্তিপুরুষ ভীষণ উদ্বেগে কি বলে তা বাতাসে ভেসে যায়। বুধন সাইকেলটি বামুনিডিহার পানের দোকানের সামনে দাঁড় করায়। শামলি নামে। বুধনের হাত ধরে ও পানের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। বুধনের স্থাবর সম্পত্তি কাজের হাতিয়ার। বউ, ছেলেমেয়ের মত সাইকেলটিও জঙ্গম সম্পত্তি, গতিসম্পন্ন। সাইকেলটি কোনও বিশেষ কোম্পানির নয়, নানা কোম্পানির। এর পেডাল, তো ওর টায়ার। সিট যদি এঁদের, গোটা ফ্রেমটি ওঁদের। এমন সাইকেলই চলে

বেশি, আর বুধনের এ সাইকেলের ওপর মমতা খুব। ছেলেকে বলে, পরে চাপবি, বড় হলে। পান কেনার জন্য পয়সা নেবে বলে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে অতর্কিতে, অকস্মাৎ বুধনের নিজেকে খুব বিপন্ন মনে হয়। একলহমার মত সময়কাল এ অবস্থাটা থাকে। একলহমা কতটুকু সময় তা বুধন জানে না। ওর সম্বল লেখাপড়া নয়। ওর সহজাত বুদ্ধিকোষগুলি বড়ই আগ্রহী ও ক্যামেরার মত শাটার টিপে চলে এবং দরকারি তথ্যসকল বুদ্ধিকোষের ফ্লপিতে রেখে দেয়। ওটাই ওর সম্বল।

যেমন চলতে ফিরতে যে সব বাস ও ট্রাক দেখেছে, তার নম্বর ওর মনে থাকে।

যেমন রোদ কোনদিকে হেলছে তা দেখতে দেখতেই 'টাইন' বলে দেওয়া।

যেমন, সাত মাস উনিশ দিন আগে কোন্ বাংলা মাসের কোন্ তারিখে ও নিকুঞ্জর সঙ্গে মদ খেয়েছিল তা মনে রাখা।

সহসা ও বিপন্ন উদ্বেগে শামলিকে বলল, আজ মাঘ্-অ মাসের সাতাশা! মঙ্গলবার! পরের মঙ্গলবার শামলি!

টুপিগলা্ নুয়াগড়ে লিত্যে...

এবং শ্রবণাতীত দূরত্বে ইথারে ভাসমান তরঙ্গে বেলেল্লা কোরাসও শুনতে পায় ও...

নুয়াগড়ের কুলি য়ে
খুসপুরী গিনু বুলিয়ে
নুয়াগড়ের কুলিয়ে

বুধন চমকে কান পাতে। শামলি শোনে না, ও কি শোনে?

কি এ লচক লচক গায়! নিকুঞ্জ মদ খেলে মেয়েছেলের মত ঢঙে নাচে এমন গানের সঙ্গে।

আমগাছে আম নাই, পাথর কিসক মার হে
কার কণ্ঠ অদৃশ্য গায়কদের কণ্ঠ চাপা দেয়
পানগাছে পান নাই... বুধন পলাইন যা!

একলহমার খণ্ডিত সময় মাত্র। একটি মোটরসাইকেল থামে এবং আরোহী বুধনের কাঁধে থাবা মেরে থামা আঁটো করে।

পানের দোকানে 'অজন্তা' ঘড়ি মুরগির মত চারবার ডাকে কোঁকর কোঁ!

সাধের সাইকেল ও শামলিকে আর দেখা হয় না। কীসে যে ঝাপট মারে, বুধনের মাথা ঘুরে যায়। ১৪০৫ বঙ্গাব্দের সাতাশে মাঘ, মঙ্গলবারে এভাবেই বুধনের তাম্বুলাভিলাষ ঘুচে যায়। মাথা ঘুরে যেতে বুধন বলতে চেষ্টা করে পিত্তিপুরুষের কথা শুনলে ভাল করতাম!

বামুনিডিহার মানুষজন আদৌ বিচলিত হয় না, বা 'কেন' শুধায় না।

চলমান মৃত মানুষদের কৌতূহল থাকে না।

চার

পরিধেয়নামা

এ সময় থেকেই বুধনের পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত আধিভৌতিক উপদ্রব ঘটতে থাকে, যে কারণে যাঁরা হিন্দিতে 'হস্তি' অর্থাৎ বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, আবার রাজপুরুষও বটেন,

তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম হতে থাকে। এমত দৃষ্টিবিভ্রম ঘটবার কারণ, বুধনের অতীব নকুলে পিত্তিপুরুষের হুটপাট উপদ্রব/হানা দেওয়া। মনে রাখতে হবে, এ সময়ে বুধনের সঙ্গে তার কোনও মস্তিষ্ক সংবহন হচ্ছিল না। সংবাহনে বিচ্ছেদ, বা বাংলায় যাকে বলে কম্যুনিকেশন গ্যাপ, তাই ঘটেছিল।

শবর এমতই 'দুঁদে পটল' বটে। এই পিত্তিপুরুষ বুধনের পিতামহের প্রপিতামহ। যেদিন বুধনের ধাত্রীভূমি অরণ্যআবৃত, তেমন কালে মানুষটি বাঁধনদড়ি পাহাড়ের মত অযুতনিযুত বছর বেঁচেছিল। সেও এক রাতকহানী-মানুষ বটে।

—বয়স কত হয়েছিল?

—বয়স আমাদের একটাই। বাংলা বৎসর ১২৭৮। সকল্‌অ শবরের-অ একোই সনে জন্ম।

—হয় কখনও? তোমার বয়স একশো সাতাশ, বুধনের বয়সও একশো সাতাশ?

—অৎ শৎ জানা নাই। তবে বুধনের বেটা বিটি সবের জন্ম ওই বাংলা সন বারোশৎ আটাত্তর!

বুধনের পিতামহের প্রপিতামহের যখন অযুত-নিযুত বছর বয়স হয়, তখনই সে মরে যায়। সৎকার্যটি করেই বুধনের পিতামহের পিতামহ বলে 'আর এখানে নয়। চল্ অন্য মাটিতে খুঁট কাটি।'

চলেই গিয়েছিল। অথচ ওরা নয় সাঁওতাল, কি মুণ্ডা। খুঁটকাটি গ্রাম পত্তন করে চাষবাস করে না। তবু বলল 'খুঁট কাটি!' ওরা শিকার করে, শিকার করে গো ওরা তখন,— তখন, তার পরেও, তার পরেও,—একদিন সদর ছিল মানবাজার, তারপর সদর হয় পুরুল্যা। ওরা বসতি করে, বসতি তুলে নিয়ে আবার চলে যায়,—জঙ্গলে ঘোরে ছায়াবৃত ওরা,—খাদ্য সংগ্রহ করে।

হরিণ, বুনো শুয়োর, খরগোশ, শজারু, পাখি শিকার করো। বনে নাই কি বাপ? বাঁশের কয়ীল, ছাতুপুটকা তো অন্তহীন, ফল খাও, ঝোর (বট) গাছেও ফল দেয়, কেঁদা মূল খাও, কচিপাতা, শবরে সব খায়। ঢ্যামনা সাপ, ব্যাঙ, মাছ, কাঁকড়া, কি এমন আছে, যা প্রকৃতি দেয় না? মধু টুবটুব চাক ভাঙো খাও।

আর কাজ করো। বাঁশ আছে, বুনে নাও কুলা-ডালা, মাছ ধরার খালুই, বাঁশপাতা-ঘুঁষের ছাতা। চীহড় লতা আছে, দড়ি বানাও।

এসব পণ্য বেচে এসো গ্রামের হাটে, আবার ঢুকে পড়ো জঙ্গলে চির-চরণিক, চির-যাযাবর, কিন্তু শিকড়-মূল উপড়ানো মানুষ নও। তোমার গান আছে, পরব আছে, সমাজের রীতি-নিয়ম আছে। চলমানতাই তোমার জীবন ও সভ্যতা।

এমন জীবনযাপন করেছে বুধনের পিতামহের প্রপিতামহ, পিতামহের পিতামহ। বাপের পিতামহ। কিন্তু বুধনের পিতামহই শেষ সৌভাগ্যবান প্রজন্মের শবর,— যারা অরণ্যকার আশীর্বাদধন্য। যেন জাদুতে সুরক্ষিত ওদের জীবন। সে পর্যন্ত ওরা চলমান পাথরের মতো সবল, শালগাছের মতো মহান ও জীবন্ত, পাহাড়ি ঝোরার মত প্রাণময়।

আর আজ? বুধনকে কেন খোঁজে তার পিত্তিপুরুষ? দেহটি মাটিতে দেওয়ার এতকাল বাদে? বুধনদের প্রজন্ম তো শিকারি নয়, শিকার। যতই কেন গাও—

হাউম শবর জাতি, বঁড় পাহাড়ে বসতি!
গাছপতরে কত শোভা পায়!

সে তো অভ্যাসের বশে বল।

বন নেই, পাহাড় আছে। জঙ্গলটি আগুলে রাখত, লেংটা করে ছেড়ে দিয়েছে ওদের যেন ঘেরা ফান্দে। শবরের মুখে টর্চবাতি, শবর হনিতব্য টার্গেট।

পিত্তিপুরুষ বুধনের সঙ্গে কোনওমতে পারে না সংবাহন স্থাপন করতে। এ এস আই-এর থাবা বুধনের ঘাড় ধরল তো সংবাহন বিচ্ছিন্ন।

তাই নিদারুণ উদ্বেগে পিত্তিপুরুষ শতাধিক বছর পেরিয়ে চলে আসে এবং বুধনের মস্তিষ্কে ঘন ঘন টেলিফোন করে। উত্তরে 'এনগেজড়' প্রত্যুত্তর আসতে থাকে।

তখন সে প্রাচীন দিনের, বা তার জীবনকালের মত ফচকা ফিচেল হয়ে যায় এবং রাজপুরুষদের দৃষ্টি ও বুদ্ধির দখল নেয়।

—আমি যা ভাবাব তাই ভাববি, যা দেখাব তাই দেখবি, এ সব সে প্রাচীন খেড়্যা ভাষায় বলে এবং টাইম-রুটিন উলটপালট করে।

যে জন্য দশ তারিখেই এক রাজপুরুষ সতেরোই ফেব্রুয়ারি বুধনকে দেখেন এক কারাকক্ষে শায়িত। তিনি জানেন না যে সাতদিন আগে পান খাওয়ার অযৌক্তিক ইচ্ছা না জাগলে বুধন এভাবে ঘুমাতে যেত না।

মাথার ভিতর সব কিলবিল করে, ছোট ছোট বাতি জ্বলে ও ফুস করে নিভে যায়। হায়! একবার যা ঘটেছিল, তাই কি আবারও ঘটবে?

ছাত্রাবস্থায় জলঢাকা ফরেস্ট বাংলায় বেড়াতে গিয়ে রাতে বিছানায় একটি লম্বাটে কী যেন পড়ে থাকতে দেখেন। মনের চিন্তার নকশা তখনও বড়ই সাহিত্যঘেঁষা। তাই সর্প দেখলাম, না রজ্জু, তাই নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন।

ঘরের আলো টিমটিমে। অতএব ঝুঁকে পড়ে দেশলাই কাঠি জ্বালাতে থাকেন। 'ময়ূরী'-মার্কা দেশলাইয়ের কাঠিগুলি ফস করে জ্বলে ও ফুস করে নেভে। অবশেষে মন বলে, নিথর নিস্পন্দ যখন, রজ্জুই হবে। ফেলে দিয়ে মশারি গোঁজা যাক। এমন সময়েই বস্তুটি নড়ে ওঠে ও চ্যাটাল মাথা তোলে।

সাপ!

বাপ...!

বলে ছিটকে বেরিয়েই তাঁর বোবা ধরে যায়।

'বাপ রে বাপ' বলা হয় না। খুবই হইচই হয়।

হ্যাজাক ও লাঠি নিয়ে চৌকিদার ঢুকে দেখে বিছানা শূন্য। তারপর... তারপর... বহুদিন অবধি কলকাতায় দোতলাতেও ঘরে আলো জ্বেলে শুতেন। ভয়ের চোটে ব্রেন ফিভার। মুখে শুধু

সাপ!

বাপ...!

ব্যতীত অন্য শব্দ বেরোত না। অবশেষে ব্যক্তিত্বশালী পিতা মনের ভয় ভাঙাতে আলিপুরে

সাপের খাঁচা দেখাতে থাকলেন। তারপর...

এখন কী করবেন? নিরীহ দর্শন (এমত নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিটিকে নিরীহ দেখানোই প্রত্যাশিত) মানুষটিকে তো দেখছেন।

কি পরে আছে সে?

হোআট ইজ হি উয়্যারিং

কি পইরা পইড়া আছে?

মগজে যেন সব কিলবিল। ঘাম হতে থাকে। সবলে রগড়ে ঘাম মোছেন। শুনতে পান, লিখ্! ফাটাচটা শাট আর ফুলপেন!

একটা নির্দেশ পেতেই তাঁর আবিল্যি ভাব কেটে যায়!

নিচু গলায় বলেন, ইয়েস সার!

লেখেন, পরিধানে জীর্ণ প্যান্ট, শার্ট। দ্যাট ইজ অল।

এটি পরিধেয়নামার এক নম্বর রেকর্ড।

দুই নং রেকর্ডকে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করা কালে পিত্তিপুরুষকে বিশেষ ভাবতে হয় না। লিখছিল একজন অকিঞ্চিৎকর পদাধিকারী রাজপুরুষ। যার এমত অভিজ্ঞতা প্রচুর। কারাকক্ষে হরাইজনটাল বা অনুভূমিক এমন অনেক অশ্বেতর শবরকে ও দেখেছে।

দেখেছে নানা কিসিমের পরিধেয়। যথা,—

* কপনি বা লেংটি মাত্র

* 'ববি' গেঞ্জি ও ফাটা লুঙ্গি।

* উপরতলা ফাঁকা, একতলায় গামছা

* জিন্‌সের তেমন প্যান্ট, যা ওজনে বিক্রি হয় এবং যাতে সুতো বলতে গেলে বিলীন

* আটহাতি 'তেল ধুতি' যা গত শতকের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত বাবুরা পরে তেল মাখতেন বাবুঘাটে ও গঙ্গায় নাইতেন। এমন ধুতি বা থান গত শতকের অমন সময়েই বালিকা বিধবাদের কোনও কোনও স্নেহময় পিতা পরাতেন।

* ধচামচা বারমুডা

* আধা শাড়ি, লুঙ্গি করে পরা

ইত্যাদি...ইত্যাদি...ইত্যাদি...

একদা এক অনুভূমিক শবরের হাতে হাতঘড়ির উলকি দেখা গিয়েছিল। পরিধেয় ছিল না।

এ বড় রহিস্য হে জগত্‌তারণ! (ও নিজেকেই বলে), সম্পূর্ণ পোশাক-আবৃত অনুভূমিক শবর ও দেখেনি।

উপর-নিচ দুটোই ফাঁকা, দেখেছে।

একদা বিবাহের জন্য ইচ্ছুক শবরকে জেল্লাদার পাঞ্জাবি মাত্র পরেও দেখেছে। নিচে ধুতি ছিল না।

ওর বড়ই বাসনা কোনওদিন ক্যাতা শরবকে বাগে পায়। ক্যাতা কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে ফুলবাবুটি সেজে মদে ভোঁ হয়ে বেড়ায়। ক্যাতার উপর জেলার ব্যাঘ্রবাহিনীর আশীর্বাদ। তিনি সর্বদা ওকে পোটেকশন দেন। ক্যাতাকে ধরলেই উনি ডবল থুতনি ও হেয়ার-ডাইকৃত

কালো চুলের টোপর ফোঁপা নেড়ে বলেন, 'উ আমার বারান্দায় ঘুমাচ্ছিল।'

এ পোটেকশান খুবই জোরালো বটে! তাই ক্যাতা একমাত্র শবর যে জেলে ঢোকে কয়েক ঘন্টার জন্য। সে সময়ে ও নিজের শতরঞ্চি বগলে ঢোকে এবং সেটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ে। অচিরে ছাড়া পাওয়ার কালে বলে যায়, এই যা ঘুমোল, দেহ্ এটুকুই বিশ্রাম পেল। বাঘবাউনী যা ছুট করায়! বিশ্রাম তো মিলে না।

ক্যাতা কি অনুভূমিক হবে না?

ওর জিনিসপত্তর কি 'সিজ' করা যাবে না?

সে সব জিনিসের তালিকা বানানো যাবে না?

এই রাজপুরুষের নাম 'আসামির সঙ্গে ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর লিস্ট' বা আ-স-ব্য-জি-লি।

এ একটি বামন-বামন বহু ব্যবহৃত ডট্‌পেন নিকলাতেই শুনতে পায় ওর মস্তিষ্কে কে যেন হাসছে আর বলছে, লিখ্ শালো, লিখ্!

আ-স-ব্য-জি-লি চমকিত হয়ে বলে, 'হঁ সার!' বাপ্ রে! এ কম্প্যুটরই হবে। সরাসরি নির্দেশ মাথায় পাঠাচ্ছে। ডাক্তার তো বলে, এই যে ব্রেন! ইনি একটি কম্পুটার বটেন!

তবে তাই হবে! কত সৌভাগ্য যে এ জেলায় তার ব্রেনই কম্পুটর হোল!

ও সসম্ভ্রমে লিখতে থাকে

* ফুল পেন, 'জি' শার্ট, পাঞ্জাবি ও গামছা

মনে থাকে, যে পরে এই লোকই খুব ধোবার পাটে কাপড় কাচা, বা ধোবিধোলাই হয়েছিল।

কেন না 'গামছা' শব্দটি পরে সংযোজিত হয়।

বুধনের পিত্তিপুরুষ, যে কী পরত, কেউ জানে না। কীভাবে সৎকার্যিত হয়েছিল, তাও অজানা। (মনে থাকে 'সৎকার'-কে 'সৎকার্য' লেখার কৃতিত্ব এক থানার ও সি-র, বা বড়বাবুর, বা দারোগার) এবং বাংলা ভাষার অভিধানে পুলিশ-ব্যবহৃত শব্দাবলী সংযোজিত না হলে অভিধানটি পূর্ণাবয়ব পাবে না। দুর্গার সেই প্রতিমার মত হবে, শতবর্ষ পূর্বে যাতে ব্যানাখাওলার কুমোর গণেশের ইঁদুর বসাতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে আবার ইঁদুর নির্মাণ। প্রাশ্চিত্তির পূজা হয়! এবং দেবরোষে কুমার ক'মাস বাদে মায়ের দয়া হয়ে মরে যায়।

পুলিশি বাংলা + সমাজবিরোধীদের নিত্যনতুন বাংলা + ঠিকে কাজে কর্মরতা নারীকুলের কলহের বাংলা, এ সবের সংযোজন চাই, স্বীকৃতি চাই। উহারাও বাংলা। ভাষাটির আয়তন বাড়াইতেছে শত শত বৎসর ধরিয়া।

এই 'গামছা' নিয়েও ঘামছা হয়।

গামছা! আগে ছিল না, পরে এল?

আগেও ছিল, পরেও ছিল! জনজীবনে গামছা এক দুঁদিয়া ট্র্যাডিশন! রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রীরা অবধি ব্যবহার করেন।

কোনওদিন ছিল না, থাকতে পারে না!

কিন্তুক লিখা আছে!

ওই লেখা ফল্‌সো! দু'নম্বরী ধর্মাবতার!

পরিধেয়নামার দুই নং অধ্যায় এখানেই শেষ।

পরিধেয়নামার পরবর্তী অধ্যায় আরওই অদ্ভুত।

লিখনরত অতীব অধস্তন রাজপুরুষের মস্তিষ্কে যে বার্তা পৌঁছতে থাকে, তা নির্দেশই বটে, কিন্তু যেহেতু তা শতাধিক বর্ষ পূর্বের খেড়্যা ভাষায় বলা হয়, রাজপুরুষটির মনে হয়, ওটি 'সায়েবরা ইংরিজি বলছে।' ও ঘন ঘন 'ইস্যার', 'ইস্যার' বলেও লেখে)

* হলদেটে একটি গেঞ্জি
* একটি বেগুনি-লাল প্যান্ট
* একটি আকাশি রঙের জাঙিয়া
* একটি ছয় ফিট— দুই ইঞ্চি লম্বা সাদা-নীল গামছা।

পরিধেয়-তালিকার বিশদ বিবরণ, তিনবার তিনরকম লেখা হয় বুধন বামুনিডিহা টু লকাপ গমনের সাতদিন পর থেকে। এই হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় পাকায় বুধনের আদি পিত্তিপুরুষ। পাকায় আত্যন্তিক উদ্বেগে। তারিখটি দশই ফেব্রুয়ারি থাকে। কিন্তু তালিকাগুলি লেখার কালে লিখনরত রাজপুরুষরা ষোলই ফেঃ, সতরোই ফেঃ আঠারোই ফেঃ এমত তারিখ লিখতে থাকে

'ইয়েস সার' বলতে বলতে।

জেট বিমানের চেয়ে অনেক উপরে, ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের বাইরে মহাশূন্যে আকাশ-গঙ্গায় মহোল্লাসে ঝাঁপাই ছোঁড়া পিত্তিপুরুষ বুধনকে সান্ত্বনা পাঠায়, আমি আছি, আমি আছি।

ফলে রাজপুরুষদের সামনে পরের বৈশাখে বুধনের পরিধেয়-তালিকা যা পেশ হয়, তা তাঁদের ঘোল খাইয়ে দেয়।

১. জীর্ণ প্যান্ট, শার্ট, দ্যাট ইজ অল! +

২. ফুল পেন, 'জি' শার্ট, পাঞ্জাবি ও গামছা +

৩. হলদেটে গেঞ্জি, বেগুনি-লাল প্যান্ট, আকাশি রঙের জাঙিয়া, ছয় ফিট—দুই ইঞ্চি লম্বা সাদা-নীল গামছা। অর্থাৎ মানুষ একটি, কয় ঘন্টার অতিথি। কিন্তু আটটি পরিধেয়, দুটি গামছা।

সরকারের ঘরে সব রেকর্ড থাকে হে! অনুভূমিক বুধন আটটি পরিধেয় পরেছিল, দুটি গামছা নিয়েছিল?

পিত্তিপুরুষের ক্ষমতা এমনই যে এভাবে দুই দিনে তিনরকম পরিধেয়-তালিকা লেখার কালে লিখনরত রাজপুরুষদের মনে কোনও 'কিন্তু' ভাব দেখা দেয় না। তারা সরল বিশ্বাসে, ঈশ্বরে ও উপরিতন অফিসারে ভক্তিমান থেকে এমত তালিকা লিখে যায় নেকড়াচোকড়ার। লেখার কালে ওদের মনের পেজারে ঘন ঘন ঝিলিক দিয়ে যায় বহু আপ্ত, বা ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনাহীন সচ্‌বচন, যথা—

যা করেছি সিটি লেজ্য কাজ—

যথা ধর্ম তথা জয়—

কারাব্যবস্থা নগাধিরাজ সমান—

কোনও ছুলু ইঁদুর তাতে ছিদ্দির বানাতে অক্ষম—

এ সব কিছুই ওদের কাছে অলঙ্ঘ্য নির্দেশ বলে মনে হয়, মনে হয়েছিল। 'ইয়েস সার' করতে করতে ওদের মস্তিষ্ক 'কনডিশন্‌ড বা আপেক্ষিক। বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল

হয়ে গেছে। হুকুম পেলে মানতে হবে। আমরা সিডনি চ্যাপলিন লিখিত সেই গল্পটি মনে করতে পারি, যেখানে সৈন্যদের উদ্যত রাইফেলের সামনে শৃঙ্খলিত বন্দি এবং সৈন্যরা 'ফায়ার!' নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে। যে-শব্দের গোলাই নিক্ষিপ্ত হোক, ওদের কানে 'ফায়ার' শব্দই ঢুকবে। ওদের আঙুল অপেক্ষমাণ। সময় যাচ্ছে। এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে এল অফিসার। সে চেঁচিয়ে বলল, 'ডোন্ট ফায়ার!'

সৈন্যরা শুনল,'ফায়ার!' এবং গুলি করল।

দস্তয়েভ্স্কির বেলা মিরাক্‌ল ঘটেছিল। সৈন্যরা গুলি করেনি! সম্ভবত তারা যথেষ্ট 'কন্‌ডিশন্‌ড' ছিল না।

এই রাজপুরুষরা তো বহুদিন হুকুমের আওয়াজ মেনে চলে। এখানেই, ইতিশ্রুতি, বহুকাল আগে কোনও (বিলিতি) রামভক্ত অফিসার চোস্ত আজ্ঞাবাহী খানসামার ওপর চটে যান। রাম পান করার সময়ে এ কি প্রশ্ন? বলেছিলেন, কি চাই, কি চাই শুধোচ্ছে কেন? যা চাই, তা করতে পারবে?

—হ্যাঁ সার!

—আমি চাই, স্রেফ জাঙিয়া পরে, খালি গায়ে, খালি পায়ে সার্কিট হাউসের চারদিক ঘুরে সাত পাক দৌড়বে।

সে আদ্যিযুগের কথা। লোকটি জাঙিয়া পরে তীব্র শীতে সাত পাক দৌড়েছিল। তখন কেউ হুকুম পেলে শুধোত না 'লেকিন কিউঁ?' লোকটিও শুধোয়নি। ফলে তার ছেলেকেও ওই চাকরিতে ঢোকাতে সক্ষম হয়।

এই যখন পরম্পরা, তখন ওরা বুধনের জীবিতকালেই তার বিষয়ে পরের তারিখসমূহে 'অনুভূমিক' লেখে কিনা, তিন দফায় তাকে আটটি পরিধেয় এবং একটি নতুন গামছার মালিকানা দেয় কিনা, তা নিজেরাও জানে না। এটুকু জানে, যে হুকুম পেয়েছে বলে এ কাজ করেছে।

এ হুকুম কে দিল তা তারা জানে না। হুকুম মানে হুকুম। জানতে চাইবে কেন?

জানতে না-চাওয়াটাই নিয়ম।

'কেন' শুধোলেই বিপদ।

এভাবেই পরিধেয় বিষয়ে সকল তথ্য নথিভুক্ত হয়, তাতে সরকারি স্ট্যাম্প পড়ে!

পাঁচ

লকাপনামা

লকাপে ঢুকবার আগে বুধন মনে মনে বলে, আর কি শামলিকে দেখব? আর কি ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরব দেখতে যাব? এমন সব ছিটাভিটা ভাবনা ওর মনে দাঁড়ায় না, ভেসে চলে যায় এখন ও কোনও উদ্বিগ্ন মমতামাখা অদেহী শ্রবণাতীত বৃদ্ধকণ্ঠে শোনে, যা বলব, তাই বলবি। স—ব কবুল যাবি। তখন পলালি না, এখন কথা শুন্।

বুধন বোঝে তার টাকরা তেষ্টায় ঠা-ঠা। জিভ নড়ে না। কখন সে উপুড়, কখন সে চিত, কখন সে প্রলম্বিত, কখন ভূপাতিত। সময়ের হিসেব নেই। দিনে দিনে ক'দিন, তা মনে থাকে না। তাম্বুলাভিলাষ হয়েছিল বলে এত নকড়া-ছকড়া!

নিঃস্বরে সে বলে, শুনেছি। এখন সে কিছুটা আশ্বস্ত। তাকে ঠোঁট নেড়ে কথা বলতে হচ্ছে না, কান খাড়া করে শুনতে হচ্ছে না। বহু নিযুত কিমি পেরিয়ে জরুরি বার্তা মাথায় আসছে, সে শুনছে।

—হাই দেখ্ বুধন। আমি থানা-লকাপে-জেহেল জেবনে দেখিনি। জানি না। পানটি খেতে না দাঁড়ালে বাপ! এত লাফড়া নাই হত। যাক্, কবুল গেছিস সব?

বুধন বলে, স—ব! যখন জন্মাই নাই, তখন হতে স-ব ডাকাতি কবুল গেছি।

এ সব যে বলে তার চোখ লাল, মুখ শব্দহীন, হাত ও পায়ের নড়ার ক্ষমতা নেই। মন বলে, সাতাশা মাঘ, মঙ্গলবার, পান দোকানের ঘড়িতে কুকড়া ডাকল চারবার!

কেউ বলে, জল দিব সার?

—না।

—মুখ হাঁ করতেছে।

—করুক।

বস্তুত এ সময়েই বুধনের মন দেহ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাফিয়ে ওঠে ও চেঁচায়, তুই কোথা গেলি?

খি খি করে হেসে তার আদি পিত্তিপুরুষ বলে—তু যেথা, আমি সেথা। না, আমার কালে বুধন! তখন গারদ হত অন্যরকম। কোম্পানির তালা কি! যেমন হাতির মাথা। শুন, দেখা হবে, তবে কি! দেরি আছে।

বুধনের মনে বিস্ময়ও জাগে না। যেন ওর সঙ্গে ওর পিত্তিপুরুষের দেখা হবে, এটাই তাম্বুলাভিলাষের প্রত্যাশিত পরিণতি।

ওদিকে পাখির মত ডানা ঝাপটে শামলি বুধনের মামাঘর যেতে নিয়ে ঘুরে গিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়েছিল। আঁধার নেমেছিল। আঁধারে শবর দেখতে পায়। তারার আলোও আলো। এমন সময়ে সন্ধ্যা তো তাড়াতাড়ি ঘনায়। তারামণ্ডলী বড় মমতায় যেন নিচে নেমে আসে। শামলিকে দেখতে দেয় আঘাটা, ডুংরি, পদচিহ্নের চিহ্ন-না, থাকা প্রান্তর, শুকনো নালা, বাতাস ওকে জুড়িয়ে দেয়, কেননা ওর শরীর বড় উত্তপ্ত, দৌড়তে দৌড়তে গ্রামে ঢোকে ও, সে যে কখন, তা বলতে পারবে না। রাত তখন মধ্যযামে। শামলি তার ঘরে নয়, সামনে যার ঘর পায় তাতে ঘা মেরে আছড়ে পড়ে। বলে, ছেলার বাপরে তুলে নিয়ে গেল গো! পুলুশ তুলে নিয়ে গেল!

শামলিকে বহে ওরা ঘরে নিয়ে যায়। তীব্র শীতেও শামলি ঘামে কিছুক্ষণ, তারপর ঘনঘন শ্বাস টেনে উঠে বসে। চেয়ে নিয়ে জল খায়। তা বাদে বলে, তুলে নিয়ে গেল, কুকড়ার ছাঁ যেমন চিলে নেয়।

গ্রাম বিরাবাজার থানাধীনে নয়। কিন্তু বুধনকে যদি তুলতে পারে, কাকে না তুলতে পারে! বুধনকে তুলে নিয়ে গেছে এ খবর তখনই বায়েবাতাসে ছড়িয়ে যায়। আজ বুধন! কাল কে? কুটিরে কুটিরে দোর খুলে ছায়া শবররা বেরিয়ে ছায়ায় মিলায়। অর্জুন শবর বলে, আবার শুরু হবে! বাদাড়ে ঘুমাব, ছেলা বাত বইবে, আবার! ই হতে শবরের মুক্তি নাই! এভাবেই অকড়বাইদে জরুরি অবস্থা জারি হয়।

নিচু গলায় কেচকেচ করতে করতে পুরুষরা ঘর ছেড়ে বনে দৌড়ায়। বনও জায়গা ছেড়ে পালিয়েছে, ফলে ওদের অনেকটা দৌড়াতে হয়। দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা শুনতে পায় নিঃস্বর, নিঃশব্দ একটি হাহাকার

প লা ই ন্ যা!

বু ধন শুনে নাই!

শবর পালায়। জরুরি অবস্থা শবরজীবনে জারিই থাকে।

শামলি ছেলেমেয়েকে ঝাপটে ধরে শাওড়িকে বলে, কাল ওরাদের দেখিস্ মা! আমি নুয়াগড় যাব!

—তুই?

—আমার দেহে আখুন সাতটা বাঘের বল!

শামলির চোখ ধক ধক জ্বলে।

'আমি শামলি শবর অভিযোগ করিতেছি, আমার স্বামী বুধন শবরকে কাল ১০/২/১৯৯৮ বিকাল চারিটায়...বাজারের পুলিশ...'

ছয়

আবার লকাপনামা
এবং
চাপান-উতোর

ধর্মাবতার! ১০ই ফেঃ বুধনকে উঠিয়ে আনা হয়, কথাটি ভুল! কি হে! আমি ঠিক লিখছি?

—ঠিকোই সার ঠিকোই। থানা আপনার, লকাপ আপনার, বিরাবাজারের মাটিতে যে কেঁচা বায়, তারাও আপনার! আপনি কি ভুলে ঠিক-ঠিকে ভুল করতে পারো?

—তাকে ঘাপলা করা হয় ১১ তারিখে...

শ্রোতাত্রয় ভাবে সেদিনে সকালেই, না কবে যেন বাইশে শ্রাবণ বিষয়ে বক্তা অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলছিলেন বটে! কত ভালো ভালো কথা! শোনার পর এক গৌণ রাজপুরুষের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি সংবলিত এক ক্যালেন্ডার থানার দেওয়ালে রাখলে ক্ষতি কি! এই রাজপুরুষের কাছে নামি-দামি মানুষ মাত্রেই নেতা। কিন্তু দ্বিতীয় রাজপুরুষ সগর্জনে বলেন, এমনটা চিন্তাও করবেন না।

দ্বিতীয় রাজপুরুষ এই জেলা, এই থানা, এই ভূমিচিত্র, জনগণের মানভূমি বাংলা, না কি ভাষা, জিরজিরে নদী, পাঁচ হাজার বছর রয়সেও একইরকম হাড়সর্বস্ব গরু, গরুর সমবয়সী লাঙল, বছরভর নানা পরব নিয়ে আবোধ্য জনউল্লাস,—এ সবে বিরক্ত।

তারই হাত বুধনদের খপ করে ধরে তুলে আনে বটে, কিন্তু এটা ওর আসল চেহারা নয়। আসল মানুষটি থাকে সাউথ সিঁথিতে ওর স্কুলশিক্ষিকা বউয়ের সাজানো-গোছানো এম আই জি ফ্ল্যাটে। সেখানে সবই শোভন ও সুন্দর। ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়া, রঙিন টিভিতে 'জন্মভূমি' দেখা এবং ওর প্রকৃত প্যাশন যা, নন্দন চত্বরে ঘোরা।

ও নিজেও থানার গৌণ কর্মীদের এবং প্রথম রাজপুরুষদের চমকিত করে সকলকে 'আপনি' বলতে চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে স্পেকুলেশান ও থামিয়ে দেয়। বলে, উনি কি বললেন, তা আপনি বোঝেননি। এখন ফালতু বকবেন না, কাজে যান।

এ সময়ে উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ কোনও পরাশক্তি যে অনেক মিলেনিয়ামের ওপার থেকে বুধনের দখল নিয়েছে তা দ্বিতীয় রাজপুরুষ, বা কারোই জানা নেই। না জেনে তুরীয় আনন্দে জীবন অতিবাহন অধিকাংশ মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাতে জাতীয় চরিত্র শিশুসুলভ রাখা যায়, হঠাৎ হঠাৎ চমকিত হয়ে 'সে কি? ইশ্‌শ্‌। কি ফিউডাল।' এ সব বলা যায়।

প্রধান পুরুষ বলে, লিখ, লিখ! সদ্‌গুরু বাস ১৯৮৬; মোনালিসা লাক্‌সারি বাস ১৯৮৮; শিবাজী মহারাজ বাস ১৯৯২; রেশন গুদাম হানা ১৯৯৬; হনিমুন টুরিস্‌ বাস ১৯৯৭, সকল ডাকাতির বেলা বুধন শবর ডাকাতদলে ছিল।

তার মাথায় মেসেজ পৌছায়, সে বলে যায়, কলমচি লিখে যায়। বক্তাও নির্দেশ মানছে, কমলচিও মানছে। কলমটিও অতীব বাধ্য।

একবার দ্বিতীয় রাজপুরুষ গলা খাঁকরায়। খ্যাঁ-খোয়-খোয়-বুদুম! —এ জাতীয় শব্দ নিকলোয় তার কণ্ঠ থেকে। প্রত্যহ চার্মস ফুঁকলে এরচেয়ে মার্জিত কণ্ঠস্বর বেরনো সম্ভব নয়।

—কী হল তোমার? বাঘ দেখেছ?

—দেখছি সার! মানে বলছি কি...

—ঝেড়ে কাশো!

—বয়স তো আটাশ! যোলো বছর বয়সে প্রথম বাসডাকাতি করে, এটা কি দাঁড় করানো যাবে?

—দাঁড় করানো যাবে না? ষোলো কেন, সাত বছর বয়স থেকে ডাকাতদের খোঁচর ও, জানো? তোমার তাতে কি? ও কবুল করেছে, করেনি?

এ সময় এক হাস্যমুখ বৈরাগি চেহারার মানুষ ঢোকেন। গেরুয়া নাইলনে সুসজ্জিত, হিরো হন্‌ডা থেকে অবরোহিত, গলার স্বর মেয়েলি এবং হাতে রুপোর চেন জড়ানো।

—সার আপনি!

— তোমার গুরুদেব তো আমার শিষ্য হে! শিষ্যবাড়ি যাচ্ছি। নতুন ইটভাটা খুলল! শিল্পোন্নয়ন করে ফাটিয়ে ফেলে দেবে। যাকে বলে উন্নয়ন! হোটেল খুলবে, মোটেল খুলবে, প্যাকেজ ট্রাভেল্‌ সার্ভিস খুলবে, আর পাঁচটা বছর!

—বসুন, বসুন। চেয়ারটা ঝেড়ে দে।

—না হে! এখানে...বুঝলে...বড়ই দম ঘুটকে যায়...চোরছ্যাঁচড়-গুন্ডা নিয়ে কারবার... পরিবেশ তমসাচ্ছন্ন। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তা, বেটা সব কবুল গেল?

—যাবে না?

—বেশ বেশ!

—আমিও তো আপনার...

পিত্তিপুরুষ এবার ওঁর ব্রেন খামচে ধরে। উনি বলেন, আহা! আহা! কেমন দিব্য অনুভূতি হচ্ছে! হতেই হবে। তোমার এখন মহা শুভ যোগ যাচ্ছে। যা ধরবে, তাতেই সুনাম হবে...

বলতে বলতে বোঝেন, ঝপ করে বেরতে হবে। কেন যে মনে হয়, তা নিজেও বোঝেন না। 'দেআর আর মোর থিংস' ইত্যাদি বলতে বলতে তিনি ঝটিতি নিষ্ক্রান্ত হন।

—যাব! যাব স্যার!

—এই যে এঁর দরের মানুষ এল আর গেল, এটা কত বড় শুভলক্ষণ তা বুঝলে? টাউন ম্যান! সাউথ সিঁথি! আর বাগড়া দিও না তো!

—কেস হয়ে গেল স্যার...

—কেস সবাই করল, এখন করবে খেড়্যা! আরে খেড়্যা অমন অনেক গলে গেছে এ হাত দিয়ে।

—আজ দশ তারিখ!

—লেখো, বহু ডাকাতির আসামি বুধন শবরকে আজ গ্রেপ্তার করলাম এগারো তারিখে...হ্যাঁ, অ্যারেস্ট মেমোতে বুধন...বলা সত্ত্বেও স্বাক্ষর করেনি। পরন্তু স্বাক্ষর করতে বললে ভায়োলেন্ট ভাবে অস্বীকার করে। এমন কি 'বাবা বুধন! লিখতে না জানো তো ঢ্যাবা দাও' বললেও শোনেনি। জি ডি নম্বর বসিয়ে দাও। আমি আসছি।

—লকাপে ওকে...

—কেন? বউ বগলে পান খেতে যাচ্ছিল...হেই বুধা! দুপুরে ভোজ খাঁয়েছিলি ন? খেয়েছে! তুমিও আনলে...আমিও খাইয়ে যাচ্ছি...তোমরাও খাইও...তবে হ্যাঁ, মারবে গাঁটে! মারবে লাঠি দিয়ে! কোনও দাগ যেন না হয়।

বেল্‌ট আঁটতে আঁটতে প্রধান পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হন।

অধস্তনদের একজন কান পেতে শোনে জিপ চলে যাওয়ার শব্দ। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন'টা! সে বলে, খেড়্যা মার খেতে জানে বটে! চেঁচায় কম! বাপ্ রে! স্যারের হাতের মার!

টাউনমনস্ক রাজপুরুষের ইন্দ শবরের প্রলম্বিত শরীর মনে পড়ে, শামলির চকিত ত্রস্ত চোখ!

বুধন শবর। সাং আকড়বাইদ। থানা কেন্দা। উচ্চতা পাঁচ ফুট (আনুমানিক), ওজন চল্লিশ কেজি (আনুমানিক)।

বলেন, জল ছিটা দাও। আওয়াজ করে না কেন?

তিনি টর্চ ফেলেন। ফেলে স্থির হয়ে থাকেন কয়েক অনুপল। বুধন চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি মানুষী নয়, অমানুষী নয়, জুরাসিক এজের আদিম কোনও প্রাণীর মত, যেন অজানা অচেনা অ-দৃশ্যপূর্ব কিছু দেখছে। চোখ কিছু বলে। উনি শুনতে পান।

—মা—ড়স্‌?

চোখের পাতা নেমে আসে।

কী করতে পারেন উনি? বুধনের চোখ জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ হয় এটা?'

ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে উনি বেরিয়ে আসেন। থানার বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ান। হুকুমমত এবং পুরুলিয়া পুলিস কোডমত সব কিছুই উনি করে যান একটি বিশ্বাসের জোরে।

এদের চেয়ে তিনি সংস্কৃতিমান। তাঁর ফ্ল্যাটে একটি সেলফে ভালো ভালো বাংলা বই থাকে। উনি সস্ত্রীক নন্দন চত্বরে ঘোরেন। ওঁর ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত শোনেন। কর্মস্থানের বর্বর পরিবেশকে মনে মনে ঘৃণা করেন।

বুধনের চোখের প্রশ্ন ওঁর মস্তিষ্কে রণিত হতে থাকে। যেন নিঃস্ব হয়ে যেতে থাকেন।

এক লহমার খণ্ডিত অণুসময়কাল তিনি এভাবে থাকেন। তারপরই ভীষণ হিংস্রতায় থানায় ঢোকেন, লকাপে।

সাত

ঘটনার সংঘট্টনামা

এ রাতকহানিতে হয়! কাহিনি উপসংহারে চাঁদবদনী কন্যা কানা মায়ের বোবা ছেলের মুখে বোল ফুটিয়ে তার হাত ধরে সোনার প্রাসাদে ঢোকে না। অগা-বগা দুই বক ভাই দুধনদীতে স্নান করে শাপমুক্ত হয়ে রাজকুমার হয়ে সোনার নৌকায় ভেসে মায়ের কাছে আসে না। ধূর্ত শিয়াল লুলা সুদামের ফাঁদে ধরা পড়ে না।

কেন না কাহিনি চলতে থাকে।

শামলি যখন বুধনের সন্ধানে আলু-ঝালু হয়ে নুয়াগড় ও স্বগ্রামের পথে দৌড়াদৌড়ি করে ও বারবার বলে, কেমন বিচার ইটা? কেমন বিচার?

তার ক্রন্দনহীন প্রশ্ন শবরদের বড় ভাবায়। এখন তারা মনে করতে পারে ১৯৯২ সালে হরি শবরের হত্যার পর পরস্পরবিচ্ছিন্ন, জনপদের প্রান্তেবাসী শবররা একত্র হয়েছিল। বেরো থানা ঘিরে বড়বাবুর শাস্তি চেয়েছিল।

মনে করতে পারে ১৯৯৬ সালে ললিত শবরকে ডেকে তার ডান হাত কেটে নেওয়ার পর দূর-দূর গ্রাম থেকে শবররা এসে অপরাধীর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে গিয়েছিল। ওরা সনিশ্বাসে বলে, মরদরা পলাতক। শুধু মেয়ে আর শিশুরা। অধর্ম করতে নাই পারলাম।

ঘরে বা না ঘুমাব কেন?

কতদিন?

আর শামলিকে ঘিরে থাকে শবর মেয়েরা। বিস্মৃত অতীতের মত আবার ফিরে আসে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকালের মত হিংস্র ঐক্যবোধ। গ্রামটিতে সবাই যেন সৈনিক। সন্ধ্যা নামতে পুরুষরা পালায়। রাত হতে বালকরা খাবার বহে নিয়ে যায়। মেয়েরা শামলিকে নিয়ে যায় বাঁধে। স্নান করায়। ঘরে এনে মুখে ভাত গুঁজে দেয়।

কুইরিকে দেখে একদিন মেয়েরা তাড়া করে। ছান্ মারো কেন? ছান্ মারো কেন? — কুইরি পালায়

কেন্দা থানাও বোঝে, কোথাও কিছুর সংবাহন চলছে। পরিস্থিতি সন্দেহজনক। কোথাও পুলিসবাহিনীতে বিপন্নতা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ। জেলার নিজস্ব পুলিস কোড কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন? এ সময়েই বুধনের গ্রামে ছাউনি বসাবার সিদ্ধান্ত হয়।

রাতকহানি শুরু হয় দশ তারিখে এবং বুধন বোঝে সময়কে সে ধরতে পারছে না সময়ই তাকে ধরছে। এ জন্য এই পর্যায়ে ঘটনার বিবরণী এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সংঘট্ট কেমন হবে তা নিয়ে ওর মস্তিস্কে অ-টেলিফোনীয় মেসেজ আসতে থাকে, ও রিসিভ করে মাত্র।

—শুনে যাবি আর দেখে যাবি।

—হুঁ।

—শামলি বলে, বিচার নাই?

—নাই।

—শুন বুধন, বুধন হে আমার নাতাকের নাতাক, তার নাতাকের নাতাক! 'পলাইন যা' বললাম, তা শুনলি না। তবও তুই পলাবি।

—পলাব?

—এমন পলাবি বুধা, তেমন কুন-অ খেড়্যা পলায় নাই।

—আখুন?

—বড় কষ্ট? চলি যাবে।

—তুই থাক্।

—আমি আছি। সব কবুল গেলি?

—স—ব। তবে জেহেলে ভেজে না কেন? হেথা কেন? আদালতে তুল্। জেহেলে ভেজ্।

—উয়াক যমে ধরছে। উয়াদের শৎ দিন, তো খেড়্যার একদিন।

ও নিজেই যে সেই নির্বাচিত খেড়্যা, যাকে দিয়ে 'খেঁড়্যার একদিন' প্রমাণিত হবে। পিত্তিপুরুষপ্রদত্ত এ সান্ত্বনায় বুধন কোনও স্বস্তি পায় না। মনে মনে গনে। দশ, এগারো, বারো, আজ কি খেতে দেবে?

মাংস ও চর্বিতে আঁটসাঁট চওড়া হাত, পাথরের মত শক্ত, অথচ উঁচু পেট, তাতে চওড়া বেল্ট, লোমশ ও কালো পেশল পা, এ ওকে কতবার মেরেছে? লাথি মেরে গড়িয়ে দিয়েছে লকাপের এদিক থেকে ওদিক? তেষ্টায় ঠোঁট হাঁ করলে বলেছে, নিজের পেচ্ছাপ চেটে খা?

হিসেব থাকে না।

আর কে মেরেছে, কে মারেনি? ভাবতে গিয়ে ও বোঝে, লোকটি শোধ নিচ্ছে। খেড়্যা কি অনুগত নাই, বাবু হে! খেড়্যার কারণে ঝাড় খায়্যেছিলে, বাবু হে! বুধনকে খাই ল্যিলে শান্তি হবে বাবু হে!

—খা!

কেউ বলে।

—উঠে খেতে পারে? ছিধর আয়!

—ছিধর!

বুধন নিঃস্বরে বলে ঠোঁট দিয়ে।

—হ্যাঁ বুধন। ছিধর শবর! তোর ঘর সেদিনও গেলাম। উঠ্... খা!

কোনওমতে ছিধর বুধনকে তুলে ধরে, জল দেয়, ভিজা মুড়ি চটকে খাওয়ায়। শবর এক জাত বটে! বুধন জানত ও মরেই যাবে। প্রত্যেকটি লাঠি, প্রত্যেকটি লাথি ওর হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। পলে পলে মরছিল ও।

ছিধর ওকে ধরতে, মুখে ভিজা মুড়ি, জল, লবণ ও মরিচ গুঁড়ার ছোট ছোট দলা ঠুসে দিতেই ওর নাড়ি খাদ্যগ্রহণ করে এবং বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল হয়।

জল খেয়ে ফিসফিসিয়ে ও বলে, ছিধর! দুদিন আমারে মার্য়ো মার্য়ো...

—জানি...ঘুমা...

—আর ঘুম...ছিধর....

বুধন ঘুমিয়েও পড়ে। আধা ঘুম, আধা অবশ ঝিমঝিনি... নিশ্বাস ফেলার কালে ওর গলা থেকে ঠেলে বেরোয় আঁ আঁ শব্দ।

এই শব্দের সঙ্গে, এই লকাপের সঙ্গে ছিধরের পরিচয় পুরাতন।

ছিধর মনে মনে বলে, কে বড়বাবু জানতি না বুধন? আমরে মাঝরাতে উঠাই আনল?

ছিধর ঝিমায়। তাকে আনল কেন? কি বা কেস দিবে? এ জনা তো কেস পরে সাজায়, আগে শবর ধরে। পুলিস ধরবে এমত আশঙ্কা থাকলে সে কি ঘরে ঘুমাত?

এমন সময় সে পরিষ্কার শোনে তার মাথার ভিতরে কারও কণ্ঠস্বর। ছিধরো হে... তুই হতে বুধনের কাজ হবে... হেথা র'বি না তুই...জেহেলে নিবে...

যেন কোন্ সুদূর হতে ভেসে আসা কণ্ঠ।

ছিধরের বিশ্বাস হয়, যা ঘটছে তা ব্যাখ্যাতীত। সে গুটিসুটি মেরে বুধনের থেকে একটু সরে শোয়। এ সময় ওর মুখে টর্চের ফোকাস। নাইট কনস্টেবল ডিউটি করছে। লকাপে যতজন থাকার কথা, তা আছে কি? রাতকহানিতে রাতের কণ্ঠস্বর বড় রগড়পূর্ণ থাকে। রগুড়ে গলা প্রশ্ন করে, ঘুমাই গেলি? ই তালাটো ভাঙ্গে পলাবি না তো ছিধর?

ছিধর জবাব দেয় না। রগুড়ে কণ্ঠ বলে, সিনিমার লকাপ নয় রে খেড়্যা, তালা ভাঙা যায় না।

বক্তা কি জানত, একদিন এই লকাপকে উদোম করে দেখা হবে?

তেরো তারিখ মাঘ সংক্রান্তির প্রত্যূষে বুধনের গ্রাম চমকিত করে জিপের পর জিপ ঢোকে। শবরটোলা নয়, মূল গ্রাম অকড়বাইদের সামনে 'স্ট্যাচু'! বলে কেউ, এবং জিপ দাঁড়ায়।

গ্রাম ও শবরটোলার মাঝে পুলিস দাঁড়িয়ে যায়। শবরটোলার নরনারী সার সার দাঁড়ায়। তাদের চোখে একটাই কথা ঝিলিক দেয়।

বুধনরে নামাবে, মাটিতে ফেলবে।

বলবে, সনাক্ত কর।

বুঝি বলবে লকাপ হতে বুধন পলায় ছিল, তাথেই গুলি মেরে...

বুঝি বলবে, পুলিসরে জোর জখম করে পলাই দিচ্ছিল, তাথেই ডাং মেরে...

কিন্তু পুলিস অকড়বাইদে ঢুকে যায়। শবরদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে, জিপে বুধন!

—বুধ-অ-অ-অ-ন-রে!

বুধন তাকায় মাত্র। তাকিয়ে থাকে। তার চোখে কোনও সাড়া নেই। দুঃসাহসে বুধনের বাপ ছোটে। জিপের কাছে যেতে পারে না, তবু বলে, বুধা!

—বাবা!

—বুধা!

—বাবা!

বুধন চোখের পাতা নামায়। ওর ইঙ্গিত বোঝে বাবা। সহদেব বলে, এত পুলিসেও হাতে ছিকল? বুধন মাথা উপর থেকে নিচে নাড়ে ও উৎসুক চোখে তাকায়। চোখ বলে, শামলি!

—বাঁধে গিছে বুধা!

এমন সময় কে যেন ছুটে আসতে থাকে দুহাত মেলে। বুধনের দু-চোখে কি প্রত্যাশা! এমন করে পাখির মত উড়াল দিয়ে শামলিই আসে!

ঝটপট জিপে বসে, পুলিস ট্রাকে ওঠে টকাটক। বাস্, কেউ নেই, কিছু নেই, অজনের নেংটা নাতি মুখে আঙুল পুরে চেয়ে থাকে। জিপের ধুলো ভসভসিয়ে ওড়ে।

শামলি এর-তার দিকে চায়।

—তারে দেখলে, তার?

—হুঁ, বুধাই বটে!

আর কিছু না বলে ওরা সরে যায়, শবরটোলার দিকে হাঁটে।

শামলি দাঁড়িয়ে থাকে।

বুধন এসেছিল!

গ্রামে এসেছিল।

আট

জেহেলনামা—এক

লকাপনামায় যেমন, জেহেলনামায় তেমনই কেন যেন বাঘা বাঘা রাজপুরুষরা কোনও অদৃশ্য ও দুষ্টশক্তির প্রভাবে সকল নিয়ম/ধারা/আইন কোড ভুলে যেতে থাকেন। বস্তুত, তাঁদের চিন্তাশক্তিতে 'শিশুসুলভ নৈরাজ্য' বা বাংলায় বললে 'ইনফ্যানটাইল ডিসঅর্ডার' দেখা যেতে থাকে। 'বাং' এবং 'ইং' ব্যাপারটি এ রাজ্যে এমনই। 'গ্রেপ্তার করল'-র চেয়ে বাংলা 'অ্যারেস্ট করল' অধিক প্রচলিত। যে কারণে আদালত বিষয়ে অভিজ্ঞ, নিরক্ষর, প্রবীণ বসন্ত খাটুয়া, কোনও বিত্তবান বৃদ্ধ মরলে ছেলেমেয়েদের বলত, 'পাঁপর কেস করে দাও'। অর্থাৎ নিজেকে 'নিঃস্ব' বা বাংলায় 'পপার বলে ঘোষণা করো। জেহেলে ব্যবহৃত শব্দাবলী বা 'ভোকাবুলারি' এমতই কোনও অজানিত রত্নসম্ভার হবে।

ওই সময়কাল যে বুধনের প্রপিতামহের প্রপিতামহ, ওর উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ, যে নেই, অথচ প্রবলভাবে আছে, তার অত্যন্ত আকুলিবিকুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা রাজপুরুষদের জানার কথা নয়।

এই অতিবৃদ্ধ আদিপুরুষ এখন নক্ষত্রগতিতে চলতে সক্ষম। দেহভার না থাকায় সে মহাশূন্যের উপরিস্তরে বিরাজ করে। তার সংবাহন, বা বাংলায় 'কমিউনিকেশন' পদ্ধতিও নিজস্ব।

মর্গে রক্ষিত শবর আতনাড়ি বা ভি'সেরা'দের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে। মৃত/নিহত/অকালে যমের দোরে প্রেরিত সকল শবরই তাদের নিজ পরিমণ্ডলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। তারা কথা কয়, হাসে, গান গায়, বলা যায় খুবই জলি-ফলি মেজাজ তাদের।

আলোচ্য আদিপুরুষ খবর পাঠায় মস্তিস্কের তেমন অংশে যা বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীর অজানা। তা নয়,—

গুরুমস্তিষ্ক, বা অ্যামিগডালা, বা হিপোক্যাম্পাস (জলহস্তীদের কলেজ-জমিন্ নয়), বা থ্যালামাস, বা মস্তিষ্ককাণ্ড, বা লঘুমস্তিষ্ক, বা পার্শ্বখণ্ডক, বা সম্মুখখণ্ডক, বা মধ্যখণ্ডক, বা পশ্চাৎখণ্ডক।

মস্তিষ্ক, অর্থাৎ 'ব্রেন', বা ইশোয়োরের ভাষায় 'বেন'-এর এই বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা, অর্থাৎ 'ডেফিনিশান'কে ধাপ্পা দিয়ে এক অনস্তিত্ব এলাকার অস্তিত্ব আছে। যাকে 'শূন্য বিন্দু' বা

বাংলায় 'জিরো পয়েন্ট' বলা যায়। পিত্তিপুরুষ সেখানেই খবর পাঠায় এবং বুদ্ধিসুদ্ধি, জ্ঞানকাণ্ড, পুলিস কোড, জেল কোড সব ঘুলিয়ে দেয়।

এ জন্যই প্রধানপুরুষটি (এ রাতকহানিতে সে এক এবং অদ্বিতীয়) যে সব বালখিল্যসুলভ ভুল করে, তা পরে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বেচারা বড়ই নকড়াছকড়া হয় এবং তার জিরো পয়েন্টে বাইশে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই অবধি সম্মিলিত কণ্ঠে গান হতে থাকে, যার প্রতি বিরতিতে বুধনের কণ্ঠ শোনা। যায়। গানটি এরকম।

'আম ধরয় ধপা ধপা, তিতুড়্যা ধরয় বাঙ্কা হে
কুইর ধরয় ডাড়ে পতরে, সেহ নাগই চেঁকা হে॥'

এমত গান কখনও উদারায়, কখনও মুদারায় গাওয়া হয়ে চলে, চলছে।

এর মাঝে মাঝে বুধনের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন

'ছার! মহর আঁতলাড়ি ?'—তাও চলছে।

বস্তুত, এ গান, এ প্রশ্ন প্রধানপুরুষকে ছাড়েনি এবং কোনও জ্যোতিষ বিধায়িত রত্ন ধারণেও কাজ হয়নি। লোকটি জানে এ জীবনে ওই লচ্‌কা গান ও বুধনের প্রশ্ন থেকে সে মুক্তি পাবে না। এমত ইতিশ্রুতি, বুধু, বুধা, বুধাই, বুধন, এমন অতীব প্রচলিত নামধারী যে কোনও হেটো মেঠো লোক এলেই ও নমস্কার করে ও 'চেয়ারে বসুন' বলে। এ সব অপরটনাও হতে পারে। বুধনের বেলা পুলিস কোড বা পি সি নিয়ে নকড়াছকড়া করার জন্যই এই আদর্শ রাজপুরুষ এমন হ্যাটা খাচ্ছে। যে জন্য আদর্শ রাজপুরুষরা 'শবর-হ্যাটা' করলেই অধস্তন নেমিছেমিরা ভবিষ্যদ্বাণী করে, ''এটাও 'অমুক বাবু' হতে চলেছে।'

কারাকাহিনির রাজপুরুষ সকল এ সময়ে এমন সব ভুল করে, যা স্বেচ্ছায় করেনি।

ভুল লকাপনামা, অর্থাৎ থানা-নামায়। 'লকাপনামা' ও 'থানানামা' কি সমার্থক?

এর উত্তর জানে তুলোসী গিরি নামক এক শ্রদ্ধেয় পকেটমার কাম দার্শনিক। বলেছে, 'মাছ না থাকলে মাছের ঝোল হয়? হয় না। থানা না থাকলে লকাপ হয় কি? বুঝ লোক, যে জানো সন্ধান।' তুলোসীর প্রাজ্ঞতা বহুকাল ধরেই সকলের স্বীকৃতি পাচ্ছে। তুলোসী উদারচেতাও বটে। সে জনৈকা অকালে-বিধবাকে বিয়ে করেছে, যাকে সে বিয়ের আগে সম্বোধনে ''মামি' বলত। বিয়ের পরেও বউকে 'মামী' বলে এ কারণে তার সন্তানদের মনে জিজ্ঞাসা জাগরুক। মায়ের নাম কঙ্কাবতী, বা কন্‌কা। বাবা বলে 'মামি'। তাহলে তারা কি বাবার মামাতো ভাই?

এটুকু 'ব্যত্যয়' অর্থাৎ 'অ্যানোমেলি' মেনে নিলে তুলোসীর প্রাজ্ঞতা বিষয়ে লোকবিশ্বাস প্রশ্নাতীত। সে স্বনির্ভর-প্রকল্পে বিশ্বাসী বলে ছেলেদেরও নিজের মত পকেট মারতে শিখিয়েছে। ও বলেই থাকে, মার খেতে না শিখলে পকেট মারতে পারবি না। ডিম না ভাঙলে মামলেট হয়?

থানা + লকাপ-নামা কালে প্রধানপুরুষ পরে কত না হেঁচাকেচি করে! সে জন্য কত না হলফনামা দিতে হয়! বয়সে তরুণ এক ঝানু আইনজীবী তাকে কত না হেনস্থা করে!

জেহেলনামা পর্যায়ে কারাবিভাগীয় রাজপুরুষরা এগিয়ে এসে প্রধানপুরুষের হাত ধরে বুঝিয়ে দেয়, 'ইয়ে দোস্তি হম নেহি ছোড়েঙ্গে'।

—তোমার পরাজয় আমাদের পরাজয়।

—তোমার জয় আমাদের জয়।

কারাপুরুষদের ‘জিরো পয়েন্ট’ যে আক্রান্ত, তা তাঁরা বোঝেননি।

ষোলো তারিখ বুধনকে সন্ধ্যা ছয়টা কুড়ি মিনিটে জেলে ঢোকানো হয়। প্রধান কারাপুরুষ সে সময়ে লিখে দেন, ওই তারিখে লকাপ অর্থাৎ জেলের সেলে সেলে কয়েদি ঢোকানো হয় ৫-৫.১৫/৫.২০ মিনিটের মধ্যে।

এই লকাপ হতেই হবে সূর্যাস্তে।

বুধন মুখ তুলেও দেখেনি।

ও শুনেছিল নিজের ‘জিরো সেল’-এ ‘বেড়া পানে চাহিস না বুধন! তোর বেড়া আকাশে নেই।’

বুধনের বেড়া বা সূর্য সনিশ্বাসে অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার পর বুধন জেলে ঢোকে।

কারাপুরুষ মনেও রাখেননি,—‘কারাধ্যক্ষ নতুন কয়েদি ভর্তি করতে পারে জেল খোলার পর, জেল লকাপের আগে অবধি।

লকাপ হবে সূর্যাস্তে। ... নতুন কোনও সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিকে লকাপের পর ওয়ার্ডে ঢোকানো চলবে না! কোনও কয়েদি সাজা পেয়ে লকাপের পর জেলে এলে একটি রাতের জন্য তাকে স্বতন্ত্র সেলে অথবা বিচারাধীন বন্দিদের ওয়ার্ডে রাখতে হবে।’

বুধন কি সাজাপ্রাপ্ত ছিল? তাকে কি এজলাসে তোলা হয়েছিল?

বুধন কয়েদিদের মধ্যে ছিধরকে খুঁজছিল, তার চোখ নিরাশ হয়ে ফিরে আসে ও চোখ বোজে।

—বুধা! বুধা! বুধা!

—তুমি আছ?

—তোর চক্ষু মুদা! ঠোঁট লড়ে না। অমনই থাক!

—স—ব কবুল গেলাম, তবুও এত মার, এত মার, আমি আর নাই গাঁ! চক্ষে ধুঁদলি দেখি।

—ছোট তো ছিলি?

—মনে নাই।

—ফুল ছিল না তোর, ফুল?

—ফুল!

এ সময়ে বুধন শুনতে পায় কার সঙ্গে বা ফুল পাতানের গান। ছিল, তার ফুল ছিল, আছে। বালকে বালকে ‘ফুল’ পাতায়। ভূমিজের ছেলে, মুসলমানের ছেলে, শবর বড় ভালবাসে আন্‌জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বের মেল্ পাতাতে।

যে-যার সঙ্গে ‘ফুল’ পাতায়, তার বাবা, মা, ভাই, বোন, বোনাই তোমার ফুল বাবা, ফুল মা, ফুল ভাই, ফুল বোন, ফুল বোনাই।

তোমার বাবা, মা ভাই, বোন, বোনাই, তার ফুল বাবা, ফুল মা...

নিরন্তর বিতাড়িত, সন্ত্রাসিত, কেন বিতাড়িত, কেন সন্ত্রাসিত, তা না-বোঝা শবরদের মন বড় বন্ধু খোঁজে, ‘আপনজন’ শব্দটির ক্ষেত্র বাড়িয়ে চলতে চায়। থাকুক, শবরকে ঘিরে একটি বন্ধুজনের জগৎ থাকুক।

বিপন্ন শবরদের পলায়নের জায়গা ‘ফুল’দের গ্রাম, বাড়ি, বসতি।

—এই তো মনে আসছে বাপ!

নিশ্চল বুধন আনন্দ-উচ্ছল কণ্ঠে বলে, গান?

অমনি সে শুনতে পায় বালক কণ্ঠে গান, বাঁশি ও হাসি।

'এক-দুই-তিন- চাইর ঝুমুর বল্‌ব
মাদলিয়া ছুঁড়া সঁগে ফুল বস্‌ব
পাঁচ-ছয়-সাত- আট ঝুমুর বল্‌ব
পাখ-ধরা ছুঁড়ার সঁগে ফুল বস্‌ব॥

বুধন খুশিতে হাসে। এই তো সে ফিরে যেতে পারছে কোমরে ঘুনসি বাঁধা, ডুংরি পরা উন্মুক্ত অপার শৈশবে। হাত ছড়িয়ে মুখে রেলগাড়ির মত্ত ক-উ-উ সিটি বাজিয়ে দৌড়ে চলে যাও, খোলা ডাঙা জমি, পাথর চটান, ওপরে আকাশ, গা-ধুয়ে দেওয়া বাতাস, কোথাও দুপুরে পাখির ডাক—কুপ্‌-কুপ্‌-কুপ!

—বুধন রে! বুধন!

—তুমি যাও কেন? আমি গান শুনি? ছিধরটা...

—দেখ হবে!

—আমি...বড়... হব না...

বুধন নিজেকেই বলে।

নয়

জেহেলনামা—দুই

সতেরো তারিখ ছিধর বুধনের কথা ভাবতে ভাবতে প্রত্যূষে উঠেছিল। কাল বুধনকে জেলে ঢোকাচ্ছিল টেনে-ছেঁচড়ে। বুধনকে দেখে ও চমকিত হয়নি। থানা-লকাপের পর তো জেলেই আসবে শবর। বুধন প্রায় নিঃস্বর কণ্ঠে যা বলে, তাও তো দাঁড়িয়ে বলতে পারেনি। ওকে ওরা দু'দিকে দুজন, নড়া ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বস্তার মত ঘষটে ঘষটে।

বুধনের পা ঘষছিল। তাই কথাগুলি ও বলবার আকুতিতে দমকে দমকে বলে। ছিধরও হাঁকুড়ির ভয়ে কান পেতে শুনতে পারছিল না।

—পাঁচদিন...মার...সকল শক্তি...মার...ছিধর...মার...

সতেরো তারিখ হাজিরার পর জেল পুলিশের পাহারায় বিচারাধীন, শাস্তিপ্রাপ্ত, বিভিন্ন 'সংজ্ঞা' বা বাংলা 'ক্যাটেগরি'র বন্দিদের (কয়েদিদের নয়, কেননা বিধিবদ্ধভাবে আদালত থেকে শাস্তি না পেলে সে ব্যক্তি 'কয়েদি' হয় না কিন্তু কারা-অভিধানে সকলকেই বন্ধ সেলে বন্দি রাখা চলে) নানা ডিউটি করতে হয়।

ছিধর সকলকে সকালের টিফিন দেয়।

সে যায় গেটে।

বুধনকে জেলপ্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতে বলা হয়। কীভাবে সে ঘষটে ও ছেঁচড়ে সেলের বাইরে আসে, উঠোনে নামে, ছিধর চমকে ওঠে। এমনটা শবর করে বটে। মার খেতে খেতে...মার খেতে খেতে...দেহটা ধপাস করে আছাড় খাচ্ছে...লাথির ঘায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে...বুট পরা-পা তাকে গড়িয়ে দিচ্ছে লাথ মেরে, দেওয়ালে লাগল শরীরটা... আবার ও-পাশ থেকে এ-পাশে

লাথ মেরে...: এমন অবস্থায় বুধন শবরের মনে হতেই পারে, যা বলে তা মানলে ও হয়ত বা প্রাণে বেঁচে যাবে। এই সময়ে বাঁচার ইচ্ছা দুর্মর, অপ্রতিরোধ্য হয় ও বুধনের শরীরকে চলার শক্তি জোগায়। এরপরেই ছিধর বুধনের কণ্ঠে 'বাঁচাও, বাঁচাও' শোনে।

সে কোনও মানুষী কণ্ঠের আর্তনাদ নয়। আর্তনাদটির যেন নিজস্ব অবয়ব আছে, এবং ভয়ংকর জেদে তা বুধনকে চিরে ফেলে বেরিয়ে আসছে।

ছিধর এগোতে পারে না। দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন, বা 'শুধু বিনা ওজরে ঝুলিয়ে তুলে আনা' বন্দি ও কয়েদিরা স্ট্যাচু হয়ে থাকে।

যার ইউনিফর্মের হাতায় তিনটে বিজয়চিহ্ন, ইংরেজি 'ভি' হরফের মত সাদা ফিতেয় সেলাই করা, সেই লোকটি বুধনকে লাঠির পর লাঠি মারছে। অন্য জেলপুলিশরা তাকেও ঘিরে রেখেছে। যাতে লাঠি উঠতে ও নামতে পারে।

ছিধর এগোতেই পারে না। সে এবং অন্যান্য নন-পুলিশ দর্শকরা লাঠির ঘা যতবার পড়ছিল, ততবার শিউরে নিজের মাথা হাত তুলে বাঁচাচ্ছিল।

এরপর কয়েকজন বিচারধীন বন্দি কারো, বা কাহাদের হুকুমে বুধনকে তুলে নিয়ে যায়।

১২ নং ওয়ার্ড। ২ নং সেল। বিচ্ছিন্ন এক সলিটারি সেল। সতেরো তারিখ দর্শকদের হটিয়ে দিয়ে সেলের দরজায় তালা পড়ে যায়। এবং বন্দি ও কয়েদিদের সেলে ঢুকিয়ে তালা মারা হয়। এমনটা কখনও করা হয় না।

বুধন দুপুরের খাবার খেয়েছিল? খায়নি? ছিধর বাইরে থেকে দেখেছিল সে শুয়ে আছে.

এরমধ্যে সে যে কখন 'পলাইন্ যায়', সে একা বুধন জানে।

আগে সে পালাল না।

যখন দশ থেকে ষোলো, (লকাপে ঢোকে বিকেলে, জেলে ঢোকে বিকেলে). —বিকেল হতে বিকেল, ছয়দিন ও ছয়রাত বেধড়ক মার, জিরেন. মার, পায়ের লাথে গড়াগড়ি, এ সব খাচ্ছিল, তখন পলাল না। অথচ তালাবন্ধ সেল থেকে পালিয়ে গেল।

'সাধারণভাবে বললে, একমাত্র পুলিশ অফিসাররাই ব্যাখ্যা করতে পারেন, কী পরিস্থিতিতে তাদের কাস্টডিতে কোনও লোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। কিন্তু অজানা নেই, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পুলিশ কর্মীবৃন্দ নিরুত্তর থাকতে চান এবং 'না' করার পরিবর্তে প্রায়শই তাঁরা চান সহকর্মীকে রক্ষা করতে, (বাস্তব) সত্যকে বিকৃত করে ফেলতে।' (রায় : বুধন শবর কেস)

বিকেলের ভূমিকা কত বড়!

সতেরো তারিখ বিকেলে জানা যায়, বুধন শবর গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

বুধন যে পালিয়ে যেতে পেরেছে, তা ও নিজেও বোঝেনি। যাতে ও বিভ্রান্ত থাকে, তা হল এখন ওর দেহ যেন নেই, দেহকে ছেঁচেকুটে কিমা বানাবার যন্ত্রণাও নেই।

এ সময়েই ও বোঝে ওর পিত্তিপুরুষ ওর সঙ্গে সঙ্গে আছে।

—ই কি হল আমার?

—আর কি! তুমি পলাইন দিলে।

—আখুন?

—আখুন উরা ছেঁচা হবে, কুটা হবে, তু উয়াদের এমুন লাচাবি বুধা! যে উরা বল্যে ছাড়বে

বুধনরে কেন বা ধরলাম।

—সৎকার্যটি হবে?

পিত্তিপুরুষ গভীর উল্লাসে হাসে। বলে, তিনবার হবে। তু হতে উয়ারা বাঘের বিহা দেখবে

—শামলি!

—শামলি থাকবে, গ্রাম থাকবে, নুয়াগড় থাকবে...

—হা দেখ, এত বেথাবিষ নাই তো আর?

বড় মমতায় পিত্তিপুরুষ বলে, যা ছিল সে পড়ে আছে। তোর বেথা নাই থাকবে।

—উটো আমি লয়?

—তুই এখন দশটা হবি। আখুন দেখ্ কেনে তুই উরাদের কেমুন পাছড়াস! খেলা জম্‌ছে!

বস্তুত ২ নং সেলে বুধনের নিষ্প্রাণ শায়িত শরীর অনুভূমিক পড়ে থাকতে কে আগে দেখে?

দেখার পর কাদের মাথার জিরো পয়েন্ট সহসা মুক্ত হয়ে যায় এবং বূঢ় বাস্তব কাদের হাড়ে দুব্যো ঘাস জন্মাবার আতঙ্ক জাগায়?

সর্বাগ্রে কোন্ ক্রুদ্ধ রাজপুরুষ এতাবৎ উল্লেখিত থানার প্রধানপুরুষকে ফোন করে বলে, তুমিই এই মৃতদেহটি বিইয়েছ। এখন এসে ম্যাঁও ধরো?

মৃতদেহ 'বিয়োবার' কথা শুনে আরেক ডেপুটির খুব অশ্লীল মনে হয় এবং তিনি বলেন, পরিস্থিতির গাম্ভীর্য বিচারে এ হেন অসভ্য কথাবার্তা অনুচিত।

তাঁর ওপরঅলা বলে, ও সব রাখুন তো! এখন আপনার শুচিবাই দেখাবার সময় নয়।

ডেপুটি তলব পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। তিনি বিষনজর হেনে বলেন, আমি যা দেখব, তাই লিখব। সত্যি কথা।

ওপরঅলা বলেন, ঝটপট ময়না, তারপর লাশ জ্বালাবার ব্যবস্থা।

তা বললেই তো হয় না, তা বললেই তো হয় না। জেলার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, জেল হাসপাতালের ডাক্তার যে রিপোর্ট লেখেন, তাই তো নথি হয়ে থাকে। হতেই পারে, যে পরে মৃত বুধন জ্যান্তের বাড়া হয়ে দাপাদাপি শুরু করে। কিন্তু এহো বাহ্য। তখন কী হল? তুলোসী গিরি তার সম্মানিত পকেটমার জীবনে দর্শন, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি প্রচুর অর্জন করেছে। সে বিশ্বাস-ই করে না যে পরবর্তী ঘটনাবলী অন্য কেউ করেছিল। সে বলে থাকে, গৃহী সন্ন্যাসী ধরণীধারণ কুইরি মৎ বংশেরই লোক। তিনি কী দেখিয়ে গেলেন বল দেখি? একই দিনে, একই সময়ে তিনি আদ্রাতে চিতই পিঠা খাচ্ছেন, আবার সেই দিনে, সেই ক্ষণে তিনি জামশেদপুরে রোগী ভর্তি করছেন, আবার সেই একই সময়ে ভাকুড়ি গ্রামে যেয়ে আমার পিসিকে বলছেন, কাদাচিংড়ি দিয়ে কচুঘণ্ট আর ভাত খাব! যে এক, সেই বহু, যে জানে কথার মর্ম, সেই হয় জ্ঞানী। বুধনের দেহবন্ধন থেকে মুক্তি ঘটেছে, ও যথা ইচ্ছা, তথা যাবে। অলৌকিক, অসম্ভবের দিন আছে, থাকবে, কেননা ছিল। কীভাবে ঘলটেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা পেলেন, ভাব!

মোটকথা, শুধুই নাম সই করতে সক্ষম বুধন বিষয়ে সরকারি কাগজপত্র জমতে থাকে। পরে দেখা গিয়েছিল, জীবিত বুধনের ওজন, এবং মৃত বুধনসংক্রান্ত কাগজপত্তরের ওজন প্রায় সমান-সমান হয়েছিল। এ সব কাগজপত্তর চিরতরে রক্ষিত থাকে। কোনও ফাইলই

হারায় না, চাপা পড়ে মাত্র। খুঁড়ে চলার ধৈর্য থাকার ফলে ফরাক্কা বাঁধের ফিডার ক্যানেল খননকালে অতি প্রাচীনকালে পোড়ামাটির অলঙ্কার, মৃৎপাত্র বেরিয়েছিল, যার সাক্ষী আজও বর্তমান।

বুধন সংবাদে ওপরওয়ালাদের মধ্যে যতই বিসম্বাদ হোক না কেন, অনুভূমিক ও নিশ্চল বুধন বিষয়ে রিপোর্টটি একেবারে যথাযথ, 'অ্যাজ পার রুল্স' লেখা হয়, যা দেহাতীত বুধনের জানার সম্ভাবনা কম।

রিপোর্টটি এরকম :

'অপরাধমূলক পুলিশ দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারামতে তদন্তমূলক রিপোর্ট' :

উদ্ধৃতি : টাউন — পি এস ইউ ডি কেস নং ২৫/৯৮

জেলা : পুরুলিয়া — তাং ১৮.২.৯৮

ধারা : ১৭৪

রিপোর্টের তারিখ ও সময় : সন্ধ্যা ৭.৩৫ তাং ১৭.২.৯৮

অকুস্থলে আগমনের

তারিখ ও সময় : ৭.২৫ সকাল, তাং ১৮.২.৯৮

তদন্ত শুরু : ৭.৩৫ সকাল, তাং ১৮.২.৯৮

তদন্ত সমাপ্তি : ৯.৩০ সকাল, তাং ১৮.২.৯৮

১. মৃতের নাম, পিতৃপরিচয়,

বাসস্থান : বুধন শবর (অকড়বাইদ)

পিতা : সহদেব শবর

গ্রাম : অকড়বাইদ;

থানা : কেন্দা; জেলা : পুরুলিয়া

২. কোন্ স্থানে দেহ পাওয়া যায় :—পুরুলিয়া জেলা কারাগারের ২ নং সেলের মেঝেতে দেহটি চিত হয়ে পড়েছিল। মেঝে থেকে সেলের উচ্চতা আনুমানিক ১৫ ফুট। লৌহনির্মিত সেলের প্রবেশপথের উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি। দরজার ফ্রেমে খাড়াভাবে ৬টি রড এবং আড়াআড়ি ১০টি রড আছে। একটি ব্র্যাকেট আছে কোনাকুনি। ভিতরে একটি বাল্ব, তা জ্বালানো যায়।

৩. লাশটির, এবং কীভাবে তা ছিল তার বর্ণনা—দৃশ্যত এক ৫ ফিট লম্বা তরুণ, বয়স তিরিশের কাছাকাছি। রঙ কালো। চুল ঘন, কোঁকড়া ও কালো। চোখ কালো, পাতা বোজা ছিল। নাসারন্ধ্র ফেনায় পরিপূর্ণ। ঠোঁটের ডানদিক দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল। মাথা ডানদিকে কাত। পা দুটি সেলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে টান টান ছড়ানো, মাথা উত্তর-পশ্চিম দিকে। বাঁ হাত তার শরীরের দিকে প্রলম্বিত। ডান হাত সমকোণে শরীরের সঙ্গে অনুভূমিক ছিল। কয়েদি বনমালী কুমার (সেলের অ্যাটেনডেন্ট) এবং বিচারধীন বন্দি রাবণ মাহাত দেহটি বাঁদিকে ধরে চিত করে দেয়। দেহ শক্ত ও ঠাণ্ডা ছিল। লাশের ঘাড়ে হালকা, ছাড়া ছাড়া, কালো চিহ্ন দেখা যায়। দেখা যায় তার ডান কানের মধ্যে জমাটবাঁধা রক্ত। বনমালী কুমার ওর ট্রাউজার নামিয়ে দেয়। অণ্ডকোষগুলি অস্বাভাবিক স্ফীত/বড়। পায়ুদ্বারে মল ছিল। মৃতের পরনে ছিল হালকা

হলুদ গেঞ্জি-শার্ট, বেগুনি প্যান্ট ও একটি রঙিন জাঙ্গিয়া। ডান হাতের দিকে ছিল একটি নীল ও সাদা চৌখুপি নকশার গামছা। ইউ ডি সি মানিক অধিকারীর কাছে জানা যায়, ১৭.২.৯৮, আন্দাজ ৬.২০-তে, ১. কর্তব্যরত ওয়ার্ডার গোপাল পাণ্ডা; ২. জেল ওয়ার্ডার প্রশান্ত কর্মকার; ৩. দ্বিতীয় জেল ওয়ার্ডার আকবর আলি মোল্লার সহায়তায় ফাঁস থেকে দেহটি নামানো হয়। অন্য জেলকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সি আই ৮৪ মাধ্যমে জেলা হাসপাতাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বিনির্ণয় করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ময়না তদন্তকালে তুলসীদাস মাহাত, মৃত-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেবেন ও মৃতকে সনাক্ত করবেন।

৪. শরীরে দৃশ্যমান আঘাত বা চিহ্ন : ডান কানে জমাটবাঁধা রক্ত; হালকা ছাড়া ছাড়া কালো দাগ ঘাড়ে, অণ্ডকোষ অস্বাভাবিক বড়; নিম্ন তলপেটের বাঁদিকে একটি কালো জরুল।

৫. যদি কোনওভাবে আঘাত করা হয়ে থাকে, কীভাবে তা হল, কোন অস্ত্র দ্বারা, তা নিরূপণ...

৬. ষড়যন্ত্রের সন্দেহ হয় তেমন কিছু হয়ে থাকলে তার বর্ণনা...

৭. বর্ণনা, পরিধেয় : হালকা হলুদ গেঞ্জি-শার্ট, বেগুনি ট্রাউজার, রঙিন জাঙ্গিয়া, (নকশা কাটা) নীল-সাদা গামছা।

৮. সাক্ষীদের মত : ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হবে।

৯. পুলিশ অফিসারের মত...

১০. সাক্ষীগণের স্বাক্ষর :

স্বাঃ .... পুরুলিয়া জেলের, জেলর

.... সুপরিন্টেন্ডেন্ট, পুরুলিয়া জেল

.... মেডিকেল অফিসার, পুরুলিয়া জেল

প্রত্যয়িত	মৎ কর্তৃক প্রস্তুতীকৃত
এস পি পুরুলিয়া	ডেপুটি হাকিম; পুরুলিয়া
২০.২.৯৮	১৮.২.৯৮

সকলেরই মনে হয়, ঝটপট ময়না ও ঝটপট দাহ ব্যতীত না অন্য পন্থা। এই ঝপ করে ধরে খপ করে সেরে দেওয়ার ব্যাপারটি সহানুভূতি সহকারে বিচার্য। এই যে অত্যন্ত উদ্বেগ, তার পিছনে আছে অতি স্বাভাবিক কারণ।

যেমন :

যিনি—যে শ্রেণির যাত্রীই হোন, এ সি ১ নং বাতানুকূল; বা এ সি ২ নং বাতানুকূল, বা দ্বিতীয় শ্রেণির শয়নযান, বা সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, প্রত্যেকেই এগিয়ে চলতে চান। এই চাওয়ার শেষে আছে পেনশান, বা এক্সটেনশান, বা অবসরগ্রহণ, বা অধিক দরমাহা মেলে এমন বর্ণিল কাজে। যেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস।

চলার পথে অকারণ বাগড়া সয় না, সয় না।

এ জেলা ক্ষেত্রে আরও কি,—

মরেছে খেড়্যা/খোড়িয়া/শবর/খেড়িয়াশবর।

এরা তো চিরকালই খরচের খাতায়। জেলে পচছে কতগুলো তাই বা কে জানে। বহুকাল

ধরেই ওদের ধরে সিংভূম বা অন্যত্র জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন ভুলেও যাচ্ছে। নামগুলো মুছেও যাচ্ছে।

থানা হাজতে মরল না জেল হাজতে তা নিয়ে বেকার মাথা ঘামানো বড়জোর দু-দশক বা দেড় দশক চলছে।

এখন, বোঝা গেল এই ব্যক্তি জেলে ঢুকে মরেছে।

তা নিয়ে কত চিন্তা/সময় খরচ করা যায়?

হাজার হোক, প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ ঘর-সংসার-আড্ডা-ব্যসন ইত্যাদি আছে।

তাই ঝপ করে ময়না আগে।

পুলিশ পাহারায় দাহ সঙ্গে সঙ্গে।

অস্বস্তি এই, কেন যেন উদ্বেগ হচ্ছে।

পয়লা কাজ আগে, অথবা ফার্স্ট কাম্‌স ফার্স্ট অর্থাৎ ময়না তদন্ত।

১৮।২।৯৮-এর ময়না তদন্ত রিপোর্টে জানা যায় বুধন এক সুগঠিত দেহ সংবলিত পুরুষ। মরণ সংকোচ বা রাইগর মর্টিসে দেহ কঠিন।

দেহে ক্ষতচিহ্ন নেই।

ফাঁসের বা কাটা-ছেঁড়ার দাগ বলতে গলার ডানদিকে একটি অসমাপ্ত ফাঁসের দাগ। ফাঁসের গিঁট দেবার কোনও দাগ নেই।

পাঁজর 'হেলদি'; ফুসফুস অঞ্চলে কোনও রক্ত নেই; পাকস্থলীতে আধা-হজম খাদ্য; ক্ষুদ্র অন্ত্র সংকুচিত; বৃহদন্ত্র সঙ্কুচিত। লিভার-পিত্তথলি ও মূত্রাশয় সংকুচিত; মূত্রথলি জলীয় পদার্থশূন্য।

না, ক্ষতচিহ্ন ছিল না কোথাও, কোনও হাড় ভাঙেনি, রোগের চিহ্নও ছিল না।

আন্তরযন্ত্র বা ভিসেরা হিসেবে সংরক্ষা করা হয়:

পাকস্থলী (খাদ্যসমেত)
এক ফুট দীর্ঘ ক্ষুদ্রান্ত্র
দুটি ফুসফুসের অংশবিশেষ
হৃদযন্ত্রের অংশ
লিভারের অংশ
দুটি মূত্রাশয়

১. রক্তের নমুনা নিয়ে শবের জিম্মাদার কনস্টেবলকে দেওয়া হয়
২. উল্লেখিত পরিধেয় বস্ত্রাদি ওই ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়...
৩. সংগৃহীত ভিসেরা সিল করে, অন্যান্য কাগজের কপিসহ তাকেই...
এবং ভিসেরা সুযোগ্য কর্তৃপক্ষকে পৌঁছাবার জন্য...
সংরক্ষিত ভিসেরার রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়া অবধি মৃত্যুর কারণ বিষয়ে রিপোর্ট মুলতুবি রাখা হয়।

ময়না ও লাশ সেলাই হয়ে গেলে দেখা যায় বুধনের পেটের দিকটি সামান্য চুপসে গেছে। এরকম তো হতেই পারে। শরীর থেকে অনেক কিছুই বেরিয়ে গেছে। উত্তর মরণসংকোচ স্তরে, বা রাইগর মর্টিসের পর শরীর, শরীরের ধর্মেই শিথিল হতে থাকে।

জীবিত শরীরের ধর্ম এক। মৃত শরীরও পচ ধরে, ফুলে ওঠে, ভীষণ ভয় দেখাতে পারে। এ জন্যই বুধনকে ঝটপট জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং অ্যাজ পার রুল থানা মাধ্যমে বুধনের স্ত্রীকেও খবর দেওয়া হয়।

আঠারো তারিখের সকাল অবধি এটাই ছিল ঘটনা।

কীভাবে খবর পায়, গাড়ির ব্যবস্থা করে, তা সন্দেহের কথা।

কিন্তু নুয়াগড় ও অকড়বাইদ-শবরটোলা শামলিকে নিয়ে পৌঁছে যায়। শবরক্ষেত্রে পি ডি সি বা পুরুলিয়া জেলা কোডে কর্তৃপক্ষই শেষ কথা বলে অভ্যস্ত।

—গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যা।

শামলির ছোটখাট শরীরে, চোখে সব ভাবাবেগ সংহত, দৃষ্টি দুর্বোধ্য।

—তোমরা দেখে নাও। তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে পুলিশ পাহারায়।

সমিতির প্রশান্ত রক্ষিত অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, বুধনকে নিয়ে যাব।

এমত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন রাজপুরুষরা হয়নি কখনও। কী বলতে পারে তারা?

—না, হুকুম নেই?

—লাশ জ্বালাতে হবে?

যারা নিতে এসেছে, তাদের মুখ দেখে মনের ভাব বোঝাও যায় না। যেন ওরা কী করবে তা ঠিক করেই এসেছে। কোনও কথাতেই প্রভাবিত হবে না তারা। চেনা মুখ এখন অসম্ভব অচেনা।

—ম্যাটাডর আমরা নিয়েই এসেছি।

—আপনার হাতে তো...

—না, লাশ নেবে ওর ওয়ারিশান, শামলি। দিন, কাগজ দিন, কীসে সই দেবে!

শামলির ভুরু ছোট ও ঘন। চোখ খুব উজ্জ্বল ও স্থির। চুল কুচকুচে কালো নয়, বাদামি ঘেঁষা। ছোটখাট মানুষ। হাড়ের কাঠামো মজবুত।

শোকবিলাপে আকুল হয়ে ও আছড়ে পড়ে না। মৃতদেহ যে চাদরে জড়ানো, তাতে রক্তের ছোপ দেখেও শিউরে ওঠে না।

কর্তব্যরত পুলিশটি মাথা নাড়ে।

এত স্থির ও সংহত কেন? এখনও দেখ, ময়লা রঙিন কাপড় পরে আছে। চোয়াল শক্ত, চুল টেনে ঝুঁটি বাঁধা।

—আপনারা লাশ নিয়েই যাবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন কোথায় যেতে হবে।

—চলুন!

এটাও রাজকার্যালয় বটে।

রাজপুরুষটি জানেন, রাজধানীতে সংবাদ পৌঁছে গেছে, যে এরা লাশ জ্বালাতে দিচ্ছে না। কোনও নির্দেশ যাতে আসে, সেই প্রত্যাশায় কথায়-কথায় সময় ক্ষেপণ করেন কিছুটা।

আশা করতে দোষ নেই। আশা করেন, এমন কিছু ঘটবে, যাতে লাশটি জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে।

বড় প্রত্যাশায় তিনি ওদের দিকে তাকান।

রক্ষিতবাবু বা শামলির মুখ একইরকম থাকে। ওরা অন্যদিকে চেয়ে আছে।

এ কি ঔদ্ধত্য! শবর মরলে লাশ জ্বালানো হয়, তো পি পি সি, পুরুলিয়া পুলিশ কোড! কে কবে কাকে চ্যালেঞ্জ করেছে?

এই বুধন কে? শবররা কি? বিধবা বউগুলো? কতদিন বিধবা থাকে? বহুজনের মত এই রাজপুরুষও মনে করেন, বিধবারা বিয়ে করে, সম্পর্ক কামনা-ছেঁড়ান হয়ে গেলেও স্ত্রী-পুরুষ যাকে হোক বিয়ে করতে পারে, এগুলো শবর সমাজের নীতিবোধের অভাব। এত স্বাধীনতা?

—দাহ করলে আপত্তি কি রক্ষিতবাবু?

—আছে।

—পুলিশ স—ব করত?

—পুলিশই তো স—ব করল। কোন্‌টা বাকি রাখল, বলুন?

—খরচপত্র....

—শুনুন! আত্মীয়স্বজন মরলে আপনারা কী করেন?

—দাহ করি!

—এরা ভুপে দেয়, সমাধি দেয়। কাগজ কি দেবেন দিন!

অপমান, অপমান! কেন যেন মনে হয়, শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়াবে। কাগজ লিখে দিয়ে দেন।

—সঙ্গে পুলিশ...

—কোন্ আইনে? দেখুন, বেআইনে কথা বলবেন না।

বুধনের বউ এই লাশ নিয়ে যাচ্ছে! আমাকে আপনি চেনেন। আমি টাউনের ছেলে, খবরটবর রাখি, চল শামলি!

প্রথম ফাল্গুনের বাতাস রুক্ষ, তাতে শীত থাকে। প্রথম ফাল্গুনের রোদ তত প্রখর নয়। ম্যাটাডরে চেপে দেখ, বুধন ঘর যায়। শামলি ওর হাত পা ছুঁতে পারে না। বড় হিমশীতল গো! ওর মন বলে চলে, মেরেছিল, খুব মেরেছিল। খু—ব...

স্থির বসে থাকে ও। আত্মসংযমে, ধৈর্যে, কোন বা প্রতিজ্ঞায় অটল। ক্রমে গ্রাম কাছে আসে। মেয়েদের সম্মিলিত বিলাপ হাহাকার বাতাসে ভাসে। শবর নিহত হওয়া কোনও বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু বুধন যেন ক্রমেই 'বিশেষ' হয়ে উঠছে। শবরদের এক করে দিচ্ছে।

বুধনের বিশাল হয়ে ওঠার এটাই সূচনাপর্ব।

দশ

সৎকার্য নামাবলী

প্রথম পর্ব

সৎকার্যের কত না নিয়ম! কিন্তু চেরাফাঁড়া লাশের পেট ও বুক যেমন-তেমন করে সেলাই করা। দেখে শামলি ও অন্য মেয়েরা 'আঁক' শব্দে নিশ্বাস টানে ও পুরুষদের দিকে তাকায়।

এখন সকল কাজই পুরুষদের। ফাটল রেখাঙ্কিত দেওয়াল ও খোড়ো চালের ঘরটির সামনে মাটিতে বুধনকে শোয়ায় ওরা। বৃদ্ধ ও প্রবীণ অর্জুন শবর চোখ না তুলে বলে, সরে যা, পরে দেখবি।

বুধনের বাবা-মা, শামলি, ওদের তিন সন্তান সামান্যই সরে। কানি ভিজিয়ে পুরুষরা বুধনের শরীর থেকে রক্তের দলা, কানের রক্ত দ্রুত মোছে। মুখ, কপাল মোছে, মাথাতেও চেরাই। অস্ফুটে কে বলে, মাথায় মেরেছিল।

কেন যেন সঞ্চরমাণ হাতগুলির মনে হয়, জলদি করতে হবে, সময় নেই। বুধনের নিষ্পন্দ হাত জানাচ্ছে, জলদি করতে হবে, সময় নেই। ভাই-ভায়াদ যারা আছে, তারা আছে, এখন কোথাও খবর দেওয়ার সময় নয়।

জেল হাজতে মৃত্যু, জেল হাজতে!

—শিয়রে ঘরের মাটি, তুলোসী মাটি রাখ্।

—খই ছিটা! খই ছিটা!

ঠক্ ঠক্, খট খট শব্দ।

শামলি অস্ফুটে বলে, মাচান বাঁধবে। বাঁশ কাটছে। বুধনের ছেলেমেয়ে চেয়ে থাকে। শবর ঘরে শিশুরা শিশু থাকে না। স্থির ও নিশ্চল ওরা দেখে। শেখে। শবরশিশুদের এমনি করেই শিখতে হয়।

আঘাতের বিস্ময়ে শামলি এর মুখ, তার মুখের দিকে তাকায়। এমন হওয়ার কি কথা ছিল?

ক'বছরের বা জীবন? শামলি আর বুধন, আর ছেলেমেয়ে, এই তো পরিবার! বুধনের বাবা মা নাতাক, নাতুড়ক দেখল, শামলি যদি দেখে, একা দেখবে? বুধনকে থানায় বা নিল কে? যদি অপরাধ করে থাকে, আদালতে তুলে জেলে বা পাঠাল না কেন?

তুলসীতলায় ওকে নিয়ে শোয়াতে হয় না। গাছটি তো ঘরের কোলে এখানে। মাচান এনে পাতে ওরা, চাটাই বিছায়। বুধনকে সন্তর্পণে তুলে শোয়ায়। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি শামলির কাপড়ে ঢাকা। কাপড় সরিয়ে দেয় কেউ। অর্জুনের চোখ নির্দেশ দেয়।

তেল-হলুদ আনে কেউ। সবাই বুকেব একপাশে, যে পাশটি চেরা-ফাঁড়া নয়, সেখানে তেল-হলুদ ছোঁয়ায়। শামলিও আঙুল রাখে কি?

কি দ্রুত কাজ হয়। কয়টি ফুল ও পাতা মুড়িয়ে ফুল বানিয়ে গাঁথা মালা নিয়ে আসে ধনি। বুকেই মালা রাখা হয়।

—জল দে!

বুধনের বাপ নাতিকে নিয়ে আসে।

শিশুপুত্র বাপের ঠোঁটে একবিন্দু জল দেয়। আর কে দেবে? কে?

মটর সাইকেলের ভট ভট আওয়াজ। রক্ষিতবাবু। অর্জুনকে ডেকে কী যেন বলে। অর্জুন মাথা নাড়ে। চটের বস্তা মটর সাইকেলের পিছনে বাঁধা ছিল। অর্জুন সেটি নেয় ও বলে, উঠা!

হ্যাঁ, তেরাস্তার মোড়ে দেহ নামাও। তিনবার সজোরে হরিধ্বনি দাও।

অর্জুনকে বলতে হয় না কিছু। কাঁথা পেতে বুধনকে শুইয়ে ওকে ঢেকে দেওয়া হয় বস্তা দিয়ে। এমতভাবে কেন নিয়ম ভাঙা হয়, কেউ শুধায় না। কোনও কথা হচ্ছে না, অথচ সবাই জেনে যাচ্ছে 'কেন'-র উত্তর। ঘরের মাটি, ঘর-তুলসীর মাটি, পয়সা, খই, সকল পাথেয়ই দেওয়া হয়। না, কাঁটাঝোপ বিছানো হয় না। কন্টকপ্রহরীর প্রতীক একটি শিয়ালকাঁটার গাছ বস্তার ওপর রাখা হয়।

দাও, মাটি দাও সবাই। কোদাল কোদাল মাটি দাও। বুধন, তোমার ঘরদেবতা তুমি নিছে যাচ্ছ। সে তোমার বুকে থাকত, এখন সঙ্গে যাচ্ছে।

এবার মাটি চেপে বসিয়ে দাও। বুধনের বেটা একখণ্ড পাথর দেয়।

কেউ গভীর সমমর্মিতায় বালকটিকে বলে, মাটি বসে যাক। পরে বড় পাথর দিস।

সবাই নিস্তব্ধ। মহাদেব, নিরঞ্জন, কোদালের বাটে ভর দিয়ে নিশ্চল।

আশ্চর্য, আশ্চর্য বিষণ্ণতা।

অর্জুন বলে, কেউ পিছনে দেখবি না।

অন্ধকার নেমে এসেছে। ওরা তেরাস্তার মোড়ে এসে তিনবার হরিধ্বনি দেয়। মাচানটি রেখে এসেছে। ওদের একমাত্র বাঁধে এসে সকলেই স্নান করে একে একে।

এখন যেন সবাই জানছে, খুব দ্রুত করতে হবে সব, বুধন সময় দেবে না।

মৃতের ঘরের সামনে ভাঙা পাতিল, ভেলা ফলের আগুন জ্বলছে ধুঁইয়ে। হাতে তাপ নাও, বুকে ছোঁয়াও। আগুন ডিঙিয়ে যাও। আজ বুধনের ঘরে ভিজা কাপড় চিপে জল ঝরাও। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শামলির হাত থেকে দু-চার দানা চাল সবাই নেয় ও চিবোয়।

আজ রাতে বুধনের ঘরে সারারাত তুষ ও ভেলা ফলের আগুন জ্বলবে। শামলি অনে—ক, অনে—কক্ষণ চেয়ে থাকবে মাটির পাতিল থেকে ওঠা ধোঁয়ার দিকে।

মানুষ চলে যায়, কত না রীতকানুন রেখে যায় জীবিতের জন্য। তিনদিনের দিন যা করণীয়, বারোদিনের দিন যা করণীয়। স—ব করতে হবে বুধনের জন্য?

স—ব?

ওর মন বলে, না—না—না।

ওর মন আপনা থেকে বলে?

না বুধন বলায়?

দ্বিতীয় পর্ব

সৎকার্য নামাবলীর দ্বিতীয় পর্বের কথা বড়ই জটিল এবং থানা কর্তৃক সংঘটিত। যদিও থানা তা পরে জেনেছে।

কেন না, আঠারো তারিখ শবরসমাজরীতি অনুসরণে বুধন সমাহিত এ ঘটনা পুলিসকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে।

স্তম্ভিত প্রধান পুরুষ বলে, বুধন শবর কে?

সুমিতি কেন বা লাফায়, কলকাতার বা টনক নড়ে কেন? তুপে দিক, জ্বালাই দিক, আমাদের কি?

অসম্ভব আর টি ও মেসেজ, এস টি ডি এবং ছোটাছুটি চলতে থাকে।

—বুধনকে মাটিতুপা করতে দিলে কেন?

—সার! ওরা জ্বালায় না।

—কী করে জানলে?

—ওরাই বলল সার!

—লাশ চাইল আর...

—ফেমিলি এসেছিল...

—হ্যান ওভার করে দিলে?

—তাই তো নিয়ম সার!

—ওর বৌ এসেছিল?

—হ্যাঁ সার! রক্ষিতবাবু এনেছিল।

প্রশ্নকর্তা ঘেমে যান। কারাবিভাগকে বাঁচাবেন, না, জেলারকে, না বিরাবাজার লকাপকে?

জেলার পুলিশ, জেলের পুলিশ, বিরাবাজারের পুলিশ, এদের মধ্যে ত্রিভুজ বিতণ্ডা চলতে থাকে।

—কী করে লাশ দিল?

—রক্ষিতবাবু এসেছিল...

প্রধান পুরুষ বলে, আমি জ্যান্ত লোকটাকে পাঠালাম। জেলে পৌঁছে সে কীভাবে...আমি বুঝতে পারছি না।

সত্যিই সে বুঝতে পারে না। কোনওদিন কিছু হল না, এবারে কী হল?

তাঁর পৃষ্ঠপোষক বলেই দেন, বেকার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। গুরু মহারাজও বলে গেলেন, তোমার সুসময় চলছে!

—কেস হবে না তো?

—করবে কে, শুনি? লোকটার বউ?

—মানে...লাশটা তো রয়ে গেছে!

—থাক না।

কিন্তু আবার বহুত ফোনাফুনির পর সিদ্ধান্ত হয়, 'সৎকার্য' শব্দটির আরেক অর্থ ভাল কাজও বটে। পি পি সি মতে 'সৎকার' ও 'সৎকার্য' সমার্থক। কিন্তু এখন 'সৎকার্য' বলতে সেই কাজ বুঝতে হবে যা পুলিসের পক্ষে ভাল, আখেরে সুফলদায়ী।

অর্থাৎ লাশটি জ্বালাতে হবে।

হায়! আমোদপুরে শবর বউয়ের লাশ স্বাধিকারে জ্বালানো গিয়েছিল। জেল বা বুধনের গ্রাম তো প্রধান পুরুষের এক্তিয়ারভুক্ত নয়!

গৌণ পুরুষটিকে খুব চিন্তাকুল দেখায়।

—তোমার আবার কী হল?

—ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—দশ তারিখ বুধনকে আনলাম...

—দশ? লেখা আছে এগারো...

—আজ হল উনিশ!

—তাতে কী হল?

—না...কিছু না!

—তুমি নাকি চাকরি খুঁজছ?

—চাকরি কোথায়!

—কাল হাটবার। মদের ঠেকগুলো রেইড করো। প্রসাদ গিরিকে টাইট দিতে হবে, মনে রেখো।

—আপনি কি বেরোচ্ছেন?

—সদরে যাচ্ছি।

গৌণ রাজপুরুষটি স্বস্তি পায়। এখন, বত্রিশে পৌঁছে, কেন যেন তার মনে হচ্ছে, তার অন্য কাজ খোঁজা ভাল। কোথাও অস্বস্তি হচ্ছে। অন্য কোথাও, অন্য কোনও কাজ! আশ্চর্য, তার বস্ কিন্তু শবরটোলায় রুটিন-রেইড করতে বলল না।

সদরে কি কাজে গেল?

সদরে যাওয়াটা ফালতু হয়ে গেল। প্রধান পুরুষ জানলেন, তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেই পুলিশকে সক্রিয় হতে বলা হয়েছে।

—কোন্ পুলিশ সার?

—আপনার থানা নয়।

—কিন্তু...

—আপনি যা করবার তা করেছেন! অনাবশ্যক লকাপে রাখা, আদালতে মোটে তুললেন না...যান, গো ব্যাক। চব্বিশ ঘন্টা অ্যালার্ট থাকবেন। যে কোনও সময়ে দরকার হতে পারে। আর শবর বিষয়ে সাবধান থাকবেন।

—হ্যাঁ সার।

—টাউনে সময় কাটাবেন না।

—হ্যাঁ সার।

—ব্যাড...ভেরি ব্যাড। আপনার জন্য...যান!

ফুঁসতে ফুঁসতে প্রধানপুরুষ ফেরে। 'ব্যাড?' বক্তা কি জানেন না, কাকে 'ব্যাড' বললেন? তার খুঁটির জোর কত শক্ত? যাক, ড্রাইভারকে বললেন, 'চোরের সাতদিন তো সাধুর একদিন।' জানলে?

—হ্যাঁ সার।

প্রধানপুরুষের সদরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ এত দ্রুত হয়েছে, যে ড্রাইভার বোঝে আজ সারের মেজাজ খারাপ থাকবে। সে বহুদিন এই জিপ চালাচ্ছে, পুরনো লোকও বটে। সাব তাকে নিয়েই হেথাসেথা ঘোরে। সে বলে, ধর্মের দিন নেই সার। মানুষ উল্টা বোঝে।

—পানের দোকানে দাঁড় করিও তো।

বেটা পান খেতে গিয়েছিল! প্রধানপুরুষের সহসা আনন্দ হয়। সব ওকে দিয়ে কবুল করানো গেছে। কিন্তু যাদের নাম করল, তাদের কি ধরা যাবে?

মন বলে, যাবে! যাবে!

আর বুধনের গ্রামে পুলিশ নেমে যায়। খুব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুলিশ। পুলিশের ইজ্জত পুলিশ রাখবে। মৃত বুধন, জীবিত বুধনের চেয়েও ক্ষতিকর। যেভাবে পারো, ওর লাশ জ্বালাবার ব্যবস্থা করো।

টাকা নিতে বলো।

গোপনতা রাখো।

টাকা নিতে বলো।

গ্রামের বাইরে যেন কেউ না জানে।

এ কাজ না করলে শামলি...

বুধনের লাশ যেমন পুলিশকে সঙ্কল্পবদ্ধ করে, সে লাশ জ্বালাবার প্রস্তাবও শবরদের একসূত্রে গেঁথে দেয়।

বুধনের মা বলে, ভালো রে ভালো! আমার সমাজে নিয়ম নাই? তিনদিন বাদে গাঙ্গুইদের ...তিতাভাত দিতে হবে না?

—জ্বালিয়ে দিলে ভালো করতি!

গ্রামবাসীরা ভিড় করে আসে, পুলিশের কথা শোনে ও যে-যার কাজে যায়।

ধনি তেতে ওঠে ও বলে, মরদরা কি বলবে?

আমরা বলছি। পাঁচজন আসবে, মাগন করে ঘাট হবে!

—ঘাট! ঘাট হয় দাহ করলে। তুপে দিলে ঘাট হয়? বামুন আসে? নাপিত আসে?

—বামুন নাই, নাপিত নাই। যা করবে, আমাদের 'লায়া', নাপিত, স—ব শবর! কিন্তু ঘাট আছে।

থানা পুলিশ বলে, মোরগা কাটবে, রক্ত ছিটাবে, তার নাম ঘাট! তোরা জাত বটিস!

—যার যা রীতকানুন!

—আজ বিশ তারিখ! জ্বালিয়ে দিলে ভালো করতিস। নজর রাখব আমরা।

—রেখো!

—বিকালে আসব।

বিকালে আসলে পরে জাদুবলে কি আশ্বাসদায়ী হৃদ পরিবর্তন শবরদের!

—কথা শুনলে তোরাদের ভাল হত।

অর্জুন শবর, যেন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। বলে, শবর কি বুঝে কীসে তার ভালো! জ্বলিয়ে দেব আমরা।

—এখনি উঠাবি লাশ?

অর্জুন আকাশ পানে চেয়ে যেন সূর্যকে সাক্ষী মানে। বলে, সাপের লেজে পা দিয়ে তো ঘুমানো যায় না। তোমাদের কথা না মানলে...তবে লক্ষণ-অলক্ষণ আছে! বিচার করে যত জল্‌দি হয়...

—বাঁচালি অর্জুন!

—আমাদের কোনও কাজে আন জাতি থাকে না। তোমরা থাকলে...

সহসা এই স্থানীয় গৌণ পুরুষের মনে অহেতুক, অযৌক্তিক ভয় হয়। এই শবর গ্রাম, অর্জুন শবরের দীর্ঘকায় দেহ, ঈষৎ সামনে ঝোলা দুই কাঁধ, অর্জুন সম্পর্কে শোনা নানা কাহিনি, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে অবছা আঁধার নেমে আসা, শবরদের চেহারা ও চাহনি, যা গলে গিয়ে মিলে যাচ্ছে অন্ধকারে, ও ভয় পায়।

থানা, জিপে গেলে দূরে নয় বটে, কাছেও তো নয়। দশ কিমি পথ। ভয় হয় এই প্রান্তর, দূরে কয়েকটি গাছ, শবর কুটিরগুলি, সব কিছুকে।

বাতাসে বিদ্যুৎ খেলছে যেন।

—কাল সকালে। আমরা দূরে থাকব।

অর্জুন ঘাড় হেলায়। যাবার কালে নিকটতম গ্রামগুলিতে নামার কথা আছে। কিন্তু জিপ কোথাও দাঁড়ায় না।

রাত নামতে না নামতে গ্রাম কি কর্মচঞ্চলতা না জাগে। বুধনদেরই একটি হেলে পড়া ঘর, যেখানে খড় থাকে গাদা করা, সেখানে মেয়েরা খড় নামায়, মেঝেতে কোদাল চালায় ধোঁয়াটে লণ্ঠন নিয়ে।

শবরদের চোখ রাতেও দেখতে সক্ষম। বহুযুগ ধরে তারার আলোই ওদের একমাত্র সহায় থেকেছে। আজ বুধন ওদের কি মনে করিয়ে দেয়। একশ বছর আগেকার না-জানা দিনের অভ্যাস ও স্মৃতি?

সমাধি থেকে মাটি তুলে ফেলে, ওই চটের বস্তায় পুরে বুধনকে ওরা এনে ফেলে মেয়েদের কাটা নাতিগভীর সমাধিতে। তারপর খড় চাপায়, খড় চাপায়।

অর্জুন বলে, গন্ধ উঠে গেছে।

—ফুলে বড় হয়েছে কত!

—হবে, ফুলছে তো! পেট ফুলে আগে।

দ্রুত একটি খড়ের মানুষ বানানো হয়। আনা হয় কাঠ। মাচানে শায়িত কড়ের বুধনকে ওরা তোলে। নিশ্বাস নেয়।

পুলিশ ও প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করবার কাজ পেয়ে শবরদের মনে যেন অলৌকিক উদ্দীপনা জাগে। ওরা বলে, বুধন হতে কত শিখা হল।

অর্জুন বলে, আমাদের সে দিন নাই আর। এখন সকলই ওদের কৌশলে চলে।

স্বভাবে দেলখোশ এবং কাঠবিড়ালি, খরগোশদের মত সুকৌশলী আত্মরক্ষা-রণনীতিতে বিশ্বাসী মহাদেব বলে, উরাদের বাণে আমাদের বাণে লড়াই। দেখা যাবে। মহাদেব কোথাও টিভিতে 'মহাভারত' খানিক দেখেছে।

—এখন বুধনটি সম্বল। ওরে সামুলে রাখতে হবে।

—রাখব! চল্ তেমাথা। পাঁচটা গ্রামের রাতের ঘুম কেড়ে নিব হে হরিধ্বনিতে।

ওরা বুধনকে কাঁধ দেয় এবং অতীতে, যেমন সগর্জন হাঁকুড় মেরে বাঘিনিকে একটা অকাল প্রসবে বাধ্য করত, তেমন গর্জনে হরিধ্বনি দেয় সকল মরদ।

বল হরি! হরি বো-ও-ও-ল!

হরি হরি! বল হরি হরি!

কে যায়? বুধন যায়!

হরিধ্বনি সঙ্গে যায়!

কে যায়? বুধন যায়! বুধন শবর যায়।

এই হরিধ্বনি ওরা আকাশপানে মুখ তুলে বাতাসে ছুঁড়ে দেয় বারবার। একাগ্র ও জ্বালামুখী তীর হয়ে হরিধ্বনি অন্ধকারকে বিদ্ধ করে, টার্গেটকে। শবরটোলার চেয়ে অনেক দূরে অ-শবর গ্রামগুলির নিদ্রা ভেঙে যায়। তারা আতঙ্কিত, স্তব্ধ। এমন হরিধ্বনি তারা কখনও শোনেনি।

ওরা বেরিয়ে এসে শবরটোলার দিকে চেয়ে থাকে। আকুলি-পস্তা গাবু পরামাণিককে বলে,

আঁধারে তীর চালাতে পারে ওরা। বাপ্ রে।

—চুপ যাও!

—এমন হরিধ্বনি শুনি নাই।

অচিরে বোঝে ওরা, এমন চিতাগ্নিও ওরা দেখেনি। কত দূরে, তবু আগুনের শিখা দেখা যায়। ললকাচ্ছে।

—বুধনকে জ্বালিয়ে দিল তবে!

—দিল! না দিলে...

শবররা কাঁটাঝোপ, ভেলাঝোপ, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি যা পেয়েছে, কেটে আনছিল। বড় আনন্দে জ্বলছিল আগুন, আকাশপানে লাফিয়ে উঠছিল। অনেক, অনেকক্ষণ জ্বলে চিতা।

অর্জুন বলে, বুধনরে পাহারা দিতে হবে।

—আগুন নিভুক, জল ঢালি।

—ঢেলে দে দু-এক কলস। এখন টুকু-টুকু...

—হাঁড়িয়া না খেলে বুধা রে...!

—কোথায় বুধা!

—পুয়াল ওমে ঘুমাচ্ছে। বুঝবে।

সকালে শবরটোলার দিকে ধাবমান, উদ্বিগ্ন জিপটিকে দাঁড়াতেই হয় গ্রামের মুখে। এমন জায়গায় পনেরো-বিশ জনের ভিড় সন্দেহজনক।

—কী ব্যাপার বটে?

—বাপ্ রে কাণ্ড! পুলিশের গুঁতো বলে কথা!

—কেন, কী হল?

—পণ্ডাকে শুধান।

আকুলি এগিয়ে আসে। সবিস্তারে বলে গত রাতে ঘন ঘন 'হরিবোল'-কথা, চিতানলের হিংস্র তেজের কথা।

অফিসারের মাথা থেকে বোঝা নেমে যায়।

—আজ গিয়েছিলেন কেউ?

—কে যাবে? কে যায় শবরটোলা? সব বেহোঁশ ঘুমাচ্ছে।

অফিসার তবুও শবরটোলায় ঢোকেন। ওঃ, নানাজনের অবদানে নির্মিত এক একতলা পাকা বাড়ি! তাও এক শবরের নামে!

সেখানেই ঘুমাচ্ছিল কয়েকজন। অর্জুন শবর সম্ভবত প্রাত্যহিক কাজটি বাঁধের ধারে সেরে ফিরছিল, কাঁধে গামছা।

—অর্জুন!

—বলেন বাবু!

—বুধনকে দাহই করলে?

অর্জুন নিশ্বাস ফেলে ও বলে, না করে উপায় কি বা ছিল? পুলিশ যখন যা বলে, করতে হবে। এখন কাজ রইল অনেক। দাহ করলে ঘাটকাজ করে, তা ওদের লায়া বলবে। অর্জুন

যখন প্রবীণ, ওকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

—ভালো করেছ। আসব আবার। কাজকর্মে টাকা দরকার তো থানায় যেও।

অর্জুন হাত চিত করে বিভ্রান্তিতে। বুধন্ তো সময়ে গেল না, অসময়ে গেল। বুড়া মানুষের কাজ নয়। শবর সমাজে সব কাজই 'মাগন' করে হয়। তেমনই হবে। বুধন না হয় সহদেবের ছেলে, শামলির স্বামী, তিন সন্তানের বাপ। কিন্তু সে তো সমাজেরই লোক।

—তোমাদের কি একে মরলে সবার অশুচ লাগে?

আমাদের হয়। বুধনের বেলা সমাজ তো জড়িয়ে গেল, তাই না? হল, সবাই হাত লাগল, কাঁধ দিল। এখন যা করবে...

—আহা! সাহায্য করতেই তো চাইছি! ওর স্ত্রী...

—বলব তাকে! এখনও সে...

অর্জুন থেমে যায়। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যেন বাতাসকে বলে, জ্বালাবার নির্দেশ ছিল, জ্বালানো হয়েছে। এরপর কিরিয়াকরম ইত্যাদির ব্যাপার আছে।

—হ্যাঁ, সে চিন্তাও তো...

অর্জুন তাকায়। যেন বোঝে না অফিসারের ভাষা। তারপর যা বলে, তার সারমর্ম, শবর চিন্তা করে কী করবে! যা করতে হবে, তা করতে হবে, এইমাত্র!

অফিসার বেশ থতমত খেয়ে যান।

—আচ্ছা! চলি!

জিপের গতির ফলে হাওয়ার ঝাপটা। অফিসারের মাথায় ধাঁধা। এ এক নতুন আবিষ্কার বটে! শবর চিন্তা করে না। চিন্তা করে না কেন? ব্রেন থাকলে চিন্তা থাকবে। এ কি কথা?

বুধনের সৎকার্যনামার দ্বিতীয় পর্বটি এতাবৎ অলিখিত ছিল. এ প্রসঙ্গে কথাও ওঠেনি।

—বুধন শবরের দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে,—এ খবর দ্রুত চাউর হয়। রাজপুরুষগণ 'ভিত্তিহীন আশাবাদিতা',অর্থাৎ 'ইউফোরিয়া' দ্বারা আক্রান্ত হন। সোয়াস্তি মেলে। স্নায়ুর ওপর চাপ কমে। একেক জনের একেকরকম অভিব্যক্তি! যেমন :

—বোম্ কালী! জানতাম এমনটা হতেই হবে!

—বাঁচা গেল! তখন যেমন ক্ষেপে উঠেছিল...আরে! টাউনে দাহ করতে দিলে...

—টাকাও নেয়নি!

—আর নেয়? শবরের মাথায় কাজের কথা ঢোকাতে চাও, পুলিশ পাঠাও!

—যাক গে! এখন ওরা পুলিশকে 'ফুলিশ' বলুক, সাপ-ব্যাঙ—যাই বলুক, এসে যায় না কিছু।

উর্দিতে 'ভি' চিহ্ন সাঁটা জমাদারও ইশোয়ারকে বলে, যাক গে! জ্বালিয়ে দিয়েছে বেটাকে!

একা ইশোয়ার আজ রাতে শুনতে পায় খি খি —খিক্ খিক্—হ্যা হ্যা ইত্যাদি নানা জাতের, নানা স্বরগ্রামের হাসি।

ও মাথা ও কান চাপা দিয়ে পড়ে থাকে। এ যে কি ভোগান্তি ওর! মর্গের মেঝে ছাড়া ঘুম হবে না। চুল্লু যতই খাও, প্রেতভয় ওর সঙ্গে থাকবে। মনকে সান্ত্বনা দেয়, জ্বলে গেল তো ভালোই হল।

কিন্তু ও স্পষ্ট শোনে মাথার গভীরে, তুপে না দিলে ডম! শবরের কার্যটি হয় না।

ইশোয়ার তার স্পনসর নগ্‌দি ডম, মহাবীরজী, কামিখ্যা কালী, সকলের সুরক্ষা চায়।

ও স্পষ্ট বোঝে, বয়াম থেকে বুধনের আঁতনাড়ি ওকে বলছে, নাই দিলি ভালো করে সিঁয়াই করি। সাফসুতরাও করিস না।

ইশোয়ারের নিঃস্বর প্রশ্ন, দাহের পরেও তুই?...

ক্রুদ্ধ উত্তর, আঁত আছে তো আমিও আছি।

ইশোয়ার ঘড়ির প্রহর গনে। বারোটার পর ঘড়ির কাটা একটু হেলবে ডানদিকে, সে সময়টুকু যেন অনন্তকাল।

ও নিশ্চল পড়ে থাকে। আঁতটি জ্বালাতে দিলে বুধন নিঃশেষে শেষ হত।

—এ কি করল কোম্পানি?

সৎকার্য :
তৃতীয় পর্ব

সৎকার্য তৃতীয় পর্বের সূচনা হয় অবশ্যই। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের যৌক্তিক সমাধানের সঙ্গে তা জড়িত থাকে।

একুশে সকালে অর্জুন ও অফিসারের সাক্ষাৎ। বুধন নিঃশেষে দগ্ধ এবং তার চিহ্ন বলতে কিছু ছাই, এ সংবাদে জেলায় রাজপুরুষদের মনে শান্তি ও আশ্বাসের করুণাধারা আনে. ওঁদের তিতিবিরক্ত চিত্ত শান্ত করে।

এবং বুধনের গ্রামে চব্বিশ ঘন্টা পুলিস ছাউনি বসাবার গুপ্ত বাসনা আপাতত পরিত্যাগ করা হয়।

কিন্তু পুয়াল গাদা, বা খড়ের গাদার নিচ থেকে বস্তাবন্দি বুধন নিজ অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল।

ফ্যাকাসে মুখে মেয়েরা অর্জুনকে বলে, বাস উঠে গেল যে!

নাক চাপা দিলেও বাস!

গোপনতা রক্ষা করাই চরম গুরুত্বের।

—বেড়া ডুবা তক...?

সবাই এ-ওর দিকে চায়। রক্ষিত বা আসে না কেন?

দিনে দিনে একুশ তারিখ আজ।

শামলি মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে।

তারপর শামলি হনহনিয়ে ওদের যে কম্যুনিটি ঘর, যার বাঁদিকে প্রশস্ত মাঠ, তাই দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়।

উদ্বিগ্ন ধনি ও সুখদা দৌড়ে আসে।

—কী হল?

শামলি দ্রুত বলে যায় নিচু গলায়, ওরা মাথা নাড়ে, সম্মতি জানায়। এ ছিল এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ওদের। পুলিশকে ধোঁকা দিতেই হবে। শামলির বুধন এখন সকলের বুধন।

কেন দিতে হবে?

পরে রক্ষিতরা বোঝে, শবর মেয়েরা যেমন সহজে যুগযুগান্ত ধরে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়, স্বাধিকারে সম্মান আদায় করে, তেমন সহজেই এই ভয়ংকর সিদ্ধান্তটি নিল। এখন তারা করে আসছে বহুযুগ ধরে। স্বামী কাঠ কেটে আনলে বিকতে যায় স্ত্রী।

বউ যদি ঘরে থাকে, শবরকে ধরতে এলে পুলিস কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। লোহার ছড়, তীর নিয়ে তেড়ে আসে।

মেয়েরা ছেলেমেয়ে স্বামীদের ওপর ফেলে রেখে চলে আসে মেলায়, সাত-দশ দিন থেকে যায়। অপার স্বাধীনতা।

এটা ওদের সমাজে বহুদিন ধরে স্বীকৃত।

যত সহজে ওরা জল টেনে আনে, রান্না করে, ইঁদুর ধান কুড়োয়, তেমন সহজেই এ দুরূহ কাজটি করে ফেলবে। সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেওয়ার পর ওরা ফিরে আসে।

পুরুষরা চোখ একাগ্র করে দেখছিল। ধনি আগে আগে আসছে। শামলির ঠোঁটেও যেন স্বস্তির বেশ।

—বুঝছি।

ধনি বলে, কি বুঝলি অর্জুন দাদা?

—তোরাই...তা আমরা কি কিছুই জানব না?

—জানবি, রাতে।

প্রশান্ত রক্ষিত বলে, থ্যামন কিছু পেয়েছিস?

ধনি বলে, উঁ উঁ উঁ উঁ...

সুখদা তার লম্বা চুল ঝামরে বলে, কাল বলব।

শামলির দিকে ওরা ঘন ঘন চায়।

অর্জুন, সহদেব, ধনির বর, বড় কালীপদ, ওরা নিজেরা বলে, ধনি যখন বোবা হয়ে আঁ উঁ করে, তখন জানবে, ওর মাথায় বুদ্ধি খেলছে।

ধনি বলে, উঁ উঁ উঁ।

পুরুষরাও বিদ্যুৎ তরঙ্গে চেগে ওঠে। অর্জুন বলে, কোথায় শামলি?

—দেখতে পাবি।

—আমাকে বলবি না?

—না রক্ষিতবাবু! এ কামটুক আমরা করি।

—থানার বড়বাবু খুব খুশি!

—আর বিরাবাজারে তিনি?

—হয়ত হাটে মোরগা আনতে পাঠিয়েছে। বুধনের দাহ হয়েছে, ওরই তো মজা। ওর ঘাড়ের উপরেই তো খাঁড়া নাচছিল!

অর্জুন নিচু গলায় বলে, শুধা নাচে? নামে না একবার?

—না অর্জুন, না!

সবার চেয়ে তরুণ তিলা শবর বলে, একদিন আমি নামাব।

—তা বাদে?

—পলাই দিব। ফুলের গাঁয়ে যাব।

সুখদা বলে, তোর ফুল এখন জেহেলে।

রক্ষিত বলে, না, জামিন হয়েছে।

—এমন সময়ে আমারদের দিদি নাই!

—দিদি তো থাকে সাত সমুদ্রের ওপারে। সে আম্‌রিকা।

—দেখত! মেয়েদের কাজ দেখলে তার বুকে...

রক্ষিত বলে, আটটা ব্লকে যত শবর আছে তারা চেয়ে আছে হে! তারা দেখছে।

বড় কালীপদ বলে, হাঁ, চাইতে পারে। শবররা রক্ষিতবাবু! অনে—ক কাল চেয়ে আছে, একবার চাকা নড়লে হয়! আর ওই বড়বাবুটারে...

—ভাবিস না কালীপদদাদা! হাঁ দেখ, তোরাও কাজ করবি তো ক'জন! আর সব পাহারা দিক।

—এ একটা খেলা তো, বল? আগে শিকার খেলত, পরে শবর শিকার করে। করে করে বাড়ি, হাস্কিং মেশিন, ইটভাটা, কি বানায় নাই?

—তোমরা ওরাদের কথায় লাচ কেন বাপ?

—উটেই দোষ গো! শবর দু'বার চিন্তা করে না। আর! রক্ষিতবাবু! আর তো করারও নাই কিছু! ওই ধর ডাং, কর ডাকাতি! কর চুরি!

—সাঁঝে আসব তবে?

—সে তুই জানবি।

আজ সন্ধ্যা বড় বন্ধু হয়ে আসে। যেন সামান্য মেঘলা ভাব। যেন অন্ধকার আজ শবরদের বন্ধু।

—বুধন আমাদের!

বলে কোদাল নিয়ে চলে বুদনি, ধনি, বৈশাখী, সুখদা, বাসন্তী, জনকা, হিমানী, শামলি।

শামলির ঘরের মেঝে কোপাতে থাকে ওরা। দুটো কোদাল, দু'দিকে দুজন, কি কাড়াকাড়ি ওদের, আমায় দে! আমি একবার মাটি কোপাই!

চৌকো নাতিগভীর গর্ত কেটে মাটির পাশে জড়ো করে। একসময়ে শামলি বলে, থাক!

পুরুষরা খড়ের গাদা নামিয়েছে। বস্তাবন্দী বুধন কী স্ফীত, কত অতিকায়।

শবর মেয়ে-পুরুষ হিঁচকে তোলে বুধনকে। শামলি বোঝে, বুধন ঘরে এল।

স্বগৃহে বুধন, যদিও তাকে দেখা যায় না। সুখদা অস্ফুটে বলে, বস্তা নাই থাকবে। কেটে যাচ্ছে।

কাঠের তক্তা দাও। মাটি ফেলো, ফেলো মাটি। সমান করে দাও। হাতে হাতে চাপো। দেখো, মেঝে যেন সমান সমান হয়।

শামলি বলে, গন্ধ নাই!

ও বসে পড়ে। গন্ধ আছে তো আছে। নাই তো নাই।

বুধন নিরাপদে আছে, এটাই বড় কথা।

বাইরে আকাশের নিচে শবররা দাঁড়িয়ে থাকে। অর্জুন, রক্ষিত সিংদেও, আর জলধর শবরকে শুধায়, এখন এলি?

—না অর্জুনদা। স—ব দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে।

সহদেব এগিয়ে আসে।

সহদেব ও অর্জুন।

রক্ষিতের মনে হয়, তরল অন্ধকার দেখতে দিচ্ছে না ওদের বয়স্ক চেহারা, জীর্ণ বস্ত্র, সময় ওদের যা পরিয়েছে।

এই সহদেব একদিন, ছাপ্পান্ন বছর আগে, ষোলো বছরের ছেলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অন্য শবরদের সঙ্গে মদের ভাটি জ্বালিয়েছে, মানবাজার থানা আক্রমণ করেছে, জেল খেটেছে।

এ এক অদ্ভুত মানবগোষ্ঠী। পেনশন পাক বা না পাক, সংগ্রাম যে করেছিল, তা মনে রাখে।

—সহদেবদা!

—তোরা চলে যা কেন? পুয়াল চাপাবার আগে গোবর ঢেলে ছড়ালাম। আর বাস ছাড়ে না।

—অর্জুনদা!

—যা, ঘর যা! কতক্ষণ বা রাখতে দিবে! আমরা জাগরণ করি।

—কী করবি?

—রাতকহানি। বলি...

সহদেব বলে, তার গলা যেমন শুনতে পাই: 'বাবা! বেধা নাই' সে বলে।

রক্ষিতবাবু বলে, তার নাই, সে বেথা দিবে এবার। হাঁ, পুলিশ এলে কোনও কথা নাই।

অর্জুন বলে, আসুক!

ওদের মটর সাইকেলের গর্জন দূরে চলে যায়।

—রাতকহানি!

অর্জুন যেন অনেক দূরে থেকে বলে, চলছে, শুনে নে। শেষ হয় নাই।

এ সময়ে আকাশ-বাতাস-চরাচর থেকে কোন দৃষ্টি অগোচর মায়া নামে কি বা! সকলে নির্বাক। তবু শুনতে পায়, সাবোধান! পলাস না!

অর্জুন শিউরে ওঠে, স্থির হয় ও ঈষৎ হাসে।

—কী হল?

—এরকম শোনা যায় শবর শুনতে পায়। 'পলাই যা' শুনলে পলাতে হয়। সহদেব! বুধন শুনে থাকবে, বুঝে নাই।

—না পান খেতে গিয়েছিল...

কালীপদ বলে, শোনা যায়?

—যায়। শবর মরেও...

অর্জুন বলে, যা! সবারে ডাক্।—ও একবার আকাশ, একবার মাটির দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে। যে শোনে, সে শোনে। যে বোঝে, সে বোঝে। অর্জুন জানে, শত শত বছর আগে মৃত শবরদের দেহ থাকে না, তারা প্রেত হয়ে এসে দেখা দেয় না। কিন্তু তাদের গভীর উদ্বেগ থেকে যায় কোথাও, শবররা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাতে তাদের আশঙ্কা হয়, সেই উদ্বেগ

তারা সঞ্চারিত করে, অরণ্য কেটে পাহাড়কে নগ্ন করলে পাহাড় যেমন উদ্বেগ জানাতে ধস নামায়,—সমুদ্র উপকূলে অরণ্যবেষ্টনী কাটা পড়লে সমুদ্র যেমন ক্রুদ্ধ উদ্বেগে ছুটে আসে জনপদে,—এ উদ্বেগ তেমনই।

অর্জুন সহদেবকে বলে, রাতকহানি সহদেব! চলছে তো চলছেই।

একটি রাতপাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়।

—পাখিটো গ্রামের আকাশ ছাড়ে নাই সহদেব!

—ও গ্রামেরই একজন তো বটে!

এ সময়ে গ্রামে পোকপতং-কীট-পাখির জন্য উদ্বিগ্ন মমতা আছড়ে পড়ে অর্জুন ও সহদেবের বুকে। সহদেব বলে, একটাই ছেলে চলে গেলে অর্জুন...কিন্তু কান্না তো আসে না। রাগে আমার বুকটা...।

অর্জুন ওকে একটা বিড়ি দেয়।

রাত বাড়ে।

কো জাগর?

কে জাগে?

শবর জাগে।

এগারো

চমৎকারা পর্ব

চব্বিশে সকাল নাগাদ এই জেলায় মহাশূন্য থেকে বিস্ফোরক অস্ত্রবর্ষণ হয় বলাই সঠিক হবে, বা 'ঠিক'-এর কাছাকাছি যাবে। এ জেলায় প্রকৃত অস্ত্রবর্ষণই হয়েছিল, যে ঘটনা নিয়ে অভিধান-অনুমোদিত 'ফাটকা' বা 'দূরকল্পনা', অর্থাৎ 'স্পেকুলেশন' আজও কোনও কোনও অলস লোক করে থাকে। কর্মরত স্কুলশিক্ষক, যাঁরা স্কুলে যান না, গেলেও ক্লাস নেন না, ক্লাসে গেলেও পড়ান না, তাঁদের অনন্ত সময় থাকে হাতে, এবং মস্তিষ্কও থাকে অলস, তাঁরা এমত দূরকল্পনা করেন। তরুণরা দিবারাত্রি আড্ডা এ জন্য দেয়, যে নির্দেশ পেলেই তারা সশস্ত্র হয়ে ঝাঁপ মারবে স্বীয় রাজনীতিক দলের সম্মান রাখতে, হিম্মত বোঝাতে,—তারাও মাঝে মাঝে সেই অস্ত্রবর্ষণ বিষয়ে মন্তব্য করে। অর্থাৎ পুরুলিয়াতে অস্ত্রবর্ষণ বিষয়ে তদন্তপূর্বক যত সত্যই উদ্‌ঘাটিত হোক, এরা তা বিশ্বাস করে না।

বুধনের কারণে যে অদৃশ্য অস্ত্রবর্ষণ হয়, তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত বুধন শবরের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাপ রে হরিধ্বনি! বাপ রে আগুন কি ললকায়! —ইত্যাদি জানার পর।

নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি একটি উচ্চ আদালতী নির্দেশ মাত্র।

উচ্চ আদালতের আদেশটি এরকম ছিল :

ডব্লিউ পি ৩৭১৫/৯৮

বাদী : পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি

তারিখ : ২২/২/৯৮

বাদী পক্ষে...

সরকার পক্ষে...

বাইশে ফেব্রুয়ারি দাখিলীকৃত আবেদনের সত্যতা এবং কেসটির গুরুত্ব বিবেচনায় এটিকে ২২৬ আর্টিকেল মতে লিখিত আবেদন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং নিম্নলিখিত অন্তর্কালীন আদেশগুলি দেওয়া হচ্ছে :

১. বুধন শবর (গ্রাম: অকড়বাইদ-শবরটোলা; থানা : কোন্দা; জেলা : পুরুলিয়া)-এর মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বের করা হোক। সনাক্তকরণ, বাইরের ও ভিতরের আঘাত, যদি থেকে থাকে,—বুধন সেগুলি পেয়ে থাকে, তা দ্বিতীয় মেডিক্যাল, তদন্ত দ্বারা নিরূপিত হোক। এইসব আঘাতই বুধনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ, বা পরোক্ষ কারণ কি না, তাও নিরূপিত হোক। পুরুলিয়া জেলা হাকিমের উপস্থিতিতে পুলিস কর্তৃপক্ষ কবর থেকে লাশ তোলার কাজটি করবেন। পুরুলিয়ার চিফ মেডিক্যাল অফিসার এই ডাক্তারি পরীক্ষা ও নিরূপণ করবেন, অথবা তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ডাক্তারদের দল এ কাজ করবেন।

২. বুধন শবরের ময়না করার সময়ে যে ভিডিও টেপ তোলা হয়, কোনও কাটছাঁট না করে সে টেপ এই আদালতে দেবেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

৩. এখন থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে লাশ তোলা ও ময়না তদন্ত করতে হবে।

৪. বিজ্ঞ সরকারি উকিল এই অর্ডার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের জানাবেন।

৫. এটি বুধবার অপরাহ্ণ চারটেয় তালিকাভুক্ত হবে।

৬. এটা নথিভুক্ত থাকুক যে বিজ্ঞ আইনজীবী প্রদীপকুমার রায়কে বাদী পক্ষের উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে। বাদী সরাসরি এই আদালতের মুখ্য বিচারপতির কাছে আবেদন পাঠান।

স্বাঃ...

সকালের ওপর যেন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নামিয়ে দেয়। বহুজনের বহু প্রতিক্রিয়া হয়।

ওর গ্রামের থানার বড়বাবু রেডিও-টেলিফোনিক-বার্তায় শোনেন গালাগালির অবিরত লাভাবর্ষণ।

—বুধনকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দেখেছিলে?

—যারা দেখেছে....

—চা-ও-ও-প! হরিধ্বনি শুনেছিলে?

—সার...শোনা যাচ্ছিল...দূর থেকে...

—সব হাবিলদার করে দিলে ঠিক হয়। কাল সকাল সাড়ে দশটা, শোনো, দশটা একত্রিশ নয়, সাড়ে দশটায় পৌঁছে যাবে। বুধনের লাশ তোলা হবে, বুঝেছ? লাশ তোলা হবে....জ্বালিয়ে দিয়েছে!

—সার...

—সব ওরা নিজের বুদ্ধিতে করল, না অন্য কেউ? ওই রক্ষিত...

—আমরা তো তাকে নুয়াগড়েই পেয়েছি সদাসর্বদা!

—চোপ!

এরপরেও গালাগালি চলতে থাকে, চলতে থাকে। যাও, রেডি হও...

বড়বাবু গলগল করে ঘামতে থাকে। মেজবাবু সান্ত্বনার কোনও কথাই বলতে পারে না। সেই তো গিয়েছিল। কিন্তু এ কি ভূতুড়ে ব্যাপার! জ্বালিয়েও দিল, পুঁতেও রেখেছে।

বড়বাবু বলে, বিরাবাজারের ও সি-কে...

বিরাবাজারে খবরটি পৌঁছয়। বস্তুত, বড় বেশি প্রচার পেতে থাকে সংবাদটি।

পুলিশ, সব কিছুর পর পুলিশকেই বাঁচাবে, সেটাই ধর্ম হয়, তা জেনেও প্রধান পুরুষ দাপাতে থাকেন, হাইকোর্ট করলে কী হবে? আমার কি? সে কি এখানে মরেছে? জেলে পাঠালাম...কথা বলছ না যে?

মেজবাবু বলে, রিট পিটিশন! কেচ্ছা অনেকদূর যাবে। আমি ভাবছি, আমাদের এখানেও...

—আসুক না এংকুয়ারি! দেখ, অত সোজা নয়। আর এখন এংকুয়ারি বা ভাবছ কেন? বেটাকে তুলুক? ময়না করুক?

—আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। যা হয়েছে, আপনার হুকুমে!

—বটে?

—নয়ত কি? ওদের পিছনে লেগে আছেন তো আছেনই। শবর মেয়েকে লকাপে রেখে...

—তখন আইন বাতলাতে পারনি?

—বাতলাব কেন? কবে আর আইন ফলো করেন? আমি সব সাফ সাফ বলব, যদি দরকার হয়। আপনার জন্যে...আমার ফ্যামিলি আছে...

প্রধান পুরুষ, হতাশ, হতাশ! সেদিন বড়সায়েব, আজ মেজবাবু...

এক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে সেনট্রি-কনস্টেবল বলে, এখন খাতাপত্তর কী হয়ে আছে, দেখতে হয়!

'শিখিও না তো' বলতে গিয়েও বলেন না। থানায় কাজ করে করে ঘুনপাকা এ সব লোক! এভাবে কথা বলার এক্তিয়ার তো তিনিই দিয়েছেন!

আশা করেন ফোন বাজবে না।

সিংরায় বা কি লোক! বলে দিল 'জ্বালিয়ে দিয়েছে'!

চব্বিশে সকালে লাশ নেওয়ার কথা এবং কোনদিন ময়না করাবার কথা।

বুধনের গ্রামে ভোর থেকেই 'সাজো সাজো' হাওয়া।

গ্রামবাসী সকল শবরই আজ কি জানি বুঝেছে। পুরুষরা দেখ, আজ মনে করতে পারছে পুলিস কবে কি করেছে।

অর্জুন যেন রাতকহানি বলার ঘোরে আছে। বলে, স্মরণ কর্, স্মরণ কর্! এটাই তো হয় রাতকহানি রে! রাত আর কাটে না।

সহদেব বলে, এই গ্রামে! খেলাধুলা হল, তাম্বু পড়ল...বীরেন মহাপাত্ত রাঁধে... সেদিনে লচ্ছু দাদার কাহিনি শুনিস নাই? আঃ! কেউ কথা বলে তো হাত উপরে উঠায়। বলে, চুপ যাও সকলে! আমি ইতিহাস বলছি! ইতিহাসই বটে!

এখন সবাই কথা বলে।

—সুমিতির নামে জ্বলন ধরে যায়, কে আসে? কে কী করে? পঞ্চায়েত টিউবয়েল দিল তো পাইপ দিল না। শেষে টিউবয়েল উঠিয়ে নিয়ে পলাল।

—বাঁধ (পুকুর) দিল, তো তার চেহারা দেখ!

—শবর থাকে না ওদের হিসাবে।

—সেবারে পুলিশ...প্রমাণ নাই কিছু...কে নালিশ করল তো ষোলোজনকে মেরে জখম করে দিল?

অর্জুনদাদা, সহদেবদাদা, বুড়াদেরও ছাড়ল না?

—একবারে এগারো জনকে ধরে নাই? ওই মহাদেব...মার খেতে মহাদেব...জেলে পাঠাতে মহাদেব...

অর্জুন বলে, অজনকে মেরে দিল, সেই কবে!

সহদেব বলে, এর আর বিরাম নাই।

অর্জুন বলে, গোরমেন কি জানে, যে শবর নামে কেউ আছে? তারা মানুষ? মরলে লাগে কাটলে রক্ত পড়ে, পাথর ছেঁচলে মরে যায়?

—ছাড় ও সব কথা দাদা। পুলিশ কার, গোরমেনের, নয়?

—সকলি গোরমেনের। হিসাব সকলরে বুঝিয়ে পাওনা দিয়ে দেয়। আমাদের কথা জানেই না।

অর্জুন বলে, আসবে ভুটের সময়ে। তোরাও, মদ দিলে মদ খাবি, ওদের কথায় লাচবি যা বলে তাই করবি। যারা করায়, তারা মনে রাখে?

এরমধ্যে রক্ষিত, আশিস, জলধর এসে পড়ে। আসে দিলীপ। ঘাড়ে ক্যামেরা।

—কী করবি, ছবি উঠাবি?

—আজকের ছবি না রাখলে হয়? এই, কারেও বল্ না অশথ গাছের ডগে উঠতে জেলার হাকিম আসবে, পুলিশ আসবে, ট্রাক আসবে।

—ডম?

—ডম না থাকলে হয়?

—ট্রাক কেন? অনে—ক পুলিশ?

রক্ষিত নিচু গলায় বলে, বুধনকে নিয়ে যাবে না?

এ সময়ে যেন হঠাৎ সবাই চুপ করে।

—বুধনরে...নিয়ে যাবে...

সহদেবের দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায়। এ সময়ে রক্ষিত ও সিংদেও চুপ করে যায়। এ ক'দি ধরে বুধন...বুধন...বুধন...

সহদেব বলে, দিনে দিনে আজ পনেরো দিন হল, পনের দিন। আর দিনে দিনে সাতদি সে নাই। সা-ত দিন!

দোলবাহাদুর বলে, সা—ত দিন!

বধিরাম বলে. মনেও হয় নাই! হুড়েতাড়ে দিন গেল তাই নয়?

—এই ইঁদুরধান কুড়া হল, ইঁদুর পিঠার সময় গেল, শবরমেলা হল...খেলাধূলার মেল হল...

—কলকাতার ময়দানে বছুরকি মেলাটি ভুলিস না..

—হাঁ, তাও তো হল...

—বুধন! ১৯৯৭ শবরমেলা দেখে গেছে!

—একদিন...বুধনমেলাও হবে।

—হাঁ রক্ষিতবাবু। তুমিই বলো, দিকে দিকে হয়। তবে এখানেও হবে?

কিন্তু এমন সময় অশথ গাছ থেকে কেউ বলে, আসছে! আসছে! অনে—ক দূরে।

পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই ভিড় করে দাঁড়ায়। ঈষৎ দূরে থাকে রক্ষিতবাবু, সিংদেওবাবু। ওরা শবরদের কাছে 'বাবু' নয়, বহিরাগতের কাছে বাবু।

দিলীপও ভিডিও ক্যামেরা প্রস্তুত রাখে। রক্ষিত বলেছে, আজ যা দেখবে, তার সবটুকু cover করো। কিছু যেন বাদ না যায়।

জীর্ণ কুটির, বিক্ষিপ্ত, অবহেলিত হলেও আত্মসম্মানী, প্রয়োজনে গম্ভীর, সম্ভ্রম জাগানো এক মানবগোষ্ঠী।

আর এ সময়ে মেয়েরা বাঁধ ভেঙে দেয়। তারা চেঁচিয়ে বিলাপ করে গান গায়।

ঘরে সাতদিন থাকলি বুধন, সাতদিন রে
কাদের তরে তোরে মাটিতে লুকাতে হল
কে করিল চেরাফাঁড়া, কে সিঁয়ান তোরে
রে বুধন, হামরাদের বুধন!
শামলিরে রেখে তুই গেলি কোথা?

শবরসংগীতে লয়, ছন্দ ও সুর একইরকম থাকে সাধারণত। শব্দে বৈচিত্র্য থাকে, শব্দ বদলে বদলে যায়। আজ, চব্বিশে ফেব্রুয়ারি যা লক্ষণীয়, তা হল মেয়েদের গান হাহাকারে, বিলাপে ও ক্রোধে পৌঁছতে থাকে পর্দায় পর্দায়।

যুগান্ত ধরে শবররা মরে না। নিহত হয় বা অজানিত কারণে মারা যায়। ফাইল বন্ধ্।

তাই অ-শবরকে ওরা নিজ মুখ দেখায় না। স্বামীর মৃতদেহ সামনে নিয়েও পাথর-পাথর ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকে, যা দেখে পুলিশ ও জনপদবাসী বলে থাকে, আশ্চর্য জাত! চোখে জল নাই।

না, কমজনেরই সৌভাগ্য হয় আপনজন হবার। কে চেনে শবরকে, কে করে সম্মান? কার সামনে কাঁদবে?

আজকে শোক থেকে গান, গান থেকে ক্রোধ। পুরুষরা চুপ করে যায়, ওদের কথা কমে আসে।

বেলা বাড়ে, বেলা ঢলে, অশথ গাছের মাথা থেকে কিশোরকণ্ঠ ভেসে আসে, এসে গেছে!

চিতোড়ার মোড় থেকে ছয় কিলোমিটার পথ বটে। দূর থেকে গাড়ির মিছিল দেখা দেয়। জলধর, রক্ষিত, সিংদেও ও দিলীপ পিছনে চলে যায়, মুখ ফিরিয়ে থাকে। শবরদের মাস্টার দেবু শবরদের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে।

সর্বোচ্চ রাজপুরুষের গাড়ি থামে। টকাটক পুলিশ নামে। বাপ্ রে পুলিশ! কত অফিসার! ডমেরা ট্রাকে বসে থাকে। মদের গন্ধ বোঝাই যায়।

রক্ষিত চোখ তীক্ষ্ণ করে। না, ইশোয়ার আসেনি। এর অন্য ডম। ওদের নাকে কি গন্ধ লাগে?

হাকিম আজ প্রত্যহের মত ধীর, সংযত, শান্ত থাকতে পারছেন না। তিনি তাঁর সঙ্গী অফিসারকে বলেন, হাইকোর্ট বলেছে, স—ব করব।

সিংরায়ের দিকে তাকান।

—আমি সার, সাড়ে দশটা থেকেই তৈরি।

—আমার কাজ ছিল। কলকাতায় জানিয়েছি। কিন্তু...

ঘুরে শবরদের দিকে চেয়ে অপমান ও ক্রোধে রুক্ষ গলায় বলেন, কে! কে বুদ্ধি দিয়েছিল? সরকারের সঙ্গে এরকম...কে? কে বুদ্ধি দিয়েছিল?

রক্ষিত ও সিংদেও নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে দূরে, মুখ ফিরিয়ে। হৃৎপিণ্ডের ধড়াস ঢড়াস শুনতে পাচ্ছে।

চোখ মুছে মেয়েরা এগিয়ে আসে। সবাই সচিৎকারে বলে, আমরা বলেছি!

পুরুষরা, বলে, আমরা।

এবার এক অদ্ভুত, অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়, যে দৃশ্যের কণ্ঠ আছে। মেয়েরা একসঙ্গে আগায়।

—বুধন আমাদের! আমরা দিব না!

—বুধন আমাদের!

—দিব না তোদের!

রুদনি, বৈশাখী, বাসন্তী, ধনি, সুখদা হিমানী, জনকা, শামলি, সকলের দেহ যেন প্রতিবাদে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

হাকিম বলেন, তোমরা বডি বের করো।

বলেন ডোমদের।

মেয়েরা চিৎকার করতে করতে এসে হাকিমকে ঘিরে ফেলে। দিলীপ ক্যামেরায়।

—দিব না বুধনকে। বুধন আমাদের। কি করতে পারিস তোরা!

জানিস তো শবরকে মেরে দিতে। চালা গুলি, চালা!

হাকিম স্তম্ভিত। এত প্রতিরোধ? এত সাহস?

—বডি তো দিতেই হবে। হাইকোর্টের আদেশ, বুঝেছেন? না দিলে... আপনারাই তো কেস করেছেন!

অর্জুন এগিয়ে আসে।—তোরা যা বিটিরা! বুধনরে নিবে, ময়না হবে, রিপোট যাবে, নইলে কেস তো হয় না।

—কেসে কি করে অর্জুনদাদা! শবর কি বিচার পায়?

—এমন কেস তো পয়লা বার ধনি!

ফুঁসতে ফুঁসতে মেয়েরা উদ্ধত ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে আঙুল দেখায়। যেহেতু এমন পরিস্থিতি কোনওদিন হয়নি, সেহেতু কর্তৃপক্ষ হতচকিত।

শবররা যা বলছে, তাই করতে হচ্ছে। শবর মেয়েরা এত সাহস কোথা থেকে পেল? জীবনে কিছু না পাওয়া মানুষ এমন চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে?

—আপনারা... ভিডিও তুলছেন?

—এটা আমাদের রেকর্ড।

—এ কি! এটা কার ঘর।

—আমার!

শামলি সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, দুই দিন সে তার ঘরে। আর বাবু! আমি চ্যাটাই পেতে

শুয়ে তারে পহরা দিয়েছি, জানলি? জানিস কেমন লাগে, যখন নিদোষে তাকে তুলে নিল, আমার কেমন লাগে?

রাগে ও ঘৃণায় ও থুতু ফেলে। —হ্যাঁ, আগে তুপলাম। তারপর লুকালাম। হোই, হোই পুয়াল গাদার নিচে। তারপর তারে জ্বালাই দিল। সে জন ইখানে। কেস হবে যি! তো কী করবি?

পুয়ালের মানুষ জ্বালাই দিল। আমার মরদরে না লুকালে... তো আমরা সকলে তারে তার ঘরে আনলাম। তা-র ঘরে।

—ওই... পচা বডি নিয়ে...

—পচাল কারা?

শামলি ঘুরে দাঁড়ায়। সকলকে শুধায়, —জগতে তার দানা ছিল...তার বাপ-মা আছে... অকালে সে গেল কেন? হাঁ, আমার ঘরে সে আছে। নাকে রুমাল বা দাও কেন? আমি রাতে তর মাটির উপর চটাই বিছায়ে ঘুমালাম, আমি কোনও বাস পাই নাই। কী করবি, উঠাবি?

—আমরাদের বুধন, উঠাতে দিব না।

সময়ে সব মেয়েই ধনি হতে পারে। ওরা সমস্বরে, যেন সন্ত্রাসনের মত আগায় ও বলে, কী করবি? গুলি চালাবি? চালা গুলি...কী করবি? আর কী জানিস?

হাকিম এই লাভার মত উদ্‌গারিত ক্রোধের সামনে যেন আত্মস্থ হতে শুরু করেন।

—দেখুন! হাইকোর্টে কেস আপনারাই করেছেন...লাশ যাবে...ময়না হবে..

সহদেব এগিয়ে আসে। কেউ বলে হাকিমকে,

—বুধনের বাবা!

সহদেব মেয়েদের বলে, উঠাক লাশ! কেস তো আমারদের, নয়?

ডম দুজন এগিয়ে আসে, ঢুকে যায়। কেউ বলে, সাবোধান! লাশে চোট না লাগে!

হাকিম নাকে রুমাল চেপে সরে যান। অর্জুন শবর এগিয়ে আসে।

—আমি অর্জুন শবব!

যেন মানুষজনের গলা নেমে আসে। বুঢ়াদের কথা নীরবে শোনাই নিয়ম।

—শবর কথা জান তুমি? শবর নামে এত ঘিন, শবর চোর...শবর ডাকাত...ডাকাতি করে কেন? কারা করায়? কাদের দালান উঠে, টাকা হয়, কারা কিনে মাল? কে তারাদের বেচে?

অর্জুন তার কথাগুলি থিতোতে দেয়। হাকিমও এক বাধ্য শ্রোতা।

—শবর বিকে না, কিনে না, কিছু পায় না। দেখ, বুধনের ঘর দেখ। আমারদের ঘর দেখ! চালে পুয়াল নাই, দেহে বস্ত্র নাই, ছেলেদের পেটে খাবার নাই! তবু শবর ডাকাতি করে। করলেও মরে, না-করলেও মরে। শবর কথা জান তুমি?

অর্জুন ক্রোধ-ক্ষোভ-সকল অনুভূতির ওপার থেকে যেন অন্য কোনও লোকের মানুষ, প্রাচীন, অতি প্রাচীন প্রজ্ঞা তার আয়ত্ত, তেমন গলায় বলে, রামের নাম জান, রাম! যে রাম বনবাসে যায়! একা এক শবরী জানত রাম আসবে! সে বনের ফল কুড়াত। খেয়ে দেখত টক না মিঠা!

আর! তার উচ্ছিষ্ট ফল শুকায়ে রেখে দিত। বনবাসে রাম যখন ভখে মরে, আহার মিলে না, শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল খেয়ে সে প্রাণে বাঁচে। এ কথা তোমারদের পুঁথিপুরাণে লিখা আছে।

হায়! তোমারদের দেবতা শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল খায়, আর তোমরা শবররে... শিকার করো!

শবররাও ক্রমে নিশ্চুপ হয়ে শোনে।

—নীলাচলে জগন্নাথরে পূজা করো? জগন্নাথ কে? বিশ্ববসু ছিল বনের রাজ্যে শবর রাজা! তার ছিল কালিয়া দেবতা। শবর রাজার কাছে এমন দেবতা কেন? বামুনদের বড় ধান্দা দেবতাটি চুরি করে। তাতেই, শুন হে হাকিম! রাজার মেয়ে ললিতাকে হাত করে সে চোর। বলে, বনে যাও তো আমারে নাও না কেন? কন্যা বলে, আন জাত যেতে নিষেধ! তো ললিতার আঁচলমুড়িতে শ্বেতসর্ষা বেঁধে দেয়, আঁচল ছিদ্দির করে দেয়।

—কন্যা চলে তো রাই সর্ষার দানা পড়ে। নিমেষে গাছ হয়, ফুল ফোটে। সেই চিন্ দেখে দেখে সে বামুন ছেলে কালিয়া দেবতা চুরান। শুন হে হাকিম! সেই দেবতাই তোমারদের জগন্নাথ। আজও মন্দিরে প্রথম পূজা করে শবর! আর আমরা, শবররা, বামুন খুঁজি না কোনও পূজাপাটে। বাম্ভনকে মানি না আমরা। সেই শবর আমরা! কারাদের ধরো, মারো, কাটো, পুলিসের হাতে বিকে দাও? বড় অপমান হয়ে গেল, তাই তো? তা চিরকালটা তোমাদের, একদিন শবরের হবে না?

হাকিম কোনও জবাব দিতে পারেন না।

সহদেব এগিয়ে আসে।

হাকিম অর্জুনের ব্যক্তিত্বের আঘাতে বেশ ধাক্কা খেয়েছেন। কোনও উত্তর দিতে পারেননি।

এখন সহদেব শবর!

কেউ বলে, বুধনের বাপ!

সহদেব দীর্ঘকায়, খুব স্থিত, সংযত, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। হাকিম সহসা অনুভব করেন, কিছুক্ষণ ধরেই এদের যেন সমানে সমান বলে মনে হচ্ছে। শবররা যে মানুষ, তা তো এ জেলায় কেউ বলেনি।

মূলস্রোতের এত বাইরে, তবু নারী ও পুরুষ কীরকম স্বতন্ত্র, স্বাধীন, নির্ভয়।

কেন? ওরা অনেক মৃত্যু দেখেছে বলে?

সহসা, বিদ্যুচ্চমকে বোঝেন, আজ প্রথম ওরা নিজেদের দেখতে দিচ্ছে। শুনেছেন, শবররা অ-শবরের সামনে যে মুখ দেখায়, সেটা আসল মুখ নয়। মুখের মুখোশ।

এখন মনে হচ্ছে তা সত্যি।

—আমি সহদেব শবর! জাহানাবাদে যখন...তখন-ইংরাজের রাজ! জাহানাবাদে যখন শবরদের জন্য শীরিশ মাস্টার কাজ করে, আমি বালক। পুলিশের মার ছিল, পয়লা বাঁচাতে আসে রেবতীবাবু। সেই সময়ে কংরেস বুঝায় যে ইংরাজ না গেলে শবর বাঁচবে না।

—তা বাবু! তখন আমি খানিক বড়! 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মদ ভাটি জ্বালাই মানবাজারে, মানবাজার...বান্দোয়ান...বরাবাজার...পটমদা...তখনও তো জিলা বিহারে... হুড়া...পুঞ্চা...সকল শবর ছিল...আমিও ছিলাম...আমিও...জেল গিয়েছি...কাগজ আছে... না বাবু। পেনশান দুইজন ছাড়া কেউ পায় নাই, আমিও পাই নাই। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য লড়েছি তো বটে! আজ স্বাধীনতাও বুড়া হল। তার একান্ন বছর বয়স হবে। কিন্তু বল! শবরদের কি করলে! কিছু নাই, হাহাকার...পাগলা কুকুর যেন, তাড়া করে মারো...না জমি, না কিছু...চুরি, লুট, ডাকাতি করত শবর? ইংরাজের রাজ আমরা কজন মনে করতে পারি, এরা জানে না।

কী দিলে আমাকে? আমার বেটাকেই...বুধনকেই মেরে দিলে...এটা কেমন স্বাধীনতা বাবু?

নৈঃশব্দ্য স্পন্দমান নৈঃশব্দ্য।

তারপর চমক ভাঙে।

হাকিম সহদেবের কথাগুলির উত্তর দিতে পারেন না। এ সব কথাও ওদের ক্যাসেটে শোনা যাবে।

যাক। তিনি কী করবেন? স্বাধীনতার সময়ে তো তাঁর বাবা অবিবাহিত এক যুবক। শবর... শবর সমস্যা তো তাঁর তৈরি নয়?

যে ক্রোধ ও অপমানের বলে ফুঁসতে ফুঁসতে ঢুকেছিলেন, তা কোথায়?

পুলিশকে বলেন, জলদি করতে বলো।

"সমাধি খুঁড়েছে রবি ডোম, পিং রঘু এবং রাজেন কালীন্দি, পিং মোহন। এদের এ কাজের জন্য পুরুলিয়া থেকে আনা হয়েছিল...

"ডাঃ সিন্‌হা চীফ মেডিক্যাল অফিসার (স্বাস্থ্য বিভাগ); শ্রী তেওয়ারি ডি.এস.পি (ডি.ই.বি ; কাশীপুরের সি.আই কে.বি. আলি এবং কেন্দা থানার ও.সি প্রবোধ সিংহ রায় সমাধি পুনর্খনন কালে উপস্থিত ছিলেন।

এক ফুট গভীর মাটি খোঁড়ার পর দেখা গেল তিন বাই তিন ফুট চওড়া ও সাড়ে তিন ফিট গভীর একটি গর্তের মুখে কাঠের তক্তা ঢাকা দেওয়া আছে। গর্তের ভিতরে চটের বস্তায় লাশটি ছিল। গর্ত থেকে বস্তাটি তুলে মেঝেতে রাখা হয়। ডোমরা এ কাজ করে। বস্তাটি খোলা হয় এবং বুধনের স্ত্রী শামলি শবর লাশ সনাক্ত করে। লাশ ছিল আনত অবস্থায় এবং পচে গিয়েছিল, তীব্র দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। পুলিস প্রহরায় লাশ পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় পুনর্বার ময়নার জন্য,—মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশমতো। পুনর্খনন ব্যাপারটি শ্রী সৌরেন ব্যানার্জী (ফোটো এন্টারপ্রাইজ : পুরুলিয়া), ভিডিওগ্রাফ করেন। তাঁকে আমি নিযুক্ত করি।

স্বাঃ জেলা হাকিম (পুরুলিয়া)"

"মাননীয় উচ্চ আদালতের ২৩/২/৯৮ (কেস নং ডবলিউ-পি ৩৭১৫/৯৮)-এর নির্দেশক্রমে বুধন শবরের লাশ ২৪/২/৯৮ বিকাল চারটা পঁচিশে পুনর্খনন করা হয় (গ্রাম : অকড়বাইদ-শবরটোলা; গ্রাম পঞ্চায়েত : মানাড়া; থানা : কেন্দা জেলা : পুরুলিয়া)। এ কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হয়।

বুধনের লাশ পুনর্খনন করে তোলা হয় তার দেশি খাপরার ছাতযুক্ত মাটির ঘরের মেঝের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে। সাক্ষী থাকেন—

১. দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডা	স্বলিখিত নাম
২. ধনঞ্জয় মাহাত	" "
৩. শ্রীমহাদেব শবর	স্বলিখিত নাম
৪. প্রশান্ত রক্ষিত	" "
৫. জলধর শবর	" "

শামলি শবর সনাক্ত করেন ও টিপছাপ দেন।"

এ সব কাগজপত্র সরকারি কানুন মতে ঝপাঝপ তৈরি হয়, যদিও ময়নার কাজটি পরদিন হয়।

ওরা লাশ নিয়ে চলে যায়। মেয়েদের কান্না ওদের তাড়া করছিল, এবং ওরা যে দশ কিলোমিটার পিছনে পড়ে আছে, সে বিষয়ে সম্বিৎ ফেরে অনেক পরে।

অভিশপ্ত ডমেরা লাশবাহী ট্রাকে ছিল। অফিসাররা বুঝলেন বুধনের গন্ধ সহজে নাক থেকে উধাও হবে না। মৃত্যুর কারণ অজানা থাকলেও গলিত লাশের পচন ঘটনা। সে লাশের গন্ধ বোধহয় ভিতরে ঢুকে গেল।

বুধনের গ্রামে ওরা অনেকক্ষণ থাকে। রক্ষিতের এখন অনে—ক কাজ।

সহদেব বলে, প্রশান্ত! গ্রামে পুলিশ ছাউনি ফেলবেই, আজ হোক, কাল হোক!

—কেস না হতেই?

—মন তাই বলে। ও তো বুধাকে নিয়ে কেস। কেসের মত কেস চলবে। সেই ডাকাতির কেসের জন্য? এখন পুলিশ, পুলিশ কেস করবে!

—এখন?

—নয় পরে করবে। শবর জীবন হতে পুলিশ সরবে না। ঘর যা তুই!

অর্জুন বলে, ভাবিস না সহদেব!

—শামলিটা...!

ক্রমে গ্রাম নিঃশব্দ হয়ে আসে।

অন্ধকার তেমন প্রগাঢ় নয়। সহদেব উঠে হাঁটতে থাকে।

অর্জুন বলে, একটু একলা থাকবে। ছেলের সঙ্গে... সময় তো পায় নাই!

কেস বটে! বুধা থাকল না। এখন ডাকাতির সেই পুরাতন কেসে শবর ধরতে ছাউনি বসাবে। পুলিস বলে না, আইন ছিংখলা?

অর্জুন বলে, বসাক!

রক্ষিত বলে, অর্জুনদাদা! সহদেবদাদা! তোরাদের এক-ও কথার জবাবে কথা বলতে পাবে নাই।

—কী জবাব দিত সরকার, তাই বল?

এই তো প্রথম জবাব চাওয়া!

—এই ময়নার রিপোর্ট...

—সরাসরি হাইকোর্ট যাবে অর্জুনদাদা! হাইকোর্ট কেস নিয়েছে, স—ব করবে!

বারো

বিচারপর্ব শুরু

বুধন একমাত্র শবর, যার কাহিনি পর্ব হতে পর্বান্তরে রচিত হতে থাকে। টাউন থেকে বিরাবাজার, জেল ও মর্গ, বিভিন্ন জনের মস্তিষ্কে জিরো জোনে বুধন শবর ভাইরাস হয়ে ঢোকে ও বলে; আঁতলাড়ি, আরও কত রয়ে গেল, সৎকার্যকালে সব দিয়ে দিও, হ্যাঁ!

ইশোয়ার ডম লাটপাট খায়, লাটপাট খায়। মনকে বলে, বুধন কী এ বিচার মানবে?

বিচারপর্ব শুরু হওয়ার সূচনাতেই সকল শবর তাদের আদিপুরুষের আনন্দকলরোলসহ বুধনের সঙ্গে সংলাপও শুনেছিল।

সে তো কথা নয়, মাতাল গান।

এ বড় সংক্রামক গান, যা সকল শবরই গাইতে সক্ষম:

'বাঘমুড়ির পাহাড়ে
তৈরল তৈরল বাঁউশ হে

উচ্চ আদালত নির্দেশে বুধনের ফোলা, দাঁত ছরকুটা, পচা, ফেনিল, গলিত শব আবার ব্যবচ্ছেদ করতে হয়।

তার ভিডিও চলে যায় কলকাতা।

বুধন, এই ময়নার পর আর শবদেহ নয়, একটা গলিত ও হিংস্র, জীবন্ত স্তূপ।

এ শবদেহ বেলচায় চেঁছে ভারী পলিথিনের বোরাতে ভরতে হয়।

২৫/২ তারিখে ব্যবচ্ছিন্ন শবদেহটি সংগ্রহ করে সৎকার্য করার জন্য শামলিকে অনুরোধ করে পুলিশ ৫/৩ তারিখে। এবং শামলি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। ওই পলিথিনের বোরা, যাতে শবকীট কিল কিল করে লুকোচুরি খেলছে, তা কেমন করে তার বুধন হতে পারে?

—দশদিন বাদে বা কেন?

ফাজিল মহাদেব বলে, দেখতে সুন্দর, বাস উঠছে সুন্দর, রেখে দেখছিল।

অতঃপর বুধনকে সৎকার্য করা হয়।

তারপর দ্রুতগতিতে যা যা ঘটে যায়, তা দ্বিতীয় রাতকহানি না লিখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু ৫/৩/৯৮ তারিখ হতে মর্গে প্রত্যহ রাতে গভীর নৈরাজ্য জারি আছে।

ইশোয়ার ডম, যে নেই অথচ আছে। অর্থাৎ বুধন কেসের কাগজে নেই। কিন্তু 'ফিকশান'-এ নয়, সত্য, অথবা ট্রুথে আছে। সেই ইশোয়ার ডমকে মর্গে গেলে দেখা যাবে না।

অবিদ্যমানতাই প্রমাণ করে যে, সে বিদ্যমান এবং অনপনেয়।

না-থাকা মানেই তো থাকা।

মর্গে পরপর আঁতনাড়ির বুতল বা বৈয়ম সকলও আছে।

রাত বারোটা বাজলে, একচুল ডানপাশে হেলার সময়টিই অনন্তকাল।

ওই সময়ে ইশোয়ার ডম সভয়ে ঘড়ির দিকে তাকায়।

সে সময়ে ইশোয়ার সভয়ে দেখে বুতলগুলি এসে পাশাপাশি ইউনিয়ন করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বুধনের উল্লাস চিৎকার:

আঁত ছাড়া সৎকার্য হয় না
লাশ জ্বালালে সৎকার্য হয় না
যা যা ছিল আমার, সব কেন নাই দিলি?
আঁতটি আমার গেল কোথায়?
এখন! ইশোয়ার! আমি তোরাদের নাই ছাড়ব।

তারপরেই শোনা যায় সমবেত কণ্ঠে ঝুমুর গান! একটি কণ্ঠে সব খাড়্যা শব্দই অশ্রুতপূর্ব, দুর্বোধ্য, ডায়ালেক্ট চেঞ্জ কইরা গ্যাছে গিয়া।

অন্য শব্দগুলি বোঝা যায়।

বাঘমুড়ির পাহাড়ে
তৈরল তৈরল বাঁউশ হে
উঠ বেহায় ঝাঁক তরাড়্যা
কাট বঁড়র বাঁউশ হে!
বাঘমুড়ির পাহাড়ে
ঝিলিক পাথর আছে হে
ঝিলিক পাথর নিজার নাই
গীত বড় বাড্যাই হে!

বুধন বলে, আঁত চাই! আঁত দাও!

কোরাস বলে, আঁত দাও! আঁত দাও!

কোরাস উত্তুঙ্গে ওঠে। বুধন চেঁচায়, আমি এখন ঘুরে আসতে লেগেছি হে ডম! সবারে জানাই দিও।

কলরোল! কলরোল! কলরোল।

ঘড়ির কাঁটা একচুল সরে। নিঃশব্দে বুতলগুলি নেমে যায়।

ইশোয়ার ডম ঘুমায়।

তারপর?

রাতকহানি আবার শুনব আমরা। রাতকহানি শেষ হয় না, হওয়ার নয়।

শেষ পর্বে বুধন কি আঁত ফিরে পাবে?

ইশোয়ার কি ফিকশন ছেড়ে অবয়বী হবে?

রাতকহানিই জানে।

এলাটিং বেলাটিং সই লো

মেয়েটি ॥ আগস্ট ২০০২

ফোন বাজছে, কেবলই বাজছে। আর ফোন ধরতে পারি না আমি, শুনতে পারি না এর-তার ওর কথা। ছেলেটি বলল, তুই শুয়ে থাক চোখ বুজে, মনে কর, ঘুমাচ্ছিস। —মনে করলে ঘুম আসে?

—তুই সব পারিস। কি কাজটা করলি ভেবে দেখ্!

—আমি ভাবতে পারি না। আর ভাবতে পারি না। ওই, ওই আবার ফোন বাজে। যা, যা তুই! বলে দে আমি বাড়ি নেই।

মেয়েটির গলা চড়তে থাকে। পারে না, আর পারে না ও। কিছুক্ষণ আমাকে শান্তি পেতে দাও।

একটু একলা থাকতে দাও।

ও কানে বালিশ চাপা দেয়। ছেলেটি ঘরের আলো নিভায়, মাঝের দরজা বন্ধ করা। দরজায় পর্দা টেনে নেয়। এই পর্দা, টেবিলের ঢাকা, বালিশের ঢাকা সব মেয়েটির হাতে সযত্নে সেলাই করা। ওর হাতে পায়ে লক্ষ্মী যাকে বলে। বেডকভার জীর্ণ হল, তো ও তাকে ভাঁজ করে, মোটা সূঁচে মিলিয়ে চৌকির নিচে মেঝেতে পেতে দিল। বলল, রাতে পা ধুবি, এতে মুছবি, তবে শুবি।

—ঘুম আসতে চেষ্টা কর।

—রুমালটা ভিজা। আমার চোখের উপর রাখ্। বড় মা বলত, এতে মাথা ঠাণ্ডা হয়।

—দিচ্ছি, ঘুমা তুই!

—ঘুমাব। ঘুমাব, ঘুমাব।

মেয়েটি বালিশে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে। ঘুমাবে, না ছাই! এখন ও পিছন ফিরে দৌড়াবে। পিছন ফিরে দৌড়ায় যে মেয়েটি সে আজকের মেয়েটি। শাড়িতে, জামাতে ফিটফাট, এক মাথা চুলে ঢলঢলে বেণি। দৌড়তে দৌড়তে ও হয়ে যেতে থাকে অন্য এক ছোট্ট মেয়ে। ছিপছিপে হয়ে যায়। মাথায় ছোট। পরনে সালোয়ার কামিজ, বড়মার হাতে বাঁধা বেণী দুটো ছটাং ফটাং নাচে, লাফায়, নাচে, লাফায়।

দৌড়তে দৌড়তে, দৌড়তে দৌড়তে। আহা, ছোটবেলার দিকে দৌড়াবার মতো আর কি ওষুধ আছে? দেখ্ তুই দেখ্ আমি ঘুমাই। ওই মেয়েটা ওষুধ খায় না, রাগে অবিচারের যাতনায় তোর উপর চেঁচায় না। অবিচারের জ্বালায় পোড়ে না।

ওই মেয়েটা এখন দৌড়ে যায় বাড়ির পাশের মাঠে। কত মেয়ে...কত ছেলে মেয়েটা দৌড়ে চলে যায় ওদের কাছে। কত মেয়ে, কত ছেলে। ইশ্... ও আরো ছোট হয়ে গেছে না কি? এখন তো বেণিও নাচে না। থোকা থোকা চুল কিন্তু বড় মা কি ছেড়েছে? মাঝে সিঁথি কাটা, দু'পাশের চুলে ক্লিপ আঁটা। গরমে ফ্রক।

বন্ধুরা ডাকে, তুই কোথায়?

রথে! ও রথে!

সে 'রথে' নামেরই কাহিনি কি বা! আষাঢ় মাসে রথের দিনে জন্মাল মেয়ে, তো বাড়ির কর্তা জ্যোঠা বলেন, নাম দিলাম, সে এক ভারি বাহারি নাম। ঠাকুমা বলেন, দিনক্ষণ গুণে গুণে—

জন্ম নিল রথের দিনে!

সেই থেকে ডাকনাম 'রথে'।

মাঠে পৌঁছেই ছোট্ট মেয়েটা মেয়েদের হাত ধরে। এখন আর কিছু নয়। এলাটিং বেলাটিং খেলা। আর মেয়েদের হাত ধরে শোনা,—

—রাজার খবর আইল

মেয়েরা বলে, কি খবর আইল?

—একটি বালিকা চাইল

—কোন্ বালিকা চাইল?

ছেলেরা বলবেই বলবে। রথে বালিকা চাইল!

কত ঝগড়া না করেছে ও। কেন? রাজা বালিকা চায় কেন?

ছেলেরা বলবে, তারে দিয়ে ঘর মুছাবে, জল আনাবে, ভাত রাঁধাবে!

—ইশ্ বালক নিয়ে তাকে বলবে জুতা সাফ কর! তামাক সেকে আনো! খানিকক্ষণ খুব ঝগড়া ঝাঁটি। তারপর আবার এলাটিং বেলাটিং খেলা! সেদিন কেমন করে মেয়েটা জানবে, সামনে কি আছে? এ তো একটা মেয়ের কথা নয়, সকল মেয়ের কথা।

২

ছেলেটি

আমি বুঝতে পারছি, ও সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। ও যখন গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যায়। তখন। একমাত্র তখনই আমি শান্তি পাই। আমারও ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আমি জানি। আমি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলে ও খুব শান্তি পাবে। সবসময় বলবে, তুই রোগা হয়ে গেলি। তুই চিন্তা করিস। আবার তারপরেই বলবে, তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না রে! আমিই কি পারি? কাকে বোঝাই, যে ওকে ছেঁচে ছেঁচে, রগড়ে রগড়ে তোমরা একে এমন করে দিয়েছ। নিজেদের কি পরিচয় তুলে ধরলে? জানো, ও কে? শিশুর মতো নির্মল হৃদয় কি সাহস ওর! কাকে অপমান করেছ?

এখন দেখছ, আকাশের দিকে থু থু ছিটালে তা নিজের মুখে এসে পড়ে? মুসলিম ছেলে হিন্দু মেয়েকে, অথবা মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করলে তাকে পদবি পালটাতে হবে? 'তোমার ধর্ম কি' তা লিখতেই হবে?

১৯৯১-এর আশ্বিনে কোনো হিন্দু-মুসলিমে বিয়ে হয়েছে, তাই বা বলো কেন? কেন বলো না দুটি ছেলেমেয়ে বিয়ে করল?

আমরা আমাদের বাবা-মায়ের প্রজন্মে শিখেছি জগৎ জুড়ে একটাই জাত। তার নাম মানব জাতি। ধর্ম একটাই, তা মানব ধর্ম।

অনেক কথা চেঁচিয়ে আমি বলি না। আমার স্বভাবে তা নেই। তবু ১৯৯৩ থেকে অবাক হয়ে

দেখে আসছি, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, সে ভাবে ভাবতেই ভুলে গেলে তোমরা? অথচ তোমাদের ভাববার কথা ছিল।

আমাদের রাজ্য অন্য রকম। এখানে মানুষ মানবিক মর্যাদা পায়। আমাদের দুজনকে তো তা শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে, বিশ্বাস করেছি, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ আমাদের মধ্যে নেই।

আমাদের আশা বিশ্বাস কেড়ে নিলে কেন?

আমি কেউ নয়। আমাদের কথা শুনবে কে? রায় বাবু, মজুমদার বাবু, এরা আমাকেই বলেছে, সব কি তুমি জেনে ফেলেছ? নিজেকে অত বুদ্ধিমান ভাব কেন?

আমারও দোষ ছিল। আমিও শিখেছি 'কাজ নয়, কথা বলো।' আলোচনার মাধ্যমেই না কি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

যেমন। যেমন অনেক কিছু।

এখন ওকে ঘুমোতে দেখছি। আমার লেখার প্রুফ সংশোধন করে যাচ্ছি। আর মনে মনে ভাবছি। এখন তো গরম স্লোগান-সর্বস্বতার দিন! তা আমি আর ও মিলে দুজনের একটা নতুন পার্টি বানাই। সে পার্টির বক্তব্য একটাই হবে, 'পদবি বর্জন করো।' পদবি দিয়েই তো পরিচয় জেনেছ এত কাল? এখন পদবি বর্জন করো। আমাদের 'পদবি বর্জন করো' পার্টিতে আট দশ জন সমর্থকও আসবে না? ধরা যাক এল। আমরা দুজন, ওরা দশ জন।

শুরু করতে বারোজন যথেষ্ট। ছেলেটি জানে, সে শুরু করবে না, করলেও কখনো, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে। কেন সে স্বপ্ন দেখবে না? স্বপ্ন দেখার অধিকার ছাড়া সব অধিকারেই তো দেশবাসী বঞ্চিত। কি করে কানুদা, ওদের একদা অটোচালক? প্রবল প্রতাপশালী ইউনিয়ন ওকে মেরে ধরে ওর অটো জ্বালিয়ে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কানুদা শেয়ালদা থেকে ঝিঙে-পটল-কুমড়ো কেনে,—এখানে রেললাইনের ধারে বসে বেচে।

ওদের দু'জনের মতো ফটকা পার্টিরাই ওর একনিষ্ঠ খরিদ্দার। কানুদার চোখে ছেলেটি স্বপ্ন দেখতে পেয়েছে। কানুদার এক ছেলে গ্যাং সদস্য হওয়ার ফলে খুন হয়েছে। বউকে নিয়মিত হাসপাতালে নিতে হয়। কেননা তার স্টমাকে টি. বি.। কানুদার অন্য দুই সুপুত্র কাঁচড়াপাড়া ও বারাসাতে তোলা ওঠায় বাজারে।

তবু ওর চোখে স্বপ্ন থাকে।

একটি অটোর স্বপ্ন।

বাস্তু নয়, জমি নয়, চাকরি নয়, স্বয়ম্ভর প্রকল্প নয়, কোনো অধিকারেই মানুষ এখন বঞ্চিত। স্বপ্ন দেখার অধিকারেই মানুষ এখন বঞ্চিত। স্বপ্ন দেখার অধিকারটা বোধহয় এ শতকে কেড়ে নেওয়া যাবে না।

এ শতক হিংস্র, আগ্রাসী, নিদারুণ ফোরেইন। সব কিছুতে ফোরেন টাকার গন্ধ, এমন কি সুন্দরবনের জেলেদের জালেও। স্বপ্ন দেখার অধিকারটা থাকুক। এ অধিকারটা হাইকোর্ট থেকে আদায় করতে হয় না।

৩

মেয়েটি স্বপ্নের মধ্যে আত্মকথা মনে মনে লিখছিল

এত ফোন, এত কাগজে আমার জয়ের খবর! কিন্তু তোমরা কারা আমার খবর সব জানো গো? প্রশংসা আর অভিনন্দন পেতে পেতে আমারই মনে হচ্ছে, যেন আমি ঘোড়ায় চেপে বন্দুক চালিয়ে যুদ্ধ জয় করে এলাম।

তা তো হয় না, হবার নয়। সে শুধু হয় বোম্বাই ফিলিমে। হয় বলে শুনেছি, তত দেখি নি। কেউ কি জানে, যারা এত বছর 'মুসলিম যখন হিন্দু বিয়ে করেছ'' বলে গেল, তারা কি জানে, যে রথের দিনে জন্মেছিলাম বলে ঠাকুমা টপ করে একটা নাম দিয়ে দিল, ''রথে''। আর রথে হয়ে গেলাম আমি।

বড় সুখের শৈশব ছিল গো, বড় সুখের! হবে না। কেন বলো? আমার জ্যাঠামশাই, (আহা! আজ তো তিনি নেই) এ এলাকায় সেই কবে কমুনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন।

তাঁর প্রিয় ভাইঝি আমি, তাঁর ভাবাদর্শে বড় হয়েছি। বিশ্বাস করেছি, জাত বলতে মানব জাতি। ধমে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কোনো বিভেদ রাখা চলে না। এমন বিশ্বাস বাড়িতে সকলেরই ছিল অল্প বিস্তর। আমার মা নিজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান নি, কিন্তু আমাকে, বা দিদিকে ডেকে দুপুরে খবরের কাগজ পড়তে বলতেন। রেডিওতে বাংলা খবর শুনতেন।

নিজের হাত দুটি ছিল নিরলস। তাঁর মনের কত কথা যে কাঁথার গায়ে সুঁচের ফোঁড়ে ফুটে উঠতে দেখেছি! ফুল, লতা, পাখি, প্রজাপতি! আমাকে একটা কাঁথা তৈরি করে দেন, কালো কাপড়ের ওপর সোনালি সুতোয় শিউলি ফুলের মেলা।

বড় যত্ন করে রেখেছি ওটা। বাড়িতে দেখতাম বড় মা, মা, কালোজ্জিরে আর কর্পূরের টোপলা বেঁধে কাঁথায়, ভালো কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাখতেন।

মায়ের হাতের কঁথাটি আমিও কালোজিরে আর কর্পূরের টোপলা বেঁধে সযত্নে রেখেছি। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, এ কালোজিরেতে তেমন ঝাঁজ নেই, কর্পূরও তেমন সুগন্ধ নয়। কুমার হাসে।

কিন্তু সবই তো কেমন মেকি হয়ে যাচ্ছে আজকাল। সবই!

আমার জ্যাঠামশাই এক আশ্চর্য মানসিকতার মানুষ ছিলেন। জেলাটি তিনি তন্ন তন্ন ঘুরতেন। গেলেন মিটিঙে, অথবা জনসভায়, অথবা কৃষকসভার মিটিঙে। নয়তো তেভাগা দিবসে,—ফলে জনসংযোগ ছিল বহুদূর ছড়ানো। যেন বটগাছের শিকড়।

আজও আমাদের জেলা বড়ই অবহেলিত। সেদিন তো আরোই ছিল অবহেলা। তবে জনসংখ্যার চাপ বাড়ার সেই শুরু। আজ তো জেলা ভেঙে দুই ভাগ, আর জনসংখ্যার এক সুবিপুল বিস্ফোরণ।

সেদিন জেলার এখান-ওখান থেকে প্রাচীন মূর্তি, কোনো দেউল বা দুর্গের ভাঙা টুকরো বা বৌদ্ধ সংঘের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা এ সব নিজে সংগ্রহ করে আনতেন। মানুষজনও এনে দিত।

সরকারকে তো এগুলি সংরক্ষণে তত আগ্রহী করতে পারলেন না। তবে সরকারি লোকজন এসেছেন। প্রতিটি প্রত্ন-নিদর্শনের সময়কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জ্যাঠামশাই-এর এ কাজে সঙ্গী আমিই।

ওই স্বভাব আমার। কি কৌতূহলে শুনতাম। মূর্তি দেখিস বিষ্ণুর, কিন্তু ইনি ধর্মরাজ নামেই পরিচিত...

—দেখ্ দেখ্, পাথরের প্রদীপ দেখ্...

—ডানদিক ভাঙা... কিন্তু ইনি বৌদ্ধ দেবী বজ্রতারা... আর... এইগুলো সাবধানে রাখিস মা রথে! পাথরের হাতিয়ার সব... তবে ভাব্ এ জায়গা কত প্রাচীন... কত প্রাচীন... আরে, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। কোনোদিন এখানে ছিল প্রস্তর যুগের সভ্যতা সেদিন সমুদ্র ছিল দূরে... তারপর গড়ে উঠল অন্যান্য সভ্যতা... নয়তো সমুদ্রের পাড়ে... এখানে ওখানে মাটি খুঁড়তে এত কিছু বারায়?

—কি হবে তা হলে?

—কি আর হবে! বারদালানের সঙ্গে তো হল ঘর, আরও দু'খানা ঘর...বারদালান ঘিরে নিলে আরোই জায়গা! লাইব্রেরিটা রাখিস... আর আমার চোখ থাকতে থাকতে প্রত্ন সংগ্রহশালা একটা করে ফেলি...

—চোখ থাকতে থাকতে বলো কেন?

—ঘন ঘন চোখ দেখাই.... চশমা তিনবার পালটালাম... নোটিশ দিচ্ছে, বুঝলি কিছু?

—এ সব ভেবো না। নোটিস কিসের?

—আরে! ওগুলোই তো নোটিস।

বলতে বলতে জ্যাঠা নির্মল ও শুভ্র হাসি হাসতেন। বললেন, চোখ নোটিস দেয়। রথে। বলে এবার আমরা যাব।

আমি বলি—এটা কি বেইমানি কর? আমার জন্ম হতে তোমরা আছ। এখন গেলেই হল?...

না রে রথে! দেহকে দেহ বলে মানি নি! তেভাগা কালে পুলিশ ঢুকতে দেই নি গ্রামে। তোর বড় মা কত বলেছে, দেহকে দেহ বলে মানুন! ঘাস নাই, জল নাই, সে ঘোড়াকে ছুট করালে ঘোড়া বাঁচে?

বড় মা শুনলে বলত, কবে বা শুনলেন, কবে বা বুঝলেন! খেতে বললে খান না, লোডশেডিংয়ে টর্চবাতি জ্বেলে আপনার মাটি-পাথর দেখেন...বড় মা-র গলা ভেঙে যেত।

আজ মেয়েটির মনে হয়, বড় মা না থাকলে তাদের কি হত! ছোট বেলা তাদের ভাইবোনদের জন্মের পর সব দায়িত্বই তো বড় মা পালন করেছেন। স্নান করানো, খাওয়ানো, রুটিন মেনে চলার অভ্যেস, কি না করেছেন।

ওর লেখাপড়ার দিকে জোর দিয়েছেন জ্যাঠা। তিনি তো শিক্ষিত। কাজের মানুষ। অন্য জগতের বাসিন্দা।

আর জোর দিয়েছেন মা। নিজে লেখাপড়া করার সুযোগ পান নি। ওকে বলতেন, তোর জেদ আছে, তুই পড় মা!

আর জ্যাঠা বলতেন, পড় তুই রথে! যতদূর পড়বি, পড়াব। আমার পরে তুই দেখবি আমার প্রত্ন সংগ্রহশালা।

গ্লুকোমাতে জ্যাঠামশাই একদিন অন্ধই হয়ে গেলেন। মনের জোর কি! বললেন, আমি ওর চোখ দিয়ে দেখব, পড়ব। এই সংগ্রহশালা তো ওর। ওই সংগ্রহশালা নিয়ে স্থানীয় কাগজ লেখে, ততদিনে তার ক্যাটালগও তৈরি হয়েছিল। জ্যাঠার কাছে আসত বিকাশদা। সে বলল, একটু প্রচার দিই। এখন তো আগের চেয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, জেলা নিয়ে গর্ব করে।

ততদিনে আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে গেছি। মাধ্যমিক পাশ করতেই জ্যাঠার আনন্দ আর

ধরে নি। উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করতে বললেন তুই পড়ে চল মা। সমাজের চোখ তো খুলছে। আজ মেয়েরাও পড়ছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি কি বলত না, বিয়ে তো দিতে হবে!

এও বলত, অনেক পড়াশোনা করলে সে মেয়ের বর মেলা দুষ্কর হয়। আমার জ্যাঠা বললেন, ও যে শুধু পড়ে, তাই নয়। ওর মনপ্রাণ উদার, ও সাহসী। আর সকলের সঙ্গে ওর তুলনা কোর না।

আজও মনে আছে সেটা ছিল স্বাধীনতা দিবস। আমার বয়স উনিশ। সবে উনিশ। তার আগে অনেক কাণ্ড করেছি, যা বড় বোনরা করেনি। ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলেছি।

খেলেছি ডাংগুলি।

এক সময় মায়ের বড় চিন্তা হয়েছিল, মেয়ে পুতুল খেলতে চায় না কেন?

খেলেছি, পুতুল খেলেছি।

পুতুলের বিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু আমার পুতলরা ছিল প্রগতিশীল। কেউ অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। কেউ দশম শ্রেণিতে।

বিয়ের সময়ে গ্রাজুয়েট বর খুঁজতাম। শৈশব কতই মধুর। বড় হয়ে গেলে বাস্তব জীবন কতই অন্য রকম। আমার খেলুড়ি বন্ধুরাও ওদের পুতুলদের গ্রাজুয়েট, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার বানিয়ে নিত।

বড় হবার সময়ে যা ইচ্ছে পড়ো, যথা ইচ্ছে খেলো, জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে এত স্বাধীনতায় বড় হওয়া, সে এক বিশেষ সৌভাগ্যই বটে।

গ্রামটি জ্যাঠার যৌবন থেকেই রাজনীতি-প্রভাবিত গ্রাম। আর আমার বক্ষে গেঁথে গিয়েছিল বিশ্বাস, "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানবজাতি।" এটা বিশ্বাস করতাম বলে আমি যেন এক বিশাল বিশ্বের নাগরিক, এ রকমই রোমান্টিকতা ছিল আমার।

খুব রোমান্টিক। খুব বিশ্বাস ছিল ছাপানো বিবৃতিতে, সরকারি ঘোষণায়। কিন্তু ১৫. ৮.১৯৮৫, ও এল আমাদের বাড়ি। ও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে। এল প্রত্ন সংগ্রহশালা দেখতে। সহসা দুজনেই দুজনকে যেন চিনে ফেললাম।

ছাপা অক্ষরে, নেতাদের ঘোষণায়, রাজনীতিক বিবৃতিতে বিশ্বাস করে বড় ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম সমাজ খুবই বদলে গেছে।

সে কথা পরে বলব।

কিন্তু ওকে চিনতে আমি ভুল করিনি। দশ-এগারো বছরের কথা কি বলব। এতটা অবধি লিখে ফেললাম। নাইবা থাকল কালি। না থাকল কাগজ।

এখন আমি ঘুমাতেই পারি।

কত না দিল আমাকে সমাজ ও সংস্কৃতির নেতারা, কত উপহার!

অ্যাংজাইটি নিউরোসিস!

যখন তখন বুক ধড়ফড়, শ্বাসের কষ্ট!

উচ্চ রক্ত-চাপ!

যিনি আমার জন্যে সতত গর্বিত থাকতেন। তিনি বলতেন, সাহস হারাস না মা!

সেই জ্যাঠা আমাকে দেখলে কি বলতেন?

হয়তো বলতেন, শ্রেণিচরিত্র না পালটালে মানুষ বদলায় না রে মা! জ্যেঠু! এদের শ্রেণিচরিত্র

পালটাবে কি? ভাবতে পারো। আমি আর ও এগারো বছর ধরে কী দাম দিয়ে চলেছি?

মুসলিম হয়ে হিন্দুকে বিয়ে করলে তাকে "ধর্ম" স্থানে "হিন্দু" লিখতে হবে। অবশ্যই হিন্দু হয়ে নিতে হবে) স্বামীর পদবিও গ্রহণ করতে হবে?

আমাদের রাজ্যেও?

রাজ্যবাসী প্রগতিশীলদের চোখ যে "থেকেও নেই।" ওদিকে কাগজে পড়ছি, মালদায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আদিবাসীদের ধরে ধরে "হিন্দু" বানাচ্ছে।

আর ভাবতে পারি না আমি।

থাক, এখন আমি ঘুমাতেই পারি।

কি যে হয়েছে আমার। ঘুমের মধ্যেও কারা যেন ভয় দেখায়।

কি রকম নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর চেহারা তাদের। আমি ঘুমের মধ্যেই ওর হাত খুঁজি।

বুঝতে পারি ওর আঙুল চলছে আমার চুলে বিলি কাটছে। তাতে আমি যত শান্তি পাই। দিনে একশো টাকার ওষুধ আমাকে সে শান্তি দিতে পারে না।

ভালোবাসা কি অপরাধ?

মানবিক বিচারবোধ আশা করা? সেটা কোন্ ধারায় পড়বে? জ্যাঠা গো! তোমার নয়নমণি মেয়েটা কিছু জানে না।

আটটা পাতা চিল ন'টা
তুমি আনো জাম পাতা।।

কোনোদিন, কোনো অবিস্মৃত শৈশবে মেয়েটা এ ছড়াটি বলেছে বেণি নাচিয়ে, ঘুরে ঘুরে, দুলে দুলে। শৈশব স্মৃতিতে থাকে। অনেক বয়সে (ছত্রিশ যদি অনেক বয়স হয়, মন যখন দগ্ধ, দীর্ণ, রক্তাক্ত, তখন মনে মনেই দৌড় লাগাতে হয় পিছন পানে। শৈশবের স্মৃতিতে হারিয়ে যেতে হয়। সবাইকে নয় বিশেষ কিছু মানুষকে।

সেই মেয়েটার কথা ও কতই লিখল স্বপ্নের অতলে তলিয়ে। স্বপ্নে গা ভাসাতে বড় ভালো লাগে গো! একদিন কিশোরী মেয়েটা ওদের পুকুরে সাঁতার কাটত। তুলে আনত হেলঞ্চা, কলমি, শুশ্‌নি শাক। একবার এক গোছা কচুরিপানার ফুল এনে বলেছিল, কি সুন্দর রং দেখ দেখ!

জ্যাঠা বলেছিলেন, ওই ফুলের রং তো ভালো। কচুরিপানা যে জল নষ্ট করে? মশা হয়? দেখতে ভালো। কিন্তু এত দোষ তার? মেয়েটা ফুলগুলো ফেলে দিয়েছিল।

ছেলেটি বলেছে। ওর কাগজের জন্যে লিখতে। কি লিখবে ও?—যা ইচ্ছে হবে তাই।

খুব মন দিয়ে মেয়েটি প্রত্ন সংগ্রহশালার ওপর একটি লেখা শুরু করেছিল। সে বয়সটা খুব ভালো। মনে আনন্দ থাকে। উৎসাহ থাকে। ছেলেটার বিষয়ে ও খুব কম জানত। ছয় বছর ধরে দিনে দিনে ধীরে ধীরে জেনেছে। সহজে ছেলেটা খুব খোলে নি, ধীরে ধীরে।

ধীরে, ধীরে.... দিনে দিনে... মেয়ে তো কলেজেও ভর্তি হল। আর ওর সঙ্গে দেখা হবে বলেই দুজনে একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম.এ. পড়েছিল।

—পড়ে তুমি কি করবে?

—বি.এড. পড়ব। এম.এ.বি.টি হবো। তারপর...

তারপর শিক্ষকতা করব। মেয়েদের পড়াব। এ আমার স্বপ্ন, জানো?

—কতদিন বা চাকরি করতে পারবে?

—সরকারি নিয়মেই চাকরি করব। বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, না ছত্রিশ বছর হবে, তখন ছেড়ে দেব।

—তারপর?

—তুমি যেমন কাজ কর, তেমনি কাজ করব... নয়তো অন্য কিছু নয়তো অন্য কোথাও...

—কিন্তু আমাদের তো তার আগে...

সব কথা মেয়েটি বলত না। ও আর ছেলেটি দুজনেই আদর্শবাদী। দুজনেই রোমান্টিক। দুজনেই মনে করত, আমরা হিন্দু বা মুসলিম নই। আমরা স্বাধীন ভারতের দুজন নাগরিক মাত্র। সেই জন্যই মিলিত হব। ছেলেটি বলেছিল, সবাই মেনে নেবে না।

—জানি।

—ধীরে ধীরে মেনে নেবে।

—আমাদের কাজ তো যা বিশ্বাস করি, তা জীবন দিয়ে প্রমাণ করা। জ্যাঠা তাই বলতেন।

—তিনি অন্যরকম মানুষ ছিলেন... কিন্তু সামাজিক সংস্কার অত সহজে যায় না, কিছু আপস করলে হয়তো...

—বাড়িতে বা কি ধর্মাচরণ করি? তুমি নিশ্চয় আমাকে... ধর্মান্তরিত হতে বলছ না?

—পাগল! আমার বাবার কথা তুমি তো শুনেছ। আমার জন্ম, শিক্ষারম্ভ সবই বাংলার বাইরে রেলওয়ে কর্মী আমার বাবা কত না সংগ্রাম করেছেন। একবার কত মাস মাইনে পান নি... শ্রমিক ইউনিয়ান করে জেলে গেছেন...তিন বছর চাকরি থেকে বসিয়ে দেয়...জরুরি অবস্থা কাটল, জনতা সরকার এল, তখন কাজে আবার বহাল হলেন। একদিন বুঝলেন, এমন ভাবে আর চলবে না... তুমি নিজেদের বাড়িতে থাকো, তুমি বুঝবে না একটা থাকার জায়গা না থাকলে কি অবস্থা হয়.

—তোমরা গোরখপুরে বাড়ি করার কথা ভাবনি?

—না। দেশ ভাগ হবার পর থেকে আপনজন বলতে যাঁরা, সবাই এখানেই চলে আসেন বাবা একা গিয়েছিলেন অন্য রাজ্যে।

একটু হেসে বলে। তখন কাজকর্ম পাওয়া যেত। বাবার কাছে শুনেছি টাকার দাম ছিল।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। নীরবতা কখনো নিঃশব্দ। কিন্তু দুজনের মৌনতা বড় মুখর ছিল।

খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি বলেছিল, জ্যাঠা বলতেন, এক সময়ে টাকা, আনা, দু'য়ানি, সিকি আধুলি, পাই, আধলা কত রকম না মুদ্রা ছিল! জ্যাঠারা ছোটবেলা গ্রামের হাট থেকে এক পাই দিয়েও শাক, ডাঁটা কিনেছেন।

—কি যে বলো! তোমাদের ঘরে তো সবজির চাষ হয়। আমি দেখি নি?

—যে বছর জল নেই। সে বছর? জ্যাঠা বলতেন, তিন পাইয়ে এক পয়সা,—বারো পাইয়ে এক আনা। চাষি বউ আঁটি আঁটি শাক দিচ্ছে এক পাইয়ে। কিনব না? হ্যাঁ। তুমি যা বলো। ঠিকই তখন টাকার দাম ছিল।

—এখন টাকার দাম থাকছে না।

—তাই তো বলি। আমাদের বিয়েতে শর্ত একটাই। আমরা কোনো ধর্মের উল্লেখ করব না

চিরদিন যেন এই জেদটা বজায় থাকে। যে বিয়েটা করছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আমার পদবি নিশ্চয় "সেন"। তেমনি নামটাও ইন্দ্র। ইন্দ্রসেন নামেই বিয়ে হবে। যারা বিয়ে দেবে। তারা ভেবে মরুক নাম কোন্‌টা পদবি কোন্‌টা।

—আর আমি?

—নাম তো জব্বর দিয়েছিলেন জ্যাঠা। সে নামে কি চলবে না?

—চলতেই হবে। নামটিও তো সুন্দর। কি রকম পুরনো রোমান্সের গন্ধ নামটাতে।

—আমার মতো দস্যি, দুর্দান্ত, বেপরোয়া মেয়ের নাম কেউ লয়লা দেয়?

—লয়লাই তো! আমার খু—ব ভালো লাগে। জানো, ছোটোবেলা আমরা একটা ছোট্ট নদীর ধারে যেতাম। নদীটার নাম নৈনা। নৈনার ওপারে বাবাদের টেলিম্যান, আমাদের জগদীশ আংকেলের ঘর ছিল।

—নদীতে স্নান করেছ?

—অল্প জল, তাতেই ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। মা নিয়ে যেতেন আটা আর ঘি। জগদীশ আংকেলের বউ বানাতেন বেগুন-মুলোর ঝাল তরকারি। গরম পরোটা আর তরকারি খেয়ে নিতাম সবাই। আংকেলের মেয়েটা কি দুষ্টু ছিল! একশো রকম ভূতের গল্প বলত আর ভয় দেখাত।

—ভয় পেতে?

—বয়ে গেছে। বলতাম, টাউনে ভূত বিক্রি হয়। এক হাঁড়ি ভূত কিনে এনে ছেড়ে দেব। তখন টের পাবি।

—ভূতের গল্প তো কতই শুনেছি। আমার কোনোদিন ভয় ছিল না। জ্যেঠা বলতেন। "ভূত" শুনে শুনে বড় হলাম। এখনো ভূত দেখলাম না।

—ভয় ব্যাপারটাও অমূলক, বুঝলে?

—আমাকে বুঝিও না মশাই। তুমি হাজার হলেও জেলা সদরে ফিরবে। আমি তো খানিক যাব রিকশায়। তারপর হাঁটব। পথের একদিকে গোরস্থান। অন্য দিকে আদ্যিকালের ভাঙা মসজিদ।

কোনো দিন। কোনোদিন ভয় ছিল না মেয়েটির। এখনও কি আছে? নেই। কিন্তু আজ। সেদিনের এত বছর বাদে মেয়েটির মনের ওপর দিয়ে যে অপ্রত্যাশিত বালুঝড় বয়ে গেছে। তাতে মনের বহিরাবরণ ক্ষয়ে গেছে।

এখনও বিরক্ত হয়। সব সময়ে মনে হয় একটা টেলিফোন। দরকার টাকা। নাম ধরে ডাকা। এ কোনো শত্রুর হবে।

শত্রুরা কি করে? কিছু না, কিছু না, চোখের দৃষ্টিতে, স্বল্প কথায় বুঝিয়ে দেয়। আমরা নজর রেখেছি।

নজরবন্দি। গৃহবন্দি, লকাপবন্দি, "বন্দি" শব্দটির আগে এত শব্দ জুড়ে থাকে কেন?

কিন্তু বন্দি তো অন্য রকমও হয়। কৈশোরে মেয়েটি যখন যে বই পায়, গোগ্রাসে পড়ে, তখন কি একটা হাটুরে বইয়ে পড়েছিল। "নয়নতারা ও কিশোরমোহন, এ-উহার প্রেমের বন্ধনে বন্দি হইলেন।" মেয়েটি পড়ত। অন্য মেয়েরা শুনত। তারপর বলত, কি বললি? "বন্দি হইলেন?" বলে হেসে গড়াগড়ি যেত।

জ্যাঠামশাইদের ছাপানো "শহীদ স্মরণে" সিরিজের বইগুলোও মেয়েটি পড়ে শোনাত। তবু

শ্রোতারা বলত। "মাঝে মাঝে প্রেমের গল্পও শোনা ভাই! তুই যেমন অ্যাকটিং করে পড়িস, মনে হয় চোখে দেখতে পাচ্ছি।"

হ্যাঁ, মেয়েটি জানে। আবৃত্তি করলে করতে পারত। নাটক করলে করতে পারত। অনে—ক কিছু করতে পারত। কিন্তু এম.এ. পাস করার পর বিয়ে করে ফেলাটাই খুব জরুরি মনে হয়েছিল দুজনের। সমর্থক কি ওদের ছিল না? ছিল। ছিল। অনেক ছিল। আজও কেউ কেউ আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। পূর্বার কথা ভাবলেই দুঃখ হয় মেয়েটির।

পূর্বা আর দীপের এত প্রেম। এত প্রেম। কিসে যে সব বিগড়ে গেল কে জানে। ইনি গেলেন উত্তরে, তো উনি গেলেন দক্ষিণে। দুজনেই রাজ্য সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হল। পাশও করল। পূর্বা গেল কোচবিহারে। তো দীপ গেল দক্ষিণে, ডায়মন্ডহারবারে। মেয়েটি শুনেছে, দুজনে এক জায়গায় থাকতে পারছে না বলে সেই চেষ্টা চালাচ্ছে আজও।

কয়েকবার এসেছে পূর্বা। এবার এসেছিল মেয়েটির কাছেই। পুরনো বন্ধুদের খবর দিল অনেক। মালবী যে স্কুলে পড়াচ্ছিল, সেই স্কুলের শিক্ষককেই বিয়ে করেছে। তমলুকে বাড়ি করেছে দুজনে। স্কুলের মেয়াদ ফুরোলেই বাড়িতে 'গোলাপি স্বপ্ন' বা 'রোজি ড্রিম' নামক একটি প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলবে।

মেয়েটি জিগ্যেস্ করল। মালবী মা হয়েছে?

—নিশ্চয়। একটা মেয়ে।

—আর সবাই? তোরা কি এখনও...?

পূর্বা বেশ সহজে বলল। কাছাকাছি পোস্টিংও হচ্ছে না। আর বাবা মারা যাবার পর মা আর ভাই আমার কাছেই থাকে। ভেবেছি, দীপকে বলব। তুই এবার বিয়ে করে ফেল্। এত বছর অপেক্ষা করলি। আবার আমার মা-ভাই, ওদিকে তোর বোনের বিয়েও ঠেকে আছে, বিয়ে কর। আমার... বয়সও তো কম হল না।

মেয়েটি বলল, তোর কি হবে পূর্বা?

—কে জানে, বল? ভাবেই বা কে? সত্যি বলতে কি, মা অবধি মাঝে মাঝে বলে। ভাই নিশ্চয় কোথাও ঢুকে যাবে। তখন তুই আর আমি।

—এ তো স্বার্থপরের মতো কথা, পূর্বা!

—এ রকমই হয়। শোন্। তোরা দুজন আমাদের ভাড়াটেয়ার বাড়িতে যেতেই পারিস। একটা ঘর, একটা বসার ও খাওয়ার ঘর...বাথরুম...কিচেন...

—ভাড়া কত?

—তোরা যা পারবি, তাই দিবি!

—মাসিমা রাজি হবেন?

—বাড়িটা তো আমি কিনেছিলাম। আমার ফ্ল্যাটটার সঙ্গে ওটাও পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাড়াটে বাড়ি করে চলে গেল।

—কত ভাড়া রে?

—ওরা তিন হাজার দিত। তোরা যা পারবি। তাই দিবি। এটুকু আমি করতে পারি।

—না রে! ভাবিস না। আমরা অনেক কম দিই। তা ছাড়া এখানে থাকাই...

পূর্বা আর কিছু বলল না। বলল, তোদের খবর আমি রাখি রে! তাপস জানায়। চিঠি লেখার অভ্যাস চলে গেছে। তাই লেখা হয় না।

এরকমই হয়ে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক। যেমন চিরকাল হয়ে থাকে। ত্যাগ করেনি সেদিনের বন্ধুরা। কিন্তু জীবনের গতি যেন নানামুখী রেলপথ। একেকজনকে একেক দিকে নিয়ে গেছে।

ওরা তো জানত ওরা দুজন চেনা ভূগোলেই থেকে যাবে। অন্য কোনো জগৎ ওরা জানে না। ওরা এটা জানত না, যে অত্যন্ত আদর্শবাদী, মৌখিক বা মুদ্রিত বিবৃতিতে অত্যন্ত বিশ্বাস, এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানবজাতি" কবিতাকে পৃথিবীর শেষ ও চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করা ভালো। খুবই ভালো কথা। কিন্তু এত বিশ্বাসী থেকে গেলে মনের গভীরে আত্মরক্ষায় চেতনা গজায় না।

মন থেকে যায় একদিনের আদিম জনজাতিদের মতো। যারা জানত না। চিনত না শিকারিদের। যে জন্য তারা নিঃশেষে সব হারিয়েছে।

অত্যন্ত নিষ্পাপ থাকে যারা, তারা হয়তো পাপী। নইলে তারা এত শাস্তি পায় কেন? নিষ্পাপ থাকাটা যে অনেকদিনই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে গেছে। তার ছেলেটি, বা মেয়েটি জানত না। কানুদা এবং তার অটো যেমন।

কানুদার মতো ওরাও জানত না স্বপ্ন দেখাটা এক মস্ত অপরাধ আজকের দুনিয়ায়।

প্রতিপক্ষও জানত না। স্বপ্নে বিশ্বাসীদের হাতেই থাকে শেষ আয়ুধ। ওরা আক্রমণকারীদের হারিয়ে দিতে পারে।

৫

"টোনাটুনির বিয়াতে বাদ্যভাণ্ড নাই"

না, ওদের বিয়েতে বাদ্যভাণ্ড ছিল না। ছেলেটি আর মেয়েটি ভাবত, সংসারের কি, সমাজের কি, পাড়াপড়শির কি, একটি ছেলে, একটি মেয়ে বিয়ে করছে যখন?

এমন নয় যে এ-ওর বাড়িতে, আর ও-এর বাড়িতে একেবারে কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হয় নি।

এ রকমটাই তো সমাজের শিক্ষিত অংশেও। যত আপত্তি একটি ধর্মের বেলা।

এর পিছনেও আছে যুগযুগান্তের সংস্কার!

ছেলেটা বলে, সকল ধর্মে বিয়ে করতে পার। একটি ধর্ম নিষিদ্ধ। এ কি বিচার!

—কতকাল ধরে চলছে?

—কে জানে!

—তোমায় বাড়িতে কি বলে?

—কি বলবে বলে মনে করো? তারা তো জানে, আমি যা ঠিক করব। তাই করব। সমাজ কি বলবে, সেই কথাই ভাবে।

—এমন বিয়ে কি হয় না? আমরাই তো চিনি মণিমালা দিদিকে।

—হ্যাঁ, চিনি...

—আমাকে একটা কথাই বলে। জানি বন্ধু হয়, জানি অনেক দিনের বন্ধুত্ব...

কি বলে? "তা বন্ধুই থাক্‌না?"

মেয়েটা হেসে ফেলে। বলে, তাই বলে।

যাক গে, গুলি মারো তো! চলো নোটিশ দিয়ে আসি।

—স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্ট তো?

—আর কি! সেখানে, কিন্তু নাম, পদবি, সব লিখতে হবে।

—তাই লিখব।

—অমনি করেই ওদের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। মেয়েটির নাম শুনে বাড়ির মালিক চমকেও যান। বলেন, আপনাকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছি... জানিও অনেকদিন....

—আমি তো সেই আমিই আছি। তফাতের মধ্যে একটা বিয়ে করেছি, তাই মাত্র।

—হ্যাঁ... কিন্তু...

—অত ভাববেন না তো! অত ভাবার কিছু নেই।

—পাড়ায় কি বলে, সেটাও সমস্যা...

ছেলেটি মিষ্টি হেসে বলে, কি বলবে? কেন বলবে? ওর বাড়িতে কেউ বলল না, আমার বাড়িতে কেউ বলল না... পাড়ার লোকে কি বলবে। তাই ভাবব?

—আপনাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবে?

—থাকব তো, দেখতেই পাবেন।

দু'দিন পরে ওদের বন্ধুরা এসে সবাই চা সিঙাড়া খেল। গল্প করল, গান গাইল, বাড়িওয়াল আসেন নি। ওপর থেকে সব দেখছিলেন, শুনছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ওরা অন্যরকম!

—কিন্তু...

—কি?

—আমাদের না কথা শুনতে হয়।

—যখন বলবে, তখন দেখা যাবে। দেখেছি মেয়েটাকে, কতজন আসত, সেও আসত। কি করে জানব...

—ভাগ্যে আমাদের একটাই ছেলে, থাকেও বাইরে। কে জানে সে কি বিয়ে করবে!

—যখন করবে, তখন ভাবব। তার তো সিধা কথা! নিজের পছন্দে বিয়ে করব।

—এখন এ রকমই শুনতে হবে।

ভদ্রলোক নিশ্বাস ফেলে বললেন। ছেলেটা দেখ কত ভালো। আমাদের বিপদে-আপদে পাই আমি আটকে গেলাম কেষ্টনগর, সে বাজারও করে দিয়েছে... সেই ছেলে এমন একটা কাজ করল কি করে?

—কি করে বলব? এখন শুনছি, অনে—ক দিনের পরিচয়।

মেয়েটা কোনো জাদু করে থাকবে।

অথচ পরদিন যখন ছেলেটি বল্‌ল, মাসিমা! আমি কল্‌কাতা যাব একবার, ফিরতে বিকেল ও একলা রইল।

তখন ভদ্রমহিলার মুখে কোনো রুক্ষ কথা আসেনি। উনি অসহায় আত্মসমর্পণে ঘাড় নেড়েছিলেন।

আর মেয়েটি? সংসারে কিছুই যেন নেই। বন্ধুরা এল তো দোকান থেকে মাটির ভাঁড়ে চা এল। ইস! জানলা দরজার পর্দা চাই। স্টোভ আছে, থাকুক। কিন্তু একটা ছোট প্রেসার কুকার কি কোনোদিন কেনা যাবে না? ঝাঁটপাক দিয়ে গেল যে বৃদ্ধা, তার কাজ পরিষ্কার নয়। না, আজ ঘরে ফিরলে ওকে চমকে দিতে হবে। সাফসুতরো তো করে রাখা যাক। তারপর দুজনে বেরিয়ে একসঙ্গে একটু একটু করে কেনাকাটি করবে। একটু একটু করে...একটু একটু... এ শহরটা অবশ্য ও ভালোই চেনে। শহরেও অনেকে চেনে ওকে। হাজার হলেও জেলা সদর!

খুব ঘসে মেজে ঘর পরিষ্কার করে জানলা, বইপত্র সব ঝেড়ে মুছে অনেক কাজ করে স্নান করতে খেতে বেলাই হয়ে গেল।

ভেতর থেকে মস্ত একটা টেনশান নেমে গিয়েছে। সত্যি, বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত ও কিছুতে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

একবার বাড়ি গিয়েও ঘুরে আসতে হবে। না হয় ক'দিন পরে যাবে। তখনই যে আরও কি কি করতে হবে। ভেবে পায়নি মেয়েটি।

তবে বি.এড.-এ ভর্তি হতেই হবে। হতেই হবে তাতে কোনো সংশয় নেই। স্কুলে পড়াবে, মেয়েদের স্কুলে, এ ওর কতদিনের স্বপ্ন।

ছোটবেলা যখন স্কুলেও যায়। আবার পুতুলও খেলে। সে সময়ে ওর পুতুলদের কেউ কেউ তো শিক্ষিকাও ছিলেন। ওর বন্ধুরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিতেই যেন বর-পুতুলদের গ্রাজুয়েট, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বানাত। ওর জ্যেঠা বলতেন, হবে, ধীরে ধীরে হবে। সবাই স্কুল কলেজে যাবে। শোন্! শিক্ষা ছাড়া মুক্তি নাই। শিক্ষিত সমাজ সাপে কাটলে হাসপাতালে দৌড়য়, অশিক্ষিতরা ওঝা ডাকে।

জ্যাঠা মনে করতেন স্কুল কলেজের শিক্ষা খুব দরকার। "শিক্ষা" শব্দটির উপর খুব শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। মেয়েটিও ওই একটি শব্দকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

ছেলেটি বাড়ি ফিরেছিল ভুরু কুঁচকে। বলেছিল, তুমি তো ডাকাতে মেয়ে। ভয়ডর নেই। আমি না এলে তুমি একা দোকানে যেও না।

—যাব না?

কি দরকার? আর কি জানো... সরকারি কাজ তো নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান... আজ জানলাম। আমাকে বিহারে কয়েকটা জেলায় যেতে হবে... বিহার তো! আমাদের সার্ভে করতে যেতে হচ্ছে... হিন্দি-জানা লোক চাই।

নিশ্চয় যাবে।

মেয়েটিই ওকে বুঝিয়ে বলেছিল। সেটা ভালোই হবে। আমারও মনে হচ্ছে, প্রত্ন সংগ্রহশালার ভালো ব্যবস্থা করার জন্যে আমার এখনও ওখানে থাকা দরকার।

—সত্যি! তুমি এত বোঝ!

—তুমি যেন বোঝ না?

—হ্যাঁ, আমি আর তুমি দুজনেই বুঝি। ভাগ্যে বললে...আমি তো আজকেই ভাবছিলাম, টুকটাক কত কি কিনব। মানে সংসারে যা লাগে...ছেলেটি মনে মনে বলেছিল। এখনই আমাদের সংগ্রাম শুরু হবে গো! তুমি আর আমি... কেউ সহজে আমাদের ছাড়বে না। এ সময়টা বড়ই অন্যরকম বড়ই!

মুখে বলেছিল, এখন থাক না। এখন তো তোমার আর আমার জীবন নতুন করে শুরু হচ্ছে কত বড় কাণ্ডটা করে এলাম বলো তো? তবে সময়টা অন্যরকম...নির্ভর করার মতো মানু কম...খুব বুঝে চলতে হবে।

—তুমি একবার দেখলেও না ঘরদোর।

—দেখেছি মশাই। সব ঝকঝক করছে।

—করবে না? বাড়ির কাজও বড়মা-র কাছে শেখা, সে তো তুমি জানো।

—জানি আর ভাবি, আমি কি লাকি!

—কেন?

—আপনি আমাকে বিয়ে করেছেন বলে।

মেয়েটি হাসে না। বলে, সে তো হতেই হত। আর কিছু হতে পারত না কি?

৬

"এমন কাহিনি যেন আরো লেখা হয় বলিয়া
টোনাটুনি আকাশে উড়াল দিল।
কোথায় গেল?"

মাথা উঁচু করেই বাড়ি ফেরে মেয়েটি। ও চলে আসাতে বাড়ির মালিকরা যেন নিশ্চিন্ত হন। ওঁর দালানে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

মেয়েটি দেখছিল, দেখছিল বাসে বসে, সদর শহরটা সত্যিই বদলে যাচ্ছে, মনে পড়ছিল ছোটবেলা ওদের স্কুল থেকেও মাঝে মাঝে টাউনে আনত।

ব্যারাকপুরও দেখাত। কলকাতা এসেছে ও জ্যাঠার সঙ্গে।

কে জানত, কলকাতায় এসে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে একদিন?

বাড়ি এসে বুঝেছিল। সকলের চোখে অনেক জিজ্ঞাসা। মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন। তুই শে অবধি...

—হ্যাঁ মা! বিয়েই করলাম!

—কোথায়?

—বিয়ে দেওয়ার জন্যেও সরকারি আপিস থাকে মা! কাগজে সই করতে হয়।

—ওর মা...মেনে নিল?

—নিলে ভালো। না নিলে আমরা নাচার! এখানে সবাই অনেক কথা বলছে?

—আমি জানব কি করে?

—আব্বু?

—তিনির শরীরটাই খারাপ।

—অরুণ আসছে?

—বাবুল-কাবুল জানবে। তা তুই...?

—ও হয়তো আসবে যাবে, তবে এখন তো বিহার যাচ্ছে কাজে...এলে তোমাদের অসুবি হলে...আচ্ছা, আমি যে এলাম, তাতে...

—বাড়ির মেয়ে বাড়িতে এলে অসুবিধে? নে, আর ভাবিস না, কাপড় ছাড়, হাত মুখ ধে খেয়ে দেয়ে ঘুমা।

এখন আশ্বিন, হিমের মাস। অথবা শিশিরের মাস। জ্যাঠা বলতেন, আশ্বিনা শিশির! জ্যাঠা, মা, বড় মা, আব্বু, সবাই কেমন স্বচ্ছন্দে বাংলা মাস, সন, এ সবই বলেছেন। মেয়েটি ভাবে, মানসিকতা বদলে যায়। ওরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বলেই অভ্যস্ত।

বাংলার মাসের নাম শিখাতে যে ছড়াটা ওরা পড়ত,

"বৈশাখ মাসে পুষেছিলাম একটি শালিক ছানা
জ্যৈষ্ঠ মাসে গজাল তার ছোট্ট দুটি ডানা"

তাও তো সবটুকু মনে নেই। শেষ লাইন দুটো মনে পড়ে।

"ফাল্‌গুন মাসে দুষ্টবুদ্ধি জাগল তাহার মনে
চৈত্র মাসে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল বনে।"

কবিতাটা ও দুলে দুলে পড়ত। একবার স্কুলে বাংলা দিদিকে জিগ্যেস করেছিল, "দিদি! পালিয়ে গেল বনে" কেন লিখল? শালিক তো বনে থাকে না?

—কোথায় থাকে?

—বাঃ! উড়ে উড়ে ক্ষেতে এসে ধান খায় না?

—কোথা থেকে আসে ওরা? নিশ্চয় গাছে ওদের বাসা থাকে।

—ও!

—শালিক কত রকম হয়। গাং-শালিক হয়, জানিস? আমার ঘর ক্যানিঙে, আমি গাং শালিক দেখেছি।

ক্লাসে মেয়েরা হেসেছিল। দিদি বলেছিলেন, 'হাসছ কেন? ও তো চোখ দিয়ে পড়ে না শুধু, মন দিয়ে ভাবে।' তাই প্রশ্ন করে।

বাংলা দিদি ওকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' বইটা দিয়েছিলেন।

ওর মন কেমন করল ছেলেটির জন্যে। হ্যাঁ, ও তো বেসরকারি সংগঠনেই কাজ করে। ওদের অনেক বন্ধুরাই করে।

মেয়েটি তো তা করতে চায় না। ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সরকার অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম পড়বে, বি.এড্ হবে। তারপর আরাম্‌সে কোনো স্কুলে পড়াবে। সেই স্কুলেই তো পড়াতে হবে, যেখানে জেলার সব স্তরের শিক্ষার্থী আসে।

সে সাজ ও করে ফেলবে। ওদের দুজনের বুকেই গভীর বিশ্বাস। এ ভাবেই ওরা সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারবে।

এই তো! কে কি ভাববে তা না ভেবে ওরা যাতে সবচেয়ে খুশি হবে, সেই কাজটা, অর্থাৎ বিয়েটা করে ফেলল। এই মোটা বেণী বেঁধে, ওর প্রিয় হলদে-সবুজ ছাপা শাড়ি আর হলদে ব্লাউজ পরে গিয়ে হাজির হল। বিয়ের পর ওরা এসে ময়দানে বসেছিল। ময়দানে আলোর কাছে বসলে কত রকম মজা! বাদাম খাও। একটু একটু কথা বলো, আর সুখে ডুবে থাকো।

একসময়ে ছেলেটি বলেছিল, আমাদের বিয়েতে কলকাতার কি রিসেপশানের ঘটা, দেখ্!

—কোথায়?

—তোর আর বুদ্ধি হল না। পথের আলো ময়দানের আলো। একেই তো বলে আলোকসজ্জা!

—মানলাম।

—এই যে যার ইচ্ছেয় বাদাম-ডালমুট পানিপকৌড়া ভেলমুড়ি খাচ্ছে, এটা হল গে বিয়ের ভোজ।

—সেও হল।

—আর এই যে এত লোক ম্যাডাম! এরাই তো আমাদের বন্ধু। প্যানডাল চাই না। ওপরে আকাশ।

—বড্ড রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছিস!

—হতে দে, হতে দে! আজ দশই অক্টোবর, ১৯৯১ আমরা বিয়ে করেছি। গ্রেট!

—তুই তোর ব্রজদাকে ডাকবি না। সে সবসময়ে তুলনামূলক ধর্মাচরণ নিয়ে বই লেখে। আর শোনাতে আসে। বেজায় বোর!

—ঠিক আছে। বলব না। তবে ওর বক্তব্যটা হচ্ছে, প্রত্যেকটি হিন্দু প্রত্যেকটি মুসলিমকে, নয় বৌদ্ধকে, নয় ক্রীশ্চানকে বিয়ে করুক।

—বুঝলাম, কিন্তু শোন, ও কেন বলে না, জাত ধর্ম চুলোয় যাক, মানুষে মানুষে বিয়ে হোক।

—সেটা হয়, সমাজের একটা ছোট্ট অংশে হয়।

—সর্বোত্তর হবেও না। পণের দাবি কি কম বেড়েছে? কোন্ সমাজে পণ নেই বলতে পারো?

—ভাবিস না তো? চল্ উঠে পড়ি। যেতে তো হবে।

—যাব, যাবই তো।

ছেলেটি আস্তে বলল, আমরা এখন দুজনেই থাকি। জীবনটা নিশ্চিন্ত হলে আর কিছু ভাবা যাবে।

—কানুদাকে দত্তক নিতেই পারিস। ও তো তোকে এটা নিন মা। ওটা নিন মা বলে।

—কি বুদ্ধি তোর। তাই ভাবি।

—নিশ্চয়। জেনে রেখো তুমি একজন বেজায় বুদ্ধিমান লোককে বিয়ে করেছ।

—তুমিও একটা জেদি, রাগি, বুদ্ধিহীন গোঁয়ার মেয়েকে বিয়ে করেছ। অসম্ভব বেপরোয়া মেজাজে ওরা ট্যাক্সি টেপেই শেয়ালদা পৌঁছেছিল। ট্রেনে এ-ওর হাত ধরে বসেছিল। ছেলেটি বলছিল, থাক থাক। কে দেখে ফেলবে!

মেয়েটি বলেছিল, দেখলে দেখুক, চুরি করেছি না কি?

মেয়েটি লিখেছিল, তুই ভালো থাকিস আমি ভালো থাকব। শুধু ভাবছি, কবে আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারব। জীবনটাই তো সামনে পড়ে আছে, কত কাজ না করতে চাই।

" এলাটিং বেলাটিং সই লো!
মনের কথা কই লো!
কি কথা, সই লো?
(শোন্), রাজার খবর আইলো
কি খবর আইলো?
(খবর) শুনে ডরাই লো
কেন্ বা ডরাস, সই লো?

(রাজা) একটি বালিকা চাইল
একটি বালক চাইল
কেন চায়, সই লো?
বুঝি বা শাস্তি দিবে
বুঝি বা ভয় দেখাবে
'কেন', জানিনা সইলো!
ডরাস, তো ছাই খাস,—
ডরিলি কি মরিলি
ডর করি না সইলো!"

মেয়েটিকে তো এ ছড়া বানিয়ে বানিয়ে নিজেকেই বলত মনে মনে। বেশ করেছে, একটা মেয়ে একটা ছেলে বিয়ে করেছে। তাতে তোমাদের কী গো। তোমাদের কী?

তোমরা কি রাজা উজির?
তোমরা কি মন্ত্রী নাজির?
তোমরা কি বড় কুটুম?
তোমরা কি হাকিম হুকুম?

তোমাদের কথা টোনাটুনি মানে না। মানে না।

মানে না। যেথা ইচ্ছা যাও! কচুপোড়া খাও! পিছু ছাড়ো না কেন? কত শত বছরের অভ্যাস তোমাদের?

সম্ভবত অনেক বছরের। কেননা ওরা খোঁজ রাখছিল। খোঁজ রাখছিল। বিয়েটা তো হয়েই গেছে, এ খবর মুখে মুখে জানাজানি হয়ে গেছে। কত কথাই না শোনা গেল!

—এরে কয় সমাজকর্মী ছেলে! ক্যান্, স্ব-সমাজে মাইয়া ছিল না?

—ছাড়েন ছাড়েন। মুখ দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছখানা উলটাইয়া খাইতে জানে না!

—আমি ওকে কোনোদিন বিশ্বাস করি নি।

আপনার মুখে এ কথা সাজে না। সেদিন ও না থাকলে আপনার জামাই হাসপাতালে পৌঁছত না। ওর অপারেশনও হত না।

—মেয়েটারই দোষ!

—তাই। এমন ছেলে পেত কোথা?

এমন কথা মৌমাছির মতই ছড়ায়। কথাগুলোয় হুল আর বিষ দুই ছিল। তারপর শুরু হল পত্র বোমা বর্ষণ।

—তুমি আমার বোনের মতো। তুমি ভাবছ, সে বিহারে গেছে। সে কোথায় কার সঙ্গে কি করছে যদি জানতে চাও...

—তুমি আর লোক পেলে না? তোমার এমন...

—লোকটার নামে ক'টা ডিভোর্সের কেস আছে তা জানো?

মেয়েটির বাড়িতেও এমন সব পোস্টকার্ড যেতে থাকল আর মেয়েটি স্পষ্ট বুঝত। ইচ্ছে করে এ সব চিঠি পোস্টকার্ডে লেখা, যাতে লোক ইচ্ছে করলেই পড়তে পারে...

এ এক এমন আক্রমণ কৌশল, যা একটি মেয়েকে চূড়ান্ত অস্থির করে দিতে পারে। মেয়েটি তো শিক্ষিত, সভ্য, মার্জিত।

সব চিঠির হাতের লেখা এক রকম নয়। কোনো কোনো চিঠির হাতের লেখা খুব সুন্দর, ভাষার ওপর দখল আছে, তা বোঝা যায়।

কবে যে ফিরবে ছেলেটি, কবে যে!

ছেলেটিকে ও লিখেছিল, চিঠি পড়ে চেঁচিয়ে গালিগালাজ করতে ইচ্ছা যায়। অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে। কবে যে আসবে তুমি, কবে যে! উদ্বিগ্ন ছেলেটি অনেক বলে কয়ে তিনদিনের জন্যে আসে। মেয়েটি তো কান্নায় আছড়েই পড়ে ওর কাছে।

এখন ছেলেটিকে মা, ভাই, সকলের সঙ্গে কথা বলতেই হয়। বলে, আপনি তো বুঝতেই পারছেন...

—বিয়ে করেছ বলে এই আক্রোশ!

—এর তো কোনো যুক্তি নেই!

ক্ষীণ হেসে ওর বাবা বলেছিলেন। আছে বই কি! ভারতে সকল ধর্মের লোক সকল ধর্মের লোককে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু এই দুই ধর্মে তা চলে না।

মেয়ে বলেছিল, কেন চলবে না? বিয়ে হচ্ছে, তারা কাজ করছে, বাড়ি ভাড়া নিয়েও থাকছে...

ছোট জায়গায় সব ঘটনাই বড় বড় দেখায়। কলকাতায় যা চলে, তা এখানেও...

—এ তো সাম্প্রদায়িকতা আব্বু!

—সে যাই বলিস! সাবাসের কাজ করেছ মা! কিন্তু সমাজ তো তা মানতে চায় না।

ছেলেটিও বলল, আমরা কোথাও একটা ধাক্কা দিয়েছি। তার প্রতিক্রিয়া এগুলো!

—এ নিয়ে তুমি কিছু করবে না?

—দড়ি নিয়ে বাতাসের গলায় ফাঁস দিতে দৌড়াব? তা কি হয়?

—তাহলে উপায়?

—ও গুলো অবহেলা করা, আর উপায় কি! বড় শহরে সবাই ব্যস্ত, মানুষেরা কাজ করে কূল পায় না। ছোট শহরে এ একটা মস্ত ঘটনা। মেয়েটি বলে, সাম্প্রদায়িকতা!

—কিংবা মৌলবাদ। কিন্তু তা বেড়েছে, সে তো দেখাই যাচ্ছে।

—রাজনীতিক ব্যর্থতা নয়?

—হয়তো সার্বিক ব্যর্থতা! সে জন্যই আমাদের অতন্দ্র থাকা দরকার। হঠাৎ ওরা ঝরঝড়িয়ে হাসতে পারল। ওদের বন্ধু অতন্দ্র, বক্তৃতা বা আলোচনা শুনলেই ঘুমিয়ে পড়ে। ওরা কত বলেছে, তোর নাম অতন্দ্র, তা তুই অত ঘুমোস কেন?

অতন্দ্র বলে, ভাই! ওই বন্ধুগণ!" বা অনুরূপ কিছু শুনলেই আমি জানি, যে বক্তৃতাটা হবে, সেটা আমি অনেকবার শুনেছি, বাকি জীবন বোধহয় শুনতেই হবে। সেটা বহু বছর ধরেই শুনছি। তা, বাঁধা বুলি শোনার চেয়ে ঘুমানো অনেক বুদ্ধির কাজ! তা ছাড়া... ভুলে যাস না, আমাকে নাইট স্কুলে পড়াতে হয়।

অতন্দ্রর বন্ধু তমালী বলেছে, সে তো ছ'টা থেকে ন'টা।

—আহা! নামটা তো নাইট স্কুল!

—সেবার কি হয়েছিল? বক্তৃতা দিতে দিতে অর্জুন বাবু চেঁচায় নি, অতন্দ্র, তুমি ঘুমাচ্ছ! ছি, ছি! এখন একটা সংকটের সময়! সর্বদা জেগে থাকতে হবে!

—কি লাভ হল? আমি তো ওঁর কথা শুনতে শুনতেই আবার ঘুমালাম। দুজনে হাসতে পারল বলে আবহাওয়া কিছু হালকা হল।

বাড়ি ফেরার সময়ে ছেলেটি ভাবল, ও যদি শুনত, ঘরের দরজা খুলে দেখেছি, জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া চিঠির পাহাড়, ঘৃণার চিঠি, বিদ্বেষের চিঠি, হুমকির চিঠি, তা হলে কি করত?

না, ওদের দুজনকেই অনেক শক্ত হতে হবে। পরিবার থেকে আপত্তি ওঠে, তা প্রত্যাশিত। সামাজিক প্রথা আচরিত নীতির বাধা ভেঙে এমত বিয়ে করলে অসুবিধায় পড়ে পরিবারটি। পরিবার মানে তো একটা ইউনিট নয়! আজকাল পরিবার ক্রমশই ছোট্ট ইউনিটে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু বিবাহ সম্পর্কে ভাইবোনের শ্বশুরবাড়ি, নিজেদের মামাবাড়ি, মাসি, পিসি, কাকা, জ্যাঠা, "পরিবার" শব্দটির সংজ্ঞা তো বিস্তৃত।

সেখানে কথা হতেই পারে।

যাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানেও এত আপত্তি, এত বিদ্বেষ?

এসব কথা ছেলেটি দুলালবাবুকে বলেছিল। দুলালবাবুর বয়স সত্তর পেরিয়ে। ওঁদের পরিবারে নামকরণে মধ্য নামটি "কুমার" বা "চন্দ্র" বা "নাথ" না হয়ে "দুলাল" হত। এঁর দাদা মাধবদুলাল সে দিনে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। ইনি ব্রজদুলাল স্কুল শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষক নেতাও বটেন। ছিমছাম চেহারা, ছিমছাম মানুষ, এই শহরেরই বাসিন্দা, ছেলেটি ও মেয়েটিকে খুবই পছন্দ করেন।

ওর কথা শুনে উনি বললেন, এ রকম হুবহু শুনে অবাক হলাম না, জানো?

—সার! আপনার মুখে এই কথা?

—মনে হয়! মনে হয়! মূল্যবোধে প্রচুর ভাঙন ধরেছে অনেকদিনই। আগে বামপন্থী হতে হলে ক্লাস করতে হত, স্টাডিসার্কেল ছিল! আজ বহুদিনই রাজনীতি হয়ে গেছে ভোটের রাজনীতি! সব রকম প্রতিক্রিয়াশীল কাজ করেও বামপন্থী থাকা যায়। অন্তর থেকে শুদ্ধিকরণ তো হয় না, হলেও কমই হয়।

—কি যে করি!

—আমি বলব?

—বলুন না।

—তোমাদের যা করবার তাই করে চলো। অন্যরকম হয়ে যেতে পারবে?

—আর পারি?

—তাহলে বলব। ওকে বিয়ে করেছ। এখানেই থাকছ। সাধারণ, অথচ সম্মানজনক একটা কাজ করো। এ সবই সত্য। কিন্তু সময়ের নাড়িতে এখন জ্বর। রাজনীতির নীতি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা মানি না। এবং সরকারি রাজনীতি তাই থাকবে। কিন্তু সমর্থক ও সদস্যাদের মনে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি থাকতেই পারে।

—আছে, আমি শ'খানেক চিঠি পেয়েছি। ও নিজেও কিছু পাচ্ছে।

—লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা!

দুলালবাবু তাঁর বাপের আমলের সেই ইজিচেয়ার ব্যবহার করেন, যার হাতার ভাঁজ খুলে দিলে চওড়া একটা হাতা বেরোত। তার ওপর চায়ের কাপ রাখা যেত।

সেই চেয়ারেই বসেছিলেন দুলালবাবু। কেদারার হাতা চাপড়ে বললেন, আমি বলব, একদা সংগ্রাম করেছি, নেতা হয়েছি, কিন্তু কোথাও আমরা ব্যর্থ, না পারলাম নিজেদের নীতি রাখতে,

না পারলাম পরের প্রজন্ম তৈরি করতে। ভোটব্যাঙ্কের কথাও ভাবতে হয় না। এত ব্যর্থতার পরেও দেখ ভোট পেয়েই যাই।

—আমি চলি সার!

—মনে করি এমন বিয়ে অনেকই হতে পারত, হয় না। ছোট শহরে হয় না।... কি বলব? তবে এটা জেনো, যে কোনো দরকারে বা অদরকারে আমার কাছে এসো। দুজনেই এসো। ওর জ্যাঠা আমাদের গর্ব ছিলেন। তাঁর বাড়ি অনেক গিয়েছি। অনেক থেকেছি, অনেক খেয়েছি। সে ছিল একদিন!

—সার! আসলে, দুটো কথা বললে ভালো লাগে, স্বচ্ছন্দ বোধ করি, তাই আসি। আপনি... বেশি ভাববেন না...যা হয়, হবে।

—এসো। না এলে দুঃখ পাব, চিন্তায় থাকব। তোমরা আছ কোথায়?

—ও এখানে নেই, আমি সেই বাড়িতেই...

—হ্যাঁ...বুঝেছি...

—ওই! যেমন যেমন পরিস্থিতি হবে, বুঝে চলব। অনেক লম্বা পরিকল্পনা করা ঠিক হবে না।

—ও কিছু করছে না।

—বি.এড.-এ ভর্তি হবে। ওই একটাই স্বপ্ন। আপাতত ওদের প্রত্নসংগ্রহশালা দেখছে।

—ওর জ্যাঠার কথাই ভাবো। দেশগত প্রাণ ছিল তাঁর। ব্যস্ত নেতা, কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই প্রত্নশালা বানালেন।

—হ্যাঁ... পাগল লোক ছিলেন।

—ওই রকম পাগল অনেক কেন হয় না, তাই ভাবি!

৭

"টোনা টুনি উড়তে চায়,
টোনা টুনির আকাশ নাই"

ছেলেটি যখন বাড়ি খুঁজে পেতে মেয়েটিকে নিয়ে এল। এতদিনে শহর বুঝেছে।

"বকো আর ঝকো, ওরা কানে দিয়েছে তুলো
মারো আর ধরো, ওরা পিঠে বেঁধেছে কুলো।।"

যে বাড়ি দেখেছিলাম, সে বাড়ি তো নয়,—এ কথা মেয়েটি একবারও বলেনি। ততদিনে ও বুঝে গিয়েছিল, আর বিশ্বাস করেছিল ছেলেটির কথার সত্যতা। যে এরকমই হবে ওদের জীবন। টোনা-টুনি এক ডালে বাসা বাঁধে। বা-বাতাসে ডাল ঝাপট খায়। বাসা ভেঙে যায়। তারা আবার বাসা বাঁধে।

ছেলেটি বোঝাত, স্থায়িত্ব খুঁজো না।

—খুঁজি না তো! পেয়েই তো গেছি।

—কি বলিস?

—তোকে পেয়েছি না?

—দুলাল সারকেই দেখ্। বাপের তৈরি অত বড় দালানবাড়ি। কি বা ওরা রাখতে পারল?

অন্যরা যে যার ভাগ বেচে দিল। এখন বারো ঘরে তেরো উঠান। দুলাল সারের দুটোই মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে কবে, বউ মরে গেছে কবে। সে একতলায় একটা বড়ো একটা ছোট ঘর নিয়ে রয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, প্রথমে হাঁড়ি ভাগ হয়, তারপরে বাড়ি।

—তারপর বাড়ি বিক্রি করে সবাই হেথাহোথা যায়।

—যা বলেছিস!

—দাঁড়া, এবার আমরাও বেড়াতে যাবই যাব। জানলি?

—ব্যারাকপুরে?

দুজনেই হাসে।

—কানুদার অটোটা হল না।

—না। এত দৌড়ালাম। ব্যাঙ্ক থেকে লোন বের করা গেল না।

—ছোট ছোট আশাগুলো আর পূর্ণ হয় না।

—এর মধ্যে কত না হয়ে গেল, তাই না?

—হ্যাঁ। ছোটবেলা মা যেমন গল্পে বলত। "সে এক বৃত্তান্ত"!—সেই রকম!

—সে এক বৃত্তান্তই বটে! মেয়েটি বলে। মা এখন সবাইকে কি বলে, জান তা?

—আন্দাজ করতে পারি।

—না, পারো না। মা সগর্বে বলে, আমার মেয়ে এমন-তেমন নয়। তিনটে মরল। তা বাদে জন্মাল। জন্ম হতেই সবার চোখের মণি।

—হায়রে রথের মা! মেয়ে জন্মাতে কাঁদনি?

—বড় মা বলত। আমাদের ঘরে বিটিরেই আমরা বেশি মান দেই। আমার নয় একটা মেয়ে। সেও তো বি.এ. পাশ করে বংশের মুখ উজ্জ্বল করে। তবে বিয়ে বসল।

—হ্যাঁ। সে বিয়েতে ধুমধাম কত!

—আর এই মেয়ে! রাঁধতে দেইনি, হাত পুরবে, নয় তেল ছিটকাবে। জ্যাঠা বলত, যেমন দেহে শক্তি, তেমন বুকে সাহস। রথে আমার শত পুত্র সম কন্যা!

আর রথে কি করত? খেলে বেড়াত, নেচে বেড়াত। ইস্কুলে যেত।

সেই রথে দেখ, কি বিয়ে করল! মা এখন সর্বজনে বলে। বিয়ে হল বিধির লিখন! যখন জামাই হয়নি, তখন হতেই দেখি। দুঃসাহসী ছেলে বটে, দিনে দিনে কত যে জেনেছি! সে এক বিত্তান্তই বটে।

কেমন সে বৃত্তান্ত?

—বিয়ের কথা গল্প কথা রে মা! যার সাথে যার মজল মন,—এ বিয়ে সে রকম।

—তবে! রথের মা! ঘরে ঘরে যদি চলে?

—ঘরে ঘরে? কেমন করে চলবে? জামাইয়ের কলিজা কত বড়? আর রথেকে তোমরা চেননি। যত ঘা খায়, তত ওর কলিজা শক্ত হয়। হিম্মত বাড়ে।

—মানুষে যে সাত-পাঁচ বলে।

—বিয়েতে লাগে একটা মেয়ে, একটা ছেলে। ও আমার বাগিচার গোলাপ, যে তুলবার তুলে নিল। আর কি বলব?

—মা! তোমার মুখে এমন কথা?

—দেখছি তো! এখন বুঝি রে! তা তুই যে যেয়ে ওর মায়ের ছানি কাটার সময়ে একবছর থাকলি। কেমন বুঝলি?

—খুব ভালো। শুধু বলে, ও সংসারী হল, দেখে গেলাম, আর কিছু চাই না। ও ছেলে তো ভয় জানে না। ডর জানে না। নিজের পথ বেছে নিয়েছে। সেই পথে চলে। হাজার মানুষকে আশা ভরসা দেয়। আর মা! দাঙ্গা ঠেকাতে আগুনে ঢুকে যায়। বলে ঐক্য ভাঙতে দিব না। এ কি মন্দ কাজ? আমার ছেলে নিয়ে আমার বড় গৌরবরে মা!

মেয়েটি বলে, এ সব কথা কি সত্যি?

—কেন, তুমি জান না?

—তোমার মুখে শুনতে ভালো লাগে।

—বেশ বলেছিস। এখন কিন্তু গল্প করাব সময় নয়। চল্, অনেক কাজ আছে।

—ওগুলো গল্প নয় রে... গল্প ছিল না কোনোদিন।

না। "ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা" বলা যাবে না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও অবিশ্বাস। কোথাও সন্দেহ, কোথাও মদমত্ত সমর্থন। কিন্তু কোথাও একটা রেলওয়ে ব্রিজ মাঝামাঝি জায়গা ফাঁকা রেখে ঝুলছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। কখনওই এটা সম্পূর্ণ জুড়ছে না। ছেলেটি জানে মাঝের শূন্যস্থানটা লোকচলাচলের জন্য ভরাট করে দেবার কাজটা করা কত দরকার।

যেমন বলেন প্রতিমের মা। ইরা মাসি।

প্রতিমের হয়েছিল গলব্লাডারে ক্যান্সার। অপারেশন করতে তাকে লন্ডনে নিয়ে যান প্রতিমে মামা। তা যেতেই পারেন ওঁরা। প্রতিমের দিদি জামাইবাবুও লন্ডনে ডাক্তার। প্রতিম নিজেও বে মেধাবী। যে কোন সময়ে পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকা চলে যাবার ব্যাপারে সব ঠিকঠাক। ইরা মাসি আর সত্যেশ মেসো সর্বদা বলেন, ওরা বিদেশে থাকুক। আমরা এখানে থেকে সমাজসেবা করব

ইরা মাসিরা প্রগতিশীল। বামপন্থীও বটে। প্রতিমের অপারেশনের সময়ে স্বামী স্ত্রী লণ্ডনে গেলেন। যে ডাক্তার অপারেশন করেন তাঁর ওপর ইরা মাসির মেয়ে জামাইয়ের ভরসা ছিল খুব

প্রতিম বাঁচে নি।

আর ইরা মাসি বলেছিলেন, ওই ডাক্তার কেন? কেন ওই সালিম?

ওঁর মেয়ে বলেছিল, ওঁরা এখানকার নাগরিক মা! পুরো পরিবারটাই তাই। সালিমকে পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টায়...

রেগে ইরা মাসি আর তাঁর স্বামী ভারতে ফিরে আসেন। সেই থেকে ওঁরা মনের দরজাও ব রেখেছেন। ছেলেটি প্রায়ই ভাবে, কোনো দিন কি খুলে রেখেছিলেন।

সত্যিই খুলেছিলেন? ডাক্তারের পদবি অন্য কিছু হলে কি প্রতিম বেঁচে উঠত?

সংসারের শিকড় কত নীচে ঢুকে গেছে?

এবার ওকে লিখতে হবে। "আমার সময়ের সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা ইতিহাস।"

মনে পড়ে, ১৯৮৯ রামজ্যোতি রথ চেপে ভাজপার সাংস্কৃতিক নেতারা ওদের টাউনে ঢুকবে রথে জ্বলবে প্রদীপ। আর 'জনতা' আনবে একটি প্রদীপ। ওই প্রদীপ থেকে জ্বালিয়ে নেবে। এ ঘরে ঘরে দীপাবলী হবে। সে দীপের আলো ধর্মের আলো। অধর্মের অন্ধকারকে দূর করবে

শুনেই তো চক্ষু চড়কগাছ। এ যে ষোলোগুটি বাঘবন্দির পুরনো খেলা। ফাঁদ কেটে বেরোবে? যেখান দিয়েই বেরোও, অন্য দিক থেকে মার আসবে।

ছেলেটি আর ক'জনকেই পেয়েছিল। সবাই ছুটোছুটি করে। থানাকে জানায়, হাতে মাইক নিয়ে ব্যাপক প্রচার দেয়।

ওর টাউনে রামজ্যোতিরথ ঢুকতে পারে নি। ঢুকতে পারবে, এমন আশা করেছিল কেন? নিশ্চয় ওদের অনেক সমর্থক। তারা কেউ কোনো আন্তর বিশ্বাস দ্বারা চালিত নয়। সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস দ্বারা চালিত। এটা দুই সম্প্রদায়েই আছে।

৬. ১২. ৯২ যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। তা ছেলেটি জানত না। সত্যিই জানত না। ১৯৮৯-এ রামজ্যোতিরথের অগ্রগতি থামানো গিয়েছিল। ইটপূজার ইট ভেঙে দেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সংঘ পরিবার এ অঞ্চলে বহুদিন সক্রিয়। তবু যে ইস্যু, বা নন-ইস্যুতে যে দাঙ্গা বাধে না, তাতে এটাই প্রমাণিত হয়, যে সাধারণ লোক দাঙ্গা চায় না, রাজ্য সরকার দাঙ্গার সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করে। আর পুলিশ স্ব-কর্তব্য করে। পুলিশ সক্রিয় থাকলে দাঙ্গা বাধানো যায় না।

কিছুই জানত না ছেলেটি। ভোরে ক্যানিং গিয়েছিল, ক্যানিং থেকে বারুইপুর। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যারাত। কেন যেন কাগজ পড়া হয় নি। (অবশ্য আজকের ভোরের কাগজে খবর বেরোবার কথাও নয়), আর রেডিওর খবরও শোনা যায় নি।

একটা কাজই গুছিয়ে করা গিয়েছিল। ট্রেনে বসে প্রচুর বাদামভাজা এবং গরম লেমোনেড খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া গিয়েছিল। এরকমই করে ছেলেটি। আর মেয়েটিকে জানায়, সকালেই সে উচ্ছে ভাজা ও মাছের ঝোল রেঁধে রেখে গিয়েছিল। দিনেও খেয়েছে, রাতেও খেয়েছে।

স্টেশনে নেমেই ও বাবুকে দেখে অবাক হয়। বাবু মুসলিম, সাইকেল চেপে ও দোকানে দোকানে পান সরবরাহ করে। সাইকেলেই ও গ্রামে ফেরে। ওর গ্রাম এবং আরেকটা গ্রামে সবাই মুসলিম। কিন্তু বাবুর চোখমুখ এ রকম কেন?

কাছে যেতে বাবু বলে, আমাকে সাইকেলে নে ভাই। ঘরে পৌঁছে দে!

—কি হয়েছে?

—তুই জানিস না?—বাবু বলে, বাবরি মসজিদের ঘটনা। ওর গলায় ভীষণ ভয়।

—যদি... যদি কেউ ধরে...

—দে তোর সাইকেল। আমি চালাই। তু-ই সামনের রডে বোস্। সেদিন গভীর রাতে ওকে গ্রামে পৌঁছে দেয় ছেলেটি। বাবুকে বলে। আমি মুসলিম গ্রাম ধরেই যাব। আর তারপর শ্মশানের রাস্তাটা কেমন, তা তো জানিস। আমি ভয় পাচ্ছি না। তুই ভয় পাস না। আমরা ভয় পেলে চলবে কেন? আর কাল বুবিউলের কাছে যা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কর।

আর.... পরদিন প্রথমেই ও মেয়েটিকে টেলিগ্রাম পাঠায়। তোমার আসা খুব দরকার।

না, মারামারি ঘটতে দেয় নি পুলিশ। কিন্তু এটা তো সত্যি, যে প্রতিবারের মতো এবারও পুরনো অথচ ভুয়া খবরটি জলের বুড়বুড়ি কাটিয়ে উঠে এসেছিল! একটি কালীমন্দির যেমন ছিল তেমনিই থাকে, কিন্তু নিমেষে রটে যায় মুসলিমরা প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙেছে, অপবিত্র করেছে।

ছেলেটির মনে আছে মুসলিম এক নেতাকে বলেছিল, আপনারা শান্তিমিছিলের আগে থাকুন। বলুন, এমনটা ঘটে নি। আপনারা তো যানও না। কিন্তু ওই মন্দির তো রক্ষা করে দুই ধর্মেরই মানুষ। বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে তো ধিক্কার দিতেই হবে।

সে সময়ে ও দেখেছে, স্বচ্ছ চিন্তা করতে এ-ও ভোলে, ও-ও ভোলে। তবু কথার প্রতিবাদ হয় না, কেননা ও বলত গভীর বিশ্বাস থেকে।

তাতেই তো সব হয় না।

সে বছর? পরের বছর? কবে ওরা টাকা পাঠিয়ে, ঘর বুক করে এক বেসরকারি লজে। ওদের জীবন থেকে অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে দুটো দিন আর দুটো রাত বের করা গেল। লঞ্চে ঘুরবে, লঞ্চেই খাবে। লজে রাতটা থাকবে। পরদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে বাস ধরবে।

মেয়ে কি খুশি! কি খুশি!

—কি কি গুছাই বলত?

নিরিবিলি শান্ত জায়গা! তিনটে নদী দেখতে পারি! মানে নদী একটাই। খানিকদূর বাদে নাম পালটায়। চল্ না, মজা পাবি।

—সঙ্গে নেবো কি?

টুথ পেস্ট আর ব্রাশ! সাবান! তোর এক সেট জামা জামাকাপড়, আমার এক সেট! আর কি!

—আমরা কি যাযাবর না কি?

—যাযাবর হয়ে যেতেও পারি। ঘুরব, আর ঘুরব। যেখানে যা মিলবে, খাব। যেথা সেথা ঘুমাব। যাকে বলে "নোমাড", জানলি?

ওরা কি জানত, ভবিষ্যতে ওদের কতবার তাঁবুর খুঁটা ওঠাতে হবে? ওরা কি বড্ড বেশি চেয়েছিল? বড্ড বেশি?

মেয়েটি এতেই আনন্দে উচ্ছল বলে কি, এটাকে হনিমুনও বলা যায়?

—যা ইচ্ছে বল?

বড় আনন্দে ঝলমল করতে করতে ওরা বাসে উঠেছিল। জলের বোতল, মুড়ি-বাদাম, আর কলকলিয়ে কথা বলছিল ওরা। ছলছলিয়ে হাসছিল। বাসের সহযাত্রীরা বুঝতেই পারছিল না ওরা বিবাহিত, না প্রেমিক প্রেমিকা।

পৌছতে পৌঁছতে বিকেলই হয়ে যায়। মেয়েটি বলল, ফাঁকা জায়গা, বাতাস তাই ঠাণ্ডা, দেখ।

—জানি। আমার চাদরটা এনেছি।

৮

টোনাটুনি আনন্দে ছিল বিহ্বল
দুজনের মনে কতো খুশি টলমল
কিন্তু নীলাকাশ ঘেরে বজ্রবাহী মেঘে
দুজনে ভূতলে গড়ে আছাড়িয়া, বেগে
তাদের দুখের কথা কে শুনিবি হায়।
সহ্য নাহি যায় তাহা সহ্য নাহি যায়॥

ছিল, আলোকিত বাড়ি, সুন্দর বাগান, পাঁচিলে ঘেরা, বৈদ্যুতিন আলোতে ঝলমলে নাম।

ছিল রিসেপশান, বসার জায়গা, ডেস্ক, ডেস্কের পিছনে এক যুবা, না প্রৌঢ়া বেসরকারি বাবু। সরকারি বাবুদের মধ্যে এনাদের মতো লোকদেরও দর্শন মেলে। সবাই বেজার, হাসতে ওদের মানা। আর নিজের দাপট বুঝিয়ে দিয়ে খুবই উদ্গ্রীব। এদের দেখে লোকটি চোখ তুলে তাকায় শুধু।

—আপনারা?

ছেলেটি নিজের নাম বলে।

—ইনি?

—আমার স্ত্রী।

—বুক করেছিলেন?

—অবশ্যই। খাতাটা দেখুন...

লোকটি জবাব দেয় না। এমন অভিনিবেশে রেজিস্টার দেখতে থাকে। যেন ওর দেখার ওপর রাজ্যের ভবিষ্যত বা বর্তমান নির্ভর করছে।

—নাম তো আছে... টাকা পাঠিয়েছিলেন আগাম...সবই ঠিক আছে...নিন। এখানে দুজনের নাম লিখুন...

এর মধ্যে আরো চার পাঁচজন টুরিস্ ঢুকে পড়েন। ডেস্‌কে ভিড় করেন...

—দাদা! আমার বুকিংটা দেখুন তো...

—কেন? দেখতে পাচ্ছেন না এনাদের অ্যাটেন করছি। হট্টগোল করলে হবে?

—যাক গে...আমাদের ছেড়ে দিন...আমরা একটু বিশ্রাম করতে চাই।

—নাম লিখুন দুজনার...

মেয়েটির নাম দেখে লোকটি দাঁতমুখ খিঁচায়,—একি মাজাকি পেয়েছেন? মোছলমান মেয়ে আর হিন্দু ছেলে স্বামী-স্ত্রী হয়।

ছেলেটির মুখ থমথম করে। বলে, আমার নাম দেখে হিন্দু বলছেন, ঠিক আছে। ঠিক তেমনিই সত্য যে ও আমার স্ত্রী।

—তা হলে স্বামীর পদবি লেখেন নি কেন? স্বামী যখন হিন্দু, স্ত্রীকে তো হিন্দু হতেই হবে, পদবিও এক হতে হবে।

—পদবি দেখে রুম ভাড়া দেন? যে কোনো পুরুষ ও মহিলা এসে এক পদবি লিখলে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘর দেবেন?

—যান যান, ভুক্কড় পার্টি!

—দেখুন। আমরা সাংবাদিকও বটে জেলার কাগজের। চাষ জমিতে মাছের ভেড়ি করে দেয় লোনা জল ঢুকিয়ে, যে জন্য তদন্ত হল, সে রিপোর্ট আমারই লেখা!

—অমন বিয়ে অনেক দেখেছি। এঃ মুসলমান মেয়ে হিন্দু ছেলে... বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে তো শাঁখা সিঁদুর নেই। স্বামীর পদবি লেখে না...

—আপনাদের মতো লোকদের জন্য এটাও সঙ্গে রাখি।

ওদের বিয়ের সার্টিফিকেট, প্রেসের শংসাপত্র ছেলেটি সঙ্গেই রাখে।

—যান, যান... এঃ, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট!

ওঃ তাতেই মরে গেলাম! শোনেন, বাবুর এখানে হোটেল, মাছের কোলড স্টোরেজ, আরো হোটেল, এমন নানা বিধি বিজনেস। এস.পি. কেন? ডি.জি. কে আনুন...আই. জি.-কে আনুন। পুলিশমন্ত্রীকে আনুন... সবাই বলবে। স্বামীর পদবি নিতে স্ত্রী বাধ্য।

—টাকা নিয়েছেন, চেক-ইন লিখেছেন, লাগেজ রইল, আমরা এর শেষ দেখব।

—সকলেই শেষ দেখাল, এখন জালি পার্টি শেষ দেখাবে! নিয়ে যান আপনার টাকা!

ছেলেটি হেসে বলে, শেষটা দেখুন।

এ কাহিনিই ঘুরে ঘুরে ওদের জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই বিশেষ কাহিনিটির জলও বহুদূর গড়ায়।

মেয়েটি বলে, লোকটার কানে চুল, নাকে চুল, আঙুলের গাঁটে গাঁটে চুল, দেখেছিলি?

—একানোড়ে।

ভীষণ ভীষণ হাসে মেয়েটি। হাসার ক্ষমতা ওর খুব বেশি। ঝরনার মতো হাসতে পারে।

—চল একবার থানায় যাই!

থানার দরজায় তালা। চৌকিদার জানাল, রাতে থানা ফোর্স ডাকাত ধরতে যায়।

কোথায় যায়। কোথায় বসে রাত কাটায়। শেষে চাঁদের আলোয় ভাসাভাসি জেটি ঘাটে ওদের রাত কাটে।

ছেলেটি বলে, আমাদের জীবন কেমন হবে, তা বুঝতে পারছিস?

—কেমন হবে?

—সৈনিক হয়ে গেলাম আমরা।

—তাই?

—তাই! সৈনিক কি করে?

—লড়াই করে চলে।

—সার! এ আমর্ড সার্ভিসে কি কি বেনিফিট আছে?

—নো বেনিফিট। ঘরের খাও, বনের মোষ খেদাও।

—সার্ভিস সুবিধার নয়। তবু একটু ঘুমাই।

—চলনা দেখি কোনো দোকান পাই কিনা!

পরিত্যক্ত হাটতলায় একটি চা-লেড়ো বিস্কুটের দোকান ছিল। দোকানির বয়ামের সবগুলো বিস্কুট খেল ওরা। পাশের ঘুমঘুম চোখ বালকের দোকান থেকে মিঠা পান! তারপর একচাদর দুজনে জড়িয়ে ঝিমাল বাকি রাতটা। ছেলেটা ঘুমঘুম গলায় বলল, এমন জঙ্গল! এত নদী নালা! কিন্তু শোষক-শাসক-ডাকাতের হাতে সুন্দরবন চিরতরে বন্দি থেকে গেল। টোনা-টুনির জীবনে কোনো কাহিনিই ফুরোয় না। কার জীবনে বা ফুরোয়? ফুরোয় না বলেই তো টুনিকে যখন তখন চোখ বুজে শৈশবে ফিরে যেতে হয়। এলাটিং বেলাটিং বলে বলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে হয়।

এই অভিজ্ঞতাটি অনেক দূর গড়িয়েছিল। পরে ওদের উকিল অরুণাভ বলেছিলেন, গড়াতই। আপনারা তো ছাড়নেওয়ালা পার্টি নন।

পরদিন সকালে ওরা গেল থানায়। গত রাতে যারা ডাকাত ধরতে গিয়েছিল থানায় তালা ঝুলিয়ে, আজ তারা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল। যা হোক, তাদের তোলা গেল। নালিশ লেখাতে এসেছে যখন, নালিশ লেখাবেই।

নালিশ লিখবে কি, কনস্টেবল ও হাবিলদার ক্ষেপেই আগুন! অ্যাঁ? হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করলেন না কেন?

—সেটা কি আপনাদের বলার এক্তিয়ার আছে?

—অবশ্যই আছে। আর বিয়ে যদি করলেন, ওঁর শাঁখা কোথায়? সিঁদুর কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা স্বামীর পদবি তিনি লিখবেন না কেন?

—দেখুন! আমি আপনাদের এস.পি.-কে চিনি। তিনিও আমাকে চেনেন।

—এস. পি দেখাচ্ছেন? যান যান, আরো ওপরওয়ালাদের কাছে যান।

তাই তো গিয়েছিল ওরা। এ ঘটনার জেরও বহুদুর গড়ায়। আদালতে ওঠে। সেই কনস্টেবল ও হাবিলদার সাসপেন্ড হয়। যথারীতি তারা ছেলেটির পায়ে পড়তে থাকে। অরুণাভ বলেন, এ আর কি দেখছ ভাই! এর চেয়েও বড় জিত হবে। লজের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পদবি না লেখার ভিত্তিতে সে এ কাজ করতে পারে না।

ক্ষতিপূরণ চাই না সার! আমি শুধু মানুষ দেখছি আর অবাক হচ্ছি। যারা সকল সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ করে তারা না কি লজমালিককে মদত দিচ্ছে। আমাদের মতো লোকরা যে প্রতিবাদ করবে একটা সুস্থ সমাজচেতনা আসবে, তা করবে কি করে বলুন তো?

অরুণাভ মৃদু গলায় বললেন প্রগতিশীলতার ব্যানার নিয়ে ঘুরলেই প্রগতিশীল হয় না। সব ফ্রন্টেই আপস চলে।

তাই হবে! আমার মতো নিধিরাম, যার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, সে এ ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে চলার সাহস দেখাচ্ছে। সেটা কেউ পছন্দ করছে না।

—এই তো বুঝেছেন।

—কিন্তু যা শিখে বড় হয়েছি। তাই তো করছি।

—আপনারা কি খুঁজছেন। তা জানেন?

—জানি, ন্যায় খুঁজছি জাস্টিস!

—যাক আপনার দলে অগণিত লোক থাকবে কি না জানি না। কিন্তু আমি আছি।

সে লজমালিককে আদালত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বলে। লজমালিকের অবস্থা তখন রীতিমত করুণ।

ছেলেটি ও মেয়েটি বলল, ওকে ধ্বংস করাটা তো উদ্দেশ্য নয়, তবে ক্ষতিপূরণ নেব।

—নিশ্চয় নেবেন।

আদালতে ছেলেটি একটি টাকা ক্ষতিপূরণ নেয়। যারা মজা দেখতে এসেছিল, তারা বোবা হয়ে যায়। অরুণাভ বলেন, আপনি আমাকেও শেখালেন।

—সে কি বলছেন?

—বিচার, ন্যায় বিচার আদায় করতে হয়। যে বিচার চাইছে, সে যদি আপস না করে, পরিণামে সে জেতে, তবে বড্ড দাম দিতে হয়। আমি চাইব, যে আপনাদের সামনে এমন বাধা আর না আসে।

ছেলেটি বা মেয়েটি আজও জানে না উদ্ধত হতে। ওরা বিনম্র হেসেছিল।

—দরকার হলেই চলে আসবেন।

ওঁরা তিনজন সামনের ন'টা বছর দেখতে পান নি। ভাগ্যে ছেলেটি আর মেয়েটি কিছু জানে নি, যে ওদের লড়াইয়ের সবে শুরু এটা, তাই পরদিন সন্ধ্যায় যখন বন্ধুরা অভিনন্দন জানাতে এল, ওরা খুব খুশি হয়েছিল।

মেয়েটি বলেছিল, কোথায় ছিলি রে? এত কিছু হল, কাগজেও বেরোল...

এখানে ছিলাম না মশাই। একটা সমীক্ষার কাজ পেয়ে সুন্দরবন চলে যাই। কাল তোতার কাছে শুনলাম। সত্যি! এটা যে কত বড় লজ্জাজনক ব্যাপার!

ছেলেটি বলল, কাউকে বোঝাতে পারি না, আমরা ধর্মের পরিচয়ে বিশ্বাস করি না। ফিল্মে

বল্, গল্পে বল্, "একটি ছেলে আর একটি মেয়ের দেখা হল," এটা ফর্মুলা দাঁড়িয়ে গেছে। দর্শক বা পাঠক তা মেনেও নেয়। কিন্তু সবার চেনা-জানা একটি ছেলে, সবার চেনা-জানা একটি মেয়েকে বিয়ে করল, সেটা মানতে পারে না।

—তোদের বাড়িতেও কোনো অসুবিধে নেই, তাই না?

কিসের অসুবিধে? ওর মা তো সকলকে বলছেন, আমার মেয়ের বিয়ে ওর সঙ্গেই হবার ছিল, হয়েছে। মেয়ে তো সুখী, তাহলেই হল।

—আর তোর বাড়িতে?

—ওকেই জিগ্যেস কর। আমার মায়ের চোখ অপারেশান হল, তো ও গিয়ে কতদিন থেকে এল।

—সত্যি! দুটো পরিবারই অন্য রকম।

—কিন্তু ভাই! এ রকম পরিবার অনে—ক হবার কথা ছিল না? বুঝি, যে ধর্মবিশ্বাস থাকতেই পারে, তা বলে এত অসহিষ্ণু হবে?

সোম বলল, তা নয় রে! এরকম যে হচ্ছে, হবে, তা তো আমাদের নেতারা একদা ভাবেন নি।

বিক্রমজিৎ মাথা নাড়ে।—কতদিন কোনো সুস্থ আন্দোলন নেই। বদ্ধ জলই দূষিত হয়।

—এখন? আন্দোলন? কলকাতায় প্রত্যহ কোনো না কোনো উৎসব হয়, কাগজ দেখিস না? ছেলেটি বলে, দেখি... দেখি... কিন্তু সেটা তো সমাজের পূর্ণ চিত্র নয়! যাক, আশা করব, আমাদের এমন পরিস্থিতিতে আর পড়তে হবে না।

নয়

মেয়েটি বলেছিল, যদি খুব প্রাণ দিয়ে চাও, তাহলে আশা পূর্ণ হতেই হবে, না কি বল্?

—যেমন তুই আর আমি?

—বলতে পারিস। কিন্তু তোর ওপর নির্ভরতা বড়ই বেড়ে যাচ্ছে।

—আর কারো ওপর তো নয়?

—এই! ভালো হচ্ছে না।

—হবে, ভালোই হবে।

—বি.টি. কলেজে নেবে তো ১৭৮, সেখানে মেরিট লিস্টে আমি আছি ৩৬ নম্বরে। ইনটারভিউটা দিতে হয় বলে দিচ্ছি!

—খুব ভালো। তা, বাহন-চাই, না একা যাবেন?

—গাড়ি বের কর, নিয়ে চল্।

—বাস বুঝি গাড়ি নয়?

—ভাগ্যে গাড়ি চাই, বাড়ি চাই ভাবি নি।

—কি যে চাইলি!

—তোকে?—এই দেখ তো আমাকে ভালো দেখাচ্ছে না?

—আমি তো আপনাকে কবে থেকে ভালোই দেখি। কি যে গেলাম প্রত্ন সংগ্রহশালার অনুষ্ঠানে!

—আর মনটি রেখে এলাম।

—যা, যা, তৈরি হ। তোকে বাসে তুলে দিয়ে তবে তো আমি ট্রেন ধরব!

—তুইও বি.এড্. পড়। দুজনেই টীচার হই?

আমাকে দিয়ে হবে না রে।

ছেলেটি বলতে গিয়েও বলল না, অনেক কিছুই হবে না ওকে দিয়ে। আর পারবে না ও, নতুন কোনো ডিসিপ্লিনে গিয়ে পড়াশোনা করে কোনো কাজে লিপ্ত হতে।

মেয়েটি স্বামীর পদবি লিখল কি লিখল না, সে লড়াইটা ওর থাকবেই। ওর নিজস্ব জীবনে স্বনির্বাচিত কাজ নিয়েও তো নিজের সঙ্গে লড়াই চলে। আর এখন, এই মুহূর্তে মেয়েটি ভর্তি হোক বি.টি. কলেজে, ওর যা স্বপ্ন, সেই কাজ করুক, শিক্ষকতা। এখনো মেয়েটি কত না সবুজ। অপমানে জ্বলে ওঠে, ভালোবাসায় গলে যায়। ওকে বিয়ে করে নিজেকে তো আরো আরো যুদ্ধের সামনে নামিয়েছে। সব যুদ্ধ যদি ধর্মযুদ্ধ হত, মুখোমুখি, যে শত্রুকে দেখা যায়, সে কি হাতিয়ার ব্যবহার করবে। তা তুমি জানো।

যেখানে অন্ধ, যুগের অনুপযোগী সংস্কার তোমার শত্রু। সেখানে তুমি কি করবে?

সেদিন কানুদা ছেলেটিকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। বলেছে, মনে একটা কথা ভাবছি, জানো?

—বউদি কেমন?

—যেমন থাকে।

হেসে বলল, আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি থাকি। ছিলাম তিনজন? অটোটা নেই, এখন দুজন। তা ক্ষতিপূরণ অনেক পেলে, কি বলো?

অনেক;

অনেক বটে! তা দেখ! একটা কথা পরামর্শ করছি আমরা দুজনে।

কি বলো?

—ভাবছি, অটো লাইসেনস বেচে দিই। যা পাই তাতে বারান্দাটা ঘিরে ওখানেই সবজি নিয়ে বসি।

—তুমি... লাইসেনস বেচে দেবে?

—দিই। দিয়ে একবার দুজনে একটু, নিত্যদের বাসে ঘুরে খেয়েও আসি। জেদ করে যে বসে আছি! আমার পর ও রাখতে পারবে? না ওর পর আমি? জেদ করতেও হয়, জেদ ছাড়তেও হয়। তোমার বয়স থাকলে আমি জেদ ধরে বসে থাকতাম।

এ সব কথা কি এক নিমেষে হয় কানুদা? একদিন বাড়িতে এসো, কথা হবে। আজ...

জানি। তোমাদের কাজটা হোক।

" রায় ঃ উনিশ দিনে ফাঁসি, একুশ দিন জেল,
তেইশ দিন যাবজ্জীবন, অতঃপর খালাস! "

মেয়েটির স্বভাবই হল আত্মবিশ্বাস। কোনো মেয়েকে অত আত্মবিশ্বাসী দেখতে কি সবাই চায়, না চাইতে পারে?

অত আত্মবিশ্বাসী. দেখলে তাকে শ্রদ্ধা কোর, হায়! প্রথম পাঠই যে পড়া হয়নি।

কারা ইন্টারভিউ নিচ্ছে, তাদের কথা মেয়েটি ভাবেই নি। "হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে" মেয়েটি

সাক্ষাৎকারের জন্য ঢোকে। ঘরের বাতাসে একটা গোপন অন্তর্তরঙ্গ বইছিল। সে বাতাসে বিদ্যুৎ।

মেয়েটি সতর্ক হয়ে যায়।

ঘরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরাই ইন্টারভিউ সাব-কমিটি, কিন্তু প্রত্যেকের চোখ মুখ বলে দিচ্ছিল এটা যেন আদালত, ওঁরা যেন বিচারক, কেস আদালতে ওঠে নি, কিন্তু বিচার হয়ে গেছে, রায় বেরিয়ে গেছে। অথচ এঁদের কতজনকে তো ও চেনে।

প্রথম প্রশ্ন এসেছিল বুলেটের মতো।

—"ধর্ম" কলামে "X" চিহ্ন দিয়েছ কেন?

—"ধর্ম" স্থানে ঢেরা ক্যান?

—ধর্ম স্থানে...

—"ধর্ম" স্থানে ওই চিহ্ন...?

—ও ভাবে ফর্ম পূরণ করেছেন কেন?

—কি কারণে, হোয়াই। ওই ভাবে ফর্ম পূরণ করা হয়েছে?

—যে মানুষ কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী নয়, সে আর কি লিখতে পারে?

মেয়েটি নরম গলাতেই বলেছিল, অবাক-অবাক চোখে। এদের কি বলা যায়, এরা যে গোদা বাংলা বোঝে না।

—কোনো না কোনো ধর্মের নাম তো থাকতেই হয়?

—হয় না। আমি কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী নই।

—তয় হিন্দুরে বিয়া বসছেন যে?

আঃ! অর্ডার! অর্ডার!

ওই "অর্ডার অর্ডার" শুনেই আমি হেসে ফেলি। ওরা এমন ভাবে দেখাচ্ছিল, যেন ওদের আমি চিনি না। ওরা যেন অধ্যাপক, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, অশিক্ষক কর্মচারী নয়।

যেন সবাই বিচারক।

—আপনি হাসছেন?

—হাসব না? একটা স্বাধীন দেশে, গণতন্ত্রে, স্ব-স্ব ধর্মে বিশ্বাসীদের জায়গা আছে, আবার প্রতিষ্ঠিত ধর্মে অবিশ্বাসী থাকারও অধিকার আছে।

স্বামী যখন হিন্দু, তখন "ধর্ম" স্থানে "হিন্দু" লিখতে হবে, স্বামীর পদবি লিখতে হবে।

বিয়ের পর বহুজনই বিয়ের অনেক পদবি লেখেন। দুটো জুড়েও লেখেন। আমি লিখি না।

মেয়েটি স্পষ্ট কথা বলে।

কলেজের অধ্যক্ষ বলেন,—আপনি পরশু আসুন। আজ ইন্টারভিউ স্থগিত রইল।

একদিন বাদে আবার যখন ইনটারভিউ শুরু হয়, মেয়েটির মনে হচ্ছিল, এ সবই অবাস্তব, বেজায় ভূতুড়ে যেন। যেমন পরশুদিন "ধর্মস্থানে X চিহ্ন কেন," "হিন্দুকে বিয়ে করেছেন তো স্বামীর পদবি লেখেন নি কেন?" "ধর্ম" স্থানে "হিন্দু কেন লেখেন নি?"

—এ সব প্রশ্ন আবার উচ্চারিত হতে থাকে। এটা কি প্রহসন, না ইন্টারভিউ?—মেয়েটি ভাবনায় পড়ে। তার জবাবের উত্তরে ওরা জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। তাতেই ওরা ক্ষেপে গেছে, তা মেয়েটি বোঝে না। ওরা ক্ষমতার স্তম্ভ। এবং ওরা যা বলে, সবাই তাই করে। এ কথাও ও

ভাবে নি। তখন এবং পরেও, মেয়েটি ও ছেলেটি "কেন এমন নির্বোধ প্রতিরোধ" তা ভেবে আকুল হয়েছে।

ওরা বোঝে নি। ওরা ওদের কাছে কতটা ভয় ও ক্রোধের ব্যাপার। ছেলেটি ও মেয়েটি একরেখ, সরল, সিধা। ওদের সাহসটা নৈতিক সাহস। ওরা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। কাগজে কলমে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী, প্রশাসন যা বলে, সেই মতো "কাজ করুক" এতে বিশ্বাসী। ওদের নিষ্পাপ নৈতিকতা, সাহস, ভয়হীনতা, প্রতিপক্ষকে ক্রুদ্ধ করছে, তা ওরা বোঝে নি। প্রতিপক্ষ প্রশাসনেরই একটি অঙ্গ। তারা 'হাঁ হুজুর" শুনতে অভ্যস্ত। পদলেহনে অভ্যস্ত।

এ কে, কোথাকার কে, এ-ভাবে জবাব দেয়? একটি মুসলমান মেয়ে এ ভাবে বলে যাবে, তা শুনতে হবে?

দ্বিতীয় দিন একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শুনে মেয়েটি বলে, এ সব প্রশ্ন আপনারা কাল করেছেন, আমি জবাব দিয়েছি।

ওঃ বেশ! আবার জবাব দিন।

দিচ্ছি। "ধর্ম" স্থানে X এই জন্য দিয়েছি, যে আমি কোনো প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমার স্বামী হিন্দু হতে পারেন, কিন্তু আমি হিন্দু হই নি। এবং স্বামীর পদবিও লিখি না।

আপনার চেয়ে অনেক নামি দামি মহিলারা বিয়ের আগের ও পরের পদবি ব্যবহার করছেন...

করতেই পারেন...

তা হলে আপনি কি...

দু'দিন ধরে একই প্রশ্নের কত উত্তর দেব? উত্তর তো একই হবে। মেয়েটির ক্লান্ত লাগছিল। হঠাৎ ও বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে বলেছে যোগ্যতার ভিত্তিতেই অ্যাডমিশান হবে। ওঁরা নীরব। এবং ক্ষুব্ধ।

ঠিক আছে। রেশন কার্ডের কপি এনেছেন?

মেয়েটি মনে মনে বলল, স-ব এনেছি। ও আমাকে স-ব গুছিয়ে দিয়েছে।

এই যে জেরক্স!

হ্যাঁ, বাপের বাড়ির।

কিন্তু আপনার শ্বশুর বাড়ি তো...

সেখানে রেশনকার্ডে জন্য দরখাস্ত করেছি, দরখাস্তের আর ওদের দেওয়া রসিদের জেরক্স দেখুন! বিয়ে সার্টিফিকেটের কপিও দেখুন। ওঁরা এমন অভিনিবেশে সব দেখতে থাকেন, যেন ভারত-পাক-কাশ্মীর সংক্রান্ত গোপন রিপোর্ট দেখছেন।

তারপর বললেন, দুঃখিত, আপনাকে আমরা ভর্তি করতে পারছি না। শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যায়। যোগ্যতা তালিকার অনে-ক নীচে নাম, এমন একজনকে নেওয়া হয়।

এ সব এ রাজ্যেই ঘটে যায়। কলকাতার কাছেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ছ'মাসের মাথায়।

মেয়েটির দাঁত চিপে বেরিয়ে আসে। পরে জানা যায় ওকে যে ভর্তি করা হবে না, তা চারমাস আগেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ওর আবেদনপত্র নিয়ে সাবকমিটির অশিক্ষক সদস্যরা কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ধর্ম' স্থানে X চিহ্ন, স্বামীর পদবি লেখে নি। ওকে ভর্তি না করাই সাব কমিটির সিদ্ধান্ত।

চেয়ারম্যান না কি ওদের বলেছিলেন, না, এই কারণে বাতিল করা যাবে না।

তাঁকে কে বলবে, সাক্ষাৎকার নেবার সময়ে নীরব থেকে ছিলেন কেন? ভর্তি নাকচ হওয়ার পরদিনই মেয়েটি, কলেজের অধ্যক্ষের নামে মহকুমার দ্বিতীয় মুনসেফ আদালতে মামলা করে।

অরুনাভ ছিলেন।

তিনি আন্তরিকতায় বলেছিলেন, খুব কারোজিয়াস! তোমরা আমাকে তোমাদের দলে এনে ফেলছ। নো সারেন্ডার! এ দমটাই মানুষের থাকে না।

ছেলেটি বলেছিল, লড়াই তো ফুরোয় না। সকল তাতেই লড়াই! বেড়াতে গেলাম, সেখানে লড়াই মেয়েটি বলে, সেবারও কোর্ট!

ছেলেটি কি ভাবতে ভাবতে বলে। ইস্যুটা খুবই সেনসিটিভ! কিন্তু চারমাস আগে থেকেই...

মেয়েটি বলল, ছাড়ো তো? ওরা যত বাধা দেবে, আমি ততই লড়ব। কি আশ্চর্য! ধর্ম কি তা জানাতেই হবে? স্বামীর পদবি ব্যবহার করতেই হবে? কমিটিতে এত লোক। তাঁরা তো শিক্ষার সঙ্গে জড়িত।

বাড়ি এসে মেয়েটি বলল, বিচার ব্যবস্থার ওপরেই আস্থা রাখছি। আর কি করব, বলতে পারিস?

ছেলেটি সস্নেহে বলল, আমি তা জানি। আকাশ মেঘে চাপা। গরমও কমে নি। আমরা স্নান করব, বিশ্রাম করব।

—কত না স্বপ্ন দেখতাম দুজনে।

—আবার দেখবি।

—রেশন কার্ড! বিশ্ববিদ্যালয় রেশন কার্ড দেখে কবে থেকে?

—ধর্মের উপর বা জোর দেয় কেন?

—বলছি না। পদবি ব্যবহার উঠে যাক!

—কি যে বলিস! এরা উঠাবে পদবি?

অবশ্য আমরাও তা পারব না। আমাদের পদবি নিয়েই যত গণ্ডগোল।

"ওকে ভর্তি না করলে সেশন শুরু করা যাবে না। আর মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত একটি আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।"

মেয়েটি দ্বিতীয় মুনসেফের রায় নিয়ে চলে যায় কলেজে।

অধ্যক্ষ রাগে কাঁপছিলেন। যা করছেন, সেটা যে করা চলে না, করলে পরে নিজেকে "মৌলবাদী নই" বলা চলে না, করা চলে না "সাম্প্রদায়িক শান্তি জীবন দিয়ে রক্ষা করুন"-এর সভা। এ সব কথা ওঁকে কেউ বলে দেয় নি।

এ রাজ্যে সর্বত্র, সব সময়ে জন আন্দোলন হয়। প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়। তার কিছুই ঘটে নি।

অধ্যক্ষ বললেন, আমরা তোমাকে ভর্তি করব না। সেশন্ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিলাম, বুঝেছ? অনির্দিষ্টকালের জন্য...

হ্যাঁ। মেয়েটিকে ভর্তি করবেন না,.(কারণটা তো রূঢ়ভাবে স্পষ্ট হচ্ছিল আর শিক্ষামন্ত্রকের নাম, তথা সরকারের নাম, ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল হচ্ছিল তা জানা যাচ্ছে না। আপনারা যা মনে করবেন। সেটাই সত্য,) এ জেদ বহাল রাখতে, সে-বছর নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ওপরেও অবিচার ঘটে যায় নিদারুণ।

মেয়েটি অবশ্য একবারও মনে করেনি সে দোষী। তার মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে তোলা এক ভাবমূর্তির এত জঞ্জাল জমেছে? এইসময়ে মাথা ধরতে শুরু করে ওর। মাঝে মাঝে।

১০

টোনা টুনির জীবন কথা সাগর সমান
অন্ত নাই পার নাই নাই অবসান।।

শিক্ষা বর্ষক্রম শুরু হয়েছিল ঠিক এক মাস বাদে। দ্বিতীয় মুনসেফের রায়কে উপেক্ষা করে, মেয়েটিকে ভর্তি না করেই সেশন শুরু করেন অধ্যক্ষ।

মেয়েটি আদালত অবমাননার মামলা করে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে।

...তারপর, তারপর, ভুল তো হয়েই যায়। মেয়েটি বা ছেলেটি জানেনি, ওই মামলা করা যথেষ্ট নয়। অধ্যক্ষ জেলা আদালতে আপিল করে আদালতের কাছে একতরফা রায় পায়, এক বছর এ কেস বিষয়ে শুনানি হবে না।

অধ্যক্ষ মনে করেন দারুণ জিতলাম। আর বাড়ি ফিরে মেয়েটি টেবিলে বসে তালুতে চিবুক রেখে গুমরে গুমরে কাঁদে।

ছেলেটির বুক আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে যায়। অমন নিষ্পাপ, তেজস্বিনী, সত্যের জন্য লড়াই করা মেয়ের চোখে যারা জল ঝরাল, তারা কি জানে নিজেদের কি চেহারা তারা তুলে ধরছে?

—না কাঁদবি না তুই। কিছুতে কাঁদবি না। আমাকে ভেঙে দিবি না তুই। আর শোন—

ভিজে তোয়ালে নিংড়ে জল ঝরিয়ে ও মেয়েটির চোখ, মুখ, ঘাড়, গলা মুছিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল লম্বা করে শ্বাস নে। লম্বা করে ছাড়্। ভিতরটা শান্ত হবে।

—তুই কি করবি?

—ম্যাজিক। ভাতে ভাত বসাব। পোস্ত বাটব। জানিস তো পোস্ত বাটা পেলে কিছু লাগে না আমার?

—আমি বেটে দেব।

না ম্যাডাম। শিল নোড়া ঘটর ঘটর করতে গিয়ে যদি হাত ছেঁচবে। সে আমার সইবে না।

মেয়েটি বলে, সে ওই মা, আর বড় মার জন্যে। প্রথম কথা তো "তুই পড়তে যা।" আর রাঁধতে গেলেই বলবে, হয় ভাত পোড়াবি নয় হাত পোড়াবি। নয় তরকারিতে এত তেল দিবি! রান্না ওরাও করতে দিত না, তুইও দিস না।

—অত সুখ নয়। সব শিখব। নতুন বাড়িতে খুব নিরিবিলি, রান্নাঘরটাও বেশ বড়। কোণে বসে খেয়ে নেওয়া যায়।

—সে তো পরের মাসে!

—কত ভ্রমণ হচ্ছে, বল্?

—নীল কুঠিটা...নারকেলবেড়িয়া...একবার দেখতে ইচ্ছা করে।

—দেখব, দল বেঁধে যাব।

—খুবই ভাগ্য যে ওরা আজই আসে নি।

—কাল আসবে।

—নোংরা চিঠিও আর আসে না।

—না আসবে কেন?

—আমার জন্য তুই কত কষ্ট না পেলি।

—কত আনন্দও পেলাম, বল? নইলে তো তোকে জানাই হত না। হঠাৎ ছেলেটি বলল, ভুল হয়ে গেল!

—কি?

—দুলাল সার ডেকেছিল। শরীরও ভালো নেই ওঁর। তোকেই খুঁজছিল বেশি। সেই যে উনি "আমাদের সমাজ অবস্থান" বইটা তোকে দিয়ে লেখাচ্ছিল, সেই বইটা বিষয়ে কি বলবে।

—যাব, কাল যাব। প্রকৃত শুভার্থী। সিনিয়ারদের মধ্যে অমনি দু-চার জন তবু আছেন! পার্টি কি বলবে, নেতা কি ভাববে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর শুধু বলে, বড় ভুল হয়েছে, তবু কিছু লিখে রেখে যাই।

—মনে হয়, আরো কিছু বলবে।

—পা দুটো ঘষে ঘষে ধুবি। পায়ের কথা ভাবিস? ওই কটা হাড়, দেহটাকে বহন করে, চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটু যত্ন তো করবি!

আর যত্ন! নিজের চেহারা দেখেছিস?

একটা প্রজ্বলন্ত উল্কাকে বিয়ে করে এই হাল হল, না কি বল্?

ইস্! আমি ছাড়া তোকে বিয়ে করত কে?

আর কারোকে এগোতে দিতাম?

এবার দুজনেই হেসে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ হাসে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটি বলে, এটাই ভালো। হাসলে অন্তত নিজের তো হালকা লাগে!

"যার কেউ নাই, তার সবাই আছে।"

দুলাল সার বলেছিলেন, বেশ করেছ। ওই লোকটা ভেবেছে, যা ইচ্ছা করে পার হয়ে যাবে, অ্যাঁ? এ রকমই হবার কথা।

ওদের সঙ্গে কুশও গিয়েছিল। কুশ ব্যারাকপুরে থাকে, আবার বাঁকুড়াতেও। কুশ অনেক লেখাপড়া করেছিল, স্বীকৃতি পেয়েছিল, সাঁওতালদের কৃষিপদ্ধতিতে ওদের নিজস্ব পদ্ধতির কি কি রাখা চলে তা নিয়ে গভীর ও আন্তরিক উদ্বেগে কলকাতা, দিল্লি, মানিলা ও বম্বেতে অনেক সেমিনার করেছিল।

হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে চল এল। ব্যারাকপুরে গান্ধীমিশনে গিয়ে বসে থাকল। আর খুব মন দিয়ে মহাদেব দেশাইয়ের বই পড়ল। মাঝে মাঝেই চলে যায় বাঁকুড়া। একটা বড় জমি দীর্ঘকাল পড়েছিল অনাবাদী। কুশ এবং গ্রামবাসী সাঁওতাল-মাহালি-বাউরিদের চেষ্টায় সেটি চিনাবাদাম ফলাচ্ছে।

কুশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। দুলাল সারকে ও বলল, সার! "এ রকমই হবার কথা" বললেন, কথা তো ছিল না। আপনারা সে সময়ে আমাদের বিশাল সমর্থন নিয়ে এসেছিলেন।

দুলাল সার খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন!

—সত্যিই তো, সত্যিই তো!

—মানুষের থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন। যত প্রতিশ্রুতি সব মুখে। নইলে, নইলে একটা বি. টি. কলেজের প্রিন্সিপাল একে এই ভাবে লাঞ্ছনা করে। সে না বামফ্রন্টের লোক? সাহস পায় কোথা

থেকে? সরকার কি করে? শিক্ষামন্ত্রী নেই? আপনারা আমাদের পিঠেও তো ছুরি মারলেন। আজ আমরা কোথায় যাব? যত সব!

—সত্যি! সত্যিই।... তা, কুশ! তুমি কি করছ এখন?

—লঙ্কা!

—নিশ্চয়। আমাদের বাড়িতে বর্তমানে আমি একমাত্র পুত্র। দাদা দীর্ঘকাল অনাবাসী। ভেবে দেখুন, কত বড় ছাতটা কয়েক শো, তা দুশোর বেশি, লঙ্কা ফলিয়ে যাচ্ছি। নানা জাতের, নানা চেহারার!

ছেলেটি বলে, মাশরুম?

—সেটা একতলায়, একদা-গোয়াল-ঘরে।

দুলাল সার বলেন, কি হবে? ভদ্রলোক চাষি? যাকে বলে, জেন্টেলম্যান ফার্মার?

—চাষি হবার দম নেই সার! তবে লঙ্কা চাষে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেবার ইচ্ছা রাখি।

মেয়েটি বলল, কুশ! চিরকাল দেখছি রেগে থাকিস।

থাকব। আমাদের... ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ঠিক হল না সার। পরে, আরো পরে, কিছু আদর্শবান ছেলে আসতেও পারে। তারা সরে যাবে। ব্রিলিয়ান্ট, আদর্শবিশ্বাসী ছেলেদের ধরে রাখবেন, আপনাদের হাতে তেমন কোনো ইডিওলজি নেই।

ছেলেটি বলল, রেগে যাস না কুশ!

দুলাল সার বললেন, এখন এরা কি করবে, সেই কাজের।

—ভেবেছি। আপনি কি ভাবলেন?

—"আমাদের সামাজিক অবস্থান" যার মধ্যে আমার আত্মকথা। আমাদের সময়ের কথা সবই থাকছে। বইখানা বলে গেছি। এই মেয়েটি লিখেছে। তা দেখ, এটা তো পূর্ব সংকল্প। বইটা আমি নিজের টাকায় ছাপব। তুমি আছ, তোমাদের সঙ্গে আরও বন্ধুরা আছে। বইয়ের হিসাবপত্র কর। টাকা আমার, ছাপো তোমরা। বিক্রি করো, যদি বিক্রি হয় তো ভালো। এর তো অভিজ্ঞতা আছে। তারপর একটা কাগজ বের করো। এ মেয়ের...ক্ষমতা অনেক।

কুশ মুখ মোছে রুমাল দিয়ে। তারপর বলে, সার! আমি কথাগুলো আপনাকে বলি নি।

না, আমরা তোমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারি নি। এ কথা তো সত্যি। আজ...আমাদের... হাতে...তরুণ প্রজন্ম নেই...আদর্শবাদই মানুষকে চালায়...আদর্শবাদ নেই। তুমি কি মনে করো, আমার মতো লোকরাও গোটা জীবনটা দেয় নি? আমি তো সৌভাগ্যবান। ঘরে মরব বলে মনে করি। ভবভূতির মতো মরব না ব্লক হাসপাতালে। অক্সিজেন না পেয়ে!

এ সব কথার পর বাড়ি ফিরে ওরা দুজন আর কুশ কথা বলে, এক সঙ্গে খায়। কুশ বলে, ইচ্ছা করে...

—কুশ! তুই রাগটা কমা।

—বয়ে গেছে। তোর ব্রেনে বরফ!

তিন জনেই হাসে। কুশ বলে, এরপরে একদিন, রওনা দেব বাঁকুড়ায়। ওখানে সেচবিহীন চাষ দেখে আমার...বিপদও তো হল। ও জমিতে কিছুই হত না। আশপাশের লোক দেখে যাচ্ছে, দেখে যাচ্ছে, যদি দেখে সেচবিহীন চাষ বছরে দু'বার করা যাচ্ছে, তাহলে জমি নিতে ঝাঁপ দেবে! এ সব কথা যখন হয়। তার ঠিক সাত বছরের মাথায় কুশ, ভূপতি মাহালি। বরুণ কিসকু, চন্দনাথ

বাউরি ইত্যাদি ইত্যাদি সবাই "জনযোদ্ধা!" নামে খ্যাতি ও প্রচার পায়। কুশকে জেরা করতে সে শুধু বলে, যদি হতে পারতাম।

১১

"পেটিকার ভিতর পেটিকা, তাহার ভিতর পেটিকা। যে পেটিকাই খোপে, একই শয়তান মাথা উটায়, দাঁত খিঁচায় ও নিমেষে অন্তর্হিত হয়। ইহা নব্য বঙ্গোপন্যাসের কাহিনী।"

বাদী অধ্যক্ষ, প্রতিবাদী মেয়েটি। স্থান দ্বিতীয় জেলা জজের এজলাস। আদালতে উভয় পক্ষই হাজির থাকে। মেয়েটি অধ্যক্ষকে দেখতে থাকে, দেখতে থাকে ভুরু কুঁচকে ও মনে মনে বলে, দেখতে তো মানুষেরই মতো!

॥ রায় ॥

"কেসটি সেই মহকুমার দ্বিতীয় মুনসেফ আদালতে দায়ের করা কেসের ফলো-আপ বা অনুক্রমণ। তারিখটি ছিল ৭.৪.৯৪

সে কেসে মেয়েটি এনেছিল কেস।

অধ্যক্ষ ছিলেন প্রতিবাদী।

আজ, অধ্যক্ষ বাদী, মেয়েটি প্রতিবাদী।

ওই কেসে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষক্রম... ওই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে মেয়েটি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মহকুমা দ্বিতীয় মুনসেফের আদালতে মামলা করে। মেয়েটি এক অস্থায়ী ইনজাংশনও চায়। ইত্যাদি... ইত্যাদি...

বাদী অধ্যক্ষের বক্তব্য মেয়েটিকে ভর্তি করা হয়নি ন্যায্য কারণে। মেয়েটি ওই অঞ্চলের বাসিন্দা নয়। সে যে ওখানকার বাসিন্দা, তার সমর্থনে রেশন কার্ডও দেখাতে পারে নি। মুনসেফের সে ক্ষেত্রে "ইনটারিম অর্ডার অফ ইনজাংশন" দেওয়া উচিত হয় নি।"

বর্তমান কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূল কেসে মহিলা বাদী। এবং এ কেসে বিবাদী। ওই কলেজে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হবার জন্য মহিলা আবেদন জানান এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ভর্তি হবার সকল অধিকারই তাঁর ছিল। যদি কোনো অন্য বিবেচনা ঢুকে পড়ে তাঁর ভর্তি হওয়া আটকায়, এবং যদি সে ব্যাপারটা থেকে যায়, তাহলে ন্যায় বিচার ব্যাপারটাই পরাস্ত হয়। মহিলার ভর্তি হবার সকল অধিকার থাকা সত্ত্বেও। তিনি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিনাদোষে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

এ উদ্বেগ তাঁর ছিল। তাই ইনজাংশনের ইনটারিম অর্ডার বের করার অধিকার তাঁর ছিল। আর বিলম্ব করলে ওই অধিকার নষ্ট হত। তাই ওই অর্ডার দিয়ে মুনসেফ কোনো অন্যায় করেন নি।

এখন এই কেস প্রসঙ্গে বলব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহিলা কলেজের কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দা নন। এবং স্থানীয় থানা অধীন অঞ্চলে বাস করেন না। বাদী পক্ষের উকিল ওই যুক্তি দেখিয়ে ভর্তি করার বিরোধিতা করছেন।

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এর চেয়ে আপত্তিজনক ও ঘৃণ্য যুক্তি হয় না। এক প্রার্থী, যে ভারতের নাগরিক, তাকে উচ্চ শিক্ষা, বিশেষত কর্মমূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য "কোথায় বসবাস করে" সেটাকেই যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। ইনি যে ভারতের নাগরিক সে সত্যকে

তো কেউ চ্যালেঞ্জ করে নি? যে কোনো ব্যবস্থায় এক অনাবাসী ভারতীয়, অথবা কোনো বিদেশি উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে পারে। আমি জানি না এক যথার্থ ভারতীয় নাগরিকের বেলা কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন এ রকম প্রাক-শর্ত আরোপ করলেন।

ওঁর বাসস্থান ওই কলেজের কাছাকাছি হতে পারে। না হতেও পারে। সংবিধান অনুমোদিত মৌল অধিকারকে এখানে বিনষ্ট করা হয়েছে। এবং কর্তৃত্ব করার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে তাও জঘন্য ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এমত ক্ষমতা যদি প্রদত্ত হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হবে, এক ভারতীয় নাগরিকের মৌল অধিকার তাতে লঙ্ঘিত হয়।

বাদী পক্ষের কৌঁসুলি আমাকে অন্যরূপ কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখাতে পারেন নি।

আমরা আপিলে দেখছি। সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং ১১৭৪, তাং ২৯.১১.৯০ অনুসারে অ্যাডমিশান সাবকমিটি বসত বাড়ির অঞ্চল সীমায় প্রশ্ন তুলেছিল।

ওই বিজ্ঞপ্তি আদালতে দাখিল করা হয় নি।

আবার বিবাদীর দরখাস্তে দেখছি, তিনি রেশন কার্ডের নম্বর লিখেছিলেন। ওই দরখাস্ত দেবার আগে তিনি এই জেলাতেই অন্য থানা অঞ্চলে থাকতেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয়। বর্তমানে তাঁর শ্বশুরবাড়ি হাবরা থানাতেই। রেশনকার্ড বদলাবার জন্য তিনি দরখাস্ত করেছেন। নির্বাচনী কমিটি এ সব প্রসঙ্গ বিবেচনাই করলেন না এবং "ন্যাচারাল জাস্টিসের নীতি ভঙ্গ করলেন।"

অনস্বীকার্য যে ইনি, ভর্তি হবার যোগ্য সকল প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতা তালিকায় উপরে আছেন। এ সব অযৌক্তিক কারণে তাঁকে ভর্তি না করার অর্থ। উচ্চশিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষাযোগ্য এক প্রার্থীকে বঞ্চনা করা। মুনসেফের হুকুমতের নড়চড় করার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এঁর ভর্তি হবার অধিকার আছে। যদি ইনি ভর্তি হতে চান তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এঁকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে একটি আসন দিতে বাধ্য।

ভর্তি-না-করার আপিলটি নিষ্ফল। এই আদেশটি নিয়ে ও কলেজে যায়।

অধ্যক্ষ ওকে আক্ষরিক অর্থেই "ঘাড়ে হাত দিয়ে বের করে দেন।" বলেন, জেলা জজের হুকুম আমি মানি না। তুমি এখানে ভর্তি হতে পারবে না।

মেয়েটির কাছেও তখন ভর্তি হওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ একটা জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেতা।

—আমাকে ঠেলে বের করে দিল। ভাবতে পারিস?

—পারি। তুই একটু বোস্, একটু জল খা!

—আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে।

—একটু বোস্।

—লোকটা আশা করে বসে আছে। আমার দম চলে যাবে। আমি কেস পারস্যু করব না। ছেলেটি ধমক দেয়। তুই বসবি? একটু জল খাবি? চোখ মুখ ধুবি?

—কেন?

—বাঃ! আজকের ঘটনা পুলিশে লিখে জানাতে হবে না?

—পুলিশ কিছু করবে না।

—লড়াই করে তো দেখছি। ধাপে ধাপে কাজ করতে হয় না। কি বল্?

—আমার মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে রে! একটা সারিডন খাই?

—চল্। বাথরুমে চল্, জামাকাপড় ছাড়্, গায়ে জল ঢাল, মাথা মুখ ধো, সারিডন খেয়ে ঘুমাবি।

—ঘুম আসবে না।

—আমি এনে দেব।

মেয়েটি বিষণ্ণ হাসে,—আমাকে শুধু ভোলাস, তাই না?

—আর কাকে ভোলাব?

বলতে বলতে মেয়েটি শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়েও গেল। ছেলেটি সযত্নে ওর পা দুটো তুলে দিল বিছানায়। কেন, কেন কেন এই অসভ্যতা? কেন সবাই ভাবছে, একটি মুসলিম মেয়ে একটি হিন্দু ছেলেকে যখন বিয়েই করেছে, তখন তো ও স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু হয়ে গেছে।

তবে "হিন্দু" লিখবে না কেন?

কেন লিখবে না স্বামীর পদবি?

এ রকম চিন্তাধারা আজও থাকবে। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে?

শিক্ষায়তনের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে?

তিনি তো জাঁক করে বলেছেন, দরখাস্তটাই নিয়ম মেনে লেখা হয়নি। কে বলে, আমরা সাম্প্রদায়িক? কলেজে হিন্দু-মুসলিম ছেলেমেয়ে পড়ছে না?

আশ্চর্য, এ কেন চলছে, চলছে, একটি মেয়ের ওপর অবিচার, অসভ্যতা, অপমান চলছে, এতে কারো কিছু এসে যায় না কেন?

কেউ কেন ভাববে না, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বিয়ে করেছিল? এমন বিয়ে কি আগে হয় নি?

১৯৩০-এর দশকে, সত্তর-বাহাত্তর বছর আগে হুমায়ুন কবীর বিয়ে করেন শান্তিকে। শান্তি সেদিনের শিক্ষিতা, সাহসী মেয়ে। আজকের প্রজন্ম জানবে না, হুমায়ুন কবীর ভারত সরকারে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বিশাল পণ্ডিত ও দার্শনিক আবু সইয়দ আইয়ুব বিয়ে করেছিলেন গৌরী দত্তকে।

এ না হয় সুদূর অতীতের কথা।

এমন বিয়ে অনেক হয়, অনেক।

কেউ কিছু পদবি পালটায় না সর্বদা।

ওর বন্ধুর দাদা ইন্দ্র সেন বিয়ে করে শাকিলা মাহমুদকে। দুজনে যে যার নামে দিল্লিতে ডাক্তারি করছে। আর অশোকদার ছেলে পর্ণ তো ক'মাস আগে বিয়ে করল সারা আলমকে। কলকাতায় একজন অধ্যাপিকা, একজন অ্যাডভোকেট।

ওরা এখানে থাকে। সকলের চেনাজানা, সে জন্যই কি ওদের মানবিক, যুক্তিবাদী, পরিচ্ছন্ন সংস্কারমুক্ততা এমন অসহ্য লাগছে?

একটা লজের কেয়ারটেকার দাবড়ি দেবে?

একটা কনস্টেবল বলবে, বেশ করেছি?

ওরা না হয় তেমন শিক্ষিত নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কাজ করে না। কিন্তু মানসিকতা তো একই রকম।

ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে খুব!

ঘুমোক, একটু বিশ্রাম পাক মন।

১২

যে ভাবেই হোক, খবরটি 'সংবাদ' হয়।

আর মেয়েটি যায় থানায়, বলে, রিপোর্টি লিখুন। আমার অভিযোগ আছে।

পরে গৌতম আর লালু বলে, আরে! লোকটা তো জানত, যে ওর নামে নালিশ করতে যাবেই যাবে। সমাজে কে বা সুস্থ, সংস্কারমুক্ত, থানা, ওই অধ্যক্ষের কাছেই টুপি পরেছে। সরকার জানুক, না জানুক, এটা তো ঘটনা যে পুলিশ প্রভাবশালী লোকদের গায়ে সহজে হত দেয় না? থানার ও. সি. রিপোর্ট তো লেখেই না। মেয়েটির লিখিত অভিযোগ ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ও বাড়ি এসে মহকুমা অফিসারকে নয় জেলা-সুপারকে সব ঘটনা লিখে জানায় ও প্রতিকার চায়।

সাংবাদিকদের ও সব কথাই বলে।

এখন এ শহরের, এ জেলার একুশটি সংগঠন। সমগ্র ঘটনার তদন্ত ও বিচার চেয়ে স্মারক লিপি দেয় জেলার শাসককে।

তারপর প্রশাসনিক তদন্ত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি মহাবিদ্যালয়, ওরফে কলেজগুলির পরিদর্শক, তিনি এখন সংবাদপত্রে সকলকে জানান, "কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম, ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাগত যোগ্যতা ব্যতীত আর কিছু বিবেচ্য নয়। কোনো মহাবিদ্যালয়কে অন্য কোনো শর্ত আরোপ করবার অধিকার দেওয়া হয় নি।"

মেয়েটি যখন বারবার প্রত্যাখাত ও অপমানিত হচ্ছিল, সে খবর কি পরিদর্শক জানতেন?

জানা যায় না।

ঘটনাটা যে ঘটছে, তা জানতেন?

জানা যায় না।

ঘটনাটি শিক্ষা দপ্তরে জানানো হয়। কিছু বুদ্ধিজীবী কাগজে প্রতিবাদ জানান।

মহাকাল রহে নিরুত্তর। এমন এক ভয়ানক বাস্তবতার কথা জানার পরেও এত নিরুত্তর থাকার কারণ কি?

ক্ষমতাসীন লোকেরা কখনো তাদের নিরুত্তর থাকার "কারণ" জানায় না। এটা ১৯৯৪-এর কথা।

আর পাঁচ বছর বাদে হলে। এ সব অপ্রিয় প্রশ্ন যারা তোলে, তারা জনযোদ্ধা। এ রকম বলা যেত।

এর মধ্যে দুলাল সারের বইটা ছাপা হয়ে যায়।

কুশ বলে, এখন শুধু দাম দিয়ে বিক্রি করব। আর নিজেরা একটা কাগজ করব।

মেয়েটি হাসে, বলে, বিজ্ঞাপন পাবি?

—পাব না মানে? চার দিক থেকে তুলব। সার, বীজ, ইত্যাদির কত দোকান আছে জানিস? ভুলে যাস না. ইংরিজি কাগজে "লাইফ ইজ আ গার্ডেন" পাতায় আমি এবং আমার লঙ্কা গাছদের ছবি বেরিয়েছে।

ছেলেটি বলে, সে তো দেড়মাস আগে। আমরা কেটে এবং খাতায় সেঁটে রেখেছি।

—ওই হল! এমন খবর কি রোজ বেরোবে? হা, হা, আমার ছবিও বেরিয়েছে। এখন আমাকে নিয়ে টি. ভি. সংবাদও হবে। এম. এস-সি. পাশ করে লঙ্কা ফলাচ্ছি সোজা কথা?

—তাতে বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়। ও সব দোকানের নাম করে দেব। যাক গে! আজ চলি ভাই। ও. সি.-কে একটু চমকাবার ইচ্ছে আছে, চমকাব?

মেয়েটি বলে, একদম নয়। পুলিশকে মন্দ ভাবা...

—অগণতান্ত্রিক

—অমানবিক

—প্রতিক্রিয়াশীল।

—তা হলে কী করবে?

মেয়েটি একটু চুপ করে থাকে। তারপর একেবারে অন্য রকম গলায় বলে, কবে এ সব সংকীর্ণতা ঘুচবে? মানুষ কত নিচে নামতে পারে?

কুশ বলে, লোকটা তো নিজেকে "সঠিক কাজ করনেওয়ালা" ভাবছে। ও যে এরকম করছে, তাতে ওর বাড়িতে, এই কলেজে, এই শহরে, রাজনীতিক দলগুলোতে কোনো প্রতিক্রিয়া তো নেই।

—অথচ রাজনীতি করে।

—ছেড়ে দে! সব জ্যোতিষী দেখাচ্ছে, পাথর পরছে, মেয়ের বিয়েতে পণ, নয়তো যৌতুক দিচ্ছে, নিজেদের ছেলেদের বেলাও গুছিয়ে বাগিয়ে নিচ্ছে, আহা, টাকা না হোক, প্লেনে হনিমুনের ব্যবস্থা, স্বদেশে বা বিদেশে কর্মস্থলে যাবার এয়ারটিকেট! মজা কোথায় বল তো?

—কোথায়?

—সবাই একটা অদ্ভুত সুখে ভাসছে। ওরা যা করে, সব সঠিক। যারা ওদের প্রশ্ন করে, সবাই সন্দেহের পাত্র! এইরকম বস্তু সব! একদিকে নিজেদের জীবন গোছাও, মাঝে মাঝে স্লোগান দাও, মিটিং-মিছিল করো, এই তো মজা এখন। এ অধ্যায়টার নাম হচ্ছে মজা পর্ব।

কুশ বলল, তুই ঘুমা।

ছেলেটি বলল, আমি ওকে একটু এগিয়ে দিই।

রাস্তায় বেরিয়ে কুশ বলল, ও অসুস্থ রে! বসে কথা বলতেও ওর কষ্ট হচ্ছিল।

—জানি! এমন একলা পড়ে গেছি! কাজ থেকে ফিরতেও অনেক দেরি হয়।

—অর্ণব মিত্র আছেন না? ভালো ডাক্তার, নীলরতন হাসপাতালেও আছেন।

ছেলেটির বুক কেঁপে যায়। বলে, হাসপাতালে কেন? তোর তাই মনে হয়?

ডাক্তার চেনাশোনা থাকলে, হাসপাতালেই তো ভালো। সব দেখিয়ে নেওয়া যায়! তোরই সুবিধে। তাই না?

—ওর ওপর দিয়ে কি যাচ্ছে, বল?

—তোরা দুজনেই নমস্য।

—আর নমস্য! ওর মতো মেয়েকে...কোনো মেয়ে, কোনো পুরুষকে অকারণ অপমান করা আমি সইতে পারি না....ও তো সবার মতো নয়...এ রকম অর্থহীন, জঘন্য অপমান....

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র! ধর্মনিরপেক্ষতম রাজ্য! কি কদর্য কপটতা, তাই ভাবি!

—রাগতে আরম্ভ করিস না। এত রাগ করে করে তোর কবে যে কি হবে!

—কি আবার হবে? আমার বাঁকুড়া আছে, লঙ্কা আছে, লঙ্কা গাছগুলো ট্রাকে চাপিয়ে চলে যাব কোনো দিন!

—অত লঙ্কা তোরা বাড়িতে খাস?

—আজ্ঞে না; কয়েকটা লট বেচেছি কলকাতার হাই-ফাই রেস্টোরেন্টে। ভালো টাকায়।

—বলিস কি?

—ওরা তো দেখেই অজ্ঞান!

—কি কাণ্ড! তবে ওই কাজটাই কর।

—না রে, সে ভাবে করতে হলে বিশাল জমিতে চাষ করতে হয়। আমি ওতে নেই।

—তা হলে?

—একটা হিন্দি বই পেয়েছি। বর্ষার জল কি ভাবে ধরে রাখা যায়। ভাবছি পাথরডাঙায় ওটা করার চেষ্টা করব।

—তারপর লঙ্কা?

—না না। যা বিনা সেচে হয়... আর কিছু না হোক, সীসল গাছ লাগিয়ে দেব, পাথুরে জমিতেও হয়। পাতার আঁশ থেকে সীসল দড়ি হয়।

—কোনো কিছুই অনেক জমি, অনেক টাকা ইনভেস্ট না করলে হয় না।

—নিরাশ করে দিস না তো! সত্যি, বিয়েও করলাম না, সব কাজকেই নকশা মনে হয়। কিছু করিও না। বাড়িতে থেকে থেকে...

—লাইব্রেরি রীডার্স ক্লাব করছিস না?

—পাড়ার ছেলেদের ইংরেজি আর অঙ্ক শেখাব ভাবছি, মা-বাবাকে বা ছেড়ে যাই কি করে, তা জানি না। বাবার কোনো অসুখ নেই, সর্বদা ভাবে, বেজায় অসুখ। মা কিডনি ট্রানসপ্ল্যান্ট করাল, হেন তেন! সে কিন্তু দিব্যি আছে। হাঁটতে যায় মহিলাদের সঙ্গে। বই পড়ে, টি. ভি. দেখে, খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে। জীবনে আগ্রহ আছে খুব।

—সেটা খুবই ভালো।

—তোদের একদিন নিয়ে যাব।

—দাঁড়া একটু শশা কিনে নিই। ও ভাতের সঙ্গে শশা আর পিঁয়াজ ভালোবাসে।

ও যখন বাড়ি ফেরে, মেয়েটি বলে, শরীর কেমন করছিল, জানিস?

—ডাক্তার ডাকব?

—না...অল্প একটু খেয়ে শুয়ে পড়ি। তুই ওদের খেতে দিস।

"ওরা" মানে অনেক বেড়াল। দুজনেই ভালোমানুষ তা বুঝে বেড়ালরা ওদের সংসারে ঢুকে গেছে। ঘরে থাকে না, খেতে আসে।

—দেব, দেব, তুই ভাবিস না।

যেন 'ভাবিস না" বললে ভাবনা যায়!

১৩

" চিতাও আগুন, চিন্তাও আগুন
চিন্তার আগুন পোড়ায় বেশি।। "

ছেলেটি আর মেয়েটির জীবন এইভাবে আছাড় খাচ্ছিল। মেয়েটিকে বারবার নিতে হয় ডাক্তারের কাছে, সেবার তো হাসপাতালেও রাখতে হল। ফর্ম ভর্তি করার সময়েও "ধর্ম কী?" এবং "স্বামীর পদবি লেখেন নি কেন", সেই একই প্রশ্ন। অবশ্যই অর্ণব ডাক্তার থাকার ফলে একটু সুগম হয় ব্যাপারটা। কুশ রেগে যাবার ফলেও একটু সুবিধে হয়। কুশ সর্বদাই বলে, ওরই মতো কিছু মার্কা না-যুবক, না-প্রৌঢ় আরো আছে। ছেলেটিকে বলল, দেখ, সর্বদা সত্যি বলতে হবে। আমাদের বয়স আটত্রিশই হবে? আমার পিসতুত বোনের ছেলে বলল, তুমি তো বুড়ো! আমরা আমাদের কাছে যুবক, ওদের কাছে বুড়ো।

—সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

ছেলেটির ওপর মেয়েটির মানসিক নির্ভরতাও পৌঁছে গেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। যাস না কোথাও, তুই না থাকলে... ছেলেটির মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েটি বেশ বাচ্চা মেয়ে হয়ে গেছে। এত নির্ভরতা। ও রকম সাহসী. তেজস্বিনী, নিষ্পাপ মেয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে দেখে ওর বুক ছিঁড়ে যায়।

ডাক্তার বললেন, অ্যাংজাইটির ফলে নিউরোটিক হয়ে যাচ্ছেন। তবে মনের জোর আছে, এখনো বিচার চান।

উদ্বেগের ভীষণ চাপে নিউরোসিস? সেটা তো না হওয়াই অস্বাভাবিক। এত হেট-মেইল, বিশ্রী সব চিঠি আসে, ভাবলাম টেলিফোন নিলে একটু বাঁচব, তা ফোনেই হুমকি দেয়।

—কারা ফোন করে, ধরতে চেষ্টা করেন নি?

—করে লাভ?

—পুলিশকে জানালে...

—এ ক্ষেত্রে লাভ হও না।

—দীর্ঘ। দীর্ঘ কাল ওষুধ খেতে হবে। রক্তচাপও ভালো নয়।

—কি করব?

—খাবার নিয়মটা মেনে চলতে পারলে ভালো। ওষুধ তো খেয়ে চলতে হবে। এক মাসের ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, নিয়মিত খাওয়াবেন, যে কোনো দরকারে ফোন করবেন। হয়তো... হয়তো ব্যারাকপুরে আসতে অত কষ্ট হবে না।

মেয়েটি বলল, দেখ, সেদিন বয়স ছিল ছাব্বিশ। ভর্তি হতাম, পাশ করতাম, চাকরি একটা পেয়েই যেতাম। আমাদের জীবনটা অন্য রকম হত। আর আজ...

—আমি আছি তো! বন্ধুরাও আছে। সকলেই ব্যস্ত থাকে, তবে ডাকলে তো পাই।

এরপর মেয়েটির প্রথম কেস, যা মুনসেফ আদালতে হয়, যা জেলা আদালতে ওঠে, সেটি জেলার সেকেণ্ড সিভিল জজের আদালতে ওঠে। সেটা ছিল ফেব্রুয়ারি, ২০০১ সাল। মেয়েটি বাদী, অধ্যক্ষ বিবাদী। মধ্যবর্তী সময়কালে অধ্যক্ষ বারবার সময় নিয়েছেন, যে, তাঁরা প্রস্তুত নন।

মেয়েটির মনে পড়ে প্রথম ইনটারভিউয়ের কথা।

—আমার ভর্তির বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

—সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, ভর্তি হবে না, কারণ, স্থানীয় এলাকার বাসিন্দার একমাত্র প্রমাণ রেশন কার্ড, যা আপনি দেখাতে পারেন নি।

—তা হলে আমি যা যা দেখিয়েছি, তা আবেদনপত্রের ওপর লিখুন।

—লিখলাম।

—১৯৫২ সালে কম্যুনিস্ট হবার অপরাধে সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্‌র স্কটিশচার্চ কলেজে চাকরি হয় নি। আর ১৯৯৩ সালে, আমি ধর্মান্তরিত হইনি। এই অপরাধে আমার ভর্তি নাকচ করলেন?

উত্তরটা কোরাস কণ্ঠে কয়েকজন দেন, প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আদালতে যাও।

পীরের দরগা বা মন্দিরে যাব না, আমি আদালতেই যাব।

মনে পড়ে, মনে পড়ে সব।

২০০০-এর ফেব্রুয়ারিতে জেলার সেকেন্ড সিভিল জজের আদালতে কেস ওঠে। বিচারক রায় দেন, কেসটি তো ৯৩-৯৪-এর শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করার কেস।

(কলেজ কর্তৃপক্ষ বারবার তারিখ নিয়ে ব্যাপারটি ২০০০ সালে ঠেলে এনেছিলেন।)

বিচারক বলেন, ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ কবেই অতিক্রান্ত। এখন বাদীর অভিযোগ আর প্রাসঙ্গিক নেই। অতএব এ কেস এখন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

মেয়েটি নিরানন্দ হেসে বলেছিল, আমি তো জলজ্যান্ত একটা মানুষ, বেঁচেই আছি। আমার জীবনের সাতটা বছর চলে গেল। সেদিন ভর্তি হই, পাশ করি, চাকরি পাই, তাহলে আমাদের জীবনটাও একটু স্থিত হয়। তা হতে দিল না কিন্তু....

—শোন এ কেসে তোকে জিততেই হবে। নইলে এ রাজ্যে আমরা যত লোক থাকি, আমরা মুখ দেখাতে পারব? মিডিয়া ততটা আগ্রহী নয়! যদি এ খবর জাতীয় কাগজে কাগজে বেরোয়, রাজ্যের সম্পর্কে কি ধারণাটা হবে বাকি দেশে? এরা যা করছে, এটা তো মৌলবাদ। মৌলবাদীরাই পারে এতটা কট্টর হতে।

স্বাতী দিদিকে আমি "না" বলে দিয়েছি।

—ঠিক করেছিস। মেয়ে বলে হ্যাটা মারছে, তা তো নয়। মুসলিম বলে হ্যাটা মারছে তাও নয়। মুসলিম ছাত্রছাত্রী যারা পড়তে চায়, তারা তো পড়েই, একটি মুসলিম মেয়ে একটি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে, ওরা সে ভাবেই দেখছে। তাই দেখবে। একটি ছেলে একটি মেয়ে বিয়ে করল,... জাত কি, ধর্ম কি, পদবি কি, সেসবে এসে যায় না কিছু, সে ভাবে একদা ভাবত, রাজনীতির ব্যর্থতার জন্য তা আর ভাবে না।

—যাক, তুইও খেপতে শুরু করিস না।

—আসল কথাটা কি জানিস? আমরা যদি বেজায় হাই-ফাই হতাম, বিশাল পয়সা থাকত, খুবই উচ্চবিত্ত হতাম, —তা হলে কর্তাদের টনক নড়ত।

মেয়েটি বলে, যাঃ! তেমন সমাজের লোক হলে সে মেয়ে কি বি. টি. পড়ার জন্যে এত হাপসাত? তারা অন্যরকম হয়।

—তাও সত্যি! আর এই শহরের মানুষজন! তাদের কৌতূহল আর ফুরোয় না।

আজ মেয়েটি যেন জোর করে চিন্তা, উদ্বেগ, অবিচারের ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে দেয়। বলে, আমার জন্য ভাবিস না আর। আমি ভালো থাকব। কেন বল তো?

—কেন?

—আমাদের দুজনের সব চেয়ে আপনজনদের কথা লিখব, যারা আমাদের সবসময়ের বন্ধু।

—তারা কারা?

—যাদের খেতে দিই? যারা এত ভালো, যে আমার শরীর খারাপ হলে একটুও জ্বালায় না?

তাই বল?

দুজনে হঠাৎ অনেকদিন বাদে খুব মন খুলে হেসেছিল। বলেছিল, সত্যি! আমাদের সংসার তো এই বিড়ালদের নিয়ে, লিখলে ওদের কথাই লেখা দরকার।

মেয়েটি বলে, ওরা চিঠি লেখে না...

—ওরা ফোন করে না...

—ওরা টিটকারি দেয় না...

—ওরা ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিল না...

ওরা প্রথমবার আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বলে নি, পরে তুমি যা লেখো তাই লিখো। এখন ওই "হিন্দু" শব্দটা বসাও, আর স্বামীর পদবিটা লেখো; লিখে ভর্তি হয়ে যাও।

—না ওরা মৌলবাদী নয়।

—আসল রাগটা কোথায় জানিস? কেস কেন করলাম!

—হ্যাঁ... তাই!

আমার কোন দুঃখ নাই রে...শুধু শরীরটা খারাপ হয়ে গেল...জীবন থেকে এতগুলো বছর নিষ্ফল হয়ে গেল।

সময় দাঁড়িয়ে থাকে না...সময় এগিয়ে যায়...২৯/৪/২০০২ মহকুমার অতিরিক্ত জেলা জজের আদালতে কেসটি ওঠে। বাদী মেয়েটি, বিবাদী ওই কলেজের অধ্যক্ষ ও তাঁর সমর্থকরা।

অরুণাভ বলেন, আইন আইনের পথেই চলবে। এখনো তো কোনো নেগেটিভ রায় পাওনি?

মেয়েটি বলল, কোথা থেকে এত সাহস, এত ঔদ্ধত্য, এত সমর্থন পাচ্ছে বলুন তো?

—ঠগ বাছতে গাঁ উজার হবে। একে তো সরকারের শিক্ষাদপ্তর হাত ধুয়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর সমাজের কোনো নাগরিকরা কর্তাব্যক্তিদের ফোন করে একটা সাড়াই পাচ্ছেন। ওকে কেসটা তুলে নিতে বলুন।

না, এরা অন্যায় করে। এবং এদের ভাবমূর্তি যদি কিছু থাকে, ওদের সেটা না কি নষ্ট হয় কেস করলে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবসা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জল না থাকাটা এখন সরকারি নীতি। তা নিয়ে আপত্তি করাটা, বিশেষ কেস করাটা রাজ্যের মুখে কালি মাখানো।

—হ্যাঁ, এদের নীতিই হচ্ছে, প্রতিবাদ কোর না। আমরা কোনো ভুল করতে পারি না।

সময়ের শরীরও জ্বলছিল।

এ তো সেই সময়, যখন গোধরার ব্যাপার নিয়ে গুজরাটে একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করে মানুষকে জ্বালিয়ে মারা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, সংখ্যালঘু নিধনের বিশাল আয়োজন। ব্যাপক ধর্ষণ, শিশু ও নারী হত্যা কয়েক মাস ধরে চলছে।

এই কয়েক মাস ধরেই এ রাজ্যে গুজরাটের নিন্দা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষায় জীবন দানের সংকল্প, সমাজের সকল স্তরে মিছিল-সেমিনার জনসভা পথসভা চাঁদা আদায়, এ সবের বান ডেকে যায়।

শুধু একটি মুসলিম মেয়ে ধর্মস্থানে হিন্দু, আর স্বামীর পদবি না লেখার জন্য নিগৃহীত হতে

থাকে। গুজরাটের ব্যাপারে মৌলবাদকে ধিক্কার, ঘরের মৌলবাদকে জীইয়ে রাখা এ রাজ্যে এক সঙ্গেই চলল।

কারোই মনে হল না, এটা অস্বাভাবিক। এটা ঘোর অন্যায়। ঘরে এটা চলবে, গুজরাটের বেলা "বুকের রক্ত দিয়ে ধর্মান্ধতা রুখব" বলা হবে, এটা যে অনৈতিক সে কথা আমরা সবাই ভুলে গেলাম।

ছেলেটি ও মেয়েটি সে সব মিছিলে সভায় পথসভায় নেমেছে, সেমিনারে গেছে।

এ সবই হয়েছে, কিন্তু এ কেসও তো সত্যি।

২৯.৪.২০০২ অতিরিক্ত জেলা জজের এজলাসে কেস ওঠে। প্রথম কেস থেকেই আদালত বলে এসেছে, ওকে এখনই ভর্তি করা উচিত। এবারও তাই বলে। জজ বলেন, আদালতের হুকুম, ওকে এখনই ভর্তি করতে হবে। পরবর্তী ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ওকে ক্লাস করতে দিতে হবে।

মেয়েটি বলে, এই রায় নিয়ে গেলে আমি কি দেখব, ওরা কি করবে বল তো?

—নূতন কিছু করবে না।

—গুজরাটের বেলা দামামা বাজায়, এদিকে মৌলবাদ জর্জর, এমনই পুরানো বিষ ওদের ভিতরে, যে শোধন করা যাবে না। সর্বত্র...সকলের মধ্যে...কোনোদিন কেউ যদি লেখে, আমার বেলা এই এই করা হয়েছে... জেনে শুনে নীরব থেকেছে সবাই... আবার এখন যারা নীরব... কেউ বিশ্বাস করবে? এরা তো আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিল, তাই না?

ওর গলা ক্লান্ত, ঘুমঘুম। ছেলেটি বলে, ঘুমা তুই, ঘুমা। ওদের কথা ভেবে নিজেকে ধ্বংস করার কোনো মানে হয়?

১৪

"যাহার তোমার বিষাইছে বায়ু"—

তাদের কতটা ক্ষমা করা যায়, কতট ভালোবাসা যায়? এ প্রশ্ন ভগবানকে নয়, মানুষকে।

২৫.৬.৯৩ মেয়েটি প্রথম মামলা দায়ের করে বারাসতের দ্বিতীয় মুনসেফ আদালতে। দ্বিতীয় মুনসেফ আদেশ দেন, ওকে ভর্তি না করলে সেশন শুরু করা যাবে না। অধ্যক্ষ বলেন তোমাকে ভর্তি করছি না। সেশন স্থগিত রাখছি। যেতে পারো। এমন অবস্থায় কেউ কেঁদে ফেলে, কেউ বিমূঢ় হয়ে যায়। আমাদের মেয়েটি বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়েছিল অধ্যক্ষের দিকে।

সরকারের রাজনীতিক দলের লোক, এক শিক্ষাব্রতী, তিনি কি বলেছেন, তা কি জানেন?

এরপর ও চারবার কলেজে গেছে ভর্তি হতে। বিভিন্ন সময়ে গেছে, জেলা আদালতের রায় নিয়ে গেছে। তিনবার রেজেস্ট্রি চিঠি পাঠিয়েছে। কোনো ফল হয়নি। "লেখো, স্বামী হিন্দু তো আমি হিন্দু। নামে শেষে খাতুন কেন? স্বামীর পদবি যা তাই লেখো।" এই বক্তব্যে ওঁরা অনড় থাকেন, থেকে যান।

এর মধ্যে গুজরাটে ভূমিকম্প, কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ ত্রাণের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরমধ্যে গুজরাট জ্বলে যায়। কলকাতা হয়ে যায় মিছিল নগরী, রাজ্য রাজধানী প্রতিবাদে গর্জায়, টাকা তোলে, গুজরাটে যায়। নন্দনচত্বরে চলে লাগাতার সংস্কৃতি উৎসব, কলকাতা মানে এখন চা উৎসব। খাই-খাদ্য উৎসব, ঋত্বিক রোশনকে দেখার জন্য সংস্কৃতির নয়া সৈনিকদের ভয়ংকর ভিড়, বাংলা ও বাঙালির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেয়েদের "ঘোচা" এবং ছেলেদের "ম্যাচো" হবার অভিযান সবই পেতে থাকে রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডদের মার্কসীয় আশীর্বাদ ও অনুমোদন।

এই প্রয়োজনীয় গণ্ডগোল আবহে মেয়েটির কথা ভাববার সময় থাকে না কারো। কোথাও,

কোথাও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ওদের মনকে রাখে অন্ধকার। মনের জানলার ওপার দিয়ে চলছে লেমিনদের দৌড়, তাই দেখতে থাকে। লেমিন এক জাতের ইঁদুর, যারা কালের সতর্কবাণী শুনতে পায়, বুঝতে পারে সূর্য নিভে যাবে, এবং পালে পালে দৌড়ে মহাসাগরে ঝাঁপ মারে। এ ভাবেই পশ্চিমবঙ্গে চলে ঘর ঘর মে দিওয়ালি!

মেয়েটি যে আছে—

সে যে লড়ছে—

সে লড়ছে জঘন্য এক মৌলবাদের বিরুদ্ধে—

তা নিষ্পাপ কিশোররা জানে না—

তাদের বাপ-মা জানে না—

বাপ-মায়ের দাদারা জানে না।

কেন না এখন কিছু না জেনেই চলে যায়।

মেয়েটিও জানে না, সে চুনী কোটালের ঝাণ্ডা হাতে হাঁটছে।

নয়ের দশকের শিকার ছিল চুনী কোটাল। সেও তো স্বামীর পদবি "শবর" লিখত না।

আর প্রশাসনের কাছে বিচার চাইত।

আমাদের মেয়েটি চুনীর মতোই নির্বাচিত শিকার। চুনীর শিকারিরা অন্য জায়গার।

এই মেয়েটির শিকারিরা "কলকাতার কাছেই" থাকে।

২০০২ সালের ৩০ শে মে এবং তেসরা জুন, অতিরিক্ত ষষ্ঠ জজের আদেশ নিয়ে ও ভর্তি হতে যায়।

কলেজে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এবার ওর সঙ্গে এগারো-বারো জন ছিলেন। তাঁরাও চেঁচামেচি করেন। এঁরা আদালতে হলফনামাও করেছেন।

অধ্যক্ষ বলে দেন, আমরা ভর্তি করব না। এটা গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত। জেলা আদালতের আদেশ মানব না। ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাব।

—যতদিন না যাচ্ছে, ততদিনের জন্য ভর্তি করুন!

অধ্যক্ষ দরজা বন্ধ করে দেন।

প্রত্যাখ্যানে মেয়েটি অভ্যস্ত।

তারপর ঘরে ফেরায় অভ্যস্ত।

তার সমর্থনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজন বলেন, শুনলি তো, বললাম, এ আমার মেয়ে! ভর্তি করুন।

শুনেছি কাকা...

এখন ভর্তি করলেও...

মেয়েটি ওঁদের অবাক করে নির্মল, নিষ্পাপ হাসে।

—কাজ করতে পারব না। সময় পাব না .. কিন্তু কাকা! অন্যের জন্য নৈতিকতার জন্য লড়াই কি ছাড়া যায়?

ঘরে এসে ছেলেটিকে বলে, সব গলে পচে বিষাক্ত হয়ে গেছে, জানলি?

স—ব।

তারপর?

তারপর?

অধ্যক্ষ হাইকোর্ট যান।

হাইকোর্ট ওঁর আপিল খারিজ করে দেয়। বলে, এখনই, বর্তমান শিক্ষাক্রমেই ২১/৮ তারিখে ওকে ভর্তি করতে হবে। ভর্তি যে হল, তা হাইকোর্টকে জানাবে কলেজ, জানাবে মেয়েটি।

১৫

মেয়েটি ভর্তি হয়েছে ২১/৮/২০০২

ভর্তি হয়ে চলে এসেছে।

সত্যের খাতিরে বলাই ভালো, "কেস তুলে নেবে, এই অর্থে মুচলেকা দিয়ে ভর্তি হয়ে যাও," এ কথা মেয়েটিকে কে বা কাহারা বারবার বলেছেন। মেয়েটি স্বমতে অনড় ছিল।

লাঞ্ছনা, অসভ্যতা, অপমানের অন্তহীন ঝড় বয়ে গেছে ওদের ওপর দিয়ে।

ওরা মাথা তুলে হেঁটে গেছে।

মেয়েটি জীবনের নয় বছরে নানা রোগের শিকার হয়েছে। আজ সে বি. এড. পড়তে অধিকারী। কিন্তু পড়ে কোনো লাভ নেই। যখন পড়া শেষ হবে, চাকরি সে বয়সে হয় না।

তাতেই কি আজকের সহসা গজিয়ে ওঠা শুভানুধ্যায়ীদের সুপরামর্শের অন্ত আছে?

—ভর্তি হও, ভর্তি হও।

—হয়েছি।

—বি. এড. পড়ো।

—পড়ব না।

—নইলে... দেখলে তো শিক্ষাক্ষেত্রে "ধর্ম" শব্দটাই তুলে দেওয়া হল?

—দেখছি।

—আর কাউকে তোমার মতো...

—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা কি করছিলেন? তাঁদের নিয়মে রেশনকার্ড বা ধর্ম এ সবই ফালতু। যোগ্যতার ভিত্তিই শেষ বিচার্য।

—নিশ্চয়।

—সেদিন কে কোথায় ছিলেন, বলুন? আমার পাশে আপনারা ছিলেন? আর রাজ্য সরকার যে বুদ্ধিজীবীদের আবেদন ১৯৯৩ থেকেই উপেক্ষা করছেন..?

মেয়েটি রিসিভার সরিয়ে রাখে। এখন সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী, ইত্যাদি ইত্যাদির ভিড়। এখন ও ঘুমোতে চায়। ঘুমিয়ে শৈশবে চলে যেতে চায়। শৈশব, বাল্য কৈশোর, যৌবন, ও খুব ভালো করে জানে। পুনরাবৃত্তি হলে ও ঠিক এই রকম জীবনই চাইবে।

এখন ও কিছুদিন ওর বিড়ালদের এলাটিং বেলাটিং সই লো! খেমটা শেখাবে।

ওদের তো প্রগতিশীলতা, ধর্ম-নিরপেক্ষতার মুখোশ নেই। ওদের বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় না।

এই লড়াইটা শেষ। কিন্তু তারপর? আসুক, লড়াই আসুক, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে মাথা নোয়াবে না।

— ০ —

লেখিকার অন্যান্য বই—

তালাক ও অন্যান্য গল্প
শিকার পর্ব
অরণ্যের অধিকার
নৈর্ঋতে মেঘ
অগ্নিগর্ভ
হাজার চুরাশির মা
চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর
ইটের পর ইট
গ্রাম-বাংলা
বন্দোবস্তী
গণেশ মহিমা
ধানের শীষে শিশির
কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু
শালগিরার ডাকে
নীলছবি
জিম্ করবেট অমনিবাস